অন্যরূপ

বিমল মিত্র

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাগরময় ঘোষ

সুহৃদ্‌বরেষু—

লেখকের অন্য রচনা—

সাহেব বিবি গোলাম

পুতুল দিদি

মিথুন লগ্ন

রাণীসাহেবা

কন্যাপক্ষ

মৃত্যুহীন প্রাণ

দিনের পর দিন

টক-ঝাল-মিষ্টি

ভূমিকা

সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থের নাম-পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বড বিরল। বিরল বলেই এ-ক্ষেত্রে লেখকের পক্ষ থেকে একটা কৈফিয়ত দেবার নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এ ভূমিকা তারই দ্যোতক।

আজ থেকে প্রায় এগাবো বছর আগেকার কথা। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের এক অশুভ দিনে 'ছাই' নামে একটি উপন্যাস 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় কুখ্যাত বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। তার জেব কতদিন চলে তা এখন অবশ্য ইতিহাসের তথ্য হয়ে আছে। কিন্তু ঠিক বাজনৈতিক দৈব-দুযোগেব অজুহাতে নয়, সত্যিই একদিন এক অপ্রত্যাশিত শাবীবিক বিপর্যয়ে আমার লেখা বাধ্য হয়ে মধ্যপথে সমাপ্ত করতে হয়। সে ও ১৯৪৭ সালের প্রায় মাঝামাঝি। সেদিন অন্ধ, অচৈতন্য ও সংশয়াপন্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্ত কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। দুর্যোগময় সেই দিনে আমার দু'জন প্রীতিভাজন সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীবিশু মুখোপাধায় ও শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলি একত্রিত করে বর্তমান প্রকাশকের কাছে গচ্ছিত রাখেন। সেদিন নিজের বিড়ম্বনায় আমিও সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, সাহিত্য-ভাবনা থেকেও সমস্ত সম্পর্ক-রহিত। এবং আমি যে আবার কোনদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনরাবির্ভূত হবো এ-সম্ভাবনাও সেদিন ছিল একান্ত সুদূর-পরাহত।

তারপর তার কত বছর পরে কবে একদিন সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ-রূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং কবে একদিন তা নিঃশেষিতও হয়েছে—তা জানার জন্যে আমার যেমন বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা ছিল না, সে-গ্রন্থের নামকরণ নিয়েও তেমনি কোনও দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না আমার।

যা হোক তারপর আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে একদিন খবর পেলাম গ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণের প্রকাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সংস্কার বা পরিমার্জনা যা প্রয়োজন তা করতে হলে আর দেরি করা নাকি চলবে না। অর্থাৎ আবার তখন নিজের পুরানো রচনা নতুন করে পড়বার পালা। নতুন করে আবার পুরানকে চিনতে হলো, নতুন করে আবার পুরানকে অনুভব করতে হলো। বুঝতে পারলাম—এ-গল্প যেমন করে বললে সঠিক বলা হতো তা সেদিন বলা

হয়নি, যেমন করে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সঠিক দেখা হতো তা-ও সেদিন দেখা হয়নি, এবং যেমন করে আরম্ভ করে যেখানে শেষ করলে আদ্যোপান্ত সুগঠিত, সুডৌল, সুগোল একটি গল্পের রূপ নিত তেমনভাবে সেখান থেকে আরম্ভ বা সেখানে শেষ করাও হয়নি সেদিন। তাই সেদিনকার রচনার দোষত্রুটি নিজের চোখেই বারবার প্রকট হয়ে উঠলো। তবে সেদিন উপন্যাস লিখতে লিখতে মধ্যপথে সমাপ্ত করতে বাধ্য হওয়াতে গল্পের যে শেষ অংশটুকু বলার সুযোগ পাইনি—তা বলার সুযোগ এতদিন পরে আবার এল।

গল্প লেখকের সব চেয়ে গুরু দায়িত্ব গল্প নিয়েও নয়, প্লট নিয়েও নয়। দায়িত্ব তার চরিত্রদের নিয়ে। গল্প লেখার সময়ে যে-চরিত্রেরা মাসের পর মাস বা কখনও বছরের পর বছর লেখককে ঘিরে একসঙ্গে বসবাস করে, তার সঙ্গে একত্রে আহার করে, একত্রে বিহার করে, তারা নিজের রক্ত-মাংসের আত্মীয়-পরিজনের চেয়েও বোধকরি বাস্তবতর। কিন্তু আশ্চর্য, বহুদিনের অদর্শনে তাদেরও কেমন যেন হঠাৎ একদিন পর-পর ঠেকে—হঠাৎ তাদের দেখলে যেন চিনতেও কষ্ট হয়। অর্থাৎ হঠাৎ যখন একদিন তারাই এসে প্রশ্ন করে—চিনতে পারছেন?—তখন বিব্রত হয়ে পড়তে হয় গল্প-লেখককে।

আমার অবস্থাও ঠিক তাই হলো।

কাদা, খড়, মাটি, রঙ, তুলি নিয়ে আবার যখন প্রতিমা গড়তে বসলাম তখন প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে মন্ত্রপাঠ, আরতি, প্রভৃতি যা-কিছু করণীয় সে সমস্তই করলাম। আমার তিন বছরেব অক্লান্ত নিষ্ঠায় অবশেষে প্রতিমাও একদিন জাগলেন, পুরান খড়ের কাঠামোতে মূর্তি একদিন আঁখিও মেললেন। ধূপ ধুনো শঙ্খ ঘণ্টায় তিনি একদিন আবার প্রসন্নও হলেন। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম—এ-প্রতিমাকে আমি চিনতে পারছি বটে কিন্তু এ-যেন তাঁর আর এক রূপ! এ যেন তাঁর অন্যরূপ! এ যেন তাঁর অনন্যরূপ!

মনে হলো—আমার মানস-প্রতিমার এই অনন্যরূপের আরাধনা আমি না করলেও, যে-রূপে তিনি জেগেছেন, যে-রূপে তিনি ধরা দিয়েছেন, সেই রূপই তাঁর শাশ্বত হোক, সেই রূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হোক!

তাই এ-গ্রন্থের আজ নতুন নামকরণ করলাম—অন্যরূপ!

বিমল মিত্র

এই আমার প্রথম উপন্যাস। এ আমার প্রথম আত্মপ্রকাশও বলা চলে। প্রথম আত্মপ্রকাশের উচ্ছ্বাস যেমন এতে আছে, তেমনি আছে অনাড়ম্বর আন্তরিকতা। সোজা কথা সরল ভাবে সেদিন বলেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম 'ছাই'। মানুষের জীবনের মর্মদাহ সেদিন যেমন করে আমাকে পীড়িত করেছিল, আর কখনও তা করলো না। হয়ত এর নাম দিতে পারতাম 'অঙ্গার'। কিন্তু ছাই-এর কাছে কি অঙ্গার? ছাই যেন আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ণ, আরো করুণ, আরো কঠোর।

আজ এতদিন পরে সমাজের সেই দিনকার কথাগুলো ভাবছি। সেই যুদ্ধের আগেকার দিনগুলো। সকাল হয় আবার একসময় রাত হবে বলে সন্ধ্যেও হয়। ঘুম থেকে লোক জেগে ওঠে, আবার রাত হয় বলে ঘুমিয়েও পড়ে। খবরের কাগজ খুলে দেখি সব জোলো খবর। কোথাও যুদ্ধ নেই, খুনোখুনি নেই। আমাদের বন্ধুরা যারা ম্যাট্রিক পাস করে আর পড়লো না, তারা চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভূ-ভারতের কোনও অফিসে একটা চাকরি খালি নেই। খালি হবার আশাও কেউ দেয় না। আর ওদিকে মেয়েরা বড় হলে যথারীতি পাত্র পক্ষ থেকে দেখতে আসে। দলের পর দল। সেজে গুজে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, নিচু হয়ে প্রণামও করতে হয়। নাম ধাম বিদ্যে বুদ্ধির পরিচয় দিতেও হয়। তারপর একসময় রসগোল্লা সিঙাড়া খেয়ে তারা চলেও যান। এমনি মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। এই ছিল তখনকার দিনে ছেলে-মেয়েদের জীবনের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই ইতিহাসের পেছনে ছিল সারা বাঙলা দেশের প্রতিভূ কলকাতা।

আজকের দিনের শহর দেখলে বুঝি তাকে চেনা মুশকিল হবে। এখন অবশ্য ভাবতে পারা যায় না তখন সমস্ত রাত বাস চলতো কেমন করে। দোকান-পাট খোলা আছে রাত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। পাঁচ সিকে দিয়ে রেডিমেড সার্ট কেনো, পাঁচ টাকা জোড়া জুতো আর সাড়ে তিনটাকা জোড়া

ধুতি পরে বাবু সাজো। চালের দোকান থেকে বাড়িতে বাড়িতে নানান রকম চালের নমুনা দিয়ে গেছে। চাল যদি কেনেন তো আমার দোকান থেকেই কিনবেন স্যার, সস্তায় দেবো। আবার অচেনা কেউ এসে খোসামোদ করে—'ছেলে পড়ানোর জন্যে মাস্টার দরকার স্যার, মাইনে চাই না, শুধু দু'বেলা খাওয়াটা দেবেন।' মেয়েরা সিনেমায় যাবে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, বাড়ির কর্তা নিজে এসে দরজা-জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে দিয়েছেন। আবরু চাই। মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাবার আগে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে। মা বলেছেন—'কোনও ভয় নেই মা, রাজরাণী হয়ে স্বামীর ঘর করো, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ নিয়ে সুখে থাকো, সাবিত্রী সমান হও।' বছরে মাঘ-ফাল্গুন কি অঘ্রাণ মাসে একবার আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি নেমন্তন্ন হলো তো বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেলো। আতর-এসেন্সের শিশি বেরুল, বেনারসী বেরুল, জ্যাকেট বেরুল, গয়না বেরুল, ছেলে মেয়েরা তিন দিন ধরে ঘুমোচ্ছে না। তাড়াতাড়ি করো সব, সন্ধ্যে বেলা গাড়ি আসবে। একটা দিন মেয়েদের ছুটি। রাঁধতে হবে না। হাসি, গল্প। কে কটা পান্তুয়া খাবে, তারই আলোচনা। উৎসব তখন কালে ভদ্রে। এ-সব ইতিহাস বৈকি! যুদ্ধের আগে যারা কলকাতা দেখেছে, তারা জানে এ-ইতিহাস। এই কবছরের মধ্যেই তা একেবারে রূপ-কথা হয়ে উঠলো। কিন্তু কেন এমন হলো? কোনও রকম করে কষ্টে স্যষ্টে তো চলছিল সব একরকম। তিরিশটাকা মাইনে পেয়ে ছেলের ইস্কুলের মাইনে মেয়ের বিয়ে, জামাইয়ের তত্ত্ব, বউ-এর গয়না, সবই হচ্ছিল। ধার কিছু হচ্ছিল বটে কিন্তু শোধও তো হচ্ছিল। পাশের মাঠে 'গণেশ-অপেরা'র যাত্রা হলে রাত জেগে গিয়ে শুনতো সবাই সপরিবারে। অফিসে বড়বাবুর অত্যাচার ছিল বটে, কিন্তু সেই বড়বাবুর ছেলের পৈতেতে কোমর বেঁধে পরিবেশন করতেও আবার আপত্তি করেনি কেউ। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল একদিন। সব হিসেব বেহিসেব হয়ে গেল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যে বেলায় হৈ হৈ পড়ে গেল কলকাতার রাস্তায়। 'টেলিগ্রাফ' 'টেলিগ্রাফ'! সব লোক একটি করে খবরের কাগজ কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে সেদিন। ফিরে দেখে আরো পাঁচখানি কাগজ আগেই এসে গেছে বাড়িতে। ভাই, ভাইপো, কাকা, নাতি সবাই কিনেছে একখানি করে। আর কোনও কথা নেই কারু মুখে। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ বেধে গেল! যেন ভুতে ঢিল ফেলেছে!

তখনও যুদ্ধটা যে কী বস্তু কেউ ভাবতে পারেনি ! পারলো কয়েকদিন পরে, কয়েকমাস পরে। কয়েক বছর পরে। যুদ্ধ থেমে গেছে আজ কত দিন হলো, তবু তার জের যেন এখনও থামেনি ! আজ এতদিন পরেও সে-দিনকার কথা শুনলে রোমাঞ্চ হয়। মুখর হয়ে ওঠে বুড়ো মানুষেরা। যুদ্ধ এখানে বাধেনি। হাজার মাইল দূর থেকে বারুদের গন্ধ শুধু হাওয়ায় ভেসে এসেছে। কিন্তু তবু যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও আরো মর্মান্তিক সর্বনাশ ঘটে গেছে এখানে। এই কলকাতার ঘরে ঘরে। আমার গল্পের মত কত সদানন্দবাবু, কত সুরুচি, কত মৃণ্ময়ীর জীবনে সে-সর্বনাশ চিরস্থায়ী হয়ে গেছে—কে খবর রেখেছে ! কার দায় পড়েছে !

তাই বলছিলাম—আজকের লোক সে-কথা ভুলে গেছে। কলকাতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইলে কোথাও তার এতটুকু চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকের এই সিনেমা, কোলাহল, ধর্মঘট আর উদ্বাস্তু-সমস্যার পাঁচিল ডিঙিয়ে যদি সুরুচিকে দেখতে চেষ্টাও করি, দেখতে পাবো কি ? দেখতেও যদি পাই—চিনতে কি পারবো ?

কিন্তু দেখতে আমি পেয়েছিলাম। আমার গল্পের যেখানে শেষ হয়েছিল প্রথম সংস্করণে, তার অনেক বছর পরে সুরুচি দেবীকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু দেখা নয়, চিনতেও পেরেছিলাম। তাই এ-উপন্যাসের নতুন সংস্করণে সেই কাহিনীই জুড়ে দিলাম।

এক উদ্বাস্তু-শিবিরের লাইবেরীতে এক সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। যারা পূর্বপাকিস্থান থেকে সর্বস্ব হারিয়ে এখানে নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে, দাঙ্গাবাজিতে নিজের পরমাত্মীয়জনকে হারিয়েছে, তাদের সাহায্যের জন্যেই ছিল অনুষ্ঠান।

সভা আরম্ভ হবার সময় হয়ে গেছে, তবু আরম্ভ হতে পারছে না। যিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন নিরাশ্রয় ছেলে-মেয়েদের জন্যে তাঁর জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছিল। শুনলাম—নাম তাঁর মিসেস চৌধুরী। দান ধ্যান তাঁর চারদিকে। নিজের ব্যবসা আছে। ব্যবসার সমস্ত আয় থেকে তিনি ছোট-ছেলে মেয়েদের জন্যে সর্বস্ব ব্যয় করছেন।

ক্লাবের সেক্রেটারী বললেন—মানুষ তো অনেক দেখলাম মশাই—কিন্তু এমন নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ লোক আর দেখিনি—

ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট্ বললেন—অথচ দেখুন, পূর্ববঙ্গের লোক তিনি নন্। তাঁর আত্মীয় স্বজন, কাজ-কারবার সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে—

লোক-জন জড়ো হয়েছে। সভা জম্-জমাট্। হাজার বিশেক লোকের এক কলোনীতে দাঁড়িয়ে মানবতার বাণী দিতে আমরা ক'জন কলকাতা থেকে এসেছি। কিছু ভালো ভালো কথা শোনাবো, জলযোগ করবো—তারপর ওদেরই খরচে মটরে চড়ে কলকাতায় ফিরবো। কিছু মুখরোচক মিষ্টি মিষ্টি কথা মনে মনে রপ্ত করে নিচ্ছিলাম। শেষে কারো আর দেরি সহ্য হলো না। সবাই ঠিক করলেন—তাঁকে বাদ দিয়েই সভা আরম্ভ হোক! সভা আরম্ভের ঘোষণা হতে যাচ্ছিল।

এমন সময় খবর এলো ·········

কিন্তু সে কথা এখন থাক। মিসেস চৌধুরীর গল্প পরে বলবো। সুরুচি, সদানন্দবাবু আর মৃণ্ময়ীর গল্পই আগে শুনুন।

শহরতলীর এদিকটা অল্প রাত্রেই নির্জন হয়ে যায়। দশ বছর আগে আরো নির্জন ছিল। সবজিবাগানের মাঝখানের পানা পুকুরটায় তখন দিনের বেলায় ব্যাঙ ডাকতো। নটবর দত্তের বাড়ির নর্দমার জল রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে এসে পড়তো পানা পুকুরের ভেতরে। পুকুরের চারিদিকের পাড়ে ছিল কচুগাছের ঘন জঙ্গল—সেই জঙ্গল থেকে একটা হেলে সাপ ছুটে রাস্তা পেরিয়ে চলতে গিয়ে লোকজন দেখে আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়তো! তখন এই চেতলার সঙ্গে বালিগঞ্জের যোগসূত্র ছিল না বললেই চলে।

বালিগঞ্জে তখন আরো জঙ্গল। চেতলার স্কুলের ছেলেরা আদি গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে যেত শশা আর ফুটি চুরি করতে। এখন যেখানে ট্রামরাস্তার চৌমাথা—ওখানে ছিল ক্ষেত। শশা, ঝিঙে, কুমড়ো, ফুটি নানা ফলফুলুরীর ক্ষেত। অনেকদিন ছেলেরা জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতের ভয়ে বেশী দূর যেতে পারে নি, সন্ধ্যা হবার আগেই এপারে চলে এসেছে। কতদিন চেতলায় ডাকাতি হয়ে গিয়েছে আর পরের দিন পুলিস খুঁজতে খুঁজতে চোরাই মালের টুকরো-টাকরা কুড়িয়ে পেয়েছে ওই বালিগঞ্জের জঙ্গলে।

চেতলায় তখন গ্যাসের আলো, পাকা রাস্তা কিছু কিছু আছে—নটবর দত্ত সেই সময়ে এই সবজিবাগানে বাড়ি করেন। বাড়ির সামনে যেখানে এখন তিনটে দোতলা বাড়ি হয়ে গেছে, ওইখানে সেই পুকুরটা ছিল। দিনের বেলা ব্যাঙ ডাকতো—গরীব লোকেরা এসে ওই পুকুর পাড় থেকে কচুর শাক তুলে

নিয়ে গিয়ে রান্না করে খেত। লোকে বল্‌তো—তুষপুকুর। পুকুরের মালিক—শৈল মিত্তির পুকুরটা বুজিয়ে জমি করে বেচতে চেয়েছিলেন। মাটি কিনে তাই দিয়ে বোজান ব্যয়সাপেক্ষ। চেতলার ধানের কল থেকে বিনা খরচে তুষ নিয়ে গাড়ি বোঝাই তুষ ফেলেছিলেন। ইচ্ছে ছিল—একদিন সমস্ত পুকুরটা রাস্তা সমান করে, কাঠা প্রতি তিনশো টাকা দরে বেচে দেবেন।

নটবর দত্ত বলেছিলেন—দিন না, মিত্তির মশাই—একশো টাকায় দিয়ে দিন, ও আমি বুজিয়ে নেব যা তা দিয়ে—আমাকে দিন জমিটা।

শৈল মিত্তির এপাড়ার তখন আদি বাসিন্দা। বললেন—পাগল হয়েছ নটবর—টাকার আমার নেহাৎ খুব দরকার নইলে পড়ে থাকুক না ও জমি, এতো আর মাছ নয় যে বাসি হলে পচে যাবে।—একদিন ওই জমিরই দর পাঁচশো উঠবে, দেখে নিও।

শৈল মিত্তিরের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। পাঁচশো ও-জমির দর ওঠে নি, দু'হাজার উঠেছে। কিন্তু এখন সে নটবর দত্তও নেই, সে তুষপুকুরের মালিকানাও তিনবার হাত বদল হয়েছে। টিম টিম করে বেঁচে আছে শৈল মিত্তির এখনও। চোখের ওপর দেখছে, কী চেতলা কী হয়েছে, কী বালিগঞ্জ কী হয়েছে। আর আপসোস হয়েছে মনে মনে। ভিটের জমি নিয়ে কুড়ি বিঘে জমি ছিল মোট—সেই জমি এখন বেচলে সাত পুরুষ খেটে খেতে হোত না।

ওই বালিগঞ্জের সঙ্গে এ অঞ্চলের যোগসূত্র করবার জন্যে বহুদিন থেকে একটা পুলের কথা চলছে। ওদিকে রাসবিহারী এভিনিউ আর এপাশের সেন্ট্রাল রোডের বরাবর জুড়ে দিলে সুবিধের আর অন্ত থাকে না, কিন্তু বহুদিন থেকে কথা চললেও, আসলে কাজ কিছুই এগোয় নি। সভাসমিতি করে আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে—কিন্তু কে কার কথা শোনে!

সদানন্দবাবুর ছাত্র পড়াতে যাওয়ার অসুবিধে, ডালহৌসী স্কোয়ারে যাদের অফিস তাদেরও যাতায়াতের অসুবিধে। সুরুচির কলেজ যাওয়ার অসুবিধে, শ্মশান যাত্রীদের দেহসৎকার করতে যাওয়ার অসুবিধে। আর অসুবিধে শেখরেরও কম নয়।

অসময়ে বৃষ্টি এসে পড়াতে শেখর চেতলার হাটের টিনের চালার নিচে দাঁড়িয়েছিল।

ও-পাশের তেলেভাজার দোকানে তখন খদ্দেরের আনাগোনা কম। তার

পাশে বেহারী ফলওয়ালী লম্ফ জ্বালিয়ে ফল আগলাচ্ছে। বৃষ্টির ভয়ে গোটা-তিনেক হেটো গরু টিনের চালার তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। একদল ভিখিরী সপরিবারে ইটের উনুন পেতে ভেতর দিকে রান্না চাপিয়েছে। ময়লা ভর্তি হাট—দুপুর বেলা হাট হয়ে গিয়েছে—ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ-ই নেই—তবু হাটময় যেন সারাদিনের কেনাবেচার গন্ধ চারিদিকে হাওয়ায় ভাসছে।

—ও বাছা, একটু সর তো গা—

একটা পাগলি তার সংসার, ছেঁড়া কাঁথা, পুঁটলি, ভাঙা হাঁড়ি, ইট কাঠ নিয়ে এসেছে আশ্রয় নিতে। শেখর চেয়ে দেখলে। দেখে সরে গেল। লজ্জা, সম্ভ্রম, বুদ্ধি, বিবেক সমস্ত যে হারিয়েছে—সে-ও খোঁজে শারীরিক আরাম। এক কোণে বসে পাগলিটা বিড় বিড় করে কি সব বকতে লাগলো।

ঝম্ ঝম্ করে জল পড়ছে—রাস্তায় জল জমে গেল। শেখর দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। এখান থেকে অনেক মাইল দূরে হাজারিবাগের নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলিতে একটি বাড়ির চারিদিকে এখন নীরব অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাইরের গেটে দারোয়ান, অন্দর মহলে একটি বৃদ্ধা পরম নিরুদ্বেগে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাচ্ছেন ঘরে ঘরে। অলিন্দে একটি পুরুষ সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত অথচ সুদৃঢ় পদে পদচারণা করছেন। সেখানকার আকাশ কি এমনই মেঘাচ্ছন্ন? বহুযুগ ছেড়ে আসা পৃথিবীর মত ধূসর তমসাচ্ছন্ন সেই স্মৃতি। পৃথিবীর কক্ষ পরিবর্তনের মত যেন শেখরেরও পরিবর্তন হয়েছে জীবনের। জীবনের কোথাও আজ তার গ্রন্থি নেই—আজকের জীবন তার যেমন উদার ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, তেমনি আতঙ্কিত মুহূর্তের দুঃস্বপ্নে রোমাঞ্চময়! সেদিনের জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের সঙ্গে অনেক তফাত। এই শৃঙ্খলিত দেশ—আজও তারই মত হতভাগ্য! শুধু সুদূর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টি ছাড়া বর্তমানের গর্ব করার মত কিছু নেই! এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে ভেসে যাওয়া, শুধু চলার আর মাথা তোলবার উদগ্র আগ্রহ নিয়ে ছুটে যাওয়া। সে-জীবন শান্ত, অলস, সমাহিত আর এ-জীবন ভীত বিপদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত! কিন্তু এ-জীবন তো শেখর নিজের ইচ্ছাতেই বরণ করে নিয়েছে।

—লাল সুতোর বিড়ি দেখি এক পয়সার—

পাশের দোকানে খদ্দের এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে নেশা করবার লোকের কিন্তু কামাই নেই। দোকানের তীব্র ইলেকট্রিক আলোটা জলসিক্ত

পিচের রাস্তাটাকে আরও মসৃণ করে দিয়েছে। খানিক পরে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। ছাতি মাথায়, রঙিন শাড়ি, রাঙা ঠোঁট, স্নো পাউডার মাখা মুখ।

—লাল সুতোর বিড়ি দেখি তিন পয়সার—এক খিলি বাঙালা পান, আর একটা ক্যাভেণ্ডার সিগ্রেট—

এ পাড়ায় লাল সুতোর খদ্দেরের সংখ্যা বেশী! কে জানে লাল সুতোর মানে কি।

সওদা নিয়ে মেয়েটি চলে গেল। প্রথম খদ্দের দোকানীকে প্রশ্ন করলে—এখানে কবে আমদানি হলো হে? কার?

দোকানী বললে—পুঁটি আগে ভবানীপুরে ছিল, এখন ছোটবাবু এখানে রেখেছে।

—ছোটবাবু?—খদ্দেরটি হতাশার ভঙ্গী করলে—ডুববে এবার, বুঝলে হে, নির্ঘাৎ ডুববে এই তোমায় বলে রাখলুম মতিলাল—

খদ্দের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরিয়ে চলে গেল। ওপাশের বাঁধানো হাটের মেঝেয় একদল মুটে গড়া গড়া শুয়ে পড়েছে। কাল সকালেই আবার উঠতে হবে। দু'একটা রিক্সা পর্দা ঢাকা দিয়ে যাতায়াত করছে ঠুন ঠুন আওয়াজ করে। দু'একটা মোটর—আর সাইকেল। একটা ভক্সহল্ গাড়ি গেল চূড়ান্ত মডেলের - এর আগেকার মডেলটা ছিল শেখরদের। চৌধুরী ছিল তাদের ড্রাইভার।

চৌধুরী যেদিন হাটে যেত, শেখরকে ডাকত।

—খোকাবাবু হাটে যাবে?

সারা সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে সাঁওতালরা হাটে আসত। এক কাঁধে ছেলে, আর এক কাঁধে বাঁকের ওপর শিকল বাঁধা টিয়া পাখী। বিশ ক্রোশ পথ হেঁটে এসে হাট করত তারা। একবার চৌধুরী গাড়ি চালাতে চালাতে একজন মাতাল সাঁওতালকে চাপা দিয়েছিল। তারপর সে কি গোলমাল। গ্রাম কে গ্রাম উজাড় করে সাঁওতালের দল তীর ধনুক নিয়ে এসে চৌধুরীকে খুন করবে বলে হাজির। চৌধুরী তেতলার ছাদের চিলেকোঠাতে লুকিয়েছিল। তারপর থানা পুলিস—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ঘুষ—কত কাণ্ড করে তবে চৌধুরী বাঁচলো। কিন্তু চৌধুরী চাকরি ছেড়ে চলে গেল। ওখানে

থাকলে একদিন চোরা তীর খেয়ে যেত। বাবা তিন মাসের মাইনে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন চৌধুরীকে।

সে-সব কত বছর আগের ঘটনা।

এখন শেখরের সে-পরিচয়টা একেবারে মুছে গেছে। এখানে এখন সদানন্দবাবুর বাড়িতে সে আশ্রিত। শেখরের মনে হয় অদ্ভুত লোক এই সদানন্দবাবু! এপাশে নটবর দত্তের বাড়ি, সামনে শৈল মিত্তিরের বাড়ি, মাঝখানে সদানন্দবাবু থাকেন একতলা বাড়িটিতে। শাদা রঙ-এর একতলা বাড়িটা সুবিধের দিক থেকে এমন কিছু লোভনীয় নয়, কিন্তু এই বাড়িতেই সদানন্দবাবুর কেটে গেল চোদ্দ বছর। চোদ্দ বছরের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেখর জানে না। কিন্তু আজ চার বছরের ইতিহাস সে জানে! এই চার বছরে অনেক কিছুর পরিবর্তন শেখর দেখেছে—কিন্তু সদানন্দবাবুর যেন কোনও পরিবর্তন হবার কথা নয়। সকাল বেলা বেরিয়ে যান ছাত্র পড়াতে, তারপর দশটার সময় একবার ফিরে এসে দুটি ভাত নাকেমুখে গুঁজে দিয়েই আবার যান ইস্কুলে। সেই খিদিরপুর ইস্কুল। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার অবসর হয় না, সোজা চলে যান ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি। তাদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরতে গভীর রাত হয়ে যায়। এমনি প্রত্যহ। প্রতিদিনের ইতিহাসে এর কোনও ব্যতিক্রম দেখে নি শেখর।

মাথায় রুমাল ঢাকা দিয়ে কে একজন দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে ঢুকলো টিনের চালার ভেতর। শেখর চিনতে পারলে। নির্মল।

নির্মলও চিনতে পেরেছে। কাছে এসে বললে—'কে শেখরদা', না?

—হ্যাঁ, কোত্থেকে আসছ নির্মল? শেখর প্রশ্ন করলে।

নির্মল বললে—দেশপ্রিয় পার্কে মিটিং ছিল—

ও—বলে চুপ করলে শেখর। এই মিটিংএর ওপর কোন শ্রদ্ধাই নেই শেখরের। গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে তাতিয়ে দেওয়া যায় নির্মলদের মত ছেলেকে। কিন্তু তাতে দেশের প্রকৃত কোন মঙ্গল হয় না।

নির্মল বললে—আচ্ছা শেখরদা, ধর যদি যুদ্ধই আবার বাধে··তখন আমাদের প্রোগ্রাম কি?

শেখর বললে—প্রোগ্রামের অভাবে দেশ রসাতলে যাবে একথা কেউ বলবে না নির্মল—যে কোন পার্টির প্রোগ্রাম যদি নিষ্ঠা নিয়ে অনুসরণ করা যায়,

তা'হলেই কাজ হয়···কিন্তু সে নিষ্ঠা কারো নেই, সে আন্তরিকতা নেই কারো ·· যখন চরকার হুজুগ উঠেছে, তখনও যেমন, তা'ও কেউ মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি, আবার যখন বোমার হুজুগ উঠেছে তা'ও মনপ্রাণ দিয়ে কেউ গ্রহণ করে নি—শেষ পর্যন্ত স্বার্থবোধ সমস্ত শুভ-চেষ্টাকে পণ্ড করে দিয়েছে।

তারপর একটু থেমে শেখর বললে—কিন্তু আমার আসল মতটা কি শুনবে?

নির্মল কাছে ঘেঁষে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি?

—আমার মতে ক্ষমা অহিংসায় রাজ্য শাসন চলবে না—বিক্রম চাই, হিংসা চাই, যেমন করে পৃথিবীর আর দশটা দেশ বেঁচে আছে, শক্তি সঞ্চয় করছে অন্য শক্তিশালীদের সমকক্ষ হবার জন্যে···চোখ রাঙালে চোখ রাঙাবার জন্যে··· আক্রমণ করলে, প্রতি-আক্রমণ করবার জন্যে—

সামনে দিয়ে একটা মোটর তীব্র হেড লাইট জ্বালিয়ে চলে গেল। তার আলোটা এসে শেখরের প্রদীপ্ত মুখের ওপর পড়তে নির্মল দেখলে—শেখরদার মুখে যেন অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে উঠেছে। শেখরদা যখন বলে এমনি করেই বলে। এমনি দৃঢ়তা, এমনি তেজ সে আর কারো মুখে দেখে নি। ক্ষণিকের জন্যে বিপ্লবী ভারতের এক জীবন্ত বিগ্রহ যেন দেখল নির্মল।

নির্মল বললে—কিন্তু শেখরদা আজকের দিনে এই স্বার্থবোধের দেয়াল কিল মেরে ভাঙতে চেষ্টা করার মত অসম্ভব আর পণ্ডশ্রম নয় কি?

শেখর বললে—যা অসম্ভব বলে আমাদের মনে হয়, তাই সম্ভব করে তোলে শিল্পীরা, বৈজ্ঞানিকরা, নইলে তাজমহলও সম্ভব হোত না সে-যুগে, আর এ-যুগে টেলিফোন, ওয়ারলেস, এরোপ্লেনও সম্ভব হোত না—আসল কথা হচ্ছে প্রেরণা, সেই প্রেরণা চাই,—যে-প্রেরণা ছিল তাজমহলের পেছনে, এরোপ্লেনের পেছনে, গ্রামোফোন রেডিওর পেছনে—নইলে—

শেখর আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেছনের যাত্রার ক্লাবে তখন রিহার্স্যাল শুরু হ'য়ে গেছে। 'ধান্য ব্যবসায়ী সমিতি'র নাট্য বিভাগে পুরোদমে অভিনয়ের মহড়া চলছে। বিভিন্ন বাজনা সহযোগে সখীর দলের সমবেত সঙ্গীত শুরু হলো।

নির্মল টিনের চালের বাইরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—বৃষ্টি বোধহয় ছেড়েছে শেখরদা।

হাট থেকে বেরিয়েই মোড়। চৌমাথার দক্ষিণ দিকে যাবে নির্মল।

বললে—'ব্রতী সঙ্ঘে'র পূজা সাব-কমিটির মিটিং আছে সোমবার, যাচ্ছ তো শেখরদা ?

—দেখি, যদি পারি—বলে শেখর গলির ভেতর ঢুকলো।

সদানন্দবাবুকে সৌভাগ্যবান বলা যায়। নিতান্ত প্রাণখোলা এই খেয়ালী মানুষটির পেছনে যে শক্তি তাঁকে চালনা করে আসছে তা বৃহস্পতি নয়, রবি নয়, বুধ নয়—সে শক্তি তার স্ত্রী মৃন্ময়ী।

একদিন মৃন্ময়ী যখন এ-সংসারে এসেছিলেন, সেদিন নববধূর রূপ রুচি আর শিক্ষা নিয়েই এসেছিলেন। এসে দেখলেন, এ-সংসার তাঁর আগমনের শুভ-কামনায় অপরিহার্যভাবে প্রতীক্ষমান। যেন আসতে দেরি হলে এ অচল হয়ে যেত। ফুলশয্যার রাত্রেই নববধূ যেন এক যাদুমন্ত্রে গৃহিণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

ফুলশয্যার গভীর রাত্রিতে মৃন্ময়ী স্বামীকে জিগ্যেস করেছিলেন—কত টাকার লাইফ ইন্সিওর আছে তোমার ?

ফুলশয্যার রাতে নববধূর মুখে এ-প্রশ্ন যেমন অসম্ভব, তেমনি অবিশ্বাস্য। সদানন্দবাবু তাঁর ইস্কুল মাস্টারি বুদ্ধিতে আজও এ-প্রশ্নের কোনও সমাধান চেষ্টা করলে খুঁজে বার করতে পারবেন না।

মৃন্ময়ী যখন প্রশ্নের উত্তরে শুনেছিলেন যে, লাইফ ইন্সিওর তো দূরের কথা দেনার সুদ দেনাকে ছাপিয়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখনই মনস্থ করলেন যে ক্যাশবাক্সের চাবি আর আয় ব্যয়ের হিসেব—তিনি যদি বাঁচতে চান তো—সমস্তর ভার তাঁকেই নিতে হবে।

সেই দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত সে-সঙ্কল্প প্রতিদিন কাজে পরিণত করে আসছেন। মৃন্ময়ীর শুভ-সঙ্কল্পে বাধা সদানন্দবাবু দেন নি, বরং সুখী এবং নিশ্চিন্তই হয়েছিলেন। বিধবা ননদ গিরিবালা প্রথমে অসন্তুষ্ট হলেও পরে বুঝেছেন বউ সেদিন অন্যায় করে নি।

কিন্তু আজকাল যেন মৃন্ময়ীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে ক্রমে ক্রমে। বিধবা ননদকে যেদিন মৃন্ময়ী মুক্তি দিয়েছিলো—সেদিন থেকে গিরিবালা পূজো পাঠ হরিনাম নিয়ে থাকেন। এখন নতুন করে আবার সংসারের ঝক্কি আর তিনি নিতে পারবেন না।

সদানন্দবাবু যখন ইস্কুলে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, শেখর চলে গেছে অফিসে, সুরুচি কলেজে আর গিরিবালা নিজের চিলে কোঠাটিতে গীতা পাঠে ব্যস্ত, সেই সময় সেই অলস ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে বারান্দায় শুয়ে মৃন্ময়ী মাদুর পেতে রৌদ্রে চুল শুকোতে দিয়ে অনেক দূরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন। একটা চিল অনেক উঁচুতে আকাশের নীলিমার পটভূমিকায় বৃত্তাকারে ওড়ে। তার কর্কশ ধ্বনি মাঝে মাঝে ক্লান্ত বাতাসে মর্ত্যের মাটিতে এসে পৌছোয়—সেই সময় মৃন্ময়ীর বুকটায় হঠাৎ যেন একটা চাপ ধরে। মনে হয় যেন দম আটকে আসবে, যেন শেষ হয়ে যাবে হৃদপিণ্ডের উত্থান পতন, আর নিশ্বাস নেওয়া আর ছাড়া। কখনও বা অম্বল উঠে বুক জ্বালা করে। জ্বলে যায় গলা, পেটের নিচেটা টন্ টন্ করে ওঠে। মৃন্ময়ীর ভয় করে। ভয় করে এই সংসার ছেড়ে চলে যেতে। একটি একটি করে এই সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তার সংগ্রহ করা। এর প্রত্যেকটি বাসন, বাক্স, তোলা-উনুন, বঁটি, হাঁড়ি, কলসী, কুলো, ডালা সমস্ত মৃন্ময়ীর কাছে অপার মমতার সামগ্রী। একটা পাথর বাটি ভাঙলে মৃন্ময়ীর আপসোসের আর সীমা থাকে না। বাসনওয়ালীরা পুরোন কাপড় জামার বদলে বাসন বেচতে আসে। ছেঁড়া কাপড়, তাও মায়া করে মৃন্ময়ীর, ছাড়তে পারেন না। একটা পুরোন ওষুধের খালি শিশি, ভাঙা মগ. কানা-ভাঙা হাঁড়ি কিছুই ফেলতে পারেন না তিনি। সব জমা হয়ে স্তূপীকৃত হয় তাঁর ভাঁড়ারে।

সদানন্দবাবুকে নিয়ে মুশকিল। কোটের বোতামটা কোথায় যে ফেলে আসবেন —যখন একটু আলগা হয় তখনই খুলে পকেটে রেখে দিলে হয়, কিন্তু কোনও দিকে খেয়াল নেই তাঁর! ভোর পাঁচটার সময় উঠে তিনি বেরিয়ে পড়েন, তারপর যখন আসেন তখন বেলা দশটা। তখুনি রান্নাঘরের সামনে একটা পিঁড়ে পেতে নিয়ে বসে যান নাকে মুখে গুঁজতে। বিকার নেই, অরুচি নেই— শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই। গলা বন্ধ কোটের ওপর একটা সিল্কের চাদর ফেলে হন হন করে রাস্তা দিয়ে হাঁটেন। অনেকে দেখেছে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ সদানন্দবাবু থেমে গেলেন, তারপর পকেট থেকে নোট বই পেন্সিল বার করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কী সব লিখতে লাগলেন। তারপর আবার চলা। ইস্কুলের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের নোট লিখলে পয়সা হয়। কিন্তু লেখবার সময় তাঁর কোথায়? এমনি রাস্তা চলতে চলতে লিখেই তাঁর অনেক বই হয়ে গেছে! তারপর এমনি ভুলো মানুষ অনেকখানি নোট

লেখা খাতাখানা একদিন হয়ত ট্রামে বা বাসে ফেলে আসেন। তখন সব পরিশ্রম পণ্ড!

সদানন্দবাবু ভূগোলের মাস্টার। তাঁকে একটি ছাত্র খাতির করে একটা ক্যালেণ্ডার উপহার দিয়েছিল।

সদানন্দবাবু, লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছিলেন। রাখালবাবু ডাকলেন— ও সদানন্দবাবু, হাতে কি?

ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—এই দেখুন—বলে গোটানো ক্যালেণ্ডারটা খুলে সামনে ধরলেন রাখালবাবুর। রাখালবাবু খানিকক্ষণ ক্যালেণ্ডারের ছবিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, হঠাৎ হাত মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন— কৃতার্থ করলেন—বলে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিলেন।

সদানন্দবাবু হঠাৎ এই মন্তব্যের অর্থ বুঝতে পারলেন না। বললেন—কেন, কিসে আমি কৃতার্থ করলাম আপনাকে?

—আপনাকে বলিনি, ছবিটাকে বলেছি—দেখুন ভাল করে। বলে রাখালবাবু চলে গেলেন।

সদানন্দবাবু দেখলেন। তা বটে। বিম্বাধরা এমনই ভঙ্গীতে একটা বাহু, গ্রীবা ও আঁখিপল্লব দুটি উঁচু করেছে যাতে দর্শক মাত্রকেই যেন কৃতার্থ করবার মতলব। সদানন্দবাবু বিচার করে বুঝলেন। মাস্টার হয়ে এমন ছবি তাঁর ছাত্রের কাছ থেকে উপহার নেওয়া অনুচিত, অশোভন হয়েছে। লজ্জা হলো—রাখালবাবু তাকে কি মনে করলেন কে জানে।

লাইব্রেরীতে এসে টিফিনের ঘণ্টায় বিপিনকে ডেকে পাঠালেন।

বিপিন এল। বললেন—এই নাও তোমার ক্যালেণ্ডার নাও, খবরদার এ ছবি ইস্কুলে খুলবে না—ইস্কুলের বাইরে নিয়ে গিয়ে যা খুশি করো—

বিপিন ক্লাস নাইনের ছেলে। হঠাৎ সদানন্দবাবুর মেজাজ দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি যে ক্যালেণ্ডার চেয়েছিলেন স্যার!

সদানন্দবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—খবরদার বলছি, আমি তোমার বাবার বয়েসী, আমার সঙ্গে ইয়ার্কী দিও না—আমি তোমার ইয়ার্কীর পাত্র নই, বুঝলে হে?

কী থেকে কী হয়ে গেল বিপিন বুঝে উঠতে পারলে না। পরের ঘণ্টায় ক্লাস টেন-এর ক্লাস নেবার সময় তারই জের চললো। ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্ক

কষতে কষতে হঠাৎ নজরে পড়লো লাস্ট বেঞ্চিতে বসে বাবুসাহেব ঘুমে ঢুলছেন।

এক ছুটে বাবুসাহেবের সামনে গিয়ে সদানন্দবাবু মাথায় গাঁট্টা মারতে লাগলেন। বাবুসাহেব আচম্‌কা গাঁট্টা খেয়ে একেবারে চমকে উঠেছে। হাত তুলে মাথা বাঁচাতে গিয়ে যত বলে—আর করবো না স্যার, আর করবো না স্যার, ততো সদানন্দবাবু জোরে মাথার ওপর আঘাত করতে থাকেন। তারপর চীৎকার করে বলেন—স্ট্যাণ্ড আপ, স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ!

বাবুসাহেব আঘাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে টপ করে দাঁড়িয়ে উঠলো বেঞ্চির ওপর।

তখন সদানন্দবাবু পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের করলেন। ছোট কাচের শিশি। শিশির মুখের ছিপি খুললেন। খুলে শিশি থেকে খানিকটা জল নিয়ে মাথার ঠিক মধ্যিখানে ব্রহ্মতালুতে থাবড়াতে লাগলেন। বার তিন চার জল দিয়ে ছিপিটা আবার শিশির মুখে আটকে দিলেন। মাথা তাঁর গরম হয়ে গেছে।

বাবুসাহেব খিদিরপুরের শীলেদের বাড়ির ছেলে। কোঁচান ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি আর এলবার্ট টেরি—দেখলেই মনে হয় পড়াশুনো করবার জন্যে আসে না সে। গায়ে সেণ্টের গন্ধ পাওয়া যায়। গাড়ি করে আসে যায়। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো বাবুসাহেব। বাবুয়ানির জন্যেই সদানন্দবাবু তার নাম দিয়েছেন বাবুসাহেব।

তার খানিকক্ষণ পরেই সদানন্দবাবুর যেন দয়া হলো। চীৎকার করে বললেন—বাবুসাহেব ঢের হয়েছে বসে পড়।

বাবুসাহেব ঘেমে উঠেছিল। লজ্জায় অপমানেও বটে, খানিকটা পরিশ্রমেও বটে!

সদানন্দবাবু লক্ষ্য করলেন। বললেন—বাপু হে, তোমাদের ভালর জন্যেই পড়তে বলি, তোমরা যদি না পড় আমার ভারি বয়েই গেল,—ইউ ডোণ্ট কেয়ার, আই ডোণ্ট কেয়ার।

ইস্কুলের ছুটির পর সদানন্দবাবু ট্রামে উঠেই একটা মনোমত জায়গা বেছে বসলেন। তারপর পকেট থেকে নোটখাতা বার করে পেন্সিল দিয়ে লিখতে

লাগলেন। ইংরেজীর একটা র‍্যাপিড রিডিং-এর বই লিখছিলেন, তার কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেছে। এস্কিমোদের দেশে পেঙ্গুইনদের কাহিনী···বরফ-শীতল মেরু প্রদেশ, শিল মাছের চামড়া দিয়ে তৈরী জামা পরে এস্কিমোরা ভেলায় চড়ে চড়ে নির্জন উপত্যকাদেশে গেছে, সেখানে বালির চরের গর্তে অসংখ্য পেঙ্গুইন পাখীর ডিম···

ঘড়াং শব্দ করে ট্রাম থামলো। ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছেন। এখানে পান্নালালের বাড়ি। পান্নালাল সদানন্দবাবুর কাছে হিষ্ট্রি পড়ে। পান্নালালের পর বঙ্কু। বঙ্কুবিহারী পড়ে সংস্কৃত।

ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেবে পড়লেন সদানন্দবাবু।

পড়িয়ে যখন সদানন্দবাবু বাড়ি ফেরেন, তখন অনেক রাত। কিন্তু বাড়ি না ফিরলে শেখর আর সুরুচি বসে থাকে তার জন্যে। তক্তপোশটার ওপর বসে তখন সদানন্দবাবু সুরু করেন - দার্শনিক, ঐতিহাসিক আর সকলের ওপর তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যা।

মৃন্ময়ী রান্না করতে করতে এ-ঘরে এসে এদের আলোচনা শোনেন। কান পেতে শোনেন কিছুক্ষণ! ওরা তিনজন। তিনজনে মিলে ওদের সভা তখন বেশ জমে উঠেছে। হয়ত সুরুচি করছে কাব্য আবৃত্তি—সদানন্দবাবু আর শেখর শুনছে। কখনও শেখর আর সদানন্দবাবুতে তর্ক বেধে গেছে। ভারত-শাসন আইন নিয়ে ন্যায় অন্যায়ের কূট-তর্ক। তখন সুরুচি চুপ করে শোনে। ওরা তর্ক করছে করুক—সুরুচি অত বড় মেয়ে, ওখানে ওদের সঙ্গে ওর থাকা কি দরকার। সদানন্দবাবুকে কতবার বলেছেন তিনি, কিন্তু ওঁর অদ্ভূত সখ। উনি বলেন—মেয়ে বলে কি তুচ্ছ নাকি। ছেলেদের মত সুরুচিরও ইস্কুলে পড়বার অধিকার আছে। মৃন্ময়ীর মনে হয়—তিনি যেন একলা। গিরিবালার বয়স হয়েছে, তিনি নিজের ঘরে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মৃন্ময়ী বাড়ির মধ্যে যেন থেকে থেকে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। যেন সুরুচি এ বাড়ির সন্তান নয়, সে যেন থেকেও নেই। সুরুচি, শেখর, সদানন্দবাবু ওরা সবাই একদলের - মৃন্ময়ী যেন দলচ্যুত। এ-সংসারে তাঁর নির্বাসন হয়েছে—তবু কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হলে মৃন্ময়ী চিন্তিত হয়ে ওঠেন।···এত দেরি করে কি অত বড় মেয়ের বাড়ি ফেরা উচিত!

শহরের আর এক প্রান্তে হলের বারান্দায় সুরুচি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা নিরিবিলি। চারিদিকের কোলাহল এখানে শান্ত হয়ে এসেছে।

অরুণা এসে বললে—আমার এই এটাচি কেসটা ধরনা ভাই, চুলটা খুলে গেছে।

সুরুচি অরুণার এটাচি কেসটা ধরলে। বললে—এখনো রয়েছো যে, কি করছিলে এতক্ষণ?

অরুণা বললে—মলিনার দুল হারিয়ে গেছল, যা কিপ্টে মেয়ে, কেঁদেকেটে অস্থির। কানের দুল খোলাই বা কেন! ফুলের কুণ্ডল তো দুলের ওপরেই পরা যায়!…উষাদি বললেন—দুল না পাওয়া গেলে কেউ যেন বাইরে যেও না।…কি দরকার ভাই আমাদের, ভারি তো চার আনা ওজনের দুল, তারই আবার আদিখ্যেতা?

সুরুচি কিছু বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু অরুণা বাধা দিয়ে বললে—আসল কথা কি জান সুরুচিদি—তোমাকে যে শকুন্তলার পার্টটা দেওয়া হয়েছে, ওই জন্যেই মলিনার যত রাগ।

অরুণার গলার নেকলেসটা স্বল্পান্ধকারে ঝিক্ মিক্ করে উঠলো। আলুথালু চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে অরুণার গাল আর কাঁধের ওপর—রাস্তার ইলেকট্রিক আলোর রেখা ফার্ন আর পাম গাছের আড়াল ভেদ করে অরুণার মুখে এসে পড়েছে। অরুণাকে খুব ভালো লাগলো সুরুচির। অরুণা ডায়োসেসন থেকে ফেল করে এসেছে এ-কলেজে।

সুরুচি বললে—কিন্তু আমার ওপর হিংসে করবার কি আছে মলিনার বল্, ও রায়বাহাদুর বোসের মেয়ে, ওর ভাবী বর বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ছে, ওকে দেখতে ভাল আমার চেয়ে…আমাকে হিংসে করে ওর লাভ কি বল্‌তো অরুণা—

—হিংসে হবে না, প্রিন্স যে তোমার নামে মেডেল য়্যানাউন্স করে গেল…

প্রিন্সের নজরে পড়েছ তুমি, ওকে ছেড়ে প্রিন্স তোমাকে লাইক করবে, এ ত সহ্য করতে পারে না—

সুরুচি বললে কিন্তু প্রিন্সের সঙ্গে কি আমার আজকের আলাপ। ও তো লাস্ট একমাস ধরে আমাকে ফলো করছে, আমিই ওকে আমল দিই না—

—কি জানি ভাই তোমাদের কাণ্ড, আচ্ছা আসি আজ, দেরি হয়ে গেল।

অরুণা এটাচি কেসটা নিয়ে শাড়ী উড়িয়ে চলে গেল।

সুরুচি বারান্দার এককোণে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু শ্রীলতার দেখা নেই। মেয়ের আক্কেল যা হোক খুব! সুরুচি তখনি চলে যেতে পারতো বাসে করে। অভ্যাস আছে সুরুচির বাসে আসা যাওয়া, কিন্তু শ্রীলতা বললে—দাঁড়া ভাই সুরুচি, বাবা মা আর ভাইদের পৌঁছে দিয়েই তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

সুরুচি বলেছিল—না তুই কিছু মনে করিস নে ভাই, আমি বাসে চলে যাচ্ছি—

শ্রীলতা বললে—লক্ষ্মীটি, আমার কথা রাখ, আমি ওদের রেখেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে; দু'ঘণ্টা তোকে জ্বালাতন করবো, আমায় একটু হেল্প করতে হবে ভাই—

হেল্প করতে হবে শ্রীলতাকে। সুরুচি সব কথাই জানে শ্রীলতার। ও একটা ছেলেকে ভালবেসে ফেলেছে। ছেলেটা নাকি একটা জিনিয়স। যেমনি বুদ্ধি তেমনি ব্যক্তিত্ব।

শ্রীলতা বলে—তোর প্রিন্সই বল আর যে-ই বল কেউ তার পায়ের যুগ্যি নয়, আবার নতুন করে যেন পৃথিবীতে জন্মেছে য়্যাডোনিস···তোকে হেল্প করতে হবে সুরুচি—তোকে একদিন সব বলবো, তোকে ছাড়া আর কাকে মন খুলে বলবো বল্—

প্রতিদিন ক্লাসের পরে যেটুকু সময় পায়, শ্রীলতা তার চিঠি দেখায়। কলেজের পরও শ্রীলতা সুরুচিকে ছাড়ে না। য়্যাডোনিসের কথা বলতে শ্রীলতার যেন ক্লান্তি নেই। অনেকদিন সুরুচিকে শ্রীলতার চিঠির উত্তর লিখে দিতে হয়েছে। কত নিশীথ রাত্রির কত গোপন অভিসার-কাহিনী বলে শ্রীলতা। শ্রীলতার উন্মুখ যৌবনের কত রহস্যময় রোমাঞ্চময় কাহিনী। কোথায় দুর্গম পাহাড়ের উপত্যকায় গিরিকন্দরের অভ্যন্তরে ঝড় উঠেছে নব কিশলয়ের

নব পত্রের চঞ্চল গুচ্ছে, সেখানে দিনে সূর্যোদয়ের সমারোহ, রাত্রের নিভৃত অবসরে কোনওদিন চলে পরিহাস-রসান্বিত লুকোচুরি, কোনওদিন সংগ্রাম—বিবেক বুদ্ধি শিক্ষা সংযম বিরহ মিলনের যৌথ সংগ্রাম ! সে-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয় অন্তর কিন্তু পুলকিত হয় সত্তা। শ্রীলতার সেইসব কাহিনী শুনে সুরুচি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হৃদয়ের কোন নিভৃত তন্ত্রীতে কখন অজ্ঞাতে কোন অরূপের হাতের স্পর্শ লাগে, ঝঙ্কার ওঠে অন্তরময়। তারপর চলচ্চিত্রের মত চোখের সমুখ দিয়ে যে-কটা মূর্তি ভেসে যায়, তার মধ্যে আশেপাশের দু'একটা মুখ—পরেশ রমেশ জাতীয় ছেলে ছাড়া আজকের এই প্রিন্স আর শেখরদার নামটাও উল্লেখযোগ্য।

হঠাৎ এই তমসাচ্ছন্ন নগরীকে সুরুচির যেন একটা বিরাট তপোবন বলে মনে হোল। মনে হোল তপস্বিনী শকুন্তলা সে। সে দূর দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে অপস্রিয়মান প্রিয়তম দুষ্মন্তের কথা ভাবছে! কে তার দুষ্মন্ত? কে তাকে তপস্যার অগ্নিযজ্ঞে পবিত্র করে নেবে! প্রিন্স তো এসেছে অনেকবার তার ভিক্ষাপাত্র হাতে করে তার দুর্বার যৌবন, তার অকুণ্ঠ আবেদন নিয়ে! সে কি ক্ষণিক উত্তেজনার আহুতি, না অক্ষয় যৌবনের চিরন্তন উচ্ছ্বাস। শ্রীলতার য়্যাডোনিস, তার দুষ্মন্ত—এরা যেন এখন এই মুহূর্তে বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়াল তার সামনে এসে।

আজ সন্ধ্যার অভিনয়ের কথা মনে পড়লো তার। এমন করে শকুন্তলার ভূমিকা সে যে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছে সে তো শুধু তার নিজের অনুভূতি দিয়ে। যতদিন রিহার্শাল চলেছে, ততদিন সে দুষ্মন্তকে দেখেছে এক স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে। তার দুষ্মন্ত তো কোনও ব্যক্তি নয়, নয় কোনও রক্ত মাংসের মানুষ। সে তো তার অনুভূতি, তার স্বপ্ন, তার একান্ত মানস-লোকের শিল্প সৃষ্টি।

সুরুচি বারান্দা থেকে মুখটা বাড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে—কই, শ্রীলতাদের গাড়িটার তো এখনও দেখা নেই!

হঠাৎ পেছনে পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো সুরুচি।

—ভিক্ষা চাই দেবী—প্রিন্স পেছনে নিঃশব্দে এসে কখন দাঁড়িয়েছে।

সুরুচি হঠাৎ আশা করেনি এতটা। কিন্তু এই তপোবনের পরিপ্রেক্ষিতে খুব খারাপ লাগলো না তার। শ্রীলতার য়্যাডোনিসের কথা মনে পড়লো।

—দুর্বাসা ভিক্ষা চায় দেবী—প্রিন্স হাতের সিগ্রেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সুরুচি পরিহাসচকিত কণ্ঠে বললে—যদি উত্তর না দিই, তাহলে অভিশাপ দেবেন নাকি ?

প্রিন্স যেন অভয় পেলে।

বললে—কলিযুগে অভিশাপের সে তেজ নেই, ফলও দেয় না। সুতরাং ভয় পেয়ো না দেবী, অভিশাপ দেবো না, কিন্তু রাগ করবার অধিকার আমার রইল।

সুরুচি ঘুরে দাঁড়াল।

সোজাসুজি চেয়ে দেখলে প্রিন্সের চোখের দিকে। সুরুচি দুষ্মন্তের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে প্রিন্সের। দুষ্মন্তের তপঃক্লিষ্ট বলিষ্ঠ চেহারার কাছে এ যেন নিষ্প্রভ। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। মোটা চশমার আড়ালে চোখ দুটি তেমন তেজস্বী নয়। শ্রীলতার য়্যাডোনিস্‌কে দেখেনি সুরুচি, বর্ণনায় যতটা শুনেছে, তাতে মনে হয় শেখরদার ব্যক্তিত্বের কাছে সে ছোট। কিন্তু প্রিন্স ? অগাধ টাকার মালিক। কলেজের মেয়েরা অজয় বোসকে প্রিন্স বলেই ডাকে। হপ্তায় হপ্তায় তার গাড়ি বদলায়, পোষাক বদলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় আর প্রেমপাত্রী বদলায় মিনিটে মিনিটে! এই প্রিন্স! কোনও মেয়েকে একাদিক্রমে এক মাস ধরে ভালবাসতে দেখা যায় নি। এই প্রিন্স! সুরুচিকে আজ একমাস ধরে নজরবন্দী করেছে, আজ তাকে অভিনয়ের জন্যে মেডেল দিয়েছে!

সুরুচি প্রিন্সের কথার জের টেনে বললে—রাগ করবার অধিকার আপনার থাক, আমি সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করবো না, কিন্তু রাগের আগে উপসর্গ বসালে তাতে আপত্তি করবো।

প্রিন্স কথাটা লুফে নিয়ে বললে—আমার নিজের জীবনটাই একটা উপসর্গ সুরুচি, আমি আর একটি জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখি। আমি একলা থাকতে পারি না—এই দেখ না, যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে, তোমাকে দেখেই থমকে গেলাম, চাণক্য পণ্ডিতের কথা মনে পড়লো, পথে রত্ন পড়ে থাকলে কুড়িয়ে নেওয়াই উচিত—তা জীবন্ত রত্নকে কুড়িয়ে পকেটস্থ কি করে আর করা যায়—গাড়ি হাজির, যদি অনুমতি হয় তো বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি—

স্বরুচি কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

একটু আগেই সন্ধ্যে হয়েছে। উমাদি ছাত্রীর দল নিয়ে ওদিকে ব্যতিব্যস্ত। এ দিকটা নিরিবিলি—দোতলার এই বারান্দাটা।

স্বরুচি বললে—উপমায় কিন্তু ভুল রইল আপনার—

প্রিন্স আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

বললে - জানতাম 'কুড়িয়ে নেওয়া' কথাটাতে তোমার আপত্তি হবে। কিন্তু আপত্তি তোমার মিথ্যে স্বরুচি, রত্ন সবাই চিনতে পারে না, কারণ সবাই তো জহুরী নয় - তাছাড়া তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই নিরিবিলিতে সামান্য যদি একটু উপমায় ভুলই করে থাকি তো কী আর এমন অপরাধ করেছি? ...প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলবো অথচ আয়-ব্যয় ফুট-ইঞ্চি, সময়-অসময় সমস্ত বিচার করবো, তুমি কি আমাকে তেমনি হতে বলো, স্বরুচি?

স্বরুচি কোন উত্তর দিলে না।

প্রিন্স আবার বলতে লাগলো—হিসেব করে চলা আমার কোনদিন হলো না স্বরুচি! আমার গাড়ির য়্যাকসিলারেটরে যখন পা দিই, তখন হিসেব থাকে না স্পীডোমিটারের দিকে। আমার যখন শখ হয় তখন হিসেব থাকে না পকেটের দিকে। আমার জীবনে কমা আছে, সেমিকোলন আছে, সব আছে, কেবল নেই ফুলস্টপ। যেদিন হিসেব করবো—যদি তেমন দুর্দিনই আসে সত্যি সত্যি—সেদিনই আসবে আমার জীবনে ফুলস্টপ, মৃত্যু হবে আমার সেইদিনই—

স্বরুচির চোখে হঠাৎ যেন প্রিন্সের বে-হিসেবী নেশা লেগেছে।

প্রিন্স সেটা লক্ষ্য করলে। তারপর পকেট থেকে সিগ্রেট কেস বার করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে—একটা গল্প বলি শোন স্বরুচি—গ্রীস দেশের গল্প। ডেমোক্রিটাস বলে একজন ছেলে ছিল সেই দেশে। চাষার ছেলে কিন্তু শৌখীন খুব। সুন্দর লম্বা স্বাস্থ্যবান ডেমোক্রিটাস অনেক মেয়ের স্বপ্নের মানুষ। সব মেয়েই চায় সে একদিন তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু ডেমোক্রিটাসের অদ্ভুত নেশা। তার কেবল সাধ সে উড়বে, পাখীর মত, ঈগলের মত আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াবে।

স্বরুচি বললে—যেমন আপনার শখ—

—তা বলতে পারো। কিন্তু যে কথা বলছিলাম। ডেমোক্রিটাস রাত্রে

শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে—সে উড়ে চলেছে পাখার সাহায্য নিয়ে অনেক দূর, দিক্‌-চক্রবাল পেরিয়ে এথেন্সের পাহাড় নদী উপত্যকা পেরিয়ে সুদূর মঙ্গলগ্রহে। মঙ্গলগ্রহের জনমানবহীন অরণ্যকান্তারের ওপর দিয়ে প্রজাপতির মত ফুলের আর ফলের গন্ধ শুঁকে বেড়াল, তারপর যখন চারিদিক ঘিরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তখন সে পাড়ি দিল পৃথিবীর উদ্দেশে। কিন্তু এসব তো কেবল স্বপ্নই। দিনরাত সে ভাবে কেমন করে সে উড়তে পারবে একদিন। কেমন করে সবার মাথার ওপর দিয়ে সে উড়ে বেড়াবে। একদিন পাহাড়ের ওপরের চূড়োয় গিয়ে উড়তে চেষ্টাও করলে—কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে হাত-পা কেটে একাকার! কিন্তু ডেমোক্রিটাস হাল ছাড়লে না। তারপর সে কি করলে জান সুরুচি? সে একদিন বনে চলে গেল তপস্যা করতে। কী কঠোর তপস্যা তার। শেষে শিল্পের দেবী মিনার্ভা ডেমোক্রিটাসের তপস্যার আকর্ষণে আর থাকতে পারলেন না। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এক সখীকে। সখীটিকে দেখতে অনেকটা তোমার মত সুরুচি। তার নামটা এখন ভুলে যাচ্ছি। সখী এসে ডেমোক্রিটাসের সামনে হাজির। জিগ্যেস করলে—'কী চাই তোমার ডেমোক্রিটাস? আমায় মিনার্ভা দেবী পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।' ডেমোক্রিটাস সখীর দিকে চোখ তুলে চাইলে। চাইতেই মুগ্ধ হয়ে গেল। অনেক মেয়ে দেখেছে ডেমোক্রিটাস, কিন্তু এমন রূপ দেখেনি। অন্ততঃ কেউ তাকে এমন ভাবে অভিভূত করেনি। তার চোখের তারায় যেন যাদু আছে। আর তার চুল,—চুল নয়তো যেন আষাঢ় আকাশের নিবিড় মেঘভার। আর তার দেহ···

সুরুচি হেসে উঠল। বললে—রাধার রূপ বর্ণনা থাক, তারপর হোল কি?

প্রিন্স বললে—তারপর আর কি। তারপর আমি যেমন করেছিলাম, সে-ও তেমনি ভুল করলে। আমি করেছিলাম উপমায় ভুল, সে করলে আরো মধুর ভুল। ডেমোক্রিটাস সখীর কথার উত্তরে কেন তপস্যা করেছিল সব গেল ভুলে। ওড়ার কথা গেল উড়ে। সে বললে—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই—

সুরুচি বললে—তারপর?

প্রিন্স সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—তারপর সে অনেক কাণ্ড—সে সব ঘটনা আমার গল্পের পক্ষে অবান্তর—

সুরুচি মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে—আপনার এ-গল্পের উদ্দেশ্য ?

প্রিন্স বললে—উদ্দেশ্য বা বক্তব্য আমিও কিছু বুঝিনা, বোঝবার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু প্রায়ই আমার এ গল্পটা মনে পড়ে, আর মনে পড়লেই আমার মনে হয় আমি যেন সেই ডেমোক্রিটাস, আর দেবী মিনার্ভা যেন আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে···ডেমোক্রিটাস মিনার্ভার দূতকে যে-প্রশ্ন করেছিল, সে প্রশ্ন আমিও করেছি, কিন্তু—

সুরুচি হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসি আর থামতে চায় না তার। হাসি থামিয়ে বললে—প্রেম-নিবেদনের অনেক রকম পদ্ধতি নভেলে পড়েছি—আপনার সত্যিই ওরিজিন্যালিটি আছে।

তারপর কলকাতার সেই মুখর পল্লীর এক প্রান্তে একটি বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে-রোমাঞ্চ নীরবে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মনের নিভৃতে ঘনিয়ে এল, তা সুরুচির কাছে অভিনব মনে হোল।

এই রোমাঞ্চময় মুহূর্তগুলি অক্ষয় হয়ে থাক—এমন আশা করা যেন সুরুচির কাছে অন্যায় মনে হোল না।

মনে হোল জীবন ও অভিনয় আজ একাকার হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে শকুন্তলার ভূমিকায় দুষ্মন্তের প্রেম নিবেদনে যদি অন্যায় না হয়ে থাকে, এখন প্রিন্সেরও তাহলে কোনও অন্যায় নেই।

প্রিন্স আরো কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, তারপর সুরুচির একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে, হাতের কমনীয়তাটুকু অনুভব করতে লাগলো।

কানের কাছে মুখ এনে প্রিন্স বলতে লাগলো—হে নিরুপমা, চপলতা যদি করে থাকি কিছু করিও ক্ষমা—আমার হয়তো অনেক বদনাম শুনেছ সুরুচি আমি মিনিটে মিনিটে প্রেমপাত্রী বদলাই, কিন্তু তোমাকে আমি বলছি, যারা দশ-পাঁচ দিন পর পর প্রেমপাত্রী বদলায় তাদের চেয়ে মিনিটে যারা বদলায় তারা অনেক ভাল লোক! আমি আত্মরক্ষার অজুহাতে এ কথা বলছি না সুরুচি, তুমি ভেবে দেখ যে প্রিন্স থামতে জানে না, যার জীবনে ফুলস্টপ নেই, যার খরচ হিসেবের পথ ধরে চলে না—সে আজ তোমার কাছে এসে থেমেছে—আমার এ অধঃপতন ভাবো তো একবার!

প্রিন্সের কথাগুলো খুব ভালো লাগছে সুরুচির।

স্বরুচি নিজের হাত টেনে নিলে না।

সেখানে সেই অল্পান্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বরুচির মনে হোল সে যেন এই কলমুখর শহর ছেড়ে অনেক ঊর্ধ্বে অন্য এক লোকে চলে গেছে। আজ যেন সবই ভালো লাগছে তার।

হঠাৎ পেছনে কার গলার আওয়াজ পেয়েই দু'জনে ফিরে তাকালো।

—দেরি হয়ে গেল ভাই রুচি, কিছু মনে করিস্ নে—শ্রীলতা দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছে।

স্বরুচি বললে—তোর আক্কেল তো খুব লতি, আমাকে একলা ফেলে—

সামনে প্রিন্সকে দেখে শ্রীলতা থমকে দাঁড়াল।

তারপর প্রিন্সের দিকে চেয়ে বললে—একলা যে কেমন কাটিয়েছ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি—এখন ভাবছি না এলেই বোধ হয় ভালো করতাম—

প্রিন্স বললে—ভুল করছেন মিস্ সেন, আপনি এসেছেন এমন সময়ে যে-সময়ে একজন কারুর আসা প্রয়োজন ছিল। অনুসূয়া বা প্রিয়ম্বদা কেউ পাশে না থাকলে শকুন্তলাকে মানায় না—সেই কথাই বলছিলাম—

স্বরুচি বলে উঠলো—আচ্ছা, তাহলে আর দেরি করা নয় লতি, মা হয়ত এরই মধ্যে খুব ভাবছেন।

স্বরুচি আর শ্রীলতা যখন গাড়িতে উঠলো—স্বরুচি দেখলে প্রিন্স পেছনে পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের বিদায় দিতে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে।

শ্রীলতা বললে—প্রিন্স বুঝি অঞ্জলিকে ছেড়ে তোকে ধরেছে এবার—দেখিস খুব সাবধান ভাই!

চার বছর আগেকার ঘটনা।

খিদিরপুর ইস্কুলের ঠিকানা নিয়ে শেখর একেবারে ইস্কুলে এসে দেখা করেছিল।

সদানন্দবাবু তখন ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে আসছেন। ক্লাস থেকে আর একটি ক্লাসে যাবার মধ্যে একবার লাইব্রেরীতে এসে বই নিয়ে যাবেন, সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভেবে নিলেন।

সদানন্দবাবুর অকারণে মনে হলো—সিঁড়ির ক'টা ধাপ তিনি তো কোনও

দিন গুণে দেখেন নি। এতদিন এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছেন – সিঁড়ির ক'টা ধাপ তাই-ই তিনি জানেন না। মানুষ নিজে তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কত অজ্ঞ। অথচ ভূগোলের ক্লাসে মেক্সিকো কোথায় ম্যাপে দেখাতে পারেনি বলে পান্নাকে কত বকুনি খেতে হয়েছিল তাঁর কাছে।

এক দুই করে নামতে নামতে সদানন্দবাবু সিঁড়ির ধাপ গুণে যেতে লাগলেন।

কিন্তু গোনা তাঁর শেষ হোল না।

অর্ধেকটা নেমেছেন এমন সময় বাধা পড়ল। সামনে একটি ছেলে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

—এখানে সদানন্দবাবু আছেন ?—ছেলেটি প্রশ্ন করলে!

—আমিই···আমার নাম···কোত্থেকে আসছ ? জিজ্ঞাসা করলেন সদানন্দবাবু।

—আমি গৌরদাসবাবুর কাছে আপনার নাম শুনেছি, তাঁর কাছ থেকেই আসছি—বললে ছেলেটি।

গৌরদাস চক্রবর্তী! সদানন্দবাবুর বিস্ময়ের আর সীমা নেই। সেই গৌরদাস! জীবনে যে গৌরদাস কখনও সেকেণ্ড হয়নি ইস্কুলে। সদানন্দবাবুই বরাবর হতেন সেকেণ্ড। সেই গৌরদাস কুস্তির আখড়া করে ছেলেদের নিয়ে দল করেছিল। তারপর সে অনেক কাণ্ড!

সদানন্দবাবু ছেলেটির আপাদমস্তক ভাল করে দেখতে লাগলেন। খদ্দর-পরা দেহ—গৌরদাসও খদ্দর পরতো। বলতো—খদ্দরে স্বরাজ না আসুক, তবু ওটা পরা ভাল। গৌরদাস ছিল অনুশীলন পার্টির মেম্বর। গৌরদাস যা করতো—সদানন্দবাবুও তাই অনুসরণ করতেন। সেই থেকে গৌরদাসের দেখাদেখি সদানন্দবাবুও আজীবন খদ্দরের জামা-কাপড় ব্যবহার করে আসছেন।

—তোমার নাম ? সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন।

—শেখরনাথ দত্ত। ছেলেটি বললে।

সদানন্দবাবু কী ভেবে বললেন—গৌরদাস আমার কথা বলে ?···মানে, আমাকে তার মনে আছে ?

—তাঁর কাছে আপনার নাম কতবার যে শুনেছি, তার ঠিক নেই। গৌরদাসবাবুর সঙ্গে আপনার একবার ঝগড়া হয়েছিল, দেড় মাস কথা বন্ধ

ছিল, গৌরদাসবাবু সেকথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন। শেষকালে সেই দেড় মাস ঝগড়ার পর—

—তাও বলেছে নাকি ?

সদানন্দবাবুর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো। তারপর আবার বললেন—আমি জানি ওর মেমরি বরাবরই খুব স্ট্রং, ওর ওই স্মরণশক্তির জন্যেই ও বরাবর ফার্স্ট হোত—আর আমি·· তা হ্যাঁ ও আর আমি দু'জনেই গভর্ণমেণ্টের চাকরি এক দিনে ছেড়ে দিলাম, নইলে এতদিন ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতে পারতো···ওই চাকরি করতে করতেই একদিন কি ঘটনা ঘটল শোন—

হঠাৎ সদানন্দবাবুর যেন খেয়াল হলো। এখনি.ত একতলায় হিষ্ট্রির ক্লাস আছে তাঁর।

বললেন—কী নাম বললে তোমার যেন···

শেখর নিজের নামটা আবার বললে।

—হ্যাঁ শেখর, বেশ নাম, আমাদের এক মারহাট্টি বন্ধু ছিল পুণায়, তার নাম বাসুদেব শেখর ডামলে। আমরা তাকে শেখর বলে ডাকতুম, গৌরদাসও তাকে চিনতো, তা পরে তোমাকে সব বলবো'খন, কিন্তু আমার আবার সময় হয়ে গেছে—এখনি একটা হিষ্ট্রির ক্লাস—

শেখর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললে—আপনার বাড়িতে আমি কিন্তু থাকতে এসেছি—

—থাকতে ? তাই নাকি ? তা বেশ তো, আমার তো বাইরের ঘরটা পড়েই রয়েছে, তুমি দিব্যি আরাম করে থাকবে।

যেন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন সদানন্দবাবু, এমনি ভাবে তিনি চাইলেন শেখরের দিকে।

শেখর বললে—চাকরি একটা আমি জোগাড় করেছি—

সদানন্দবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—করেছ—তবে তো ল্যাটা চুকেই গেছে, গৌরদাস যখন আছে তখন আর ভাবনা কি। গরীবদের মা বাপ সবই সে, তা থাকবে এক জায়গায়, আর খাবে আর এক জায়গায়—তাই কখনও হয়—আমার বাড়িতেই খাবে, বুঝলে ?

শেখর বুঝলো।

সদানন্দবাবু বললেন—ছাই বুঝেছ, আমার বাড়ির ঠিকানা জান ? এই নাও

ঠিকানা নাও · বলে একখানা নোটবই-এর পাতা ছিঁড়ে বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

বললেন—তুমি যাও—এইখান থেকে সোজা ট্রামে উঠে যাও—তিন পয়সার টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসে, তারপর আমি যাচ্ছি—

সদানন্দবাবু চলে গেলেন।

শেখর পেছন থেকে চেয়ে দেখলে—ছোট খদ্দরের ধুতি আর গলাবন্ধ কোট পরা আর সিল্কের চাদর কাঁধে সহজ মানুষটি—ঠিক যেমনটি সে শুনেছিল গৌরদাসবাবুর কাছে। হাতে একটি এটাচি কেস। শেখর জানতো সদানন্দ-বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে না। এই মানুষটিকে দেখলে বোঝা যায় না এককালে স্বদেশী করেছেন—সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু গৌরদাসবাবু বলেছেন সদানন্দবাবুর মত মনে প্রাণে এমন অসহযোগী সেদিনকার দলের মধ্যে খুব কমই ছিল। গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—শীতকালের রাত্রে লাহোর জেলের মধ্যে সদানন্দবাবুর গায়ে নাকি বালতি বালতি জল ঢেলেছিল, তবু সদানন্দবাবু একটিবারও হাঁচেন নি।

চার বছর আগেকার কথা সদানন্দবাবুর সব মনে না থাকতে পারে। সুরুচির মনে আছে আর শেখরেরও মনে আছে।

নম্বর খুঁজে, রাস্তার নাম মিলিয়ে, সেদিন শেখর যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—তার সদর দরজার ভেতর থেকে খিল দেওয়া।

সর্পিল গলির একধারে একতলা বাড়িটা।

শেখর এসে সামনে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতর কোনও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। কড়া নাড়বে কিনা ভাবছে, হঠাৎ দেখলে একটি মেয়ে রাস্তা দিয়ে শেখরের দিকে আসছে।

শেখর কি আর তখন জানতো ওর নাম সুরুচি। মেয়েটি রাস্তা দিয়ে এসে ওই বাড়িতেই ঢুকবে নাকি?

শেখরকে দেখে মেয়েটি একটু থমকে দাঁড়াল। মেয়েটির হাতে খাতা আর বই, ইস্কুল থেকে ফিরছে বোঝা যায়। শেখর মেয়েটিকে পথ করে দিতে একটু সরে এলো।

মেয়েটি সোজা গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। দরজা খুলে দিলেন ভেতর থেকে মৃন্ময়ী। আন্দাজে বুঝলো শেখর—উনিই সদানন্দবাবুর স্ত্রী।

খোলা দরজা দিয়ে মেয়েটি ভেতরে চলে যাচ্ছিল—এবং দরজাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

উপায়ান্তর না দেখে শেখর প্রশ্ন করলে—এটা কি সদানন্দবাবুর বাড়ি?

ফিরে দাঁড়াল সুরুচি।

বললে—হ্যাঁ, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—আমি তাঁর কাছ থেকেই আসছি—শেখর বললে।

ভেতর থেকে মৃন্ময়ী কি যেন বললেন, বোঝা গেল না।

সুরুচি বললে—বাবার ফিরতে তো সেই রাত দশটা—

—রাত দশটা? কিন্তু······শেখর যেন মুশকিলে পড়লো। এতক্ষণ সে কোথায়, কি করে কাটায়!

শেখর বললে—তিনিই আমাকে এ বাড়ির ঠিকানা দিলেন, আমাকে আসতে বলে নিজে একটু পরে আসবেন বললেন—

সুরুচি কি আর বলবে। এমন সমস্যার কোন সমাধান আছে কিনা, সুরুচি হয়ত সেই কথাই ভাবছিল। কিম্বা হয়ত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করছিল। বলিষ্ঠ গঠনের খদ্দর পরিহিত ছেলেটিকে দেখে অবশ্য অন্য কিছু সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ থাকে না। সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এমন অনেককেই দেখা গেছে। সদানন্দবাবুর বিগত জীবনের যে ইতিহাস সুরুচি শুনেছে, তাতে এই ধরনের ছেলেদের প্রতি সদানন্দবাবুর ভালবাসা বা স্নেহের অবধি নেই—তাও সুরুচি জানে। রাস্তা থেকে নিরাশ্রয়দের কুড়িয়ে এনে জামা-কাপড়, বিছানা-বালিশ কিনে দিয়ে কত ছেলের জীবনে তিনি অমূল্য উপকার করেছেন। সুরুচি না জানুক শেখর জানে গৌরদাসবাবুর আবাল্য বন্ধুর এ গুণের কথা। গৌরদাস-বাবুর আর সদানন্দবাবুর যেন এই এক বিষয়ে আজও একটি চারিত্রিক মিল রয়েছে—যদিও দু'জনের কর্মক্ষেত্র আজ বিভিন্ন।

শেখর বললে—তাহলে আমি কিছুক্ষণ পরে আবার আসবো।

কিছুক্ষণ মানে যার নাম দু'ঘণ্টা। চেতলার হাট আর বাজারের রাস্তা দিয়ে ওদিকে পরমহংস রোড দিয়ে সেণ্ট্রাল রোডে গিয়ে পড়লো শেখর। সেণ্ট্রাল রোডের ওপরেই পার্ক একটা। তখন বিকেল। ছেলেদের ভিড়

পার্কের ভেতর, চারদিকে বড় বড় শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ। পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার উঠে ঘুরে এল আলিপুরের দিকটায়। ওদিকটা সাহেব পাড়া। শহরের যা' কিছু ভাল পল্লী ওরাই সব একচেটে করে রেখেছে! শেখর দেখলে—অনেকখানি জমি আর বাগান নিয়ে উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়িগুলো। চেতলার সঙ্গে এদিকটা যেন মিশ খেতে চায় না। ওরা রাজার জাত ব'লে রাজসুখ ভোগ করে। গৌরদাসবাবু বলে—ওরা আমাদের সরকারের শ্বেতহস্তী, ওদের দেখলে নমস্কার করতে হয়—না করলে পাপ হয়। বাজারের পাশ দিয়ে যে বস্তীটা বরাবর কোর্টের পেছনে গিয়ে ঠেকেছে—অদ্ভুত ও জায়গাটা। মানুষের মত হাত-পা-মুখওয়ালা জীব সব—কিন্তু যেন মানুষ বলা যায় না ওদের। বস্তীর ভেতর একটা পুকুর—সেই পুকুরে যারা আসে যায় তাদের চেহারা আরও বীভৎস। কতকগুলি মেয়ে। শেখরের দিকে প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে চায় তারা। শেখর বস্তী ছাড়িয়ে ত্রস্ত পায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এপাশে বস্তীটা আর ওপাশে সাহেব পাড়া—মাঝখানে যে-কটা একতলা দোতলা বাড়ি তাতে দু'একটা রেডিও বাজছে, একটু টবে করে ফুলগাছ বসানো। ওরা অল্পবিত্ত। পাশাপাশি এমন দৃশ্য চেতলা ছাড়া আর কোথাও দেখে নি শেখর। ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে গেল শেখরের। সেই সকাল বেলা পাইস হোটেলে ন'পয়সার ভাত খেয়েছে, তারপর যে-কটা পয়সা ছিল ট্রাম ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি সদানন্দবাবুর বাড়ি আশ্রয় না মেলে হয়ত তাকে আবার ফিরে যেতে হবে তাদের পার্টির অফিসে। তাদেরই কাছে হাত পাততে হবে জীবিকার জন্যে। তা হোক, দেশে শেখর ফিরবে না কিছুতেই। গৌরদাসবাবু বলে দিয়েছে—ফকির বন্‌ যা—দেশকে স্বাধীন করতে হলে নিজে ফকির হতে হবে আগে—

হাঁটতে হাঁটতে শেখর আবার ফিরে এল সবজীবাগানে।

বাড়ির দরজা বন্ধ। দরজার কড়া নাড়তেই যে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল শেখর তাকে চিনতে পারলে—সেই মেয়েটি।

শেখর জিগ্যেস করলে—সদানন্দবাবু ফিরেছেন?

—না, এখনও তো ফেরেন নি—বললে সুরুচি।

মুশকিলে পড়লো শেখর। বেশ অন্ধকার করে এসেছে চারিদিক। রাত হয়েছে বলা যায়। শহরের প্রান্তে এসে কপর্দকহীন অবস্থায়

আর কোথাও যাবার কল্পনা করাও অসম্ভব। এখানেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে।

শেখর নিচু দিকে মুখ করে বললে—তাঁর সঙ্গে আমার আজ দেখা হওয়া দরকার—বিশেষ দরকার—

স্থরুচি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বললে—তা'হলে বস্থন ভেতরে।

শেখর মুখ উঁচু করলে। স্থরুচির মুখের দিকে সোজাস্থজি চেয়ে দেখলে। মেয়েটি ধরে ফেলেছে নাকি তার দৈন্ত! শেখরের অসহায় অবস্থা জেনে তাকে করুণা করছে নাকি। শেখর কিছু বুঝতে পারলে না। সোজা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরের একপাশে একটা তক্তপোশের ওপর বিছানা। বিছানার মাথার দিকের দেয়ালে মশারিটা গোটানো রয়েছে একটা পেরেকে বাঁধা দড়িতে। বিছানার পূব দিকের জানালার তলায় একগাদা বই। নতুন চেহারার বই। তক্তপোশের ওপর গিয়ে বসলো শেখর। শেখরকে বসিয়ে স্থরুচি ভেতরে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ তো এই সদানন্দবাবু। অবশ্য গৌরদাসবাবুর কাছে সবই শুনেছে সে। কিন্তু তাকে কথা দিয়ে এমনভাবে না আসা কখনও ভাবতেও পারা যায় না! শেষ পর্যন্ত আজ রাত্রে এখানে থাকার অনুমতি বা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা কে জানে। তাছাড়া এ বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতেই তো সে এসেছে। সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট করে কোনও কথা তো এখনও পর্যন্ত হয় নি।

একটা বই তুলে নিলে শেখর। ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক। 'ইতিহাসের কাহিনী,' লেখক সদানন্দবাবু নিজে। অগ্নিযুগের সেই সদানন্দবাবু। অসম অসহযোগী সদানন্দবাবু ইতিহাসের কাহিনী লিখেছেন। দু'একটা পাতা উল্টে দেখলে শেখর। গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজীর কাহিনী। চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রা—আরও অনেক কাহিনী। একটা নয়—অনেকগুলো বই লিখেছেন সদানন্দবাবু।

হঠাৎ ভেতর থেকে চা নিয়ে ঢুকল সেই মেয়েটি।

নিঃশব্দে চা দিয়ে আবার নিঃশব্দেই চলে গেল। শেখর চায়ের অভাব বোধ করছিল এতক্ষণ। সারাদিনের পরিশ্রমের পর চা খেয়ে বেশ তাজা হোল শরীরটা।

রাত যখন আটটা বেজে গেছে তখন সদানন্দবাবু ঢুকলেন ঘরের ভেতরে।

কাঁধ থেকে সিল্কের চাদরটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বললেন—কি নামটা যেন তোমার বললে? এক ঘণ্টা ধরে মনেই করতে পারছি নে—কি যেন নামটা, কি যেন নামটা—

—শেখর—

—আর বলতে হবে না। শেখর, বেশ নাম···তারপর খদ্দরের গলাবন্ধ কোটটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে উঠে বসলেন তক্তপোশের উপর। বললেন—আমাদের দেশে মহাকবি ছিলেন একজন রাজশেখর নামে, আর আমাদের মারাঠি বন্ধু বাসুদেব শেখর—এবার মনে পড়েছে···তারপর চীৎকার করে ডাকলেন—সুরুচি—সুরুচি—

সুরুচি এল ঘরের ভেতর। শেখরের মনে হোল সুরুচি যেন রাঁধতে রাঁধতে চলে এসেছে। হাতে হলুদের দাগ।

সদানন্দবাবু জামার পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করলেন। শিশিটা সুরুচির হাতে দিতেই সুরুচি সেটি নিয়ে চলে গেল। তারপর একটু পরেই ফিরিয়ে দিলে সদানন্দবাবুর হাতে। সদানন্দবাবু শিশিটা আবার পকেটে রেখে দিলেন।

শেখরের কৌতূহল হোল।—ওটাতে কি আছে মাস্টারমশাই?—জিগ্যেস করলে শেখর।

সদানন্দবাবু যেন শুনতে পেলেন না। বললেন—আমার সেই 'স্বদেশীযুগের ইতিকথা'টা দাও তো মা—একে পড়ে শোনাই, তুইও শোন্ না, ভাল জিনিস দু'বার শুনতে দোষ কি?

তারপর শেখরের দিকে ফিরে বললেন—তুমি ভাবছ ওইটুকু মেয়ে ও ও-সব বুঝবে না, কিন্তু ওকে আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃত শাস্ত্র—ওকে রোজ রাত্রে এসে পড়াই আমি। আমি আরও শেখাতে পারতুম, কিন্তু আমার সময় কই? ওর ইচ্ছে আমার কাছে বাড়িতে পড়বে। ও বলে—ইস্কুলে কি আর পড়া হয়? তা' যেটুকু আমি শিখিয়েছি, তাই ভাঙিয়েই ও জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে—বল্‌তো মা সেই কবিতাটা 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী'···

সুরুচি 'স্বদেশীযুগের ইতিকথা' নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সদানন্দবাবু বললেন—লজ্জা কি, শেখরের সামনে লজ্জা কি—ও গৌরদাসের ছাত্র—আমারই ছাত্র বলতে পারিস—বল্ মা শুনি, শোন শেখর, মন দিয়ে শোন তুমি···

সুরুচি যেন কেমন লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সদানন্দবাবু বললেন—আচ্ছা শেখর, তুমি ওই দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকো তো—ব্যাস্, এবার তো আর লজ্জা নেই বল্—

সুরুচির কণ্ঠস্বর ধীর শান্ত গম্ভীর হয়ে উচ্চারিত হোল—

অয়ি ভুবনমনমোহিনী
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননীজননী ॥

তারপর চোখ দুটো আর দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ রাখতে পারলে না শেখর, অজ্ঞাতে কখন শেখর চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। চেয়ে দেখলে, সদানন্দবাবু একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুরুচির মুখের দিকে আর সুরুচির দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের কড়িকাঠের দিকে—তারই কাছে দেয়ালে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি ···সুরুচির কণ্ঠ আবৃত্তির সঙ্গে প্রয়োজনমত উঁচু নীচু গ্রামে ওঠা নামা করতে লাগলো—

নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী ॥

সদানন্দবাবু যেন এ জগতে নেই। তাঁর দৃষ্টি যেন দ্রষ্টব্যকে অতিক্রম করে সুদূরে পৌঁছে গেছে। সমস্ত ঘরময় নিবিড় স্তব্ধতা—শুধু সুরুচির কণ্ঠের আবেগ বাতাসে আর বায়ুমণ্ডলের ইথারে ভেসে বেড়াচ্ছে। শেখর শুনতে লাগলো—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।

শেখর চেয়ে দেখলে সদানন্দবাবুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। গৌরদাসবাবুর চোখেও এমনি জল ঝরতে দেখেছে সে কতদিন। সুরুচির

দিকে চেয়ে দেখলে—সুরুচির কোন দিকে দৃষ্টি নেই সে একমনে আবৃত্তি করে চলেছে—

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা—বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী—

কখন আবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে সদানন্দবাবুর জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি চোখ দুটো মুছে নিলেন কাপড়ের খুঁট দিয়ে। তারপর শেখরের দিকে চেয়ে বললেন,—এ-কবিতাটা আমার বড় প্রিয় শেখর—সুরুচির আবৃত্তি তো শুনলে, এবার ওর বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা শুনবে ?

তারপর সুরুচির দিকে চেয়ে বললেন—বল তো মা, বৈদিক সাহিত্য ক'ভাগে বিভক্ত ?

সুরুচি যেন পরীক্ষকের সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। সুরুচি শেখরের দিকে লজ্জিত দৃষ্টি দিয়ে চাইলে।

—বল না, লজ্জা কি, ভারী লাজুক ও, বুঝলে শেখর—ওকে সব শিখিয়েছি—কোন্ বেদ সব চেয়ে পুরোন—কতগুলো মন্ত্র আছে কোন্ বেদে—সব জানে, বল মা—বল—

সুরুচি বললে—আমি যে ভাত চড়িয়ে এসেছি—পুড়ে যাবে যে !

—বলতে আর কতক্ষণ লাগে, কত রকমের বেদ আছে বলেই চলে যাবি—তাতে কি ?

সুরুচি বললে—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ্—আমি ভাত নামিয়ে আসি বাবা—বলে সুরুচি চলে গেল।

সদানন্দবাবু বললেন—ওর মা'র অসুখ কিনা, রাঁধতে হচ্ছে ওকেই—সব ওকে শিখিয়েছি—ইস্কুলে কিছু পড়াশোনা হয় না, কিন্তু আমি যে সময়ই পাইনে, এই দেখ না সারাদিন টিউশনি করেই কাটে, বাড়িতে কতক্ষণই বা থাকি—

চার বছরের আগের ঘটনা, কিন্তু সুরুচির সব মনে আছে আজো। সুরুচি রান্নাঘরে এসে যেন বাঁচলো। সদানন্দবাবু গড় গড় করে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সুরুচি ভাতটা নামিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলে—শেখর

একমনে চুপ করে শুনে চলেছে আর সদানন্দবাবুর বক্তৃতা সমান স্রোতে চলেছে।

সদানন্দবাবু বলছেন—এই ধর, তোমার আত্মা যার মৃত্যু নেই, দেহের লয়ের সঙ্গে যার লয় হয় না, অক্ষয় অব্যয় সেই আত্মা…

সুরুচি চলে এল। আবার সেই বক্তৃতা। কতবার শুনেছে সুরুচি সব। রান্না ফেলে সুরুচি আবার এসে দাঁড়াল। সদানন্দবাবু বলছেন—সংহিতার যুগে আমাদের এই পূজো-আচ্চা এমনি জটিল ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণের যুগে যত রকমের যাগযজ্ঞ প্রচলন হোল। তারপর আযধর্মের দার্শনিক ভিত্তি, বিশেষ করে আরণ্যকে আর উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই যুগেই উঠলো একেশ্বরবাদ। এই যে পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড, এর পেছনে অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব সেই প্রথম উপলব্ধি হোল। উপনিসদের দার্শনিক চিন্তাধারায় কর্মফল আর দেহান্তরবাদ—

সদানন্দবাবুর বক্তৃতা শেষ হোল না। সুরুচি এসে বললে—বাবা তোমার ভাত দেওয়া হয়েছে।

সদানন্দবাবু বললেন—একটু পরে, এখন কথা বলছি।

সুরুচি বললে—কথা পরে হবে, ক'টা বেজেছে জান ?

—ক'টা ?

—সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

—তাই নাকি ? তবে ওঠ শেখর, আর দেরি নয়, আগে খেয়ে নাও, তারপরে কথা হবে। যদি আমার কাছে কিছুদিন থাক তেমোকে সব শিখিয়ে দেব—সন্ধ্যাবেলা আমি পড়িয়ে এসে তোমাদের…সদানন্দবাবু উঠলেন।

কিন্তু খাবার জায়গায় সদানন্দবাবু গিয়ে দেখলেন, কেবল একজনের খাবার দেওয়া হয়েছে। বললেন—কইরে, শেখরের জায়গা করিস নি—বোস তুমি শেখর এখানে—আমার…

সদানন্দবাবু রান্নাঘরে যেতেই গিরিবালা গলা নিচু করে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সদা, তুই কি—খবর দিতে হয়তো যে, বাইরের একজন খাবে, আমি আজ খাবো না। আমার একাদশী, বউ-এর অসুখ—ওই মেয়েটার ভাতগুলো দিক …ও সারারাত উপোষ করবে—

তাইতো! সদানন্দবাবুর খেয়ালই হয়নি। উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে

তো কিছু আর মনে থাকে! বললেন—তাহলে আমাকে একটু কম করে দে ভাত ছি ছি—তাহলে তুই কি খাবি সুরুচি? চিঁড়ে দুধ আছে ঘরে?

সুরুচি আর এক থালা ভাত বেড়ে দিয়ে বললে—তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে যা হয় আমি করবো'খন।

এসব চার বছর আগেকার ঘটনা। চার বছর আগে একটি দিনে শেখর এমনি করেই এ-বাড়িতে এসেছিল—তারপর আজও এখানেই রয়ে গেছে। প্রতিদিন রাত্রে সদানন্দবাবু বাড়ি ফিরে শেখর আর সুরুচিকে নিয়ে পড়াতে বসেন। শেখর আসার পরদিন থেকেই যেন সদানন্দবাবু উৎসাহ পেয়েছেন। আগে সুরুচির বিয়ের কথা তবু একটু ভাবতেন, কিন্তু শেখর আসার পর থেকে সে চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করেছেন সদানন্দবাবু। বলেন—বিয়ে হয়ে গেলে তো আর এসব শুনতে পাবে না···তবু যদ্দিন আমার কাছে আছে লেখাপড়া নিয়ে থাকুক, বিয়ের পরে তো আর ওসব চর্চা হবে না—

পিওন বাইরের ঘরের জানালার কাছে এসে চীৎকার করে—চিঠি আছে—

দুরন্ত দুপুর। দূরাগত অপরাহ্নের মৃদুতম সঙ্কেতও নেই এ-দুপুরের আবহাওয়ায়। এই অলস দুপুরের পটভূমিকায় সুরুচিকে দেখা গেল সংসারের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত! বাসন মাজতে মাজতে সুরুচি ছুটে এসেছে এ-ঘরে। চিঠি আর কে তাকে লিখবে। প্রাণতোষ চৌধুরী চাকরি নিয়ে লাহোর চলে গেছে—সে নয়তো। সে চিঠি দেবে কেন—অঞ্জলির সঙ্গে তার তো বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। কিংবা হয়ত প্রীতির বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠি, পাটনায় তার বিয়ে হচ্ছে - সিভিল ম্যারেজ, আই. সি. এস. মিঃ সেনাপতির সঙ্গে। কিন্তু না, এ পিসীমার চিঠি! গিরিবালা দাসী।

পিসীমা থাকেন ওপরের চিলে-কোঠার ছোট্ট ঘরে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে ভাসুর-পো'দের চিঠি।

—ও পিসীমা—সিঁড়ির ঘরের দরজায় গিয়ে সুরুচি ডাকলে।

—কি মা আয় না, ভেতরে আয় না—পিসীমা ডাকলেন। বললেন, মা কেমন আছে তোর? ঘুমুচ্ছে দেখে এলুম—জাগালুম না তাই। ওষুধটা আর একবার খাইয়েছিলি?

তারপর চিঠি নিয়ে বললেন—শম্ভুর চিঠি। দে তো মা, ওই জলচৌকিটাতে ওপর থেকে আমার চশমাটা দে তো

চশমা দিয়ে সুরুচি সোজা নিচে চলে এল। কলতলায় বাসনের কাঁড়ি। সমস্তই সুরুচিকে মাজতে হবে। একদিন মা'র অসুখ করলে সংসার কত কঠিন, সবাই বুঝতে পারে। আর মৃন্ময়ী সুস্থ থাকলে কোথা দিয়ে কোন্ ফাঁকে সব কাজ সমাধা হয়, কেউ জানতেও পারে না। মা যেন যাদু জানে। একলা সবাইকে দেখে, সংসার পরিচালনায় কোথাও কোনও ত্রুটি থাকে না। খেয়ালী সদানন্দবাবুর তত্ত্বাবধান যেটুকু করতে হয়, তাও করেন মৃন্ময়ী। শেখর অফিস যাবে, সুরুচি কলেজে যাবে, গিরিবালার একাদশীর উপবাস- সমস্ত দিকে মৃন্ময়ীর নজর তীক্ষ্ণ। সংসারের কাজ কি কম। উনুনে রান্না চাপিয়েছেন—অফিসের ভাত দিতে হবে, এমন সময় কাচা কাপড় নিয়ে হাজির ধোপা।

মৃন্ময়ী বলেন হ্যাগা তোমার কি কোনও আক্কেল নেই? এখন এই অফিস-কলেজের ভাত দেবার সময় তুমি এলে? এখন কাপড়ের হিসেব কে মিলোয় বলো তো?

একটা চাকর এনেছিলেন সদানন্দবাবু কিন্তু থাকে না কেউ! ঝি একটা আছে ঠিকে, ক'দিন হোল সে-ও কামাই করছে। সমস্ত কাজের ভার পড়েছে সুরুচির ওপর। কলেজ যাওয়া হয় না। ভোরে উঠে শুরু হয়েছে সুরুচির সংসারের কাজ। নিজে হাতে দিয়েছে উনুনে আগুন। বাসি কাপড় কেচে একটা উনুনে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে, আর স্টোভে করেছে চায়ের গরম জল।

শেখর আরও ভোরে উঠে বেড়াতে যায়। বেড়িয়ে যখন ফেরে, তখন সুরুচির চা-এর জল গরম হয়ে গেছে। সদানন্দবাবুর চায়ের অভ্যেস নেই—তিনি স্নান করেই বেরিয়ে গেছেন ছাত্র পড়াতে। চা খেয়েই শেখরের বাজারে যাবার পালা।

মৃন্ময়ী সুস্থ থাকলে বলেন—এই দেড় টাকা তোমায় দিলাম শেখর এরি মধ্যে তোমায় সব করতে হবে—মাসের শেষ দিক, এর বেশী দিতে প্যারবো না।

বাজার করে ফেরার পর শেখর হিসেবটা লিখে ফেলে। তারপর পড়াতে বসে সুরুচিকে।

হিষ্ট্রি পড়াতে পড়াতে শেখর বলে—ব্রিটিশ, গ্রীক আর রোমের ইতিহাস

পড়ছ তোমরা, এক-একটা দেশের আর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী পড়ছ ··দেখছ দেশে দেশে শুধু হানাহানি আর খুনোখুনির ইতিহাস···এই পৃথিবী যেদিন প্রথম সমুদ্রস্নান থেকে উঠলো, সেই শুভ দিনটি থেকে শুরু হয়েছে পররাজ্য অধিকারের—আর সে দেশের লোকেদের দাস করার ইতিহাস। সেই রোমুলাস থেকে শুরু করে জুলিয়স সিজার, জুলিয়স সিজার থেকে মুসোলিনী সকলেরই এক পথ !

বলতে বলতে শেখরের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে আসে, সে যেন ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ···শত শত কলঙ্ক গৌরবের কাহিনী তার বুকে আঁকা আছে। সে বলে—যেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়বে দেখবে পৃথিবীতে এই মাত্র একটি দেশ, যারা বাইরের কোনও দেশকে যুদ্ধ করে জয় করবার চেষ্টা করেনি। একদিন এই ভারত থেকে আমরা গিয়েছি সুমাত্রা, জাভা, বর্মা, কম্বোডিয়ায়,—সে ছিল আমাদের সংস্কৃতির তাগিদ। হিমালয় অতিক্রম করে একদিন বাঙালী মনীষী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে—সে-ও ছিল সংস্কৃতির তাগিদ। কিন্তু কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ড্রেক—ওরা চেয়েছিল রাজ্য বিস্তার। দ্রাবিড় আর্য পারসিক গ্রীক শক পহ্লব কুষাণ আরব তুর্কী আর আফগান এরা আমাদের দেশের ওপর বার বার আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে।—তারা সম্পূর্ণ সফল হয় নি, শেষে এল বণিকবেশী ইংরেজ। বণিকের মানদণ্ড একদিন দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে !

সুরুচি শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায়। শেখর যখন বলে—তখন মাত্রা থাকে না তার। রবার্ট ক্লাইভ থেকে শুরু করে চলে আসে সিপাই বিপ্লবে। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য বিস্তারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি আর নানা সাহেবের দেশপ্রীতি আর হতভাগ্য বাহাদুর শার শেষ পরিণতি। বলতে বলতে শেখরের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে।

তারপর সামলে নিয়ে বলে—শুনছি আবার নাকি যুদ্ধ বাধবে। যুদ্ধ যদি বাধে সুরুচি, সে যুদ্ধে আমাদের কল্যাণ হবে—এ তোমায় বলে রাখছি ; অনেক দুঃখ কষ্ট নির্যাতন আমাদের সহ্য করতে হবে—অনেক দুর্ভিক্ষ, অনেক মহামারী; অনেক রক্তপাতের এখনও প্রয়োজন। আগামী যুদ্ধে আবার এই দেশের মধ্যে থেকেই ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ উঠবে, তাঁতিয়া টোপি আর নানা সাহেব উঠবে—সেদিন যদি দেশের ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে থাকে, ঠিক সময়ে দেশের

বৈদেশিক রাজশক্তিকে আঘাত করতে না পারে, তবে জানবে আমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে আরও —

তারপর শেখর হঠাৎ মাঝপথে থেমে যায়—যেন সচেতন হয়ে ওঠে। বলে —থাকগে, কী বলতে বলতে কি সব বলে ফেলেছি —

কিন্তু স্বরুচি তখন ভাবে অন্য কথা। সেই প্রিন্স আর এই শেখরদা'—এদের মধ্যে কে সত্য ? দুজনেরই নেশা! একজনের জুয়ার নেশা, ঐশ্বর্য, প্রেম, বিলাসিতা, অর্থের নেশা আর একজনের দেশসেবার নেশা। সারাদিন যেন সে বন্দী। যেন স্বাধীনতা নেই শেখরদার। শেখর যখন ঘুমিয়ে থাকে ঘরের ভেতর—স্বরুচি দেখেছে তখনও সে যেন ওই সব স্বপ্ন দেখছে।

আজ কিন্তু পড়তে বসা হয়নি মৃন্ময়ী হয়েছেন শয্যাশায়ী। সকাল থেকে সংসারের ভার নিতে হয়েছে স্বরুচিকে। মার ঘরে গিয়ে স্বরুচি দেখলে—জেগে উঠেছে মা। মৃন্ময়ী জিগ্যেস করলেন—কী রাঁধলি ? কাল বড়ির জন্যে ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, কি করলি সেগুলো ? দুধ দিয়েছে গয়লা ?

মৃন্ময়ীর সহস্র প্রশ্ন। অসুখের মধ্যে পড়েও সাংসারিক খবরাখবর তাঁর কাছে অপরিহার্য।

স্বরুচি বললে—কেমন আছ মা এখন ?

এমন শয্যাশায়ী হওয়া মৃন্ময়ীর প্রথম নয়। এমন প্রায়ই হয়ে থাকে। প্রথম যখন শুরু হয় তখন বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয় পেয়ে যেত। ধড়ফড় করে ওঠে বুকটা, মনে হয় যেন এখনি দম বেরিয়ে যাবে। প্রথমটা খুবই কষ্ট হয় মৃন্ময়ীর, তারপর একটা বাঁধা ওষুধ আছে সেইটে খেলেই একটু কমে আসে। কিন্তু তবু দু'তিন দিন মৃন্ময়ী উঠতে পারেন না—শুয়ে থাকতে হয় তাঁকে।

মৃন্ময়ী ডাকলেন—একটু কাছে সরে আয় তো মা।

স্বরুচি বিছানার পাশে মার কাছ ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল।

—এই কপালের এই জায়গাটায় একটু হাত বুলিয়ে দে তো মা—স্বরুচির হাতটা টেনে নিলেন মৃন্ময়ী।

স্বরুচির অদ্ভুত মনে হয় এই মার চরিত্র। সন্তান, সংসার, আর্থিক সাচ্ছল্য ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারে না এরা যেন। কোথায় পৃথিবীতে মানুষ করছে মানুষের ওপর অত্যাচার, কোন্ রাষ্ট্রের উত্থানপতন হোল, কোথায় আবিসিনিয়ার হাইলে সেলাসী সিংহাসনচ্যুত হোল মুসোলিনীর চক্রান্তে, কিম্বা

লজিকের সিলজিসম্, সিভিকস্-এর ফেডারেশন আর কনফেডারেশনের তফাৎ, অথবা হিস্ট্রির টিউটনিক পিরিয়ড—কিছুই এদের জানবার দরকার নেই। বেশ আছে মা। শুধু মাছের ঝোলে কতটুকু জিরে-ফোড়ন দিলে সুস্বাদু হয়, ফুলকপির বড়িতে একটু আদা দিতে হয় কি না, ঘুঁটে কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়, এসব খবর মার নখদর্পণে।

মৃন্ময়ী বললেন—ঈশ্বর ঘটক সেদিন একটা পাত্রের খবর নিয়ে এসেছিল।

সুরুচি বললে—জানি।

—ছেলেটি জনাই-এর মিত্তিরদের বাড়ির মেজ ছেলে—এম এ. পাস করেছে—ওকালতি করে, মা মারা গেছে—এক বোন বিয়ে দিতে বাকি এখনও, তা বাপের নাকি টাকা আছে অনেক—শুনছি ছেলেটির স্বভাব চরিত্র ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, একটু ময়লা রঙ—হ্যাঁরে ময়লা রঙ-এ তোর আপত্তি আছে?

সুরুচি কোনও উত্তর দিলে না।

মৃন্ময়ী আবার বললেন—লম্বা চাওড়া চেহারা তো বললে, কে যে দেখতে যায়, ওঁর তো সময়ই নেই, ও মানুষকে দিয়ে কোনও কাজ আর হবে না, তা ভাবছিলাম শেখরকে বলবো ও গিয়ে দেখ আসতে পারে···মৃণ্ময়ী চুপ করলেন।

খানিক পরে মৃন্ময়ী আবার বললেন—মেজ মামার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পাটনায়, ছেলেটি তখন কলেজে পড়তো, ভাল ছেলে কিন্তু গরীব, লেখা-পড়া করবার পয়সা নেই, মেজ মামাই তাকে পড়িয়ে পাস করালে, তারপর বিলেতে পাঠালে—টাকা থাকলে সবই হয়, সেই জামাই এখন শ্বশুরবাড়ির দেখা শোনা সমস্তর ভার নিয়েছে—আমার কী আছে বল, একটা লোকই নেই যে ছেলে দেখে আসে।

সুরুচি একমনে মার মাথা টিপতে লাগলো।

—তুই যখন হলি, তখন পুরুত মশাই কুষ্ঠী তৈরী করে বললেন—এ মেয়ের জন্যে ভাবনা নেই মা তোমার, এ রাজরানী হবে, কেন্দ্রে বৃহস্পতি—এর রাজসুখ ভোগ আছে, মেয়ে হয়েছে বলে দুঃখ কোর না মা, এ মেয়ে তোমাকে সুখ দেবে—তা' সুখের তো অবধি দেখতে পাচ্ছিনে—ভেবে ভেবে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।

সুরুচি বললে—অত ভাবো কেন তুমি, ভাবতে তোমায় কে বলে মা?

—বুঝবি মা বুঝবি, গলায় মেয়ে থাকলে ভাবনা হয় কি না যখন তোরও

মেয়ে হবে তখন বুঝবি—যার লোকজন আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, দেখা-শোনা করবার লোক আছে তাদের না ভাবলে চলে, আর হাতে টাকা থাকে অনেক তো ভাবতেও হয় না—মৃন্ময়ী চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

সুরুচির মনে হোল মা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে—চোখের পাতা দুটো বোজা। মা এককালে খুব সুন্দরী ছিল—অবশ্য সুরুচি মার সৌন্দর্য পায় নি। এখন মার স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়েছে। গলার কণ্ঠা দেখা যায়। তবু সুরুচির মা বলে মৃন্ময়ীকে কে বুঝতে পারবে!

খানিক পরে মৃন্ময়ী হঠাৎ চোখ তুললেন। বললেন—হ্যাঁ-রে কালো রঙ-এ আপত্তি আছে তোর?

সুরুচি বললে—আবার তুমি ওই সব কথা ভাবছ? বিয়ে কারো আটকায় মা? এই যে তুমি, তোমার কথাই ধরনা···তোমার বিয়ে আটকেছিল? সুন্দরী মেয়েদের বিয়ের জন্যে আবার ভাবনা?

মৃন্ময়ী বললেন—অত গর্ব করিসনে মা, আমারও রূপের জন্যে অহঙ্কার ছিল ভাবতুম কে না জানি রাজপুত্তুর বসে আছে আমার জন্যে, শেষে তো সেই এই ঘরেই পড়তে হোল—হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে আর বাসন মাজতে মাজতেই জন্ম গেল,···তা অভাবের ঘরে কে আর সাধ করে মেয়েকে দিতে চায় মা। আমাদেরই পাড়ার কেষ্টদাসী, লোকে বলতো বিয়েই হবে না--এমন কুচ্ছিৎ, তা সেই মেয়ে এখন নাকি দশটা দাসী বাঁদীকে হুকুম চালায়··অথচ রূপ নিয়ে আমরা ধুয়ে খাচ্ছি!

সুরুচি বললে—তা কি রকম পাত্র তোমার পছন্দ বল তো—আমার হাতে অনেক পাত্র আছে—রাজপুত্রের মত বড়লোক আছে, আবার শেখরদার মত গরীব লোকও আছে···একটু মত দিলেই তারা বিয়ে করতে চায়।

মৃন্ময়ী চমকে উঠলেন—ও-মা, বলিস কি তুই রুচি, তোদের আজকাল এসব কি শিক্ষা হচ্ছে ছি ছি! কেন, আমরা কি তোর ভাল চাই না, আমরা কি তোকে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করছি—ছি মা, ওসব মতি যেন কখনও না হয় তোমার—আমাদের বংশে কখনও অমন হয়নি—আমাদের মুখ পুড়িও না মা · মৃন্ময়ী যেন ভীষণ এক আঘাত পেয়ে মর্মাহত হয়ে গেলেন।

সুরুচি উঠলো, বললে—ঐ কলে জল এল, চৌবাচ্চা খুলে দিয়ে আসি মা—মার এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না সুরুচির। যাকে পাবার জন্যে প্রিন্স-এর

মত ছেলে তার সমস্ত নিবেদন করতে প্রস্তুত, যার কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্যে শ্রীলতার দাদা, ইলার ছোট কাকা সঙ্গীত সঙ্ঘের প্রাণতোষ চৌধুরী, আরও অনেকে ব্যগ্র, সেই সুরুচির বিয়ের জন্যে মৃন্ময়ীর এই দুর্ভাবনা নিতান্ত হাস্যকর। দরকার নেই হাজার হাজার টাকা খরচ করবার। কেন, সেকি তুচ্ছ নাকি! কলেজের অভিনয়ের দিনই বোঝা গিয়েছিল তার আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে কি না। গ্রীন-রুমের বাইরে নানা ছুতোয় স্লিপের পর স্লিপ আসছে উষাদির কাছে। আসল উদ্দেশ্য উষাদি জানতো। রায়বাহাদুর বোসের মেয়ে বলে যার অত অহঙ্কার, সেই মলিনার কি হিংসে তার ওপর। বাইরে থেকে কেবল এসেছে ফুলের তোড়া তার নামে। তার ভক্তের দল তারা।

অরুণা শ্রীলতার দল তাকে বার বার সবাই সাবধান করে দিয়েছে। পুরুষ জাতটাই নাকি বিশ্বাসঘাতক। যারা নিজেদের সস্তা করে দিয়েছে পুরুষের কাছে, তাদের কাছে, তাদের কাছেই পুরুষরা বিশ্বাসঘাতক! সুরুচির সে জ্ঞান আছে। কতটুকু ছেড়ে কতটুকু টানতে হয়, তা সুরুচি ভাল করেই জানে।

শেখরদার ঘরটা পরিষ্কার করতে ঢুকলো সুরুচি। এতটুকু অগোছাল নয় কোনও জিনিসটি। শেখর বিলাসী নয়, কিন্তু তবু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত। বিছানাটা তুলে আবার নতুন করে বিছানাটা পাতলে । বইগুলো ঝেড়ে মুছে আবার যথাস্থানে রাখলে। শেখর দার ঘরে এলেই সুরুচির মনে হয় যেন তীর্থস্থানে এসেছে সে। বইগুলো কি যত্নে রাখা, এতটুকু দাগ লাগেনি কোথাও—অথচ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে পড়ে শেখরদা।

সারাদিন কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সুরুচির। শ্রীলতার সঙ্গে তার য়্যাডোনিসের গল্প করা হোল না। অরুণার বাবা নাকি আর ওকে পড়াতে চান না। তার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে—কোন্ কোন্ পাত্র দেখা হচ্ছে, কে কে দেখতে এসেছে তাকে, কি কি প্রশ্ন করেছে তারা - সেই সব গল্প।

এতক্ষণ হয়তো সেই বি এন রায়ের লজিকের ক্লাস চলছে। স্টাইল করে ইংরেজি উচ্চারণ। গলাবন্ধ কোটের নিচে স্টীফ্ কলার লাগানো সার্ট—ঘাড়টা বেঁকে না। অপূর্ব মানুষ। ভুলেও একবার মেয়েদের মুখের দিকে তাকাবেন না। ইয়ংম্যান—নতুন নাকি বিয়ে করেছেন। গড় গড় করে লেকচার দিয়ে যাওয়া—কড়িকাঠের দিকে মুখ করে। কিন্তু কি তীক্ষ্ণ নজর!

কোন্ কোনে কেউ একটু গল্প করছে কি তার পড়া শুনছে না, অমনি তিনি থেমে যাবেন। যতক্ষণ না তারা চুপ করে ততক্ষণ তিনিও মুখ খোলেন না।

লজিকের ঘণ্টার পর পি. বি. এস-এর হিষ্ট্রির ক্লাস। গ্রীক আর রোমান হিষ্ট্রি। পি. বি. এস-এর ক্লাস ভাল লাগে না স্থরুচির। গলার আওয়াজটাও বিশ্রী। ক্লাসময় গোলমাল চলে। ওর চেয়ে শেখরদা ভাল হিষ্ট্রি পড়াতে পারে। বুড়ো মানুষ পি. বি. এস। রোল কল করতেই আধ ঘণ্টা। এত আস্তে আস্তে নাম ডাকেন। আর কতটুকুই বা পড়া হয়। এই তো ছ'মাস হয়ে গেল, এখনও পার্শিয়ান ওয়ারে'র চ্যাপটারটাও শেষ হোল না।

সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়ে উনুনে আগুন দিয়ে দিয়েছে স্থরুচি। সন্ধ্যে হয়ে এল। প্রদীপটা জ্বালিয়ে একবার সমস্ত ঘরগুলোয় দেখিয়ে দিলে। তারপর দরজার চৌকাটে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তিনবার শাঁখ বাজানো। গিরিবালা নেমে এসেছেন। এসে রান্নাঘরে এলেন। বললেন—একলা পারছিস তো সব? চাল ক'কুনকে নিতে হবে জানিস তো? ঘুঁটে আছে? না থাকে তো গয়লাবুড়ীকে খবর দিতে হবে।

স্থরুচি বললে—তুমি কিছু ভেবো না পিসিমা, এত বড় ধাড়ী মেয়ে হলুম—একলা পারবো না তো কি দশটা ঝি লাগবে নাকি?

পিসীমা বললেন—পারলেই ভাল বাছা, তোর বাবা তো কিছু কাজ করতে দেয় না, কেবল পড়া আর পড়া—অত পড়ে আর কি হবে, বিয়ের পর সেই তো তোর মার মত হাঁড়ি ঠেলতে হবে—

তারপর চলে যেতে যেতে ফিরে এলেন। বললেন—তোর কাজ হয়ে গেলে আমার একটা কাজ করে দিবি রুচি—আমার ভাসুর-পোকে একটা চিঠি লিখতে হবে—

আরো খানিক পরে দরজার কড়া নড়ে উঠলো। শেখরদা এসেছে! ঝোলের কড়া নামিয়ে রেখে স্থরুচি উঠলো।

—কে?—স্থরুচি ভেতর থেকে জিগ্যেস করলে।

—আমি—বলে উঠলো শেখর। ভেতরে ঢুকে শেখর বললে—কিছু হোল না স্থরুচি, তখনি জানি, চেম্বারলেন প্রাইম মিনিস্টার থাকতে কোনও আশাই নেই—

স্থরুচি বললে—কিসের আশা নেই শেখরদা—

—মিউনিক্ প্যাক্ট হয়ে গেল। একে একে সব দেশগুলো ওই ভাঁওতা দিয়ে গ্রাস করবে হিটলার। মানুষের বুদ্ধিতে ঘুণ ধরেছে, নইলে জেনে শুনে এমন করে নিজের ধন বাঁচাবার জন্যে পরের সর্বনাশ কেউ করে—পাঁটা বলি দিয়ে কি আর অমঙ্গল এড়ানো যায়! ও রাইনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, রুমেনিয়া সব নিয়ে নেবে।

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে বললে—কাকীমা কেমন আছেন?

—একটু ভাল, আমার কলেজ যাওয়া হয়নি, আমিই রাঁধছি আজ—সুরুচি বললে।

শেখর জামা-কাপড় বদলে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে এসে বসলো। বললে—কী রাঁধছো?

সুরুচি তাড়াতাড়ি একটা পিড়ি পেতে দিয়ে বললে—এইটেতে বোস,—

শেখর বললে—পিঁড়ি দিলে তো এক গ্লাস জলও দাও—

—জল কেন খাবে, ভাত হয়েছে একেবারে ভাত খেয়ে নাও না,······

—এরি মধ্যে সব রান্না হ'য়ে গেল? রান্না করতে কবে যে শিখলে, তা' তো জানিনে, তবে মেয়েদের বোধ হয় রান্না করতে শিখতেও হয় না, রান্নাটা দেখছি মেয়েদের জন্মগত অধিকার—ও আমরা অনেক ট্রেনিং নিলে তবে যদি শিখতে পারি। আমরা যেদিন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, সেদিন আমাদের সৈন্যদের জন্যে রান্না করবে কারা, তাই একটা সমস্যা। ওই বিদ্যেটা শিখে নিতে হবে আমাদের—নইলে তোমরা তো আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে না—

সুরুচি বললে—কেন যাবো না? কিন্তু যাওয়া ভাল হবে কিনা আগে সেইটে ভেবে দেখ। গেলে পুরুষদের মধ্যেই লাঠালাঠি বেধে যাবে। আর একটা সমস্যার কথাও ভাববার। আমাদের ইলা একটা পার্টিতে মেম্বর হয়েছিল—শেষে কি বিপদ তার—

শেখর বললে—বিপদ কিসের?

—বিপদ বলে বিপদ, তার বাবা একটা ভাল বিয়ের সম্বন্ধ করলে। কিন্তু পার্টির লোকেরা তাকে বিয়ে করতে দেবে না ইলাই পার্টিতে সব চেয়ে সুন্দরী। তারা বললে—ইলা বিয়ে করে ফেললে পার্টি ভেঙে যাবে, পার্টির

মেম্বর আর কেউ হবে না, যেখানেই ইলার সম্বন্ধ হয়, সেখানে গিয়েই তারা ভাঙচি দিয়ে আসে, শেষকালে······

হঠাৎ মৃন্ময়ীর ঘর থেকে একটা করুণ আর্ত চীৎকার এল। মা যেন চীৎকার করে ডাকলেন—রুচি ও রুচি—

রান্না ফেলে সুরুচি দৌড়ে গেল মার কাছে। শেখরও ছুটে গিয়েছে। মৃন্ময়ী হাঁফাচ্ছেন প্রাণপণে। যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। হাত-পা নাড়ছেন—বোঝা গেল অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর শরীরে। চোখ দু'টো সোজা ঠেলে উঠছে বাইরে।

সুরুচি মৃন্ময়ীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগলো—মা, ও মা, মা—কথা বল—

তারপর মালিশের ওষুধটা নিয়ে মা'র বুকে মালিশ করতে লাগলো। শেখরদাকে বললে—দাঁড়িয়ে দেখছ কি শেখরদা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস—কান্নায় ভারী হয়ে এসেছে গলা, চোখ দিয়ে জল পড়ছে সুরুচির।

সুরুচি মা'র মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলতে লাগলো—ওমা, মা, কোথায় কষ্ট হচ্ছে বল মা, আমার যে ভয় করছে—ও পিসীমা, মা কথা বলছে না কেন?

গিরিবালা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কাছে এসে। জীবনে অনেক শোক পেয়েছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যু, দুটি ছেলে, একটি মেয়ের মৃত্যু। মৃত্যু তাকে হঠাৎ বিচলিত করে না। তবু তাঁর চোখ দু'টোও ভারী হয়ে এল। বললেন—কাঁদিসনে রুচি, চুপ কর বলে মৃন্ময়ীর শিয়রে গিয়ে গিরিবালা বসলেন।

অনেক রাত্রে সুরুচির ঘুম ভেঙে গেল। একটা স্বপ্ন দেখছিল সুরুচি। অদ্ভুত স্বপ্ন। যেন অসুখ হয়েছে সুরুচির। শুয়ে আছে চোখ বুজে বিছানার ওপর। হঠাৎ নিঃশব্দ পদে যেন কে একজন ঘরে ঢুকলো। সুরুচি অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলে: প্রিন্স! প্রিন্সের সেই নিখুঁত পোশাক পরিচ্ছদ, সেই নিখুঁত কায়দা কানুন!

দরজাটা আধখানা খুলে জিগ্যেস করলে - আসতে পারি দেবি—

সুরুচির চোখের চাউনিতে আমন্ত্রণের ইঙ্গিত পেয়ে প্রিন্স নিঃশব্দে কাছে এগিয়ে এল। এসে বিছানার মাথার দিকে বসলো। তারপর প্রিন্স একটা হাত দিয়ে সুরুচির কপালে বুলোতে বুলোতে বললে খবর দিতে যদি যে তোমার অসুখ হয়েছে, তা হলে সুখী হতাম—

স্থরুচি কোনও উত্তর দিলে না!

প্রিন্স আবার বললে,—একটা স্থখবর তোমায় দেওয়া হয়নি স্থরুচি, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পরের শনিবার মাঠে গিয়েছিলুম, সাত হাজার তিনশো টাকা নিয়ে এসেছি, আর একটা খারাপ খবরও আছে—কাল মাঠে গিয়েছিলুম চার হাজার চলে গেল।

স্থরুচি চোখ তুলে বললে,—লাভে লোকসানে দাঁড়াল কী?

প্রিন্স একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে,—লাভ-লোকসানের কথাই নয় স্থরুচি, অঙ্কের হিসেব গণিতের নিয়ম ধরে চলে, কিন্তু মনের হিসেবের মাপকাঠি আলাদা। তার বিচারে এক পেগ হুইস্কির দাম তু' টাকা কি তিন টাকা সেটা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হোল হুইস্কিটা ভাল কি খারাপ জাতের—কথাটা বুঝলে?

স্থরুচির মনে হোল যেন প্রিন্স আজ নেশা করেছে। কিন্তু এমনিই প্রিন্সের ব্যক্তিত্ব যে তাকে ভাল লাগে মেয়েদের। স্বপ্নের মধ্যে প্রিন্সকে অপূর্ব স্থন্দর মনে হোল স্থরুচির।

প্রিন্স বলতে লাগলো—আসল কথা তাও নয়। আসল কথা হচ্ছে—জীবন থেকে শুরু করে সব কিছুই জুয়া, আমরা দিনের পর পর দিন জীবন নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, প্রেম ভালবাসা নিয়ে জুয়া খেলছি আর এই মাঠে গিয়ে ঘোড়া নিয়ে যে জুয়া খেলছে তাকেই আমরা নিন্দে করি - এই আমাদের স্বভাব—

প্রিন্স আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়লো—

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হোল যেন। স্থরুচি প্রাণপণে বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। সারা গায়ে যেন ব্যথা—টন্ টন্ করে উঠলো সমস্ত শরীর। তবু উঠতে হবে তাকে। কে দরজা খুলে দেবে!

প্রিন্স যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে—উঠছ কেন?

—দরজা খুলে দিয়ে আসি।

—কে এসেছে?

স্থরুচি যেন বললে—তুষ্মন্ত!

—তুষ্মন্ত! চমকে উঠলো প্রিন্স।

—হ্যাঁ, শেখরদা আমার তুষ্মন্ত, আর আপনি তুর্বাসা। আপনি চলে যান এখান থেকে—বেরিয়ে যান, কেন আসেন আপনি? আপনি আসেন আমার

তপস্যা ভঙ্গ করতে—আপনি আমার জীবনে ধূমকেতু, আপনার পায়ে পড়ি আপনি যান—আপনি যান্—

সুরুচি স্বপ্নের মধ্যেই চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, আরে তারপর নিজের কান্নাতে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল সুরুচির। সুরুচি বিছানার ওপর উঠে বসলো! কী অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছিল সে। হাসি পেল সুরুচির। কোথায় প্রিন্স, কোথায় শেখরদা।

তারপর আস্তে আস্তে উঠলো সুরুচি। সন্ধ্যাবেলা ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। অনেক দিনের গুমোট গরমের পর ভালো করে আজ ঠাণ্ডা পড়েছে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইল সুরুচি। নির্মুক্ত আকাশের নৈশ পটভূমিকায় খণ্ড চাঁদের ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়েছে নিঃসাড় পৃথিবীর বুকে। হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ মনে হোল নিজেকে।

মার ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। শেখরদা কদিন ধরে সেবা করছে অক্লান্ত-ভাবে মাকে।

সুরুচি পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। অল্প আলোয় মার রোগম্লান মুখ আরো ম্লান দেখাচ্ছে। কদিন একটু ভালো আছে মা। আর বারান্দার এক কোণে একটা তক্তপোশের ওপর শেখরদা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। রোগীর সেবা করতে করতে কখন ক্লান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়েছে এখানে—জ্ঞান নেই।

সুরুচি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল শেখরদার সামনে। তার প্রিন্স, শ্রীলতার য়্যাডোনিস, শকুন্তলার দুষ্মন্ত সমস্তর সমষ্টি যেন এই শেখর। শেখরের মুখের ওপর এসে পড়েছে খণ্ড চাঁদের একফালি রশ্মি। নিঃশ্বাস পতন উত্থানের সঙ্গে নড়ে উঠছে সমস্ত শরীর। সুরুচি দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে শেখরের সান্নিধ্যের তাপ অনুভব করছে—তারপর সেই ঘুমন্ত শেখরের কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শ রাখলে সুরুচি। শেখর জাগলো না। হয়তো কদিনের উপর্যুপরি রাত জাগার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনও। সুরুচির সমস্ত শরীরে স্পর্শের রোমাঞ্চ প্রসারিত হয়ে গেল।

দূরে একটা নিশাচর পাখীর তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর ভেসে আসে। এখনি খণ্ড চাঁদ ডুবে যাবে নাজিরদের তেতলা বাড়ির অন্তরালে। নিস্তব্ধ পৃথিবীর প্রেতায়িত আত্মা এখনি বুঝি হা হা স্বরে চীৎকার করে উঠবে অহেতুক

আতঙ্কে এই মুহূর্তে! মূক শান্ত্রীর মত মুহূর্তগুলি স্থির—স্তব্ধ। এই সব মুহূর্তে বুঝি অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে তৃণে, কিশলয় বিকশিত হয় অজ্ঞাতসারে। সুরুচির সমস্ত অন্তরাত্মা নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠলো।

আজ এই রাতে ঘুম আসবে না আর। সুরুচি নিঃশব্দে শেখরের কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা কাত করে—তার গালে আর শেখরের কাঁধে একাকার করে রেখে দিলে।

—কে? শেখরের ঘুম ভেঙেছে।

সুরুচির যেন উত্তর দেবার কথা নয়।

—কে? শেখরের বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। উঠে বসতেই সুরুচি মুখ ঢাকা দিয়ে তক্তপোশের ওপর নিচু হয়ে রইল।

শেখরের মনে হলো—সুরুচি যেন কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে তরে দেহ। থর থর করে কাঁপছে তার শরীর। চারিদিকে চেয়ে দেখলে শেখর—কোথাও কোনও জাগরণের ক্ষীণতম চিহ্নও নেই। শেখর যেন হতবাক হয়ে গেছে সুরুচির এই আচরণে।

শেখর বললে—কী হোলো সুরুচি, এত রাত্রে ··· ·

কিছু যেন শেখর বুঝলে, কিছু যেন বুঝলে না। কিন্তু কিছু যেন করবারও নেই তার এখন। আস্তে আস্তে শেখর সুরুচির মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি রেশমের মত নরম। শেখরের হাতের স্পর্শ পেয়ে সুরুচি যেন আরো বিচলিত হয়ে ওঠে। শেখর সুরুচির মাথাটিকে আরো নিবিড় করে নিজের কোলের কাছে টেনে আনলে।

শেখর জিগ্যেস করলে—কী হয়েছে বলো তো—

সুরুচি মাথা তুললে না। শেখরের কোলের ভেতর মাথা রেখে বললে—মনে আছে শেখরদা—তুমি একদিন বলেছিলে সেই······

সেই অনেক কাল আগেকার কথা, কবেকার কোন্ কথা, কত কথা সব মনে থাকে কি? কবে একদিন আঙ্গুলের সঙ্গে আঙ্গুলের স্পর্শে রোমাঞ্চ উঠেছিল, কবে একদিন পড়াতে পড়াতে চোখে চোখে একাকার হয়েছিল, তারপর কবে অঙ্কুর থেকে হোলো তরু, কবে শ্রদ্ধায় ভালবাসায়, স্বপ্নে জাগরণে, আনন্দে উৎসবে আন্দোলিত হয়েছে অন্তঃকরণ—সব কথা কেমন করে মনে থাকবে শেখরের।

সেই দুই প্রহর রাত্রির পটভূমিকায় শেখরের মনে হলো সে দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি। অথবা এ ক্লান্ত রাত্রির প্রবঞ্চনা। অথচ সুরুচিকে তো দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না অবহেলায়! বোধ হয় ক্ষান্তবর্ষণ বসন্ত রাত্রির দ্বিপ্রহরে কোন যাদু আছে। কিন্তু শেখর উঠলো দাঁড়িয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় কোল থেকে সুরুচির মাথা নামিয়ে দিলে। তারপর দুই হাতে সুরুচির দুটি হাত ধরে বললে—চলো, ঘরে গিয়ে শোবে চলো পাগলামী করে না—

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শেখর দেখলে সুরুচি উঠেছে। তারপর শেখর সুরুচিকে দুই বাহু দিয়ে সযত্নে বেষ্টন করে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সুরুচি আস্তে আস্তে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো। তারপর শেখর পাশে মাথার কাছে বসলো। বসে হাত বুলোতে লাগলো সুরুচির মাথায়।

সুরুচির মুখে একটা কথা নেই। বালিশের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে রয়েছে। সুরুচির মনে হোলো—এ কি লজ্জা। নিজের দুর্বলতা এমন করে প্রকাশ করতে হয়! শেখরদার ব্যক্তিত্বের সামনে সুরুচি যেন নিতান্ত হেয় তুচ্ছ সামগ্রীতে পরিণত হয়ে গেল। এমন করে নিজেকে সস্তা করা কি তার উচিত হলো। অপমানে, লজ্জায় সুরুচির মনে হলো সে যেন শেখরের সামনে আর মুখ তুলে চাইতে পারবে না। তার নারীত্বের সমস্ত গৌরব সে এক মুহূর্তের ভুলে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়েছে।

শেখর সুরুচির পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে ধীরে ধীরে বললে—চুপ করো সুরুচি, চুপ করো, আমি বলছি চুপ করো—

সুরুচিকে শান্ত করিয়ে শেখর এসে জানলার কাছে বসলো। এখান দিয়ে বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ কখন ডুবে গেছে। চারিদিকে এখন নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে শেখর সেই জানালার কাছে চুপ করে বসে রইল। তার মনে হোল কোথায় যেন বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে কারও। হয়ত তারই কিম্বা হয়ত তার নয়। কিন্তু মুহূর্তের উত্তেজনাকে বিশ্বাস নেই। সে যেমন হঠাৎ সমস্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি তাকে বাধা দিলে এক নিমেষে নির্জীব শান্তও হয়ে আসে। আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা, সংযম সব যেন আজ শেখরের পায়ের তলায় দৃঢ় কঠিন পাষাণ স্তম্ভের মত তার ভিত্তিমূল হয়ে আছে, সেখান থেকে তাকে হটাবার সাধ্য বুঝি কারো নেই। আবার একবার তার মনে

হোলো মানুষের সহজ ভাল লাগায় অন্যায়টুকুই বা কোথায়? এই রাত্রির নিভৃততম অন্তস্তলে যেখানে অদৃশ্য স্পর্শের প্রভাবে ফুল ফোটে, অঙ্কুর গজায়, সেখানে ন্যায় অন্যায়ের কোনও বাঁধাধরা গণ্ডী আছে নাকি?

কাদের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত চারটে বাজলো। শেখর তখনও জানলার ধারে বসে আছে।

শেষরাত্রে সদানন্দবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। অত ভোরে উঠে প্রাতকৃত্য সারাই তাঁর অভ্যাস। চারিদিকে তখনও অন্ধকারের জড়িমা। ঘর থেকে বাইরে এসে কলঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে উঠেই তার মনে পড়ে গেছে একটা কথা। কাল 'ইতিহাস প্রবেশিকা' লিখতে গিয়ে লিখে ফেলেছেন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ৩১৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ৩১৭ ভুল, ওটা ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে হবে—আজই প্রুফটা ঠিক করে দিতে হবে।......

হঠাৎ তাঁর মনে হোলো বারান্দার পাশ দিয়ে কে যেন ক্ষিপ্র-সতর্ক পদে সরে গেল।

—কে? কে যায়?—চীৎকার করে উঠলেন সদানন্দবাবু।

উত্তর নেই।

—কে তুমি?—আবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

—আমি—

—কে? শেখর! জবাব দাও না কেন? তোমার কাকীমা এখন কেমন আছে? ওষুধটা খাইয়েছিলে?

সদানন্দবাবু আর কথা বললেন না। চেয়ে দেখলেন—শেখর বারান্দার সামনে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

জনাই-এর মিত্তিরদের বাড়ি থেকে আজ দেখতে আসবে সুরুচিকে।

বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তাদের আসার কথা আছে, মৃন্ময়ী বললেন—আজ আর কলেজ যাসনি সুরুচি—আজ খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমো—

গিরিবালাও বললেন—আজ আর তেতে-পুড়ে কলেজে গিয়ে দরকার নেই।

কিন্তু সুরুচি কথা শোনে না। আজ না গেলেই নয়। শ্রীলতার সঙ্গে য়্যাডোনিসের কাল দেখা হওয়ার কথা ছিল কার্জন পার্কে। কালকে ওদের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিন। মনে হচ্ছে য়্যাডোনিস কাল প্রোপোজ করবে : অন্তত শ্রীলতার তাই ধারণা। শ্রীলতা বলছিল—নইলে অমন করে আমায় দেখা করতে বলবে কেন বল ? ওরা চাঁদপাল ঘাট থেকে ফেরী স্টীমারে করে ওদিকে বেড়াতে যাবে। রোববার। অনেকখানি সময় পাবে ওরা, কালকের সমস্ত ঘটনা শুনতে হবে শ্রীলতার মুখে।

শেখর ঘর থেকে ডাকলে—সুরুচি, আমার কলমটা দেখেছ—?

সুরুচি এ ঘরে এল। বললে—কলম পাচ্ছ না ? .

—সকাল বেলাই ছিল এখানে, আর এখন কোথায় গেল—বলে শেখর স্যুটকেসটার ভেতরে খুঁজতে লাগলো। ওদিক থেকে সুরুচি বলে উঠলো—এই তো সামনেই পড়ে রয়েছে—চোখের সামনে অথচ···

কলমটা নিয়ে শেখর বললে—তোমার বিয়ে হয়ে গেলে, কে যে আমার কাজ গুছিয়ে দেবে কে জানে—

—গুছিয়ে দেবার জন্যে লোক আনবে—সুরুচি বললে।

শেখর কি বলতে যাচ্ছিল,—সুরুচি তার আগেই বললে—আমি চল্লাম, আমার কলেজের দেরী হয়ে যাবে—

—আজ আবার কলেজ যাবে নাকি ? চারটের সময় কারা আসবে শোন নি ?—

তার আগেই কলেজ থেকে চলে আসবো—বলে সুরুচি নিজের ঘরে চলে গেল।

জামা কাপড় বদলে নিয়ে শেখর নিজের কাজে বেরুচ্ছিল—মৃন্ময়ী ও ঘর থেকে ডাকলেন—শেখর, এ ঘরে শোন একবার—

শেখর যেতেই মৃন্ময়ী মাথার ওপর ঘোমটাটা টেনে দিলেন। বললেন—দেখ তো, কোন্ কাপড়টা পরলে সুরুচিকে মানাবে ?

বাক্স খুলে মৃন্ময়ী একগাদা কাপড় বার করে সামনে রেখেছেন। মৃন্ময়ী বোধ হয় কোনও পুরুষের চোখ দিয়ে দেখতে চাইছিলেন সুরুচিকে—তাই শেখরের মতামত নেওয়া। একটা একটা করে শেখর উল্টে উল্টে দেখলে কাপড়গুলো : প্রত্যেকটা কাপড়ের সঙ্গে মিলিয়ে আলাদা আলাদা ব্লাউজও

রয়েছে। শেখর একটা শাড়ি পছন্দ করে বললে—এইটেই পরতে দেবে স্বরুচিকে, এই রঙ-টাই ওকে মানাবে, কাকীমা—

শেখর আবার বললে—ওর হাতের কাজগুলোও জোগাড় করে রেখো কাকীমা—হঠাৎ দেখতে চাইলে, তখন—

সমস্ত ঠিক করে রাখলেন মৃন্ময়ী। জানালার পর্দা, টেব্‌ল ক্লথ, স্বরুচির হাতের তৈরী সব কাজের নমুনা। ইস্কুলের প্রাইজ পাওয়া বইগুলো বার করে রাখলেন।

সদানন্দবাবুকে সকাল সকাল আসতে বলে দিলেন মৃন্ময়ী। চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে তাদের আসার কথা। ইস্কুল থেকে আধ রোজের ছুটি নেবেন তিনি।

দুপুরবেলা ঠিক সময়েই বাড়ি এসে পৌছুলেন সদানন্দবাবু। শেখরও ফিরে এলো বাড়িতে। কিন্তু স্বরুচিরই দেখা নেই। মুশকিলে পড়লেন মৃন্ময়ী। বললেন—কে জানে ভগবান মুখ রাখবেন কি না—

চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর ঘটক আর মিত্তির মশাই এসে হাজির। সদানন্দবাবু শেখরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দরজা খুলে দিয়ে বসিয়ে দিলেন মিত্তির মশাইকে। বললেন—আস্থন আস্থন—অভ্যর্থনা করে বসিয়ে সদানন্দবাবু বললেন—ভারী কষ্ট হোলো আপনাদের, ট্রাম রাস্তা থেকে হাঁটতে হয়েছে অনেকটা—তবু তো এখন ভাল দেখছেন, আমরা যখন প্রথম এই চেতলায় এলুম—

মিত্তির মশাই তক্তপোশের উপর ছড়িয়ে বসে বললেন—কত দিন হোলো আছেন এখানে ?

—তা, এই বাড়িতেই কাটিয়ে দিলাম চোদ্দ বছর—বললেন সদানন্দবাবু।

এই চোদ্দ বছর আগে কেমন করে এই বাড়িতে এসেছিলেন তিনি—তখন এই চেতলায় রাত্রে শেয়াল ডাকতো, এই বাড়িরই পেছন দিকে তিনটে কেউটে সাপের বাচ্চা বেরিয়েছিল—তখন গ্যাসের আলো ছিল না রাস্তায়, ড্রেন ছিল না—সেই সময় দশটাকা ভাড়ায় তিনি নিয়েছিলেন এই বাড়ি। তখন এই সামনে শৈল মিত্তিরের বাড়ি, পশ্চিমে নটবর দত্তের বাড়ি,—এই রকম দু একটা ছাড়া ছাড়া বাড়ি শুধু চারদিকে ; মাঝে মাঝে কয়েকটা পানা পুকুর। রাত্রে এ-পাড়ায় চলতে ফিরতে ভয় করতো মশাই—গল্প বলতে বলতে মেতে উঠেছেন সদানন্দবাবু।

মিত্তির মশাই বললেন—তা হলে আর দেরী করা কেন—এবার মা-লক্ষ্মীকে আনার ব্যবস্থা করুন—

সদানন্দবাবু যেন বিব্রত বোধ করলেন। কিছু করতে না পেরে পকেট থেকে শিশিটা বার করলেন, করে বাঁ হাতের তালুতে একটু জল ঢেলে মাথার মাঝখানে থাবড়াতে লাগলেন। মাথা তার যেন হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছে—কি করবেন কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলেন না—

শেখর উঠলো—উঠে ইঙ্গিতে ঈশ্বর ঘটককে ঘরের বাইরে ডেকে আনলে। গলা নিচু করে ঘটকের কানে কানে বললে—একটু বিপদ হয়েছে ঘটক মশাই, সামলে নিতে হবে আপনাকে—মেয়ে যে এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি—

—তাই নাকি? তা এখনি আসবে তো? একটু গল্পসল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাক্—এক কাজ কর দিকি—চা পাঠিয়ে দাও তো দু কাপ—

ঈশ্বর ঘটকের বুদ্ধি আছে বটে। ঈশ্বর ঘটক ঘরে গিয়ে বসল, শেখর নিঃশব্দে চা-এর ব্যবস্থা করতে ভেতরেই যাচ্ছিল, হঠাৎ সবাই দেখলে রৌদ্রতপ্ত মুখে ঘামতে ঘামতে ঘরে ঢুকছে সুরুচি; হাতে একগাদা বই, চুলগুলো এলো খোপা করে বাঁধা। কপালের সামনে আর কানের কাছে দু'একটা চুলের টুকরো উড়ছে। কান আর গাল দু'টো লাল হয়ে উঠেছে রোদের তাপে! ক্লান্ত ধীর পায়ে সুরুচি সদর দরজা অতিক্রম করে ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সদানন্দবাবু বিব্রত হয়ে উঠলেন। চেয়ে দেখলেন—মিত্তির মশাই চেয়ে আছেন সুরুচির দিকে।

মিত্তির মশাই বললেন—এটি কে?

সদানন্দবাবু উত্তর দেবার আগেই ঈশ্বর ঘটক উত্তর দিলে—আজ্ঞে, এইটিই হোলো আমাদের পাত্রী—এই মাত্র কলেজ থেকে এল কি না—লেখাপড়ায় ভারী শখ, নিজে মাস্টার কিনা, মেয়েটিকেও মনের মত করে গড়েছেন—

উৎসাহ পেয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। বললেন—কাব্য, ইতিহাস, সংস্কৃত শাস্ত্র সব শিখিয়েছি আমি নিজে……

ঈশ্বর ঘটক বললে—আর কি চমৎকার রান্না! এই বাড়িতে মায়ের অসুখ বিসুখ হলে ওই মেয়েই এক হাতে সারা সংসার চালায়, তারপর হাতের সেলাই ফোঁড়াই……টেব্‌ল ক্লথ—চেয়ে দেখুন ওইটে তো ওরই করা—তা-ছাড়া কাব্য আবৃত্তি। আপনার সেই "অয়ি ভুবনমনমোহিনী"টা আজ মিত্তির

মশাইকে শুনিয়ে দেবেন কিন্তু—বুঝলেন মিত্তির মশাই, যে শুনেছে তার চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে ছেড়েছে······

সদানন্দবাবু বিনীত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মিত্তির মশাই-এর দিকে···

ঈশ্বর ঘটক বললেন—তা হলে একবার মা-লক্ষ্মীকে আনবার ব্যবস্থা—

সদানন্দবাবু উঠলেন, বললেন—এখনি আনছি—

মিত্তির মশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—না না, আর দেখতে হবে না—এই তো সামনে দেখলাম, আর কষ্ট দিতে হবে না—

—তা কি হয়—সদানন্দবাবু প্রতিবাদ করলেন—কষ্ট কিসের? এখনি নিয়ে আসছি সঙ্গে করে—

কিন্তু সদানন্দবাবুর প্রতিবাদ মিত্তির মশাই শুনলেন না। কিছুতেই কষ্ট দেওয়া চলবে না আর। স্বাভাবিক ভাবে দেখাই হোলো আসল দেখা। সাজ গোজ করিয়ে পাউডার, স্নো, ক্রীম মাখিয়ে কি আর সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়? এই তো বেশ। না সদানন্দবাবু, সে কিছুতেই হবে না। সদানন্দবাবুর হাত ধরে ফেললেন মিত্তির মশাই।

মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল সদানন্দবাবুর। মৃন্ময়ী আর গিরিবালা ভেতরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। সদানন্দবাবু ভেতরে ঢুকতেই ছেঁকে ধরলেন।

মৃন্ময়ী বললেন—তাই কখনও হয় নাকি? না না তুমি বল ভদ্রলোককে—এতদূর থেকে এলেন, মেয়ে না দেখে কি আমরা ছাড়তে পারি?

—উনি যে বললেন দেখেছেন, সামনে দিয়ে স্থরুচি এল—ওইতেই ওঁর দেখা হয়ে গেছে—

শেখর ঘরে ঢুকলো হঠাৎ। বললে—কাকাবাবু, আপনাকে ডাকছেন ওঁরা—

সদানন্দবাবু এক দৌড়ে বাইরে এসেছেন। মিত্তির মশাই-এর হাত দুটো ধরে বললেন—আপনি অপরাধ নেবেন না মিত্তির মশাই—একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই—

কিন্তু মিত্তির মশাই-এর গোঁ কম নয়। কিছুতেই খাবেন না তিনি। বললেন—কুটুম্বিতে হোক, তখন কত খাওয়াতে পারবেন দেখবো—

মিত্তির মশাই উঠলেন। বললেন—খবর দেব গিয়ে—

ঈশ্বর ঘটকও উঠলো ক্ষুণ্ণ মনে। ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল—কিছু ভাবনা নেই, আমি যাচ্ছি মিত্তির মশাই-এর সঙ্গে সঙ্গে—

দরজা বন্ধ করতেই মৃন্ময়ী আর গিরিবালা ঘরে ঢুকলেন পেছনের দরজা দিয়ে। সদানন্দবাবু যেন হতভম্ব হয়ে গেছেন। শেখরের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—কি বুঝলে, শেখর।

মৃন্ময়ীও শেখরের 'মুখের দিকে সাগ্রহে চাইলেন। এত আয়োজন, এত তোড়জোড় সব ব্যর্থ হোলো নাকি? এ কি ধরনের মেয়ে দেখা। হাতের কাজ দেখান হোলো না, জলযোগ করান হলো না—নিয়মমত সেজেগুজে। মেয়েকে প্রশ্ন করে বোবা-কালা কিনা জানা হলো না—এ কি রকমের মেয়ে দেখতে আসা!

শেখর বললে—আমার তো মনে হচ্ছে যেন পছন্দ হয়ে গেছে—

মৃন্ময়ীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সুরুচি অবশ্য দেখতে সুশ্রী—কিন্তু বিয়ের মত ব্যাপারে এত সহজে পছন্দ অপছন্দ হওয়া কি সম্ভব নাকি? গিরিবালা বললেন—সবই ভগবানের ইচ্ছে—।

বৌবাজার থেকে চেতলা। এক ঘণ্টার রাস্তা। কাঁধের চাদরকে বাগিয়ে ট্রামে উঠে বসলেন সদানন্দবাবু। মনটা বড় অপ্রসন্ন হয়েছে তাঁর। পকেট থেকে নোট খাতাখানা একবার বার করলেন। কিন্তু লিখতে মন আসে না। ক'দিন থেকে মৃন্ময়ী তাঁকে তাগাদা দিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছেন আজ বৌবাজারে, কিন্তু না এলেই ভাল হোত যেন।

সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ভীড় বেশী নেই। একদৃষ্টে বাইরে চেয়ে রইলেন তিনি। রবিবার। রাস্তার ধারে গ্যাস পোস্টগুলো দ্রুতগতিতে পেছনে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ তাঁর মনে হোল—বৌবাজার থেকে চেতলা পর্যন্ত কতগুলো গ্যাস পোস্ট আছে কে জানে। গুণতে লাগলেন তিনি। যদি জোড় সংখ্যা হয়, তা হলে সুরুচির বিয়ে এই মাসের মধ্যেই হবে। মাসের আর পনের দিন বাকি! আর বিজোড় হলে, হবে না! সুরুচির বিয়ের জন্যে তাড়া সদানন্দবাবুর বেশী নেই। সুরুচির নিজেরই তাড়া নেই। তাড়া যত মৃন্ময়ীর। সন্ধ্যে বেলার সভাটা খুব ভাল লাগে সদানন্দবাবুর। শেখর বুদ্ধিমান, শেখরের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে! সব বোঝে শেখর। ইতিহাস থেকে শুরু

করে রাজনীতি, শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত—সব বোঝে। সুরুচির বিয়ে হবার পর সভা কি আর থাকবে।

একুশটা পোস্ট গোনবার পর হঠাৎ ট্রামটা মাঝপথে থেমে গেল। ধাক্কা খেয়ে সদানন্দবাবুর সঙ্গে সামনের সীটের আঘাত লাগলো। বেশী লাগেনি তাই রক্ষে। কিন্তু পোস্ট গোনা আর হোল না। সদানন্দবাবু পকেট থেকে শিশিটা বার করে মাথার ব্রহ্মতালুতে বার দুই জল থাব্‌ড়ে নিলেন। মাথাটা আজকাল ঘন ঘন গরম হয়।

আবার পকেট থেকে নোট খাতাখানা বার করলেন। 'র‍্যাপিড রিডিং'এর সেই বইটা এখনও শেষ হয়নি। মন দিয়ে লিখতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ ধর্মতলার কাছে আসতেই একটা চীৎকারে তাঁর লেখায় বাধা পড়লো। বাইরের দিকে চেয়ে দেখলেন। হকাররা চীৎকার করে খবরের কাগজ নিয়ে ছুটোছুটি করছে—

ট্রামের দুই একজন লোক পয়সা বাড়িয়ে দিলে বাইরের দিকে। চার পাঁচজন হকার দৌড়ে এল জানালার কাছে, চীৎকার করছে—লড়াই শুরু হো গিয়া—ভারী লড়াই বাধলো—জবর যুদ্ধ হোল—

সদানন্দবাবু এক আনা পয়সা বার করলেন—

—চার আনা—চার আনা—

চার আনাই দিতে হোল সদানন্দবাবুকে। বেটারা জো পেয়েছে। এক আনার কাগজ চার আনায় বিক্রী হচ্ছে। তা হোক! যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত বাধলো সত্যি সত্যি! সুভাষ বোসের কথাই সত্যি হোল! সদানন্দবাবু পড়তে লাগলেন। জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে! এরোপ্লেন, সাঁজোয়া গাড়ি, মেসিন গান, আর লক্ষ লক্ষ সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে পোল্যাণ্ডের ওপর —ওয়ারশ'র পতন অনিবার্য ওদিকে পার্লামেণ্টের বিশেষ বৈঠক বসেছে। চেম্বারলেন এবার কি করবেন কে জানে! আর বুঝি ঠেকিয়ে রাখা গেল না হিটলারকে!

সামনের ভদ্রলোক সদানন্দবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—এবার ব্রিটিশের দুর্দশার চরম মশাই—

পাশ থেকে একজন বললে—হিটলার কাঁচা ছেলে নয় মশাই, সেবারের অপমান সুদে আসলে আদায় করে নেবে, দেখবেন—

তারপর ট্রামসুদ্ধ লোকের আলোচনা শুরু হোল। উত্তেজনায় তর্কে গরম হয়ে উঠলো আবহাওয়া। সদানন্দবাবু কিন্তু হতভম্ব হয়ে গেছেন। হঠাৎ নিজের কি কর্তব্য বুঝে উঠতে পারলেন না। একদিন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সরকারী চাকরি ছেড়েছিলেন—জেল খেটেছিলেন। সে এক কথা। আজ আবার কী করবেন কোন্ পথ বেছে নেবেন কে বলে দেবে! সুরেন বাঁড়ুজ্যের সময়ের উত্তেজনাও দেখেছেন। বিপিন পালের বক্তৃতাও শুনেছেন। সে কি জ্বালাময়ী বক্তৃতা। তারপর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন—লবণ আইন ভঙ্গ—ডাণ্ডী মার্চ—কাঁথির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাঁরই হাতের ওপর লাঠির আঘাত পড়েছিল! সে সব কী দিনই গেছে! তারপর কতদিন ও-সব ছেড়ে দিয়েছেন। এই মাস্টারি, এই নোটবুক লেখা—এ পেশা তিনি বাধ্য হয়েই গ্রহণ করেছেন। সারা জীবন শুধু দেশ দেশ করেই কাটলো তাঁর—একটা পয়সাও তাঁর জমলো না। হঠাৎ যদি তিনি কয়েক দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তো বাড়ির লোকেরা উপোষ করবে! একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়ে দেওয়া। ছেলে থাকলে আজ আর তাঁকে সংসারের ভাবনা ভাবতে হোত না। তাঁর এই বয়সে এই অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ বাধলো—সদানন্দবাবুর মনে হোল তাঁর জীবনে এই যুদ্ধ যেন একটা উপদ্রব! গত যুদ্ধের কথা মনে আছে তাঁর। চালের দাম উঠেছিল বারো টাকা। এবারও ওই দাম উঠবে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া এবার নাকি আরো ভীষণ যুদ্ধ। জার্মানী ডেথ্-রে আবিষ্কার করেছে। সে-আগুন লাগলে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তারপর এরোপ্লেন। কত রকমের এরোপ্লেন বেরিয়েছে। মাথার ওপর থেকে বোমা ফেলবে—ধ্বংস হয়ে যাবে শহর। এই কলকাতা শহর—এই ট্রামগাড়ি, টাওয়ার হাউস—ধর্মতলার এই দোকানগুলো কিছু আর আস্ত থাকবে না। ভাবলেও কেমন আতঙ্ক হয়—অবাক লাগে! বোমা যদি পড়ে, লোকে কি করে বাঁচবে কে জানে।

ট্রাম বদলে আবার আলিপুরের ট্রামে উঠলেন। সমস্ত লোকের মুখে ওই এক কথা। এক আলোচনা। সবাই এক একখানা করে খবরের কাগজ কিনছে। অফিস ফেরতা বাবুর দল। জল্পনা-কল্পনার আর অবধি নেই। কিছু চাল এই সময়ে কিনে রাখা ভাল। এখন কিনলে সস্তা দরে পাওয়া যাবে। হিটলার এবার তৈরী হয়ে নেমেছে। কাইজারের মত গোঁয়ার নয়

—ভেবে চিন্তে চারিদ্দিকের আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে সে। তা'ছাড়া মুসোলিনী আছে সঙ্গে। একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর। আর এবারকার যুদ্ধতো আর আগের বারের মত নয়—যে চার বছরের মধ্যে থেমে যাবে। এবার বছর দশেক তো বেকসুর চলবে! এক একজন কথা বলে আর ট্রামসুদ্ধ লোক সেই কথা মন দিয়ে শোনে। সদানন্দবাবু মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। যা শুনলেন তা যদি সত্যি হয় তো ভয়ের কথা বটে! কিন্তু আশ্চর্য—অন্যান্য লোকগুলো এমনভাবে কথা বলছে যেন তাদের দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবার পালা।

ট্রাম থেকে নেমে চেতলার হাট পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এলেন বাড়িতে। শেখর এলে আলোচনাটা জমবে ভাল। বাড়িতে ঢুকে সদানন্দবাবু বললেন – শেখর এসেছে নাকি?

মৃন্ময়ী রান্না ফেলে ছুটে এলেন।

সদানন্দবাবু মৃন্ময়ীকে বললেন—খবর শুনেছ?

মৃন্ময়ীর মনে হোল মিত্তির মশাই তা হলে হয়ত রাজি হয়ে গেছেন। বললেন,—পছন্দ হয়েছে?

সদানন্দবাবু সে কথা কানে না তুলে বললেন,—যুদ্ধ বেধে গেল—শুনেছ?

মৃন্ময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বৌবাজারে পাঠালেন তিনি মেয়ের বিয়ের খোঁজ নিতে—সেই খবর চুলোয় গেল, যুদ্ধের খবরটাই হোল বড়! বললেন,—রাখ তোমার যুদ্ধ, মিত্তির মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হোল?

এতক্ষণে যেন সদানন্দবাবু তাঁর স্বাভাবিক সত্তায় ফিরে এলেন—দেখা তো হোল, কিন্তু সে-এক কাণ্ড হয়ে গেছে ওদিকে।

মৃন্ময়ী অবাক হয়ে গেলেন।—কী রকম?

সদানন্দবাবু নিচু গলায় বললেন—সুরুচি কোথায়?

—ওঘরে পড়ছে—মৃন্ময়ী বললেন।

সদানন্দবাবু বললেন,—আমার তো বিশ্বাসই হয় না, গিয়ে দেখি মিত্তির মশাই রেগে একেবারে - তা রাগবারই তো কথা!······

সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বললেন সদানন্দবাবু। মিত্তির মশাই, ঈশ্বর ঘটকের অসুখ হওয়াতে, বড় ছেলেকে বুঝি পাঠিয়েছিল সদানন্দবাবুর বাড়িতে। তা সুরুচি নাকি অপমান করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সদানন্দবাবুর তো

বিশ্বাসই হয় না। সদানন্দবাবুও বলে এসেছেন তাঁকে—ছেলের বিয়ে দেবার যদি ইচ্ছে না থাকে সে আলাদা কথা—কিন্তু একজনের মেয়ের নামে বদনাম দেওয়া কেন? সুরুচিকে কি আর সদানন্দবাবু বাপ হয়ে চেনেন না? সুরুচির মত মেয়ে কি কখনও এমন কাজ করতে পারে? হয়ত আর কারো বাড়ি ভুল করে গিয়েছিল তাও অসম্ভব নয়, সেখানে কারা কি বলেছে—শেষকালে বদনাম হোল সুরুচির!

মৃন্ময়ী খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—তা সুরুচি সব পারে—আশ্চর্য নয় কিছু—

তারপর খানিক থেমে আবার বললেন,—তোমাদের মতেই চলে, তোমাদের কথাই শোনে—আমি তো কেউই নই—আমার কি, যা খুশি করুক—

সদানন্দবাবু বললেন,—ঘরেই তো রয়েছে, জিগ্যেস কর না ওকে—সত্যি মিথ্যে—

—জিগ্যেস করতে হয় তুমি কর, ছেলে যদি পছন্দ না হয়ে থাকে বললেই হোত আমাদের, আমরা তো ওর ভালোই চাই, তুমিই জোর করে লেখা পড়া শেখালে, ও তো বাড়িতেই পড়তে চেয়েছিল—

সদানন্দবাবু কী করবেন ভেবে পেলেন না। এত শিক্ষা দীক্ষা সব কি ভুল নাকি? কিম্বা হয়ত সুরুচি ঠিকই করেছে। যেখানে অনিচ্ছা রয়েছে সেখানে জোর করে ধরে বেঁধে দিলেই কি সুফল হয়! বয়স হয়েছে, নিজস্ব একটা মত বলে জিনিস হয়েছে—এ তো আর আগেকার যুগের গৌরীদান নয়।

সদানন্দবাবু বললেন,—দাঁড়াও আমিই ওকে জিগ্যেস করছি—বলে সুরুচির ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি, প্রচণ্ড শীত পড়েছে!

বৌবাজারের একটা গলি থেকে শেখর বেরুল। বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই আবার ফিরলো। খবরের কাগজখানা ফেলে এসেছে অফিসে। চারিদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। পাশের বাড়িতে উনুনে কোথাও আগুন দেওয়া হয়েছে—ধোঁয়ায় ধোঁয়া। চোখ দুটো বুজলে শেখর। চেনা পথ—চোখ বুজেও যাওয়া যায়। তবু সঙ্কীর্ণ আঁকা বাঁকা গলি। গলির শেষ প্রান্তে একটা ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলে শেখর। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

আলোয়ানটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলে। আজ যেন বেশী করে শীত পড়েছে।

সাঙ্কেতিক কয়েকটি টোকা দেবার পর দরজা খুললো।

দরজা খুলে দিলে তৃপ্তি। বললে—একি, আবার ফিরলেন যে ?

ঘরের ও-কোণে বিলাস, বসন্ত আর স্বধীরদা বসে আছে। তারা তখনও আলোচনা করছে। শেখর বললে,—খবরের কাগজখানা ফেলে গেছি—দাও তো তৃপ্তি—

সাদা সেমিজের ওপর আটপৌরে শাড়ি পরা রোগা মেয়েটি। এককালে নাকি বছর পাঁচেক আগে টি. বি. হয়েছিল। তবু ক্লান্ত শরীরকে টেনে নিয়ে চলেছে মেয়েটি কেবল তার অদ্ভুত মনোবল আর অপরিমেয় উচ্চাশা নিয়ে। শেখর চেয়ে দেখলে তৃপ্তির দিকে।

ওদিক থেকে স্বধীরদা হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

শেখর এগিয়ে গেল। স্বধীরদা বললে—একটা কথা—তোকে বলতে ভুল হয়ে গেছে শেখর—কতকগুলো পোস্টার করতে দিয়েছি ভারতী প্রেসে, যাবার পথে একবার তাগাদা দিয়ে যাসতো—জরুরী দরকার—ছাব্বিশে জানুয়ারীতে দেয়ালে লাগাতে হবে—বলবি সাত দিনের মধ্যেই চাই—।

তৃপ্তি এসে কাগজটা হাতে দিলে শেখরের। শেখর চলে আসছিল—

—আর একটা কথা—স্বধীরদা বললে।

শেখর ফিরে দাঁড়াল।

স্বধীরদা বললে—কাল একটু সকাল সকাল আসবি। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকেছি কালকে। আর দেরী করা চলে না, জাপান যুদ্ধে নামবার পর থেকেই যুদ্ধটা নতুন পথে মোড় ঘুরলো, আমাদের কর্মপন্থাও এবার বদলাতে হবে—প্রীতম সিং খবর এনেছে স্বভাববাবু এখন জার্মানীতে, আজাদ হিন্দ দল গড়ছেন—সেই সম্বন্ধে আলোচনাও হবে।

তৃপ্তি কথাগুলো শুনছিল। বললে—লতিকাদিকে খবর দিয়েছি—স্বধাংশুদাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি—

শেখর কথা দিয়ে বাইরে এল। তৃপ্তি এসে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে ব্ল্যাক-আউটের রাত। হঠাৎ আলো থেকে বেরিয়ে এসে সব যেন ঝাপসা লাগে। রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল শেখর। কলকাতার আবহাওয়া

অস্বাভাবিক। এমন আবহাওয়া কখনও দেখেনি আগে সে। পার্লহারবারের যেদিন পতন হোল, সেদিন থেকে থম্ থম্ করছে আবহাওয়া। অলস তর্ক আর নয়—এবার কাজ করবার সময় এসেছে। যুদ্ধ যেন এক অতর্কিত মুহূর্তে একেবারে ঘরের দরজায় এসে পৌঁছেছে। রাস্তার বাতিগুলো এতদিন ছিল অর্ধাবৃত, এবার পূর্ণ আবৃত করা হচ্ছে! বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

শেখর ট্রামে উঠে বসলো।

অনেক—অনেক দূরে এখন এই অন্ধকারে পাহাড়ের চূড়োর ওপর থেকে কামান দাগছে গোলন্দাজ সৈন্য। বিদীর্ণ হচ্ছে শেল্, ব্লিৎসক্রীগ চলছে লণ্ডনের ওপর। হেইনকেল আর সুপারফোর্ট্রেস—বম্বার আর ফাইটার—তীব্র কর্ণ-ভেদকারী শব্দ করে বোমা এসে পড়ছে এ আর. পি. শেল্টারের মাথায়। য়ুরোপ আর টিঁকবে না, ফ্রান্স গেছে, গ্রীস, রুমানিয়া, হাঙ্গারী একে একে সব যাবে, এই তো সুযোগ। এদিকে পার্লহারবার, সিঙ্গাপুর, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট তারপর বর্মা, রেঙ্গুন, সব শেষে ভারতবর্ষ।

সুধীরদা সেদিন তাদের গোপন সভায় বলেছে—এই আমাদের সুযোগ। সুভাষবাবু ওদিকে বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দ দল গড়ছেন—এই সময় দলে দলে ব্রিটিশ আর্মিতে ঢুকতে হবে, তারপর এদিক থেকে যারা ফ্রণ্টে যাবে, এরোপ্লেন নিয়ে উড়ে বোমা ফেলতে যাবে—তারা ফ্রণ্ট পেরিয়ে জাপানী দলে গিয়ে যোগ দেবে আর ফিরবে না—

শরীরের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে ওঠে শেখরের।

ময়দানের ট্রাম রাস্তাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দিয়ে অন্ধকারে দেখা যায় সারি সারি তাঁবু পড়েছে। এই ক'দিন আগেও এখানে খোলা মাঠ পড়ে ছিল। হাজার হাজার কণ্ট্রাক্টর লাগিয়ে দিন রাত কাজ চলছে। এরোপ্লেন রয়েছে গোটাকতক। লালমুখ সব সৈন্য ওখানে আছে। অন্ধকারে এখন তাদের দেখা যায় না। প্রচণ্ড শীত। আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলে শেখর।

কালই মিটিং আছে। তারপর যদি সুধীরদার প্রস্তাব মত কাজই হয় তখন শেখরই আগে যাবে ঝাঁপিয়ে। এই তো এখানেই হেস্টিংস। এইখানে হয়েছে রিক্রুটিং সেণ্টার। একদিন এখানে এসেই নাম লিখিয়ে যাবে শেখর। শুধু শেখর নয়—বসন্ত, বিলাস, সুধীরদা নিজেও। তারপর একদিন তাদের পাঠাবে

ফ্রন্টে। মেসিনগান, ট্যাঙ্ক, রাইফেল আর মিলিটারী লরী নিয়ে পৌঁছুবে তারা বর্মায় নয়ত আফ্রিকায়। তারপর একদিন ডাক আসবে সামনে এগিয়ে যাবার। মাঠ জঙ্গল নদী সমুদ্র পেরিয়ে পিঠের ওপর রেশন আর হাতে রাইফেল নিয়ে সামনে এগিয়ে চলবে শেখর। রাত্রির অন্ধকারে ক্যাম্পের দরজা খুলে ডিউটি দিতে বেরুবে একদিন। পায়ে থাকবে মিলিটারী বুট। গায়ে গরম ওভার কোট, রাত্রের অন্ধকারের আচ্ছাদনে ব্রিটিশের সীমারেখা পেরিয়ে চলে যাবে অনেক দূরে। সেখানে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়াবে জাপানীদের সামনে। বলবে—আমরা ব্রিটিশ আর্মির লোক নই। আমরা ভারতবাসী, আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরা বাইরে থেকে আক্রমণ করবো ভারতবর্ষ। আমরা স্বাধীন করব ভারতবর্ষ! বলব, আমাদের সুভাষ বোস কোথায়। তিনিই আমাদের নেতা। আমরা তোমাদের দলে এসেছি নিজেদের দেশ স্বাধীন করবো বলে।

মাথার ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ছে। গোঁ গোঁ শব্দ তার—ট্রামের আওয়াজকে অতিক্রম করে কানে আসছে। যদি সুযোগ পায় এই পাইলটই সে হবে একদিন। আকাশচারীর অপার স্বাধীনতা। ধরা বাঁধা রাস্তার আইন-কানুন জানতে হয় না, ট্রাফিক পুলিশের হাত তোলার ঔদ্ধত্য নেই সেখানে। নির্বিবাদে গিয়ে পৌঁছুবে তার গন্তব্য স্থানে। তারপর একদিন হাতের হাতিয়ার উল্টে ধরবে—দল বেঁধে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে এই দেশে বিজয়ীর বেশে।

গোপালনগরের মোড়ে এসে ট্রাম থামলো। এখানেই নামতে হবে তাকে। ট্রাম থেকে নেমে পড়লো শেখর।

—কে, শেখরদা? ব্ল্যাক-আউটের রাতেও চিনতে পেরেছে নির্মল।

আলোয়ান মুড়ি দেওয়া নির্মল এগিয়ে এল সামনে। বললে—বাড়ির দিকে যাচ্ছ তো? চল—

চলতে চলতে নির্মল বললে—বার্লিন থেকে নাকি সুভাষ বোস রেডিওয় লেকচার দিচ্ছেন—শুনেছ?

শেখর বললে—শুনছি তো তাই—সবাই বলছে।

নির্মল বললে—কিন্তু বার্লিন আমাদের স্বাধীনতা দেবে বলে তুমি বিশ্বাস কর?

শেখর রেগে গেল। বললে—স্বাধীনতা কি হাতের মোয়া নাকি যে, একজন হাতে তুলে এনে ফেলে দেবে? স্বাধীনতা পাবার জিনিস, চেষ্টা করে কষ্ট করে পেতে হয়—

—কিন্তু জার্মানী বা জাপানকেই যদি ডেকে আনি, তাহলে ব্রিটিশরা কি দোষ করলে?

শেখর নির্মলের দিকে চোখ তুলে বললে—ঠিক কথা। সেই জন্যেই তো তোমাদের ব্রতীসঙ্ঘ থেকে বিদায় নিয়েছি। সেইখানেই আমার সঙ্গে তোমাদের কারুর মতে মিলল না, আমরা জাপনকেও রুখতে চাই, ব্রিটিশকেও রুখতে চাই—দেখ ভাই আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও—তোমরা কিছু যদি না পার তো চুপ করে বসে বসে খবরের কাগজ পড়, আমাদের বাধা দিও না—

বোঝা গেল শেখর রেগে উঠেছে। বললে—এতদিন সুভাষ বোসকে তোমরা দেখে আসছ, লোকটা জীবন দিলে দেশের জন্যে, একটি মিনিট দেশের কথা ছাড়া ভাবলে না, তাকেই বা তোমরা কোন আক্কেলে সন্দেহ করে 'ফিফথ্ কলাম্' বল? সেদিন কাগজে দেখলাম সেণ্ট্রাল এসেম্বলিতে এক মেম্বর প্রশ্ন করেছে: ভোটের সময় সুভাষ বোস বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন কিনা—

গলির মোড়ে এসে শেখর বললে—মতে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলবে না, কিন্তু দোহাই তোমাদের, পেছন থেকে ছুরি মেরোনা তোমরা—

সব্‌জি বাগানের গলির মধ্যে ঢুকে শেখর বাঁচলো। বড় রাস্তা থেকে গলিটা আরো অন্ধকার। কয়েকটা পানাপুকুর আর গাছপালা জায়গাটাকে আরো ঠাণ্ডা করে রেখেছে। রাত হয়ে গেছে অনেক। এখন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ভাত ঢাকা আছে নিশ্চয়ই। গত কদিন থেকেই সময় মত বাড়ি আসতে পারছে না শেখর। অনেক কাজের চাপ পড়েছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে যখন শেখর শোবার ব্যবস্থা করছে হঠাৎ পেছনে যেন কার পায়ের আওয়াজ হোল।

পেছন ফিরে শেখর দেখলে—সুরুচি—

বললে—একি? এখনও ঘুমোও নি?

সুরুচির চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল সুরুচি যেন খুব ভয় পেয়ে গেছে।

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে স্নুরুচি এসে বসলে শেখরের খাটের ওপর। যেন আর দাঁড়াতে পারছে না দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে।

শেখর দু হাত দিয়ে স্নুরুচিকে ধরলে। বললে—কী চেহারা হয়েছে বলো তো তোমার—

—আলোটা নিভিয়ে দাও বলছি—বললে স্নুরুচি।

শেখর আলোর স্নুইচটা উঠিয়ে দিয়ে এল। ঘর অন্ধকার, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। শেখর আলো নিভিয়ে দিয়ে এসে বসলো স্নুরুচির পাশে। বসে একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

বললে - কী হয়েছে বলো ত এবার—

যেন আলোতে লজ্জা হচ্ছিল এতক্ষণ। আলো নিভতেই স্নুরুচির অনেকটা সঙ্কোচ যেন কেটে গেল। মুখ নিচু করে নিয়ে স্নুরুচি বললে। সমস্ত বললে।—সন্দেহ হচ্ছে সর্বনাশ হয়েছে তার। কে জানতো একদিন মানুষের শুভ ইচ্ছা, ভালবাসা, সমস্ত কিছুকে পদদলিত করে তার এই স্থূল দেহ তাকে প্রবঞ্চনা করবে। কে জানতো একটি মুহূর্তের মোহ, একটি গোপন ভুলের ইতিহাস তাকে একদিন প্রাসাদ শিখর থেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। এই সংসারের রীতিই হয়ত এই—বলতে বলতে স্নুরুচি উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

শেখর স্নুরুচির মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর টেনে নিয়ে বললে—এর সমস্ত দায়িত্ব তো আমার—তুমি অত ভাবছ কেন ?

সেই অন্ধকার রাত্রের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে যত সহজে কথাটা বললে শেখর, বিষয়টা কি সত্যিই তত সহজ ? সেইভাবে বসে বসেই ভাবতে লাগলো শেখর। দায়িত্ববোধ বড় অদ্ভুত জিনিস। প্রথমে সহজরূপেই আসে, কিন্তু তার ভার বওয়া ভারী কঠিন। কোথায় বিশ্বগ্রাসী সংগ্রাম শুরু হয়েছে—তার জের চলছে বহু দূর দূরান্তরের নগণ্য গ্রামসীমা পেরিয়ে অখ্যাত জনপদ পর্যন্ত—আর এখানে এই অর্ধরাত্রির প্রান্তসীমায় নিভৃত অন্ধকার কক্ষের ভেতর যে দায়িত্বভার সে গ্রহণ করলে, তার জের কত সুদূরপ্রসারী তা এখন এই মুহূর্তে কে বলতে পারে ? কোথায় রইল তার অভ্রভেদী আকাঙ্ক্ষা—দুর্বার দুস্তর পথে নক্ষত্রমণ্ডলচারীর মত উত্তুঙ্গ আশা আর কোথায় এই গৃহকপোতীকে নিয়ে তীর্থ বাস। তবু তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার এমন অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তি হবে, একথা একঘণ্টা আগেও যদি সে জানতে পারতো। জানলে

এমন আকস্মিকভাবে অভিভূত হোত না সে, পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করে কথা দিতে পারতো। অঙ্গীকার অস্বীকার করার কথা নয়—কিন্তু একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময়, একটু কুড়িয়ে ছড়িয়ে ভাববার অবসর—এইটুকু! তাহোক—আশা আর নিরাশা, বাস্তব আর কল্পনা নিয়েই তো জীবনযাত্রা।

শেখর স্থরুচির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—

কিন্তু বলবার আর অবসর হোল না। স্থরুচি শেখরের হাত ছাড়িয়ে অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে এল। শেখর পেছন পেছন বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু ধরতে পারা গেলনা স্থরুচিকে। স্থরুচি নিঃশব্দ পদে নিজের ঘরে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিয়েছে।

স্থরুচি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে, কিন্তু ঘুম আসে না তার! বড় ভয় করতে লাগলো। বিছানার ওপর শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কত রাত হোলো কে জানে—তবু ঘুমের সঙ্গে পরিচয় হোলো না। বালিশটা জোর করে দুই হাতে জড়িয়ে বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল স্থরুচি—ঘুম এবার আসতেই হবে! কিন্তু বন্ধ চোখের দৃষ্টিতে কত কি অদ্ভুত দৃশ্য ধরা পড়ে। সাতরঙা কতকগুলো বিন্দুর সমষ্টি যেন চোখের সামনে ঘুরতে ঘুরতে ওপর থেকে নিচে নামছে। তারপর সেই বিন্দুগুলো একে একে সামনের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে তারা দূর থেকে ছুটে আসছে তার চোখ লক্ষ্য করে—বিন্দুগুলো ফেটে পড়ছে তার চোখের ওপর সশব্দে, কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে না স্থরুচির।

এমন ঘুম-না-আসা স্থরুচির আগে কখনও হয় নি, একবার ছাড়া। পূজোর সময় শ্রীলতাদের বাড়ি গিয়ে কী একরকম সরবৎ খেতে দিয়েছিল ওরা—বাড়ি এসে কিছুতেই আর ঘুম হয় না। সারা রাত মনে হয়েছিল খাটটা কে যেন একবার আকাশে তুলে দিচ্ছে আবার একবার হঠাৎ নিচেয় ফেলে দিচ্ছে। সে কি রাতই যে কেটেছে একটা। কিন্তু আজকের এ-রাত অন্যরকম। চোখ দুটো অবিরত জ্বালা করছে, সমস্ত শরীরের অভ্যন্তরে যেন কোথাও আগুন লেগেছে। কোথায় পুঞ্জীভূত ভুলের আবর্জনা জড় হয়েছিল—তারি ওপর লজ্জা, ঘৃণা আর পাপের ইন্ধন দিয়ে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই

সময় যদি কাউকে সব বলতে পারা যেত। যদি সহানুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে কেউ শুনতো তার কথা। সান্ত্বনা দিত অপার মমতা দিয়ে। কিন্তু কার কাছে যে যাবে ভেবে পেল না সুরুচি। আজ তার মতন দুরবস্থায় কোন মানুষের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এতখানি লজ্জা এতখানি বিষ কে আত্মসাৎ করে নেবে?

খাটের নিচে কড়মড় শব্দ হচ্ছে! কিসের শব্দ কে জানে।

সুরুচি বিছানা ছেড়ে উঠল। আলো জ্বাললো। নিচু হয়ে দেখলে একটা বেড়াল। ইঁদুরের হাড় বেড়ালের হজম করতে বুঝি কষ্ট হয় না। সুরুচির সঙ্গে চার চোখ এক হতেই বেড়াল চিবোন বন্ধ করলে। পাশের বাড়ির পোষা বেড়াল। সাদা-কালো ছাপ লাগানো গায়ে—গোল গোল চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। কি হবে আর ওকে বিরক্ত করে! সুরুচি দাঁড়িয়ে উঠলো। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

যে দিন সবাই জানতে পারবে। কী লজ্জা, কী ঘৃণা। তার মনে হোল এখনি যেন তাকে লক্ষ্য করে সবাই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। বলছে—ওই যে, ওই সেই মেয়েটি।

ওরা আছে বেশ! সারাদিন নিজের কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাত্রে এসে ঘুম! ওদের কাছে মৌখিক খানিকটা সান্ত্বনা, খানিকটা আদর। শেখরদার চোখে মুখে কিসের ছবি ফুটে উঠেছিল কে জানে। আলো নিভোন ছিল, দেখা যায় নি কিছু। ঘর থেকে যখন সুরুচি চলে এল, তাকে ধরে রাখতে পারেনি শেখরদা। বুকে তুলে নিতে পারেনি তাকে। কেন তাকে বলতে পারেনি—তার সমস্ত কলঙ্কের কাঁটা তার ভালবাসা দিয়ে গোলাপের মত ফুটিয়ে তুলবে। তার সমস্ত মেঘভারাতুর আকাশ রামধনুর আবির্ভাবে ধন্য করে তুলবে সে!

কিন্তু রাগ করাও অন্যায় শেখরের ওপর। শেখরদাই বা এ-দায়িত্ব নেবে কেন? সুরুচি নিজেই দায়ী। আর নিজেকেই বা দায়ী করে সে কী করে? কেমন করে কবে কখন কী হোল, সে-ই কি জানে নাকি? দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে ইচ্ছে হোল সুরুচির। কেউ জানে না তার কথা। কেউ খোঁজ রাখে না। সবাই স্বার্থপর। যে যার নিজের সমস্যা নিয়ে আছে। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা কেউ ভাবে না। সর্বনাশের শিখরে দাঁড়িয়ে সে

ঝাঁপিয়ে পড়বে গভীর মৃত্যুর সমুদ্রে—কেউ জানবে না। কেউ দেখবে না। এক মিনিটে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই করতে হবে তাকে!

আবার উঠলো সুরুচি। বড় শীত পড়েছে, তবু সুরুচির মনে হলো তার যেন সারা শরীরে ঘাম বেরুচ্ছে। উঠে দরজা খুলে বাইরে এল। কনকনে শীত। পাণ্ডুর আকাশের প্রান্তে একখণ্ড চাঁদ অস্পষ্ট ধূসর। দেখলে মনে হয় যে চাঁদের অবয়বে যেন তারই ছায়া পড়েছে। বিষণ্ণ মুহূর্তমণ্ডিত রাত। এ রাতের অন্তস্তলে কোথায় যেন এক গূঢ় আতঙ্ক লুকিয়ে আছে। প্রেতের মতন অশরীরী আতঙ্ক। আজ সারা রাত বুঝি এমনি এই আতঙ্ক আর অরাজকতার অভিনয় চলবে। বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়ালে শৈল মিত্তিরের বাড়ির অর্ধেকটা নজরে পড়ে। নটবর দত্তের বাড়িটা পশ্চিম দিকে নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ ওদিক থেকে একটা এরোপ্লেনের আওয়াজ এল। প্রথমে অস্পষ্ট তারপর স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রখর। এরোপ্লেনটা দেখা যায় না, কিন্তু পাশা-পাশি একটা লাল আর একটা সবুজ আলো জ্বলছে। চলন্ত যন্ত্র-দানব—ওর অভ্যন্তরে আরো কজন প্রাণী সুরুচির মত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে কে বলতে পাবে। ওরা হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করতে চলেছে। হঠাৎ সুরুচির মনে হোলো, যদি এখন বোমা পড়ে। তার মাথায় নয়—কিন্তু কাছাকাছি কোথাও। তাহলে কি সে বাঁচবে। বাঁচার কথা দূরে থাক—এই বাড়িটার অস্তিত্বও কি থাকবে! একদিন হয়তো এ শহরে সত্যি সত্যিই বোমা পড়বে—মাটির নিচে ট্রেঞ্চের ভেতরে সত্যি সত্যিই আশ্রয় নিতে হবে সকলকে। সেই দিনটা কেন নিকটতর হয়ে আসে না? কেন বোমা পড়ে না আজ এই মুহূর্তে। তাহলে তো আর জবাবদিহি করতে হয় না কারুর কাছে। দূরে কাছে যে যেখানে আছে—আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত তারা সবাই জানবে সুরুচির মৃত্যু হয়েছে অপঘাতে। সুরুচি আত্মহত্যা করেছে সে কথা কেউ জানবেনা। সুরুচির আত্ম-বিলোপের এই প্রচেষ্টাকে কেউ ধিক্কার দেবে না। প্রাণ যখন সস্তা হয়ে গেছে, জীবন যখন তার যথার্থ মূল্য হারিয়েছে, তখন সামান্য একটা মেয়ে সুরুচির মৃত্যুকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। প্রতি মুহূর্তে যেখানে মৃত্যুর নিশ্চয়তা, সেখানে বেঁচে থাকাটাই তো উল্লেখযোগ্য।

ও-পাশের ঘরে শেখরদা আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। শেখরদা এতবড় দুঃসংবাদের পরও দরজা বন্ধ করে শুতে যেতে পারলো! হয়তো ঘুমও আসবে তার। সমস্ত রাত ঘুমের ঐশ্বর্যে আবৃত হয়ে সকালবেলা সমারোহ করে জেগে উঠবে। রাত্রের দুঃসংবাদের কাহিনী হয়তো দুঃস্বপ্ন বলেই ভুল হবে তার। তারপর যখন শুনবে? শুনবে বিগত রাত্রির দুর্ঘটনার কথা! শুনবে সুরুচি স্বেচ্ছায় নিঃশেষ করে দিয়েছে তার প্রাণলীলা, আত্মঘাতের চরম অঙ্কে সুরুচি সাঙ্গ করে দিয়েছে তার ভূমিকা, আর সুরুচির আত্মা একদণ্ডের একটি ক্রিয়ায় লাভ করেছে পরম নির্বাণ—তখন? তখন কাঁদবে নিশ্চয়ই! যত বড় কাঠিন্যের আবরণই থাক—শেখরদাকে সুরুচি চেনে। কর্তব্যবোধের চরম প্রেরণায় শেখরদা আত্মবলি দিতেও পেছপা হবে না। তবু মৃত্যুকে কে ভালবাসে? কে ভালবাসতে পারে ঠাণ্ডা কঠিন বাস্তব নিষ্প্রাণতা।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সুরুচি ছাদে উঠতে লাগলো। এখানে একতলার এই বাঁধা দেওয়ালের সীমানায় যেন তার ব্যথা বিস্তার লাভ করতে পারে না। বিস্তার না হলে কি ব্যথার প্রশান্তি লাভ ঘটে। মনে হোলো যেন ছাদের খোলা হাওয়ায় গগনবিস্তৃত প্রচ্ছদপটে সুরুচির অন্তরাত্মা আপন আত্মীয়কে খুঁজে পাবে। এরা যেন কেউ নয়। মার জন্যে দুঃখ হবে না তত—কিন্তু বাবা! ওই সরল সহজ মানুষটির কথা সুরুচির যেন ভুলতে পারার কথা নয়। বাবার কষ্ট যা হবে, তা সুরুচি এখনই কল্পনা করতে পারে।

ছাদের আলসের একেবারে ধারে এসে দাঁড়াল সে। অনেক দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে শ্মশানের কাছে দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দিরের চুড়োটা দেখা যায়। শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার আগুনে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—তারপর আবার ঝাপসা। সমস্ত শহরময় ব্ল্যাক-আউট। ধূ ধূ অন্ধকার চারিদিকে। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কোথা থেকে কামানের শব্দ উঠলো। হয়তো উত্তর দিক থেকে একটা এরোপ্লেন চলেছে পূর্ব-দক্ষিণ কোণা-কুণি। সারা নিশীথ-নগরী ওরা প্রহরা দিচ্ছে নাকি।

একতলার ছাদ।

সুরুচি নিচের দিকে ঝুঁকে দেখলে। কত নিচু হবে। মাথাটা হঠাৎ বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো। গায়ের শাড়িটা ভালো করে নিবিড়ভাবে সারা শরীরে জড়িয়ে নিলে। কই—আর তো শীত করছে না। ওই এরোপ্লেন থেকে যারা

বোমা ফেলে, যারা প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ে দশ হাজার ফুট ওপর থেকে পৃথিবীর বুকে—তারা কি শুধু টাকার জন্যে করে? নিচের দিকে চাইলে মাথা কি তাদের ঘুরে যায়? কিছু নয়—সমস্তই সহ্য হয়। এই দারুণ শীতের রাত—এই ব্ল্যাক-আউটের রাত—এই অশান্তিময় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা—এও তো সহ্য হচ্ছে তার। সুরুচি তো লাফিয়ে পড়ছে না ছাদ থেকে নিচেয়—অথচ এই মুহূর্তে তাকে তো বাধা দেবার কেউ নেই। হঠাৎ কী মনে পড়ায় সুরুচি যেন আবার শান্ত হয়ে এল। দুই হাত সুরুচি নিজের সারা গায়ে বুলোতে লাগল। তারই শরীরের কোন এক গোপনতম অংশে নিভৃততম পরিবেশে সে রয়েছে। একখণ্ড লজ্জা, একখণ্ড কলঙ্ক। কথাটা ভালো করে ভাবতেই দুই হাতে মুখ চোখ ঢেকে ফেললে সুরুচি। এই চরমতম অবস্থার জন্যে কাউকে দায়ী করার প্রশ্ন ওঠে না। শেখরদা তাকে বিয়ে করবে—তাকে গ্রহণ করে তাকে মহীয়সী করে তুলবে। কিন্তু এ-অনুকম্পা সে গ্রহণ করবে কি করে? কোথায় রইল তার সাম্রাজ্ঞীর অহঙ্কার—কোথায় রইল তাকে জয় করতে দেবার অন্ধ অধিকার।

দূরে কয়েকটা নারকোল গাছের সারি উন্নত শির নিয়ে দাঁড়িয়ে। কুয়াশা-বেষ্টিত পরিবেষ্টনী। ফোঁটা ফোঁটা হিম পড়ছে আলুলায়িত চুলের ওপর। ভিজে রাত। এই সব রাতেই বুঝি মৃত আত্মারা জীবিত হয়ে ওঠে। নতুন ভ্রূণ জন্ম নেয়। এমনি এক রাতেই তো সে অঙ্কুরিত করেছে একটি অদৃশ্য বীজ—সেই বীজ আজ তাকে অনন্যোপায় করে এই মৃত্যু-তীর্থে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সুরুচির মনে হোল তার শরীরের অভ্যন্তরে কে যেন মৃদু সঙ্কেত করছে। অদৃশ্য প্রাণের নিষ্ঠুর সঙ্কেত। সে-সঙ্কেতের অর্থ সুরুচির কাছে অপরিচিত নয়। সে-সঙ্কেত পেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে অবহেলা করে ছুটে যায় সৈনিক। সে-সঙ্কেতের অপেক্ষায় বসে থাকে শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি প্রভাতের রক্তিমার দিকে চেয়ে—এ সেই সঙ্কেত। সুরুচি প্রাণপণে আর্তনাদ করতে গেল—কিন্তু মুখ দিয়ে তার শব্দ বেরুল না। তার মনে হোল কে যেন তাকে ঠেলছে—পশ্চাতের দিক থেকে সামনে। সামনে বিরাট গহ্বর—এক মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিচেয়—তারপর সব নিঃশেষ।

হঠাৎ যেন পিসীমার চিলে-কোঠার ঘরের দরজা খোলার শব্দ হোলো।

এখনি দেখে ফেলবে তাকে। স্থরুচি আড়ালে সরে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে পিসীমা বেরুবে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

—কে?

আবার প্রশ্ন করলেন গিরিবালা।

নিঃশব্দে সরে এসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল স্থরুচি। গিরিবালার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে থেকে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেকে! তারপর নিচের একতলায় এসে কান পেতে শুনল—গিরিবালা তাঁকে অনুসরণ করছে নাকি! না কেউ আসছে না। কোন পদশব্দের আভাস নেই কোথাও। একতলার রোয়াক তখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। শৈল মিত্তিরের দোতলা বাড়ির আড়ালে চাঁদ ডুবে গেছে। ঠাণ্ডা শবের মত প্রেতায়িত আবহাওয়া। স্থরুচির ভয় করতে লাগল। ঘরে গিয়ে শুলে এখন আর ঘুম আসবে না। বিছানায় যেন কাঁটা বিছানো আছে। মৃন্ময়ীর ঘরের দরজা বন্ধ—ওপাশে সদানন্দবাবু আর একটু পরেই উঠবেন। এখন রাত কত কে জানে। শেখরদার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল স্থরুচি। বন্ধ দরজার ভেতর এখন নিবিড় ঘুমের সমুদ্র নিস্তরঙ্গ নিথর নিটোল। কিন্তু শেখরদা ছাড়া তার গতিই বা কি আছে। মান অভিমানের, অধিকার-অনধিকারবোধের, লজ্জা-সম্ভ্রমের প্রশ্ন এখন নিস্প্রয়োজন, নিরর্থক। একমাত্র শেখরদাই তাকে এই বিড়ম্বনার, এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। শেখরদার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আবার ভাবতে লাগল স্থরুচি। আঘাত দেবে দরজায়? স্থরুচি জানে, ভাল করেই জানে—একটু সঙ্কেত পেলেই দরজা খুলে যাবে। তার পর দুইটি বাহুর নিবিড়তায় তাকে আশ্বস্ত করবে শেখরদা। কিন্তু না। স্থরুচির আবার মনে হোলো—সে কেন ডাকবে তাকে। তার তো জানা উচিত—এখানে রাত্রির প্রহরগুলি কেন বিনিদ্র, এখানে মৃত্যুর শিয়রে মুহূর্তগুলি কেন অচল। স্থরুচি ফিরে এল। ফিরে এসে নিজের ঘরে নিঃশব্দে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

প্রতিদিনের মত সকলের আগে গিরিবালার ঘুম ভেঙেছে। তারপরে উঠেছেন মৃন্ময়ী। চা সদানন্দবাবু খান না, সেই একটা তাঁর স্থবিধে। তারপর শেখর উঠে বেড়াতে যায়। শীতকালের সকালবেলার জড়তা যেন আর কাটতে চায় না। লেপের তলা থেকে শরীরটাকে বার করলেই যেন অসাড় হয়ে

আসে। তবু কলকাতার শীতকে কি আর শীত বলা উচিত! শীত পড়ে হাজারীবাগে। সে যেন এক জমাট-বাঁধা অবস্থা। সকালবেলা উঠেই চৌধুরী গাড়ি নিয়ে পড়তো। গাড়িটাকে ধুয়ে মুছে রাখা, ইঞ্জিনটায় একটু মবিল দেওয়া, ভেতরের সিটগুলো পরিষ্কার করা। গ্যারাজের পাশে ছিল একটা কাগজীনেবু গাছ, একটা বাঁশ দিয়ে গাছের ডালপালাগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা হোত, নইলে কাঁটায় লেগে কাপড়-জামা ছিঁড়ে যেতে পারে। এ-কলকাতার শীতে শেখরের কষ্ট তেমন হয় না।

সদানন্দবাবু বলেন—শীত-টীত আমার করে না—বলে খালি গায়ে চট্‌পট্‌ করে সরষের তেল চাপড়াতে শুরু করেন! তারপর চৌবাচ্ছার কাছে গিয়ে ঘটি নিয়ে হুড় হুড় করে ঠাণ্ডা জল ঢালেন মাথার ওপরে। শীত হয়ত করে তাঁর—কিন্তু গঙ্গাস্তোত্রটা এমন চীৎকার করে আবৃত্তি শুরু করেন, ভয়েই শীত পালিয়ে যায়। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গাকে এমন প্রাণ খুলে ডাকা শেখর আর কারু মুখে শোনে নি। শীতকে সদানন্দবাবু ভয় করেন না, বরং গরমটাই সহ্য হয় না তাঁর। গ্রীষ্মকালে মাথার চুলগুলোকে নিয়ে হয় তাঁর বিড়ম্বনা। একদিন নাপিত ডেকে ছেঁটে ফেলেন সমস্ত সমান করে।

মৃন্ময়ী সকাল বেলা উঠেই উনুনে আগুন দিয়ে দিয়েছেন। ডালটা চাপিয়ে স্নানটা সেরে নেন। কয়লার দাম বাড়ছে—চেয়ে চিন্তেও সময় মত কয়লা পাওয়া যায় না। উনুনে কয়লা পুড়লে মৃন্ময়ীর যেন সহ্য হয় না। গায়ে লাগে। কোত্থেকে আসে সব—কে আনে! সুরুচিকে দিয়ে কোনও কাজই হবার নয়। ওর বয়সী ছেলে হলে আজ মৃন্ময়ীর ভাবনা। সারাদিন লেখা পড়া আর গল্প। মানুষ তো কেউ নয়। উনি থাকেন সারাদিন বাড়ির বাইরে। ওই যে বাইরের একটি ছেলে—কাজ একটু আধটু বললে করে। কিন্তু বলবে কখন। কোথায় থাকে, কি কাজ করে, কখন আসে, কখন যায়—শেখরের টিকি দেখতে পাওয়াই ভার। রাত্তির বেলা উনি যখন ফেরেন তখন সংসারের দুটো চারটে কথা বলবার সময় হয়, কিন্তু শোনে কে? অত বড় মেয়ে সে-ও ওদের সঙ্গে মিলে গল্প করে। গল্প মানেই সময় নষ্ট। সময় নষ্ট মৃন্ময়ী দেখতে পারেন না দু'চোখে। এ-সংসার যেন একা তাঁরই। অথচ এতগুলো লোকের ঠিক সময়ে খাওয়া, দাওয়া, তদ্বির তদারক—কে করে! অনেক দিন আগে তাঁর মনে আছে—একদিন তিনি যখন বধূ হয়ে এসেছিলেন এ-বাড়িতে, তখন কত

আশা কত উগ্তম ছিল তাঁর। তাঁর সংসার হবে—তাঁর নিজের সংসার—সেখানে আর কারো কর্তৃত্ব থাকবে না। সংসার—আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পুত্রবধূ, মেয়ে-জামাই নিয়ে তিনি সংসারের গিন্নী হবেন। তাঁর কথায় লোক উঠবে বসবে! কিন্তু কোথায় কী! বিয়ের পর কত বছর কিছু হোল না। গিরিবালা কালীঘাটে গিয়ে নকুলেশ্বরতলায় পুজো দিয়ে এসেছেন। গাজীপুরের মেলায় গিয়ে গাজীসাহেবকে সিন্নী দিয়েছেন। তুক তাক কি আর বাকি ছিল। সবাই জানতো ছেলে-মেয়ে তাঁর হবে না। তাঁর কপালে সংসার করবার সৌভাগ্য নেই। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনা, দুধে আলতায় মঙ্গলঘটে শাঁখ বাজিয়ে বউ বরণ করা। এ-কি কম সৌভাগ্যের কথা! গিরিবালারও আগ্রহের সীমা ছিল না। শেষ পর্যন্ত যেদিন সন্তান সম্ভাবনা হোলো মৃন্ময়ীকে গিরিবালা বলেছিলেন—তোমার ছেলে হবে বউ—

মৃন্ময়ীরও আশা হয়েছিল হয়ত তাই হবে। সদানন্দবাবুর ওসব দিকে খেয়াল নেই। বলেছিলেন—মেয়ে হলেই বা দোষ কি!

সত্যিই তো মেয়ে হলেই বা দোষ কি! সদানন্দবাবুর কিছু তাতে অসুবিধে হয়নি। ওরা তিনজনে মিলেই থাকে, তিনজনেই গল্প করে. মৃন্ময়ীকে ওরা ও-দলে গ্রহণ করে না। তিনি যেন এ-সংসারে অপ্রয়োজনীয়। প্রথম যখন শুনলেন তিনি—মেয়ে হয়েছে, তখন কান্না আসা কি অস্বাভাবিক হয়েছিল। গিরিবালা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন সেদিন। বলেছিলেন—মেয়ে বলে কি ফেলনা নাকি? কপালে সুখ থাকলে ওই মেয়েতেই সুখ হবে—

মেয়ে তো হোলো। চিরকালই অভাবের সংসার। স্বামীকে সংসারে ফিরিয়ে এনেছেন বটে, কিন্তু তাঁকে প্রকৃত সংসারী যাকে বলে তা করতে পারা যায়নি। তা হোক, তবু সেই অভাবের মধ্যেও সুরুচিকে দারিদ্র্যের মুখ দেখতে দেননি, অভাবের পরিচয় কখনও পায়নি সুরুচি। পুরুতঠাকুরকে দিয়েছিলেন মেয়ের কোষ্ঠী করতে। এতদিন পরে যদি বা একটা হোলো—তাও আবার একটা মেয়ে। কার ঘরে পড়বে কে বলতে পারে! পুরুষের ভাগ্যের মতই মেয়েদের বিয়ে—কোথায় কখন কেমন করে হবে কে জানে। মৃন্ময়ীর মেজমামার মেয়ে—তার যে বিয়ে হবে কেউ ভেবেছিল? টাকার জোরে তাও হোলো—ভালই হোলো। তা ছাড়া কেষ্টদাসী? এখন নাকি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দাসীবাঁদীদের ওপর হুকুম চালায়। যা হোক্

পুরুতঠাকুর কোষ্ঠী বিচার করে বলে দিলেন—এ মেয়ে তোমার রাজরানী হবে মা—দেখে নিয়ো—কেন্দ্রে বৃহস্পতি—

উনুন থেকে ডালের কড়া নামিয়ে ভাত চড়িয়ে দিলেন মৃন্ময়ী।

সকাল বেলা গিরিবালা নিচে নামতে পারেন না। তখন তাঁর জপ আর পুজো চলে। শৈল মিত্তিরদের বাগান থেকে কিছু ফুল, দু'চারটে বেলপাতা নিয়ে আসেন। ওই সময়টা তাঁর একটু পাড়া বেড়ান হয়ে যায়। শীতকালে গাছের নিচের দিকে পাতা নেই—ওপরেও বিশেষ নেই। তবু তারই মধ্যে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে নিতে হয়। পাড়ার আরো দু'চারজন বুড়ীও আসে ফুলের আর বেলপাতার সন্ধানে।

মানদা আসে সাজি নিয়ে। বলে হ্যাঁগা, শেতলাতলায় কথকতা হচ্ছে কদিন থেকে—গেছ্‌লে নাকি ?

গিরিবালা বলেন—তোমার ভাইঝি কেমন আছে, অসুখ হয়েছিল—

দু'চারটে কথা। যে যার নিজের সংসারের কাজে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে এ-বাড়ির ও-বাড়ির খবর আদান প্রদান চলে। চৌধুরীবাড়ির মানদা আসে, ফণি গাঙ্গুলীর বিধবা মেয়ে অমূল্যবালা আসে। কেউ বলে—একদিন এসো দিদি—সংসারের জ্বালায় আর সময় পাইনে—

—কদিন যে দেখতে পাইনি—গঙ্গার ঘাটে কদিন খুঁজছিলাম—

—একটা পাত্রের সন্ধান আছে পিসীমা ? মেয়েটা বড় হচ্ছে দিনদিন—

—একটা লোকের অভাবে—নিম-বেগুন খাওয়া হোলো না এ-বছর—কে পেড়ে দেয় দিদি—

—কী যুদ্ধই বাধলো মা, সাবু পাচ্ছি না, ভাইঝির অসুখ, তা খেতে দিই কী বলো তো—

পাড়ার কয়েকজন বুড়ীর একত্র হয়ে খবরাখবর নেওয়া চলে। চেতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে প্রতিবেশীদের বউ-ঝিদের সঙ্গে দেখা হয়। শেতলাতলায় পুজো দিতে গিয়ে মেয়ের বিয়ের পরামর্শ হয়। পাঁজি সবাই পড়তে জানে না। মুখে মুখে শুনতে হয় কবে একাদশী, কবে নীলের উপোস। এই বাড়িতেই কেটে গেল চোদ্দ বছর। তখন চেতলা কী ছিল। ওই তুষপুকুর—ওখানে কচুশাক হোত। কতদিন ওই শাক তুলে এনেই রান্না হয়েছে। আশেপাশের জমিগুলো খালি পড়ে ছিল। রাস্তাঘাটে বউঝিরা বেরুতো নিঃসঙ্কোচে।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি মেয়ে বউদের যাওয়া আসা ছিল। এখন সব বাড়ি হয়েছে চারপাশে। আগেকার যুদ্ধের পর পাশের তিনকড়ি দত্তরা বাড়ি করলে। কাচের চুড়ির ব্যবসা তাদের। এবার আবার যুদ্ধ বেধেছে। কারুর পৌষ মাস আর কারুর··· ···তা ছাড়া কত নতুন লোক এসেছে এই চেতলায়। গঙ্গার ঘাটে গেলে নতুন সব মুখ, কাউকে চেনা যায় না। সকালে দিনের বেলাতেই যা একটু সময়, সন্ধ্যে হলেই তো অন্ধকার—চারিদিকে ব্ল্যাক-আউট। রাস্তায় চলতে চলতে লোকের সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা খেতে হয়। আর গিরিবালার অত সময়ই বা কোথায়? কদিন ধরে ভাসুর-পোকে একটা চিঠি দেওয়াই হচ্ছে না। নিজের জপ করাই হয়না ভাল করে। এবার এক গুরুর কাছে মন্ত্র নিলে হয়। কালিদাসীর গুরুদেব এবার বোশেখী পূর্ণিমার দিন আসবেন। যদি তাঁর দয়া হয়, এবার দীক্ষা নেবেন তিনি। সদাকে বলবেন তিনি কাশীতে গিয়েই থাকবেন। মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা পাঠালেই তাঁর চলে যাবে। পাঁচটা করে টাকা সদা কি আর বিধবা দিদির জন্যে খরচ করতে পারবে না!

আজ কিন্তু গিরিবালার কিছুই ভাল করে মনের মত করে হোল না।

কোন রকমে নটার মধ্যে পুজোটা সেরে নিয়েই রান্না ঘরে চলে এলেন। মৃন্ময়ী তখন রান্না শেষ করে নতুন করে উনুনে কয়লা দিয়েছেন। শেখর খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে কাজে।

গিরিবালা মৃন্ময়ীর কাছে গিয়ে বললেন-- ও বউ—শোন—

মৃন্ময়ী মুখ তুলে বললেন—কি দিদি?···কিন্তু গিরিবালার মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেছেন।

গিরিবালা আরো নিচু হয়ে গলা খাটো করে বললেন—রুচি কোথায়?

স্বরুচির কলেজ বন্ধ। বড়দিনের ছুটির পর আর কলেজ খোলেনি। বোমা পড়বার ভয়ে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনেক মেয়ে কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেছে। চেতলাতেও কয়েকঘর নিজেদের দেশে চলে গেছে।

মৃন্ময়ী বললেন—কেন দিদি, কি হোল?

গিরিবালা আবার জিগ্যেস করলেন—স্বরুচি কোথায়? দেখতে পাচ্ছিনে তাকে—

মৃন্ময়ী বললেন—কি জানি, দশটা বাজতে চললো, এখনো ওঠেনি বিছানা

থেকে, দেরী করে ঘুম থেকে উঠেছে আজ, আজ চা পর্যন্ত খেলে না—আমিই শেখরকে চা করে দিলুম—

গিরিবালা এবার রান্নাঘরের মধ্যেই বসে পড়লেন। বললেন—রুচির কথাই বলছিলুম—তুমি তো বউ কিছুই নজর দাও না, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে—কাল মাঝ রাত্তিরে—

মাঝ রাত্রের ঘটনাতে গিরিবালার সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে। কদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। কলতলায় গিয়ে সেদিন আর বেরুতেই চায় না। বেরিয়ে আসবার পর দেখেছেন বমি করে জল দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছে। দু-একটা ভাতের টুকরো তখনও এখানে ওখানে পড়ে আছে।

মৃন্ময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাই কি সম্ভব নাকি! তাঁর নিজের পেটের মেয়ে—তার কি এমন কাণ্ড!

গিরিবালা বললেন—দেখনি, কদিন থেকেই ভাতে মুখ দিচ্ছেনা .... যেন আলিস্যি আলিস্যি ভাব- সামনে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে কথা বলতে পারে না—

মৃন্ময়ীর হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। বললেন—কী যে তুমি বল দিদি, আমাদের রুচি? কার কথা বলছো ঠাকুরঝি?

ভাল করে শুনেও যেন মৃন্ময়ীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এমন কেলেঙ্কারীর কথা যে ভাবা যায় না। শেষকালে কি এই তাঁর কপালে ছিল! হাতের কাজ ফেলে মৃন্ময়ী উঠলেন! কিন্তু কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

—তুমি বোস দিদি—বলে মৃন্ময়ী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মৃন্ময়ী সোজা চলে এলেন সুরুচির ঘরে। সুরুচি বালিশে মুখ গুঁজে তখন শুয়ে আছে। ঘরের জানালাটা পর্যন্ত খোলা হয়নি। মশারিটা পর্যন্ত তোলা হয়নি।

মৃন্ময়ী বললেন,—কি হোল বলতো তোর রুচি।

সুরুচি একবার মুখটা তুলে আবার পাশ ফিরে শুলো।

মৃন্ময়ী ছাড়লেন না। ছাড়বার পাত্র তিনি নন। কাছে গিয়ে হাত ধরলেন। বললেন,—ওঠ্, শোন্‌তো, এদিকে ফের্—

জোর করেই একরকম পাশ ফিরিয়ে দিলেন সুরুচিকে। সুরুচির চেহারা দেখে মৃন্ময়ীর ভয় হোল। সারা রাত সত্যি সত্যিই তা হলে ঘুমোয়নি। একদিনে মেয়ের এ কি চেহারা হয়েছে! চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

চোখের নিচে কাল দাগ পড়েছে—তার ওপর জল পড়ে পড়ে ভারী দেখাচ্ছে চোখের পাতা। একটু ফুলেও উঠেছে।

মৃন্ময়ী দুটো হাত ধরলেন সুরুচির। বললেন,—আয়, ওঠ, মুখে জল দিবি চল –

একরকম জোর করেই ধরে তুললেন মেয়েকে। সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মৃন্ময়ী সুরুচির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখলেন। কাপড়টা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলে সুরুচি। কিন্তু মৃণ্ময়ীর দৃষ্টির সামনে সুরুচি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। চোখ নিচু করলে সুরুচি। সুরুচির মনে হোল মা যেন তার সর্বাঙ্গে প্রখর পর্যবেক্ষণ শুরু করছে, তার শরীরে যেন আবরণ নেই, সে নিরাবরণ হয়ে মার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর মা তার সর্বাঙ্গ দেখতে পাচ্ছে।

তারপর যেন নিঃসন্দেহ হয়েই মা বললেন,—এ কি সর্বনাশ করলি মা রুচি ? আমাদের মুখ পোড়ালি—

স্খলিতমূল বৃক্ষের মত সুরুচি এক মুহূর্তে মার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। মার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আকুলি বিকুলি করে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। যেন সত্যিকার আশ্রয় মিলেছে এখন। যেন এখানেই একমাত্র প্রকৃত সান্ত্বনা পেতে পারে সে। মৃন্ময়ীর মাথায় তখন বজ্রাঘাত হয়েছে। বজ্রাঘাতও বুঝি এমন নিদারুণ অসহ্য নয়। কি করবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবেন কি, তাঁর বুকের মধ্যেও যেন সেই পুরোনো অসুখটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাঁর তো বুকের অসুখ আছেই—এবার আবার সেটা শুরু হবে নাকি। কিন্তু সামলে নিলেন তিনি। মেয়েকে আস্তে আস্তে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর পাশে বসে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—এমন সর্বনাশও মানুষের হয়—

মৃন্ময়ী ভাবতে লাগলেন,—সর্বনাশ যে সত্যিই কখন কেমন করে কোথায় ঘটে কেউ বলতে পারে না। এখন উপায়। এতদিনের এত ভগবানকে ডাকা, এত কালী ঘাটে পুজো দেওয়া, এত আয়োজন, এত শিক্ষা, সংযম, ভালবাসা, মায়া মমতা সব মিথ্যে হয়ে গেল !

গিরিবালা পাশে এসে দাঁড়ালেন। মৃন্ময়ী বললেন,—দিদি এর চেয়ে মরণ হোল না কেন আমার—আমার যে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে—

গিরিবালা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কেমন করে এ সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে ভেবে পেলেন না। সান্ত্বনাই বা দেবেন কাকে। বিপদ তো মৃন্ময়ীর আর গিরিবালারই। তাঁদেরই তো সান্ত্বনা পাবার কথা।

রান্না, খাওয়া, প্রাত্যহিক সংসারের নিয়মিত কাজে আর যেন হাত বসে না। রুচিও নেই খাওয়ার। দুপুরের ক্লান্ত প্রচ্ছদপটে আজ যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে কে। একটি নিমেষে সমস্ত বিস্বাদ হয়ে গেল। মৃন্ময়ীর মাথা ধরে গেল। ভাববার সামর্থ্য নেই মাথায়। পাঁচিলের মাথায় একটা কাক অকারণে অনেকক্ষণ ধরে চীৎকার করছিল—মৃন্ময়ী তাড়িয়ে দিলেন বিরক্ত হয়ে। চারিদিকে যেন কেবল অপব্যয় আর অমঙ্গলের চিহ্ন। পাশের বাড়ির বেড়ালটা রোজ আসে মাছের লোভে, খাওয়ার শেষে মৃন্ময়ী ভাত মেখে দেন তাকে, আজ দিলেন দূর করে! চুলোয় যাক সব, সব জাহান্নামে যাক্। যেন সব দিকে ভাঙন ধরেছে। এতদিন ধরে সব দিকে নজর রেখে তো এই হোল।

গিরিবালা মৃন্ময়ীকে আড়ালে ডেকে বললেন,—ওকে বেশী বোক না বউ—

বকবার আছে কি! বকেই বা কি হবে। গিরিবালা খাওয়ার আগে সুরুচিকে নিজে তেল মাখিয়ে দিলেন। মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে মাথাটা ভাল করে পরিষ্কার করে দিলেন। স্নানের পর চুল আঁচড়ে দিলেন। সুরুচি যেন আবার আগেকার মত ছোট্ট মেয়েটি হয়েছে। গিরিবালা ছোটবেলায় সুরুচিকে এমনি করে পাশে নিয়ে শুতেন—পিসীমা না হলে ভাত খাওয়া হোত না। সুরুচিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গিরিবালা বিছানা ছেড়ে উঠলেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোল।

এ বাড়িতে আজ যেন শোকের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। যেন এ বাড়ির প্রাত্যহিক প্রাণধারায় আজ বিয়োগ যবনিকা নেমে এসেছে। মৃন্ময়ীর কিছু ভাল লাগে না। সংসারের কাজগুলো—নেহাৎ যে-গুলো না করলে নয়, তাই শুধু করা। ঘি-ওয়ালা এল ঘি বেচতে, তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন,—কাল এসো। সন্ধ্যেবেলা এক ঘটকী আসার কথা ছিল। মৃন্ময়ী বলে দিলেন—পরে আর একদিন এসো, আজ সময় নেই। এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারা যায়নি—এত বড় বিপদের জাল পাতা চলছে ভেতরে ভেতরে। বেশী

করে রাগ হোল সদানন্দবাবুর ওপর। তাঁরই যত দোষ! কোথাকার কাকে বাড়িতে আশ্রয় দিলেন—নাম জানা নেই, ধাম জানা নেই—একেবারে বাড়ির ভেতরে আশ্রয় দেওয়া। সংসারের একটা উপকারে আসা দূরে থাক তার জন্যেই তো যত ঝঞ্ঝাট! কখন রাত্রে বাড়ি ফেরে, বসে থাকো তার ভাত কোলে করে। ঠিক সময়ে ধোপার বাড়ি থেকে কাপড় এল কিনা হিসেব রাখো। কে করে এ সমস্ত। এখন এই যে বিপদটা হোল—এখন কি করে লোকের কাছে মুখ দেখানো যায়। রাতারাতি পাত্রই বা কোথায় পাওয়া যায়—যে সব জেনে শুনে বিয়ে করবে! শেখর—শেখরের কথা মনে আসতেই মৃন্ময়ীর রাগে ঘৃণায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায়। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর দরকার নেই। খুব শিক্ষা দিয়েছে বটে। আজই এ ব্যাপারের শেষ করতে হবে! শেষ করলেই তো আর সব সমস্যার সমাধান হবে না—! জায়গাটা ভাল নয়, একটা সামান্য ব্যাপার হলেই এখানে হৈ চৈ পড়ে যায়। এখানকার লোক তো কেউ ভালো নয়, এখনি মানদাদিদি আসবে, ফণি গাঙ্গুলীর বিধবা মেয়ে অমূল্যবালা আসবে—একটু গন্ধ পেলেই আসবে, তারপর জানতে আর কারুর বাকি থাকবে না। দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে মৃন্ময়ীর। মনের শান্তি নেই—হাত থেকে পাথর বাটিটা পড়ে ভেঙে গেল। পিঁড়ীর পেরেকে খোঁচা লেগে কাপড়টা ছিঁড়ে গেল।

তারপর রাত হোল। মৃন্ময়ী রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। গিরিবালাকে দেখে বললেন,—কী করছে এখন রুচি?

গিরিবালা বললেন,—এতক্ষণ তো কাছে শুয়ে ছিলুম, কথা তো কিছু বলছে না—মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল পড়ছে—বললাম, কাঁদিসনে—চুপ কর—

সুরুচির মনের অবস্থা বোঝা যায়। ওর কিছু দোষ নেই। গিরিবালা তখনি বলেছিলেন—মেয়েদের অত কলেজে পড়ানো কি ভাল। সুরুচির নিজেরও পড়ায় বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। সদাই তো পড়ানোর জন্যে জেদ ধরলে। গিরিবালার ছোটবেলায় এই এত শায়া ব্লাউজ বডিসের প্রচলন ছিল না, এত পাউডার স্নোরও ব্যবস্থা ছিল না। শিবপুজো, পুণ্যিপুকুর আর পুতুল খেলা এই সব নিয়েই কুমারী বয়েসটা কেটেছে তাঁদের। তারপর কখন একদিন বর এসেছে, বিয়ে হয়েছে, শ্বশুর বাড়ি গেছেন, যাবার সময় হাপুস চোখে কেঁদেছেন—তাঁদের কাল-ই ছিল আলাদা—আর আজকাল—

হঠাৎ বাইরে দরজার কড়া নড়ে উঠলো—

রান্না করছিলেন মৃন্ময়ী। তরকারীর কড়াটা নামিয়ে উঠলেন। সদানন্দবাবু এসেছেন। অন্যদিন সুরুচিই দরজা খুলে দিয়ে আসে। আজ মৃন্ময়ীকে খুলতে হবে।

—ও বউ—শোন ইদিকে—

সুরুচির ঘর থেকে ডাকলেন গিরিবালা। মৃন্ময়ী দাঁড়ালেন। বললেন,—কী?

—তুমি সদাকে কিছু বোল না এখন, ওর কানে এখন তুলো না—বললেন গিরিবালা।

মৃন্ময়ী বললেন,—ওর কানে তো উঠবেই একদিন—তখন……

—তা সে পরে ওঠে তো উঠবে—এখন বোল না—মানুষটা তেতে পুড়ে আসছে সারাদিনের পর—আমার মাথা খাও বোল না এখন বউ—গিরিবালা মৃন্ময়ীর হাতটা ধরে ফেললেন। মৃন্ময়ীর মেজাজ তো তিনি জানেন।

মৃন্ময়ী কথা দিয়ে বাইরে এলেন। দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেলেন। সদানন্দবাবু নয়, শেখর। মাথায় যেন হঠাৎ সমস্ত রক্ত উঠে পড়ল মৃন্ময়ীর। শেখরকে দেখেই রাগে ঘৃণায় মৃন্ময়ী কাণ্ডজ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। শেখর পা বাড়িয়েছিল ভেতরে ঢোকবার জন্যে……

মৃন্ময়ী বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন—

বললেন,—ভেতরে ঢুকো না, দাঁড়াও—ওইখানেই দাঁড়াও—

শেখর চমকে উঠেছে, কিছু বুঝতে পারলে না। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সুরুচি এসেই দরজা খুলে দিয়েছে—আজ তার পরিবর্তে কাকীমা নিজেই বা এলেন কেন কে জানে।

মৃন্ময়ী ততক্ষণে এক নিঃশ্বাসে একেবারে শেখরের ঘরে চলে এসেছেন। শেখর যখন এ বাড়িতে এসেছিল, তখন নিজের বলতে তার কিছুই ছিল না। তারপর এ কবছরে কিছু জামা কাপড় আর এক গাদা বই কিনেছে। বই-এর গাদা। এক বাক্স বোঝাই বই। হাতের কাছে যেখানে যা পেলেন মৃন্ময়ী জড়ো করে নিলেন—স্যাটকেশটা নিলেন আর এক হাতে।

শেখর হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে ছিল। মৃন্ময়ী কাপড় চোপড় আর স্যুটকেশটা সামনে এনে ফেলে দিলেন। বললেন—এই নাও তোমার জিনিস-পত্তর—এ-

বাড়িতে আর মুখ দেখিও না—যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছ তুমি, দুধ কলা দিয়ে কাল-সাপ পুষেছিলাম বাড়িতে—এখন বিদেয় হও—

শেখর যেন কিছু বুঝলে, কিছু যেন বুঝতে পারলে না। কিন্তু স্বরুচি, সে কি জানে! তার তো দায়িত্ব সে নেবে কথা দিয়েছে। না, কাকীমার কথা সে কেন শুনতে যাবে? স্বরুচির সঙ্গে একবার কথা বলা যায় না? কিন্তু শেখরের চোখের সামনে সশব্দে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মৃন্ময়ী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

অনেক রাত্রে সদানন্দবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রামটা একেবারে ফাঁকা চলেছে।

পান্নালালেরা কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে, সমস্ত কলকাতার যেন এক অস্বাভাবিক আবহাওয়া। ইস্কুল আজও খোলেনি। সব ছাত্রই যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। সিঙ্গাপুরের ওপর জাপানীরা দিনরাত আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর জয় করা অত সোজা নয়! কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছে সিঙ্গাপুরের জাহাজঘাটা।

খিদিরপুরের মোড়ে হঠাৎ রাখালবাবু ট্রামে উঠলেন।

—এই যে সদানন্দবাবু—

—আসুন, আসুন—এত রাত্তিরে কোথায় চলেছেন? জিগ্যেস করলেন সদানন্দবাবু।

রাখালবাবু হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি! সচরাচর নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করেই চলেন। একটা ভারিক্কি চাল—একটা সবজান্তা গোছের আত্মম্ভরিতা—সদানন্দবাবুর পাশে বসে কৃতার্থ করলেন তাঁকে।

রাখালবাবু বললেন—বাড়ীর মেয়েছেলেদের দেশে পাঠিয়ে দিলেন নাকি?

সদানন্দবাবু বেকুবের মত চাইলেন। বললেন—দেশে? তিনি যেন কিছু বুঝতে পারলেন না।

রাখালবাবু বললেন—আমার কথা যদি শোনেন তো কালই পাঠিয়ে দিন—এক মিনিট দেরী করবেন না—

—আপনি? আপনি পাঠিয়েছেন নাকি?

রাখালবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন—আপনারা এখন বুঝতে পারছেন

না, কিন্তু দেখবেন, কলকাতার একখানা বাড়ির একটা ইঁট পর্যন্ত আস্ত থাকবে না, গুঁড়ো হয়ে যাবে—ভূমিকম্প হলে যেমন হয়—ঠিক তেমনি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোমা পড়বে আর থামবে না—

সদানন্দবাবু যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বোকার মতন চেয়ে রইলেন রাখালবাবুর দিকে।

রাখালবাবু বললেন - শেয়ালদ' আর হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ভীড়টা দেখে আসবেন দিকিনি, ট্রেনে যারা যেতে পারছে না, তারা সোজা নৌকো ভাড়া করে যাচ্ছে, আমি তো পঞ্চাশ টাকা গরুর গাড়ি ভাড়া দিলুম·····

—পঞ্চাশ টাকা? বিস্মিত হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু।

—পঞ্চাশ টাকা তো সস্তা মশাই, আমাদের পাড়ায় জয়রাম পাল তো তিনশো টাকায় ট্যাক্সি ফুরন করেছে—

—বোমা কি সত্যিই পড়বে? জিগ্যেস করলেন সদানন্দবাবু।

—পড়বে না, বলেন কি?—এক ফুৎকারে যেন সদানন্দবাবুকে তিনি উড়িয়ে দিতে চান।

বললেন—ভেতরকার খবর তা হলে আপনাকে বলি, চিড়িয়াখানার বাঘগুলোকে সরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, সাপগুলোকে নাকি মেরে ফেলবে, আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের অর্ধেক জিনিস তো সরিয়ে ফেলাই হয়েছে—ভেতরে ভেতরে এই সব ব্যবস্থা হচ্ছে আর আপনি চুপ করে বসে আছেন—

—তা হলে কি করা যায়?

—করবেন আর কি, মেয়েছেলেদের দূরে পাঠিয়ে দিন, আর যদি পারেন তো চাল ডাল কয়লা কেরোসিন তেল টিনচার আইডিন কিছু সংগ্রহ করে রেখে দিন, বোমা যখন পড়বে তখন কি আর বাজার বসবে ভাবছেন? কে কাকে দেখবে তখন, আমি তো মন দশেক চাল, কয়লা দু'মন, কিছু কিছু সব জিনিস রেখেছি জোগাড় করে—

সদানন্দবাবু হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ-সব কি কথা! কোথায় পাঠাবেন তিনি সুরুচিদের! সুরুচির পড়াশুনো, ওর বিয়ে, ওর কলেজ! তাই কি সম্ভব।

বললেন—তবে যে সেদিন কাগজে পড়ছিলুম, সিঙ্গাপুরের পর ওরা নাকি অস্ট্রেলিয়াকে আক্রমণ করবে—

রাখালবাবু বললেন—ওই আনন্দেই থাকুন, ওদিকে তা হলে সুভাষ বোস কী করতে গেছে? ভারতবর্ষ হোল সব চেয়ে বড় ঘাটি এ-বেটাদের, এদের কাবু না করতে পারলে শান্তি আছে ওদের—তাছাড়া ইটালী থেকে জার্মানী থেকে সব রেডিওতে বাঙলা ভাষায় বলছে যে—

—কি বলছে? জিগ্যেস করলেন সদানন্দবাবু।

—বলছে ব্রিটিশদের এবার নিস্তার নেই, বোমা ফেলে ইংল্যাণ্ডকে একেবারে জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে—তা ওরা পারে মশাই, ওদিকে হিটলার রাতারাতি ম্যাজিনো লাইন ভেঙ্গে দিলে আর এদিকে 'রিপালস্' আর 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস'—অবাক করে দিয়েছে মশায়—তারপর যখন হিটলার তার গোপন অস্ত্রগুলো ছাড়বে—তখন বাছাধনদের—

কদিন থেকেই শুনছিলেন সদানন্দবাবু যে সময় খারাপ চলেছে, কিন্তু সময় যে সত্যিই এত খারাপ তা তার মনে হয়নি। কয়েকজন ছাত্র চলে গেছে বড়দিনের ছুটিতে, তারপর আর তারা আসেনি, আরো কতক যাবার বন্দোবস্ত করছে। ছাত্ররাই যদি চলে যায় তা হলে তারই বা কলকাতায় থাকার কি অর্থ হয়। কিন্তু সে তো দূরের কথা। এখনি সরিয়ে দিতে হবে স্রুচিদের। সবজীবাগানেরও কয়েকজন চলে গেছে। রাখালবাবুর কথা শুনে ভালো লাগল না তার! রাখালবাবু যেন উত্তেজনা সৃষ্টি করবার একটা বিষয় পেয়েছেন। যেন লোককে ভয় পাইয়ে তার একটা অহেতুক আনন্দ হয়! ভাবতেও পারা যায় না। এই কলকাতা শহর, এই চৌরঙ্গী, কালীমন্দির, মনুমেণ্ট সব ধ্বংস হয়ে যাবে! কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। তা কখনই হতে পারে না। না হবার পক্ষে তাঁর কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু তাই কখনও হয়। যত সব বাজে ভয় দেখানো। বাইরে যাওয়া তাঁর হতেই পারে না। তাকে ছেড়ে স্রুচিও বাইরে যেতে চাইবে না। তাছাড়া সে যে অনেক অর্থ ব্যয়ের ব্যাপার! রাস্তার ধারে ধারে, মাঠের ওপর গর্ত খোঁড়া চলেছে—বাড়ির সামনে দরজা জানালার সামনে দেওয়াল গাঁথা হচ্ছে বোমার টুকরো গায়ে লাগবে না বলে। এ সম্বন্ধে শেখরের মত কি জানতে হবে। ও এসব বোঝে ভাল। কদিন থেকে শেখরের সঙ্গে ভাল করে দেখা হচ্ছে না। বেশী রাত করে বাড়ি ফেরে আজকাল।

ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন তিনি। গোপালনগরের মোড়ে অন্ধকার

জড়ানো। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। ব্ল্যাক-আউটের রাতে ভাল করে দেখা যায় না। খুব শীত পড়েছে। আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। এদিকটা—এই বাজারের দিকটা আরো অন্ধকার। হাটের ভেতর ভিখিরীরা শীতে কাপড় চাপা দিয়ে কোঁ কোঁ আওয়াজ করছে। যাত্রার যে ক্লাবটা আছে—ওটাও আজ নিস্তব্ধ। একটা পুলিশ নিঃশব্দে টিনের চালের তলায় বসে আছে।

—ঠুং ঠুং—

হঠাৎ চমকে উঠেছেন তিনি। কিন্তু খুব ভাগ্য-জোরে সামলে নিয়েছেন। অন্ধকারের মধ্যে কখন যে রিক্সাটা একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল জানতে পারা যায়নি। আর একটু অসাবধান হলেই চোট লাগতো। চেতলা রোড দিয়ে এসে গলির ভেতরে ঢুকলেন। আজ যেন সত্যিই পাড়াটা বড় ফাঁকা মনে হতে লাগলো।

বাড়িতে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। মৃন্ময়ী নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। সমস্ত বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ। যেন কোথাও সবাই গেছে বেড়াতে—আর কিছুক্ষণ পরে আসবে।

স্যুটকেশটা রেখে হাতের বইগুলো নামিয়ে দিলেন।

ডাকলেন - রুচি, ওমা রুচি—

মৃন্ময়ী বিরক্ত হলেন, বললেন—চেঁচাচ্ছ কেন? তোমার জ্বালায় কি মানুষে একটু ঘুমুতে পারবে না?

—রুচির কী হোল? .....সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন।

মৃন্ময়ী উত্তর করলেন না। বললেন—ভাত দিইছি, খেয়ে নাও—

খেতে বসলেন সদানন্দবাবু। অন্যদিন দরজা খুলে দেওয়া থেকে শুরু করে বই গুছিয়ে রাখা, জামা খুলে নেওয়া, খাওয়ার কাছে তদারক করা সব সুরুচিই করে। সদানন্দবাবুর কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগলো। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এদিক সেদিক নজর দিলেন। মৃন্ময়ীও যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর।

মৃন্ময়ীকে আড়ালে ডেকে গিরিবালা বললেন—বউ, তুমি একটু মেয়েটার কাছে বোস, আমি বসছি সদার খাওয়ার কাছে—

গিরিবালাকে দেখে সদানন্দবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন। দিদি কখনও খাওয়ার সময় তো কাছে আসে না।

সামনে বসলেন গিরিবালা। বললেন—চৌধুরীরা আজকে চলে গেল কাশীতে, বুঝলি? বলছে নাকি বোমা পড়বে কলকাতায়, হ্যাঁরে, সবাই যদি চলে যায় তো আমরাই বা এ-পাড়ায় থাকবো কি করে একলা—?

খানিকপরে হঠাৎ যেন খেয়াল হোল সদানন্দবাবুর। বললেন—শেখর কোথায়? এসেছে?

গিরিবালা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন—চলে গেছে সে।

—চলে গেছে? কোথায়?—আকাশ থেকে পড়লেন সদানন্দবাবু। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

গিরিবালা বললেন—চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, তা ছাড়া বোমার ভয়ে এখন তো সবাই পালাচ্ছে—প্রাণের চেয়ে চাকরিটাই কি বড়?

যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোল না সদানন্দবাবুর। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেল! বলা নেই, কওয়া নেই। একবার সদানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করে গেলে পারতো! কে জানে। কী ওদের মতিগতি। চাকরি ছেড়েই বা সে দিলে কেন! প্রাণের ভয়ে? গৌরদাসের শিষ্য প্রাণের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবে। কিম্বা হয়ত সে সত্যি কথা বলেনি। হয়ত এখানে এ-বাড়িতে তার অসুবিধে হচ্ছিল।

সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—কখন গেল?

গিরিবালা বললেন—বিকেল বেলা—

—কিছু বলে গেছে?—আবার জিগ্যেস করলেন সদানন্দবাবু।

খাওয়া শেষ করে ঘরে গিয়ে বসলেন। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকগণের আগমন সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ লিখছিলেন তিনি তাঁর নতুন বইতে। জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভের কিছুকাল আগে ইংলণ্ডে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে বণিক সমিতি গঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরের দরবারে এক দূত পাঠিয়েছিলেন, সেই দূতের নাম টমাস রো। ১৬১৫ খৃস্টাব্দের সেই দিনটি। ইংরেজ জাতি ওই দিনটাতে উৎসব করে না কেন? শেখর বলতো জাহাঙ্গীরের সময় থেকে মোগলদের শুরু হোল পতন আর ইংরেজদের শুরু হোল উত্থান।

শেখরের কথা মনে পড়তেই সদানন্দবাবু ডাকলেন—

কিন্তু ডাকা হোল না তাঁর। ডাকতে গিয়ে মনে পড়লো শেখর মালপত্র

নিয়ে চলে গেছে। এতক্ষণ বোধ হয় ট্রেনে চলছে। কিন্তু কেন চলে গেল! স্থরুচি এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লো কেন! মৃন্ময়ী যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর। খাওয়ার সামনে দিদি এসে বসেছিলেন কেন আজ!

সদানন্দবাবুর কলম আজ একটুও সরতে চাইল না। শেখর থাকলে আজ উত্তর দিতে পারতো ১৬১৫ থেকে আজ ১৯৪২—এতগুলো বছর সব কি ব্যর্থ! শেখর নেই, শেখর চলে গেছে—কে উত্তর দেবে?

বাড়ির সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হোয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শেখর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সহজে বিচলিত হওয়ার ছেলে শেখর নয়। কিন্তু ঘটনাটা এমনই আকস্মিক যেন ভাববার অবসর দেয় না।

একে একে সব যেন বুঝতে পারলে শেখর। রাগ হোল না তার। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে কারো। যখন ঝড় ওঠে তখন বিচার করে বিবেচনা করে ওঠে না সে, বনস্পতি থেকে মহীরুহ, মহীরুহ থেকে তরু তৃণ কেউ বাদ যায় না। তা ছাড়া তার অনুমানই যদি সত্যি হয় তা হলে সে-ই নিজে দোষী। দায়িত্বের সমস্ত ভার তো আনন্দের সঙ্গে মাথায় তুলে নেবে কথা দিয়েছিল। বেশী দিনের তো কথা নয়—এই তো গত রাত্রির ঘটনা। মাথা উঁচু করে সত্যকে স্বীকার করবার দুঃসাহস তার আছে—সে কেন পেছিয়ে যাবে চোখ রাঙানি দেখে। শেখরের অধিকারবোধের কথা এখন তো আর ওঠেই না। আগে যদি তার অধিকার এক তিলও না থেকে থাকে, এখন আছে তা পুরো মাত্রায়। পৃথিবীর কোনও কোণে তার যদি আশ্রয় না থাকে, এখানে এ বাড়িতে অন্তত স্থরুচির জীবনে তার আশ্রয় অবধারিত।

মাথা তুলেই সে দাঁড়াবে, নিজের অধিকারই সে এখানে প্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু হঠাৎ সদানন্দবাবুর কথা মনে পড়তেই কেমন যেন নিরুদ্যম হয়ে এল। কে জানে কেমন ভাবে গ্রহণ করবেন তিনি! তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে রেখে বলবে—আমায় ক্ষমা করুন, ক্ষমা না পেলে উঠবো না—

শেখর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দরজার সামনে। যদি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে দরজা আবার খুলে যায়। প্রথম ঝড়ের আবেগে যে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, পরে প্রতিআবেগ আর বর্ষণ শুরু হবার পর হয়ত সে আবার ধীরে ধীরে

খুলে যেতেও পারে। হয়ত স্বরুচি নিজেই বেরিয়ে আসবে, কিম্বা মৃন্ময়ীই হয়ত অনুতপ্ত হয়ে আবার ফিরে আসবেন। কিম্বা……

কিন্তু কিছুই হোলো না।

সেই নিবিড় অন্ধকারের বিড়ম্বনায় আর অপমানে শেখর দাঁড়িয়ে রইল কেবল, তারপর স্যুটকেশটা আর বিছানার বাণ্ডিলটা দু'হাতে তুলে নিলে। এখনি সদানন্দবাবু ফিরবেন। ঠিক এমন অবস্থায় তাঁর সামনে মুখ তুলে দাঁড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব।

জনবিরল গলি। ব্ল্যাক-আউটের রাত। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে শেখর সবজীবাগানের গলিটা পার হয়ে এল। পরাজয় মানতে শেখর জানে না। গৃহ থেকে তাড়িত হওয়া—তাও শেখরের কাছে নতুন নয়। যে-বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের বুকে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা দিয়েছেন, তারই দেওয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা! সব সত্যি, তবু কোথায় যেন একটা ক্ষীণতম কাকুতি বুক বিদীর্ণ করে সমস্ত শিথিল করে দিচ্ছে। এই ঘটনার মধ্যে কোথাও গ্লানি নেই, তবু শেখরের কঠোর চিত্তে যেন ছায়াপাত হচ্ছে অন্তর্দাহের। মানুষের চোখে তো অন্তত শেখর দোষী।

সৌভাগ্যক্রমে সেণ্ট্রাল রোডের মোড়ে একটা রিক্সাও পাওয়া গেল।

—এই রিক্সা—রিক্সা ডেকে চেপে বসলো শেখর।

বললো—চলো সিধা—

বার দুই ঠুং ঠুং শব্দ করে টেনে নিয়ে চললো রিক্সা। হঠাৎ চেতলার বাজারের কাছে এসে একটা হোঁচট্ খেলে রিক্সাটা। চেতলার হাটের কাছে ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির পাশে মতিলালের পান সিগ্রেটের দোকানের কাছে! কিন্তু খুব সামলে নিয়েছে রিক্সাওয়ালা।

ধাক্কা খেয়ে শেখর চমকে উঠেছে। সামনেই সদানন্দবাবু। আর একটু হলেই সদানন্দবাবুর গায়ে চোট লাগতো।

অন্ধকার রিক্সায় বসে শেখর মুখটা দুই হাতে ঢেকে নিলে। তারপরেই নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল। কেন তার এই অহেতুক লজ্জা! এখনি বাড়ি ফিরে গিয়ে সদানন্দবাবু তাকে খুঁজবেন। কাকীমা কী উত্তর দেবেন কে জানে। একবার মনে হোলো—এখনি ফিরে গিয়ে সদানন্দ-বাবুর কাছে সমস্ত খুলে বলে। সদানন্দবাবুকে শেখর ভাল করেই চেনে।

অমন ক্ষমা, অমন দয়া একমাত্র গৌরদাসবাবুর কাছেই সে পেয়েছে। কিন্তু মনে মনে শেখর যখন জানে অন্যায় সে করেনি তখন ক্ষমা চাওয়ারও তো অর্থ হয় না। কার অন্যায়! এমন কাজ জীবনে কখনও শেখর করেনি যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয় কারো কাছে—লজ্জায় মাথা নিচু করতে হয় কারো সামনে।

কিন্তু আজ যাক। কিছু সময় গড়িয়ে যাক। দিনের বেলায় সুস্থ মন নিয়ে বিচার করে কাকীমা বুঝতে পারবেন শেখর কিছু অন্যায় করেনি। আর যদি কিছু অন্যায়ই তাদের চোখে হয়ে থাকে তো সে অন্যায়ের প্রতিকার শেখরেরই হাতে। মৃন্ময়ীর সংসারের সুনামকে একমাত্র শেখরই এক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারে। তা শেখর করবে! সুরুচির লজ্জা শেখরেরই লজ্জা! সুরুচির কলঙ্ক শেখরেরই কলঙ্ক! এই কথাটাই শেখর কাল বুঝিয়ে বলবে কাকীমাকে।

কালীঘাটের পুলের ওপর দিয়ে আলীপুরের শেষ ট্রামটা ফাঁকা চলে গেল।

বুকটা নিচু করে রিক্সাওয়ালা উঁচু পুলের ওপর উঠতে লাগলো। ওপরে গিয়ে সাবধানে নামতে হয় নইলে গড়িয়ে একেবারে চলন্ত মিলিটারী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা। পুলের দক্ষিণে মোড়ের মাথায় দু' একটা দোকানে তখনও আলো জ্বলছে। কয়েকটা মেয়ে একেবারে রাস্তার ওপর সভা বসিয়েছে। হাসি আর তামাসা চলছে খুব। কলকাতার লোকসংখ্যা কমে এসেছে। যারা আছে তারাও পরিবারদের বাইরে পাঠিয়ে হোটেলে নয়তো মেসে আশ্রয় নিয়েছে। রূপোপজীবিনীরা গুলজার করে বিড়ি টানছে। যুদ্ধের বাজারে ওদের যেন ক্ষিদে বেড়েছে। দুএকটা খাকী পোশাক পরা লোকও আশে পাশে ঘুরছে।

রিক্সাওয়ালা ডান দিকে ঘুরছিল। শেখর বললে—সিধা চলো—

ট্রাম রাস্তা ধরে সোজা চলতে লাগলো রিক্সা।

একসময়ে রিক্সাওয়ালা বললে—বাবুজী—

—কিরে—

চলতে চলতেই রিক্সাওয়ালা জিগ্যেস করলে—যুদ্ধের কি খবর বাবুজী—

এ যুদ্ধে রিক্সাওয়ালারও টনক নড়েছে। সেদিন ট্রামে পাঁচ বছরের একটা ছেলে তার বাবাকে প্রশ্ন করছিল—হিটলার কে বাবা? হিটলার আর মুসোলিনী—ওদের নাম কখন এক ফাঁকে গ্রামান্তরের ক্ষুদ্র কুটিরেও পৌঁছে গেছে। চালের দর চড়লো, কাপড়ের দর চড়লো—ওরা জানে তার জন্যে

হিটলার আর মুসোলিনীই নাকি দায়ী। সব কাপড় সব চাল নাকি সেপাইদের জন্যে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে। সারা পৃথিবীকে অন্ধকার করে দিয়েছে এই যুদ্ধ। আর একটা কথা মনে পড়লো শেখরের। মহাত্মা গান্ধি সেদিন বলেছেন তিনি যদি ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী হতেন তিনি হিটলারকে ইংলণ্ডে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন। রহস্যজনক এই মহাপ্রাণকে যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। সুধীরদা কিন্তু বলে—এই তো সুযোগ! যে দেশের লোক দু'শো বছর ধরে অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে, এই সুযোগে সে আবার অস্ত্র ধরতে শিখবে। সে অস্ত্র প্রয়োগ জাপানের বিরুদ্ধে নয়, জার্মানীর বিরুদ্ধে নয়, ইটালীর বিরুদ্ধে নয়—সে অস্ত্রে সে তাড়াবে ব্রিটিশদের! সেদিন ট্রামে যেতে যেতে হঠাৎ দেখেছিল একদল ছেলে চীৎকার করছে—জাপানকে রুখতে হবে—জাপানকে রুখতে হবে—!

ওরা আরও দুর্বোধ্য!

রিক্সাওয়ালা আবার প্রশ্ন করে—আমাদের রাজারা এখন জিতছে না হারছে বাবু?

—হারছে—শেখর বললে।

কে জানে কেন, কিন্তু রিক্সাওয়ালা শুনে যেন খুশি হয়েছে মনে হোল। শেখরের ইচ্ছে হোল জিগ্যেস করে তাকে—কেন? রাজার পরাজয়ের খবর শুনে তার আনন্দ হবার কারণ কী? শেখরের মনে হয়েছিল হয়ত এই কারণে সে খুশি হয়েছে যে যারা রিক্সায় চড়ে তারা না-খেটে যা উপায় করে সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে রিক্সা টেনেও পেট ভরার মত উপায় করতে পারে না এই রাজত্বে। কিন্তু শেখরের ধারণা ভুল।

কালু কাহারকে খুন করার অপরাধে রিক্সাওয়ালার বাপের ফাঁসি হয়েছে।

শেখর বললে—খুন করলে সব রাজত্বেই ফাঁসি হবার নিয়ম—

রিক্সাওয়ালার কিন্তু যুক্তি আছে। বলে—সকলের বেলাতে এক নিয়ম থাকাতো উচিত বাবুজী, আমাদের গাঁয়ের চৌধুরীবাবুরা রামু দোসাদের বউকে চুরি করে নিয়ে এসে এক রাত্তিরেই সাবাড় করে দিলে, তাদের তো কিছু হোলো না। বংশী লালা ভেজাল ঘি খাইয়ে কত লোককে মারছে তাকে তো কেউ ফাঁসি দিচ্ছে না—

শেখরের বলবার কিছু নেই। ঠুং ঠুং করে রিক্সা চলতে লাগলো। কবে কত লোক তার রিক্সায় চড়ে অন্ধকারে অচল সিকি দিয়ে গেছে তার তো কই

শান্তি হচ্ছে না। রিক্সাওয়ালা যেন আপন মনেই বলে—ভগমান ছিল না বাবুজী! নইলে এই রাজত্ব কবে হাতছাড়া হয়ে যেত! তারপর যেন অপ্রত্যাশিত ভাবেই রিক্সাওয়ালা বলে—এবার এতদিন পরে অবতার এসেছে বাবুজী—হিটলার সেই অবতার, হিটলার মানুষ রূপী ভগমান ছাড়া আর কেউ নয়—এবার এ-রাজত্ব যাবে বাবুজী!......

শেখর চমকে উঠলো। বলে কি রিক্সাওয়ালাটা! এরা কবে এত কথা শিখলে! কে শেখালে এদের! যে দিন ১৬১৫ সালে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' তৈরী হোল, সার টমাস রো এল জাহাঙ্গীরের রাজ দরবারে, সেদিনকার মানুষ এরা নয়, এরা উনিশ শো বেয়াল্লিশের লোক! সেদিন সদানন্দবাবুর সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। সদানন্দবাবুর কথা মনে পড়তেই সুরুচির কথাও মনে পড়লো।

একটা রাস্তার মোড়ের কাছে আসতেই শেখর নির্দেশ দিলে—বাঁয়া—

বাঁ দিক ধরে রিক্সা চলতে লাগলো।

রাস্তার ধারে সিনেমা ভাঙলো। অল্প কয়েকজন বেরুল। আজকাল ভীড় কম। সিনেমার দেওয়ালে একটা মেয়ের ছবি। অনেকটা সুরুচির মত চেহারা। সুরুচিকে যেন ঘন ঘন মনে পড়ছে এখন। প্রথম দিনকার কথা মনে পড়লো। সেই ইস্কুল-ফেরতা মেয়েটি তার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে চেয়েছিল। ঘরে যখন বসেছিল সদানন্দবাবুর প্রতীক্ষায়, ভেতর থেকে এক কাপ চা করে এনেছিল। তারপর সেই আবৃত্তি। লজ্জায় তো প্রথমে কিছুতেই আবৃত্তি করবে না। তারপর ললিত কণ্ঠের আবৃত্তি—'অয়ি ভুবন-মনমোহিনী'—

ছটা বছরের কালচক্রে কত কী ঘটলো। সুরুচির বিয়ের সম্বন্ধ নিজেই ভেঙ্গে দিলে। তারপর কাকীমার অসুখের সময় মাঝরাত্রে হঠাৎ সুরুচির সেই আবেগ-বিহ্বল আকর্ষণ! সমগ্র যৌবনের বর্ণ-বহ্নি ধীরে ধীরে দগ্ধ করল তাকে। তার জ্বালা ছিল না, কিন্তু আলো ছিল, তাপ ছিল। সেদিন সেই রাত্রেই যদি শেখর চলে যেতে পারতো সুরুচিকে ছেড়ে, তাহলে আর আজকের এই বিয়োগের যবনিকা টানতে হতো না। সুখী হতো কাকীমা! সুরুচির আগে আর কোনও মেয়ের সঙ্গেই পরিচয় ছিল না শেখরের। শেখরের জীবনে হয়ত এরও প্রয়োজন ছিল। আর একটি মেয়েকে চেনে শেখর। সে তাদের পার্টি-অফিসের তৃপ্তি। তৃপ্তিকে কিন্তু মেয়েমানুষ বলে কোনদিন মনেই হয় না

শেখরের। অফিস চালায় তৃপ্তি। বছর চারেক আগে টি বি-তে মর মর হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। বাঁচলো সেখানে গিয়ে—কিন্তু সংসারে আর ফিরলো না। সুধীরদা তাকে টেনে নিয়ে এসেছে অফিসে! দুবার জেলে গেছে! অদ্ভুত মেয়েটা! নিবিড় যোগ আছে সমস্ত মেম্বারের সঙ্গে, কিন্তু সে যে মেয়েমানুষ, একথা যেন সে ভুলেই গেছে।

তৃপ্তি একদিন বলেছিল—সুরুচিকে আমাদের পার্টির মেম্বার করে নাও না কেন শেখরদা,—

শেখর বলেছিল—সুরুচির সে ক্ষমতা নেই তৃপ্তি, সুরুচির মত মেয়েরা শুধু বউ হতেই পারে—

দুবছর আগে অন্তত সুরুচি তাই ছিল। কলেজে যেত-আসত, বিলাসিতার অনুকরণে সুরুচি যেন সব মেয়ে জাতকে টেক্কা দিতে চায়। কলেজের মেয়ে আর ছেলে মহলে কেমন করে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে তাই তখন ছিল তার লক্ষ্য। শাড়িটাকে কী ভাবে পরলে ফিগারটাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, বর্ষাকালে কোন্ রঙের শাড়িটা দর্শকচিত্তে দোলা দেয়, সন্ধ্যেবেলা কোন সেণ্টটা মনহরণ করে—এসব আর্টের চর্চাতেই কাটতো বেশীটা সময়। তারপর সেদিন পর্যন্ত কলেজের অভিনয়ে শকুন্তলার ভূমিকায় মেডেল দিয়েছিল কোন বড়লোকের ছেলে। তারপর সিনেমা আর মটর, অভিনয় আর পিকনিক—! তারপর হঠাৎ শেখর একদিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলে সুরুচি যেন আগেকার সুরুচি নয়। যেন সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন হয়েছে তার। সুরুচি যেন তার চরম গভীরে আপন সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে। শেখর যখন ইতিহাস পড়াতো, তখন বিমুগ্ধ হয়ে ডুবে যেত অতলে। নানাসাহেব আর তাঁতীয়া টোপীর গল্প শুনে রোমাঞ্চময় হয়ে উঠতো সুরুচি। দু'শো বছরের ইংরেজ রাজত্বের যে-পাপ দেশের মনে গভীর হয়ে শেকড় গেড়েছে—তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যখন শেখর দিনের পর দিন নানাভাবে বক্তৃতা দিয়েছে, তখন সুরুচির মনে কত গভীর রেখাপাত করেছে তা তার চোখ দুটো বলে দিত। এমনি করে সদানন্দ-বাবু আর শেখর ধীরে ধীরে সুরুচিকে এক নতুন চরিত্রে রূপান্তরিত করে তুললে। কিন্তু সুরুচিকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে শেখর নিজেও বদলে গেল। এমন করে সে ডুববে ভাবতেই পারা যায় না। সুরুচিকে তুলতে গিয়ে শেখরই তলিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

বৌবাজারের মোড়ে এসে শেখর রিক্সা থেকে নামলো।

সেই গলিটার ভেতরে গিয়ে পরিচিত দরজায় আঘাত করতে একটু পরেই দরজা খুললো।

শেখরকে দেখে তৃপ্তি অবাক হয়ে গেছে—একি, এত রাত্তিরে যে? মাল-পত্তর নিয়ে?

শেখর শুধু বললে—রাত্রে এখানে থাকতে এলাম—

—তার মানে? যেন অবাক হয়ে গেছে তৃপ্তি।

শেখর বললে—মানে টানে কিছু নেই, এবার থেকে এখানেই থাকবো রে তৃপ্তি—

তৃপ্তি হঠাৎ কাছে সরে এল। বললে—আজকেই এলে শেখরদা?

—কেন, আজ কি হয়েছে?

—আজ সকাল থেকেই ক'জন এসে দেখে গেছেন, সন্দেহজনক লোক সব, মনে হচ্ছে নজর পড়েছে আমাদের পার্টির ওপর—তৃপ্তি বললে।

—কেন, ধরবে নাকি আমাদের?—

—ধরতেও পারে, তৃপ্তি বললে।

—কিন্তু আমরা তো বে-আইনী কিছু করিনে—

তৃপ্তি বললে—ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে সব কিছুই তো বে-আইনী, ধরতে পারলে নজীরের জন্যে আটকাবে না—

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেখর জিগ্যেস করলে—ভেতরে যেন বসন্তর গলা শুনছি—কে কে আছে?

—সবাই আছে; সুধীরদা, বিজয়দা, বিলাসদা, বসন্তদা……

—হঠাৎ?

—কালকেই আমাদের অফিস অন্য বাড়িতে সরাতে হবে, তারই আলোচনা চলছে—রাতারাতি সব কাজ করতে হবে, আজকে কেউ ঘুমোবে না—তৃপ্তি বললে।

শেখর চলে যাচ্ছিল ভেতরে। তৃপ্তি জিগ্যেস করলে—তোমার বিছানাটা খুলে পেতে দেব নাকি শেখরদা—

—আমি পেতে নেবখন—বলে শেখর চলতে চলতে হঠাৎ ফিরে এল।

বললে—একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি, স্থরুচির সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে শিগগীরই—

তৃপ্তি যেন কি বলবে ভেবে পেলে না। এতখানি অবাক সে জীবনে হয়নি।

বললে—তাহলে ওখান থেকে চলে এলে যে?

—কী বোকা, সেই জন্যেই তো চলে এলাম রে, আমি তো আর ঘর-জামাই নই যে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকবো।

কথাটা বলে হো-হো করে হাসতে হাসতে চলে গেল শেখরদা। কিন্তু তৃপ্তি যেন সে-হাসির অর্থ বুঝতে পারলে না। খানিকক্ষণ শেখরদার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর শেখরদার বিছানার বাণ্ডিলটা খুলতে লাগল। নিজের বিছানার পাশেই শেখরদার বিছানাটাও পেতে ফেললে।

ক্রমে ক্রমে অনেক রাত হোল সবজীবাগানের গলিতে।

নাজিরদের তেতলা বাড়ির মাথার ওপর নারকোল গাছটা নিথর নীরব হয়ে প্রহরা দিতে লাগলো! পূর্ব দিকের পুকুরের পাড়ে বাদামগাছটাতে লক্ষ্মী পেঁচা চীৎকার করে করে পাখা ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। মানুষের সমাজে যখন সবাই নিশুতি—তখন বুঝি শুরু হোল ওই রহস্যময় জগতের জীবনযাত্রা।

মৃন্ময়ীর ঘুম এল না। আজ পাশে সদানন্দবাবু শুয়ে আছেন। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাঁর শরীর। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এলেন মৃন্ময়ী।

মাঝের ঘরে স্থরুচিকে নিয়ে ঠাকুরঝি গিরিবালা শুয়ে আছেন। মৃন্ময়ী নিঃশব্দ পদে সেই ঘরে ঢুকলেন। গিরিবালা জেগেই ছিলেন।

—কে? বউ?

—হ্যাঁ ঠাকুরঝি আমি, স্থরুচি ঘুমিয়েছে?

—ঘুমোল—বললেন গিরিবালা।

খানিকক্ষণ কারো মুখেই কথা নেই। স্থরুচি নিঃশব্দে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। তার ঘুম আসছে না।

গিরিবালা জিগ্যেস করলেন—সদাকে বল নি তো বউ?

—ও মানুষকে আবার বলা—মৃন্ময়ী বললেন—কেবল শেখরের কথাই সারাক্ষণ—'কেন সে চলে গেল', 'তার কোনও অযত্ন হয়েছে কি না'—'কবে আসবে কিছু বলে গেছে কি না'—অমন ভাল মানুষ, তার সর্বনাশ এমন করে করতে হয়—

—তা বলে তোমার অমন করে তাকে তাড়ানো অন্যায় হয়েছে বউ—তাও বলবো—গিরিবালা বললেন।

সুরুচি চুপ করে শুনতে লাগলো।

গিরিবালা আবার বললেন—শেখরকে তুমি তাড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু শেখরকেই তোমাকে শেষ পর্যন্ত ডেকে আনতে হবে—

মৃন্ময়ী কাল ঝোঁকের আর রাগের মাথায় শেখরের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই মনে হয়েছে—কাজটা ভাল হয়নি। অল্পবিত্ত পরিবারের মেয়ে, তার বিয়ে হওয়া এমনিতেই তত সহজ নয়। তারপর কেলেঙ্কারীর কথা যদি পাড়ায় রটে যায় তাহলে শেখর ছাড়া আর কোনও গতিই নেই। ছেলে হিসেবে শেখর খারাপও নয়। তা ছাড়া দিনকাল বদলাচ্ছে!

গিরিবালা বললেন—জিগ্যেস করেছিলাম ওকে, বললে তার ঠিকানা সুরুচি জানে না—

মৃন্ময়ী ভাবলেন—ঠিকানা যা কিছু তার এই সবজীবাগানেই সব ছিল। কোথা থেকে এসেছিল একদিন সদানন্দবাবুর কাছে, যেমন আরো কতজন এসেছে, তারপর আবার হয়ত কোন বাড়িতে আশ্রয় নেবে এমনি করেই! তারপর একে একে যখন বহুদিন এখানে থেকে গেল, তখন তার কুল-শীল পরিচয় জানবার আর প্রয়োজনও হয় নি—সে-ও বলে নি।

মৃন্ময়ী বললেন—ওঁকে জিগ্যেস করলে হয়ত কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে—

গিরিবালা বললেন—আমি আর একটা মতলব করেছি বউ, যদি কিছু শেষ পর্যন্ত না হয়, তখন তাই-ই করতে হবে—

মৃন্ময়ী আর ভাবতে পারেন না। তাঁর যেন মাথার সমস্ত তাল-গোল পাকিয়ে গেছে। ঘরে চলে এসে সদানন্দবাবুকে ঠেলা দিয়ে জাগালেন। বললেন—শুনছো, ওগো শুনছো—

আচমকা জেগে উঠে সদানন্দবাবু বিস্মিত হয়ে গেছেন।—কী হলো—

মৃন্ময়ী বললেন—শেখরের ঠিকানা জানো তুমি? তোমার বন্ধু গৌরদাস না কার চিঠি নিয়ে এসেছিল—

এত রাতে শেখরের ঠিকানা জানবার কেন প্রয়োজন হোল সদানন্দবাবু বুঝতে পারলেন না। কিন্তু গৌরদাস যুদ্ধ বাধবার পর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। গৌরদাস থাকলে না হয় তার কাছে শেখরের খবর পাওয়া যেত—

সদানন্দবাবু বললেন—তা এত রাত্রে তার ঠিকানা জানবার জন্যে এত—

মৃন্ময়ী কথার উত্তর না দিয়ে নিজের জায়গায় আবার শুয়ে পড়লেন।

সকাল বেলা গিরিবালা শৈল মিত্তিরের বাগানে ফুল তুলতে গেছেন। প্রতিদিনের মত মানদা এসেছে, ফণি গাঙ্গুলীর বিধবা মেয়ে অমূল্যবালা এসেছে। কথাটা সেই সময় পাড়লেন গিরিবালা।

মানদা খবরটা শুনে গালে হাত দিলে।

—তা ভালোই হোল দিদি, এতদিন পরে ভগবান যখন দিলেন, তখন দেখো ও ছেলেই হবে—

—কার কথা বলছ ভাই?—অমূল্যবালা বুঝতে পারে নি।

—ওমা এতদিন পরে বউ-এর আবার···তা আমার বড় জা'র কী হোল? বিয়ের দু'বছর পরে একটা ছেলে হয়ে মারা গেল তারপর চোদ্দ বছর আর কিচ্ছু নেই—শেষকালে বুড়ো বয়েসে এক মেয়ে হয়েছে এখন, সেই মেয়ের আবার আদর কত—

—তা বেশ, সুরুচির এতদিনে ভাই বোনের শখ মিটবে—

—তোমরা আশীর্বাদ কর দিদি, বউ-এর ছেলে হোক্, মেয়ে হাজার হলেও মেয়ে, কথায় বলে: মেয়ে ঘর শূন্য করে, আর ছেলে ঘর পূর্ণ করে······

মানদা বললে—তবে দিদি একটা কথা বলি—বউকে নিয়ে বিদেশে চলে যাও, এই বোমার সময়ে কলকাতায় রেখো না—সুস্থ মানুষই এখানে থাকলে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে—এই পেল্লাদ ঘোষেরা সব কাশী চলে যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে যাও না—

কথাটা সকালবেলা সদানন্দবাবুও শুনলেন। এতদিন পরে আবার নাকি মৃন্ময়ী সন্তানসম্ভবা! হঠাৎ কী যে করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। এই

দুর্দিনে, এতদিন পরে, আবার ? কাল রাত থেকে যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা আবার তার গরম হয়ে উঠলো—

রাস্তার ওপরেই স্যুটকেশটা রাখলেন, তারপর পকেট থেকে শিশিটা বার করে হাতের পাতায় খানিকটা জল নিয়ে মাথার ব্রহ্মতালুতে থাবড়াতে লাগলেন।

খুব ভোরে তৃপ্তির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

ধড়ফড় করে উঠে পড়েছে শেখর। শেখর উঠে দেখলে সুধীরদা, বসন্ত, বিলাস, বিজয় ওরা সবাই আগেই উঠে পড়েছে। তখন চারিদিক ভালো করে ফর্সা হয় নি। ঘুমের জড়তা ভালো করে কাটে নি কারো। আচম্‌কা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সকলেরই যেন ভীত-চকিত দৃষ্টি।

সুধীরদা বললে—মাঝ রাত্তির থেকেই অফিসের চারদিকে পুলিশ ঘেরাও করেছে—

সকলের আগে টের পেয়েছে তৃপ্তি। অদ্ভুত মেয়ে তৃপ্তি! সারারাত ঘুমোয় না নাকি। দরকারী কয়েকটা কাগজপত্র এক ফাঁক দিয়ে সরিয়ে ফেলেছে বাইরে। কিন্তু সময় বেশী ছিল না হাতে। বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। তৃপ্তি সুধীরদার নির্দেশ পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে চারজন পুলিশ, দারোগা, সার্জেণ্ট ঢুকলো ঘরের ভেতর।

সুধীরদার সামনে গিয়ে দারোগাবাবু বললেন—ভারতরক্ষা আইনে আপনাদের সকলকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম আছে—বলে পকেট থেকে এক-টুকরো কাগজ বার করে বাড়িয়ে দিলেন।

ছাত্ররা দু'চারজন সব চলে গেছে বাইরে। কবে আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। কী কলকাতা শহর কী হোল। সকালবেলা উঠেই যাকে পড়াতে যেতেন সদানন্দবাবু, কাল সেও চলে গেল। পনের টাকা মাইনে দিয়ে গেছে অবশ্য। তবু সদানন্দবাবুর সকাল বেলাই ঘুম ভেঙে গেছে। বহু দিনকার অভ্যেস কোথায় যাবে।

গিরিবালা ঘুম থেকেই আজ একটু সকাল সকাল উঠেছেন।

বললেন—আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা কিছু করলি নাকি সদা ?

তা বটে! আর তো দেরী করা চলে না। পাড়া তো ফাঁকা হয়ে এল। চেতলার বাড়িগুলো ফাঁকা পড়ে আছে।

— কাল বাড়িওয়ালা এসেছিল—গিরিবালা বললেন।

—এ মাসের ভাড়াটা বাকী পড়ে গেছে, তাগাদা করতে এসেছিল বুঝি?

গিরিবালা বললেন—তাগাদা করবে আর কোন মুখে, বলছিল বাড়ি আপনারা ছেড়ে দেবেন না, দশ টাকা ভাড়া কমিয়ে দেব—; তা বাড়ির কি আর অভাব এখন—কুড়ি পঁচিশ টাকায় দোতলা তিনতলা বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে—তা আমি বললুম—

সত্যি সত্যি যদি সবাই চলেই যায় তা হলে এত বড় বাড়িটাই বা কি দরকার। বাড়ির মালপত্র পান্নালালদের বাড়িতে তুলে রেখে একটা মেসে গিয়ে উঠবেন সদানন্দবাবু। দশ টাকা ভাড়া কমলেই কি তাঁর এত বড় বাড়ির এতগুলো টাকা ভাড়া মাসে মাসে গোনা যায়। তেমন যদি অবস্থা হয় কলকাতার, তখন কে-ই বা থাকবে কলকাতায়! রাখালবাবু তো বলেছেন—একখানা ইট পর্যন্ত আস্ত থাকবেনা। সব নাকি গুঁড়ো হয়ে যাবে। তখন কি মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে থাকবে নাকি লোকে। কাগজে তো লিখছে লণ্ডনে নাকি সব লোক মাটির তলায় ঘর করেছে। শেষকালে ইঁদুরের মত হয়ত তাই করতে হবে। কবে কি হবে বলা যায়! দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুর গেল। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সুরক্ষিত করা সিঙ্গাপুর, তাও যেতে দুদিন লাগলো না। তারপর বর্মা গেছে। বর্মার নাকি আর কিছু নেই বাকী। বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে হাঁটা পথ দিয়ে লোকজন সব পালিয়ে আসছে। কোথায় আকিয়াবের বন্দর, আরাকানের অরণ্য গিরি পর্বত—এক ফোঁটা জল মেলে না রাস্তায়, সেই পথ দিয়ে সব হেঁটে আসছে। বলিহারী জান বটে সব।

গিরিবালা বললেন—বউ-এর শরীর যা তাতে আর এখানে থাকতে ভরসা পাইনে সদা, এতদিন পরে যদি বা একটা ক্ষুদ কুঁড়ো যাহোক হবার আশা হচ্ছে এখন কাশী হোক, গয়া হোক বোমার ভয় থেকে দূরে কোথাও যাওয়া ভাল—বউ-এর বুক তো ভাল নয় জানিস—আর······

একটু থেমে গিরিবালা আবার বললেন—টাকা কিছু খরচ হবেই তা ছাড়া আর উপায়ই বা কি বল—সে যেমন করে হোক টাকার জোগাড় করতেই হবে—তাতে যদি গয়না-গাঁটি বাঁধা দিতে হয় তাও দিতে হবে—

টাকা! তাও তো বটে। সদানন্দবাবুর এতক্ষণ ও কথাটা মনেই আসেনি। কোথায় যাওয়া হবে, কেমন করে যাওয়া হবে, কে নিয়ে যাবে সব কথা ভেবেছেন কিন্তু আসল কথাটাই ভাবেননি তিনি! ইস্কুলের তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ে আছে। সেই বড়দিনের ছুটির পর আর ইস্কুল খোলেনি। দুদিন গিয়েছিলেন হেড মাস্টারের বাড়িতে। দেখাই পাওয়া যায় না তার। ছোকরা মানুষ। খিদিরপুর ইস্কুলেরই ছাত্র হৃষীকেশ সিংহ এম. এ বিটি. বি. এল। বিদ্যে আছে বুদ্ধি আছে, কিন্তু আসল জিনিসই নেই। তার কথা বড় একটা থাকে না। সেক্রেটারীর কাছে মুখ তুলে কথা বলতে পারে না।

সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—সুরুচি উঠেছে নাকি? কেমন আছে?

গিরিবালা বললেন—শরীরটা তার ভাল নয় সদা, এখানে থাকলে ও-ও বাঁচবে না, আমার তো আর একদণ্ড থাকতে ভাল লাগছে না এখানে, বউকে আর মেয়েকে নিয়ে কোথাও শিগগীর চলে যেতে ইচ্ছে করছে—তুই একটা ব্যবস্থা করে দিলেই যেতে পারি—

সদানন্দবাবু হঠাৎ জিগ্যেস করলেন—সুরুচির কি হয়েছে রে?

গিরিবালা যেন হঠাৎ চমকে গেছেন। সদানন্দ কি টের পেয়ে গেছে নাকি। সদানন্দবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন গিরিবালা—

সদানন্দবাবু আবার জিগ্যেস করলেন—আজ তিন চার মাস যেন ও বদলে গেছে, তেমন কাছে আসে না, কখন কী করে, কখন ঘুমোয়, কখন ওঠে, আমি কিছুই টের পাইনে, কী হোল ওর?

সত্যিই সদানন্দবাবুর যেন হঠাৎ খেয়াল হয়েছে সুরুচি আর আগেকার মত তাঁর কাছে আসে না। যেদিন দৈবাৎ নজরে পড়ে সদানন্দবাবু দেখেন সুরুচি আর সে সুরুচি নেই। সুরুচির হাসির আওয়াজ আর তাঁর কানে আসে না। পোশাক পরিচ্ছদের যেন আগেকার মত আড়ম্বর নেই আর। তাঁর মনে হয় যেন সুরুচি রোগা হয়ে গেছে। সেদিন হঠাৎ সুরুচি সদানন্দবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সদানন্দবাবু কিছু বুঝতে পারেন নি। চিবুকে হাত দিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন—এ কী মা, সকাল বেলাই একেবারে কী হোল—

সুরুচি বলেছিল—আজ নতুন বছরে তোমার আশীর্বাদ চাই বাবা—

প্রত্যেক পুজো পার্বণে সুরুচি বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়।

এটা ওর নতুন নয়, বহুদিনের অভ্যেস! কিন্তু সেদিন পায়ের ধুলো নিয়ে নিঃশব্দ পদে আবার ফিরে চলে গেল। অত শান্ত মেয়ে তো সুরুচি আগে ছিল না। ভেতরে ভেতরে কোনও অসুখ হোল না তো—

গিরিবালা কথাটা ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললেন—ফণী গাঙ্গুলীরা কাশী গেল, আর পেল্লাদ ঘোষেরা সব চুনারে গেছে, মধুপুর দেওঘর গিরিডিতে নাকি আর থাকবার জায়গাই নেই—এত ভীড়, যত কলকাতার লোক সব গেছে, আমি ভাবছি সদা, চক্রধরপুরে গেলে কেমন হয়—ওখানে নাকি সস্তা গণ্ডা—

—চক্রধরপুর? সে কোথায়?—সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন।

চক্রধরপুরে গিরিবালার ভাসুর-পোর এক মাসতুতো ভাই আছে। রেলে চাকরি করে। বহুদিন তার কোনও খবরাখবর জানা নেই, তা বহুদিন আগে গিরিবালা একবার গিয়েছিলেন চক্রধরপুরে। নিরিবিলি জায়গা বটে, লোক কম, কিন্তু তবু রাঁচি রোডের সমাজ যেন রেল কলোনির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে বাজার পেরিয়ে ফাঁকা মাঠের ধারে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতাল। চেঞ্জার দুচারজন যারা যায়, তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। রাঁচি রোডের পূব গা থেকে দক্ষিণ দিকে যে পায়ে-হাঁটা পথটা চলে গিয়েছে ওটা সোজা গিয়ে মিশেছে একেবারে খাড়া পাহাড়ের পায়ের তলায়। ওই দিক থেকে গাঁয়ের কোল মেয়েরা কুলি কামিনের কাজ করতে রেলের কলোনিতে আসে। চেঞ্জাররা ওই পথ দিয়েই সকাল সন্ধ্যে বেড়াতে বেরোয়। তারপর ফিরে এসে টাটকা কুয়োর জল, গাছ পাকা পেঁপে আর টাকায় পাঁচ সের দরের দুধ খায়।

গিরিবালা বললেন—চক্রধরপুরে আমার ভাসুর-পো সরোজের মাসতুতো ভাই রেলে কাজ করে—আমি গেলে খুব খাতির করবে—

সদানন্দবাবু বললেন – ভীড় এখন সব জায়গায়—এখন কি আর বাড়ি খালি আছে সেখানে—

গিরিবালা বললেন—আমি যে চিঠি লিখে দিয়েছি, বলেছি বাড়ি ঠিক করে রাখতে—

সদানন্দবাবু বললেন—আজকে একবার তা হলে হেড মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসি, তিন মাসের মাইনে বাকী পড়ে আছে—

হৃষীকেশ সিংহ এম এ. বিটি. বি এল.। ছোকরা মানুষ। খদ্দরের চাদর পাঞ্জাবি ধুতি পরে ভারিক্কী সাজবার চেষ্টা আছে। তীক্ষ্ণ তীব্র গলার আওয়াজ। জোরে জোরে কথা বলে। ছেলেরা ভয় করে, ভক্তি করে। একদল ছাত্রের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে, চুপ হয়ে যায়। কিন্তু হলে কি হবে! সেক্রেটারী ললিতবাবুর কাছে গিয়ে আর কথা বেরোয় না। সেবারের কথা সদানন্দবাবুর মনে আছে :

সেবার ছেলেরা ধর্মঘট করেছিল। ঠিক করেছিল নয়, করবার উপক্রম করেছিল। বার্ষিক পরীক্ষার সময় ক্লাস টেন্ এর ছাত্র বিলাস নকল করছিল। ধরে ফেললেন রাখালবাবু। কিন্তু ধরবেন কাকে! বিলাস ছেলেদের পাণ্ডা। তাকে এক্সপেল্ করা সোজা কথা নয়—

বিলাস চীৎকার করে উঠলো—ভাই সব, আজ বিচার চাই—

তারপর চললো বিলাসের বক্তৃতা। যুদ্ধ বেধেছে, চারিদিকে জিনিস-পত্রের দাম চড়েছে। সময় কোথায় পড়বার—যারা পরীক্ষা গ্রহণ করে তারা অবিবেচক। ছেলেদের মাথায় ভারী ভারী বোঝা চাপিয়ে তারা বেশী করে টাকা উপায় করতে চায়। ছাত্রদের ফেল করিয়েই ইস্কুলের লাভ—ইস্কুল আর কিছু নয় ব্যবসাদারি, সেই ব্যবসাদারি, সেই জুলুম, সেই শোষণ······

একদিকের এক কোণ থেকে হঠাৎ একটা কালির দোয়াত ছুঁড়লো কে, সেটা এসে লাগলো অঙ্কর মাস্টার হরিপদবাবুর টাকে। হো হো হাসি, হৈ হৈ চীৎকার, বন্দেমাতরম, জুলুমবাজী বন্ধ করো—সব মিলে সে-এক বিশ্রী অরাজক অবস্থা।

সেক্রেটারী ললিতবাবুকে টেলিফোন করা হোল। হেড মাস্টারের কাছে খবর পাঠানো হোল।

সেক্রেটারী ললিতবাবু রায়সাহেব হয়েছেন সে-বছর। রাইটার্স বিল্ডিং-এ কেরানীর কাজ করেন। ঠিক কেরানী নয়। কেরানীদের বড়বাবু। এককথায় কেরানীকুলচূড়ামণি। সেক্রেটারী উত্তর দিলেন—'হৃষীকেশকে খবর দাও—

হৃষীকেশ সিংহ ইস্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র। বাচ্ছা ছোকরা বয়েস। ছুটিতে ছিল। খদ্দরের চাদরখানা বাগিয়ে এসে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো টেবিলের ওপর। সব থম্ থম্ করে উঠলো। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আছে। হেড মাস্টার চীৎকার করে উঠলো—তোমরা যে-যে একজামিন্ দিতে চাও না,

আমার কাছে এগিয়ে এস, তাদের আমি নিজে পরীক্ষা করবো, আর যারা পরীক্ষা দেবে, পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা আছে, তারাও আমার কাছে এস তাদের আমি আলাদা ঘরে পরীক্ষা নেব—বল কে কে পরীক্ষা দিতে চাও, আর কে কে এগজামিন দিতে চাও না—ভয় নেই, সামনে এগিয়ে এস—

এক কোণ থেকে কে একজন শেয়ালের ডাক ডেকে উঠলো—হুক্কা-আ-হুয়া-আ—কিন্তু হৃষীকেশ হতবুদ্ধি হোল না। টেবিলের ওপর এক ঘুষি মেরে প্রচণ্ড এক শব্দ করলে।

—এবারেও আমি ক্ষমা করলাম তোমাদের, কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি এই ঘটনা ঘটে, আমি সেই মুহূর্তে ইস্কুল বন্ধ করে দেব—তালা চাবি দিয়ে দেব—ইস্কুল কারো সম্পত্তি নয়,—তোমাদের ভালোর জন্যে এই ইস্কুল—তোমাদের মানুষ করবার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান—তোমরা একে রাখতে পারো ধ্বংস করতেও পারো—

পেছন থেকে একজন চীৎকার করে উঠলো—বন্দেমাতরম—

তারপর হৃষীকেশ এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। একপাশে মাস্টারদের দল দাঁড়িয়েছিল। হরিপদবাবুর মাথা থেকে সারা গায়ে কালির দাগ। বেচারা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ হৃষীকেশ যেন বোমার মত ফেটে উঠলো—স্টপ্—

সমস্ত ইস্কুল বাড়ি যেন হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠলো। হঠাৎ যেন আচম্‌কা ঝড়ের দাপটে আলোগুলো সব নিবে গেল। তারপর হৃষীকেশ চীৎকার করে উঠলো—আজ তোমরা সব বাড়ি যাও, পরীক্ষা তোমাদের বন্ধ—পনেরো দিন পরে আবার পরীক্ষা হবে—যারা সেদিন পরীক্ষা দিতে চাইবে—তারা আসবে, যারা চাইবে না তারা আসবে না—আসতে পাবে না—আমিও তোমাদের মত এই ইস্কুলেরই ছাত্র, তোমাদের সম্মান আমার সম্মান—তোমাদের অপমান আমার অপমান—আজ তোমরা বেরিয়ে যাও—যারা পরীক্ষা দিতে চাও তারা কালকের মধ্যে আমাকে এসে জানাবে—যারা আসবে না—

তারপর সত্যি সত্যিই সব গোল মিটে গেল। সুড় সুড় করে একে একে সব ছাত্র এল, পরীক্ষা দিয়ে গেল। কোনও গোলমাল নেই।

সকাল বেলাই সদানন্দবাবু হেড মাস্টারের বাড়ি গিয়ে হাজির। হৃষীকেশ

ভোর বেলা উঠে বেড়াতে বেরুচ্ছিল। সদানন্দবাবুকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললে—আসুন মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবু বললেন—তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না, এসে এসে রোজ ফিরে যাই—

হৃষীকেশ বললে—কাল আমি সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলেছি—ওঁদের অফিসের আবার খুব নাকি কাজ বেড়েছে, চারিদিকেই ইভ্যাকুয়েশন-এর হিড়িক—উনি আবার ওর ফ্যামিলীকে পাটনায় শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন—কথা বলবার সময়ই পান না—

—কিন্তু তিন মাসের মাইনে আমার বাকি পড়ে রয়েছে—ভাবছি আমার ফ্যামিলিকেও বাইরে পাঠাবো, তা টাকাকড়ি হাতে নেই, একটু বুঝিয়ে বলতে পারো না—

হৃষীকেশ বললে—শুনছি নাকি মাইনে সব অর্ধেক হয়ে যাবে, পুরো মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই ইস্কুলের—যা হয় এক সপ্তাহের মধ্যে জানা যাবে, পরশু মিটিং আছে কমিটির—আসল কথা কি জানেন মাস্টার মশাই—হৃষীকেশ বলতে বলতে থেমে দাঁড়াল।

রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছেন দুজনে। খিদিরপুরের ট্রাম লাইনে তখন জলের গাড়ি চলেছে। একটা কাক মরে পড়ে আছে, আর তার ওপর দিয়ে সার বেঁধে চলেছে মিলিটারী লরীর দল, ছোট বড় নানান সাইজের অদ্ভুত সব গাড়ি—এমন গাড়ি আগে কখনও কারোর চোখে পড়েনি। লরীর মোটা মোটা চাকার তলায় কাকটা পিষে থেঁতলে একেবারে নিরাকার হয়ে গেছে—একদল কাক চীৎকার করে অস্থির করে তুলছে আবহাওয়া। মারোয়াড়ী লালাজী গত রাত্রের বাসি হালুয়া ছড়াচ্ছে, আর তারই লোভে একদল কাক প্রাণভয় তুচ্ছ করে তাই খেতে ছুটে এসেছে রাস্তার ওপর। কিন্তু মিলিটারী লরীগুলো যেন নির্মম সব দানব—রাস্তা কাঁপিয়ে চলেছে, কোন দিকে কেয়ার নেই!

—আসল ব্যাপারটা তবে শুনুন—হৃষীকেশ বললে।

—সেক্রেটারী এবার 'ওয়ার ফণ্ড' চাঁদা দিয়েছেন হাজার টাকা, আরো কিছু ইস্কুল ফণ্ড থেকে দেবার ইচ্ছে আছে, সেইটে পাস হবে পরশু, এবার রায় বাহাদুর হবার আশা আছে কিনা। তা এখন ঠিক হচ্ছে স্টাফ আপাতত

কমিয়ে দেওয়া হবে, ছজন মাস্টার রেখে আর সব ছাড়িয়ে দেবে—এখন এইরকম তো শুনছি, পরশুদিন সব ঠিক খবর জানা যাবে—

সদানন্দবাবু যেন হতবাক হয়ে পড়লেন।

কাকগুলো চীৎকার করছে চারিদিকে। রাস্তায় জল দিচ্ছে হোস পাইপ দিয়ে। জলের ছিটে এসে সদানন্দবাবুর কাপড়ে জুতোয় কাদা লাগিয়ে দিলে।

ছোকরা হৃষীকেশ হন্ হন্ করে চলে। সদানন্দবাবু পেছনে পেছনে গিয়ে জিগ্যেস করলেন—তা হলে ছজন মাস্টারে কাজ চলবে কি করে?

—কাজ চালিয়ে লাভ কি?—হৃষীকেশ বললে—সত্যি কথা বলতে কি, ইস্কুলের ওপর ভরসা আমি ছেড়েই দিয়েছি, মাস্টারী করেই বা কি হবে, আমি একটা ব্যবসা ফেঁদেছি মাস্টার মশাই,—আপনাকে সত্যি কথাই বলি—

—ব্যবসা? নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না সদানন্দবাবু।

—হ্যাঁ মাস্টার মশাই, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—ইস্কুলে তো পড়াই ও-কথাটা, এবার নিজের জীবনে কাজে লাগিয়ে দেখছি—হৃষীকেশ বললে।

—কিসের ব্যবসা হৃষীকেশ?

—পেরেক।

—পেরেক?

সদানন্দবাবু পেছন থেকে সামনে সরে এলেন। বিস্ময়ের আর তাঁর সীমা নেই। পেরেক? লোহার পেরেক? কাঁটা পেরেক যাকে বলে। পয়সায় দশটা বারোটা করে যার দাম! ধান নয়, চাল নয়, রুপো নয়, সোনা নয়—পেরেক। শুনতে ভুল করেননি তো তিনি!

—এখন আপনার হাসি পাচ্ছে মাস্টার মশাই, কিন্তু ওই পেরেকই দেখবেন একদিন পয়সা দিয়েও কিনতে পাবেন না।

—তা পেরেক আমি কেন কিনতে যাচ্ছি? একি আর চাল যে, রেঁধে খাওয়া চলবে—হাসলেন সদানন্দবাবু।

—এত বড় যুদ্ধ, ওই সামান্য পেরেক না হলে কিচ্ছু হবে না, টন টন পেরেক কিনেছি—এক মণ দু মণ নয়, একেবারে টন টন—গাড়ি গাড়ি—

—কে তোমার পেরেক কিনতে যাবে? কারো এত মাথা ব্যথা হয়নি—

—এখন তো বেচবো না, গুদোমে বন্ধ করে রেখেছি, যখন এই পেরেকের দর দশ গুণ বারো গুণ হবে তখন ছাড়বো, একশো টাকার জিনিস বেচবো হাজার টাকায়, দুহাজার টাকায়—

—বলো কি ?

—আর বলবো কি, যদি কিছু করতে চান মাস্টার মশাই, এই সুযোগ! কিছু না হোক—দুটাকার ছুঁচ কিনে রাখলেও আপনার দশ টাকা মুনাফা হয়ে যাবে—এই বলে দিচ্ছি—

গড়ের মাঠের দিকে এসে পড়েছেন তাঁরা। রেস কোর্সের এ-ধারটায় যুদ্ধের আয়োজন চলছে। কিছু কিছু মিলিটারী লরী জড়ো.হয়েছে। সমস্ত ময়দানটা ঘিরে ফেলেছে। বিরাট ব্যাপার। রাতারাতি যেন এরা মাঠটাকে শহর বানিয়ে ছাড়বে। সদানন্দবাবুর মনে পড়লো আর একদিনের কথা। ছেলেদের সেই ধর্মঘটের দিন হৃষীকেশ বড় বড় কথা বলে বক্তৃতা দিয়েছিল: ছাত্র তারা —ছাত্রদের সম্মান—মাস্টারদের সম্মান—কত ভাল ভাল সব কথা! আজ হৃষীকেশ যেন অন্য রকম মূর্তি ধরেছে। হৃষীকেশের খদ্দরের নিচে যেন মাংসলোলুপ একটা মূর্তি উঁকি মারছে এখন।

হৃষীকেশ তখনও বলে চলেছে—যা ধরবেন তাতেই পয়সা হবে, পেরেক, ছুঁচ, কুইনাইন, ধান, চাল, কাপড়, মনিহারি জিনিস—বসে বসে টাকা চলে আসবে। শুধু গোড়ায় কিছু টাকা ফেলা চাই।

কথাগুলো সদানন্দবাবুর ভালো লাগলো না। তাঁর বহুদিনের শখ ছেলেদের মানুষ করতে হবে। তারা স্বদেশ সেবার ব্রত নিয়ে বেরুবে ইস্কুল থেকে জীবনের উদার বিশাল ক্ষেত্রে। সেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য দিয়ে তারা দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে! হৃষীকেশ এ কী হোল! এ কী করলে সে! কেন তবে হৃষীকেশ মাস্টারী লাইনে এসেছিল। চারিদিকে যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, শহর ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে, তখন যুদ্ধের মহামারীর সুযোগ নিয়ে একি রাহাজানি! হৃষীকেশের এ-কাজটাকে সমর্থন করতে পারলেন না সদানন্দবাবু।

সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—তাহলে ইস্কুল কবে খুলবে?

হৃষীকেশ বললে—তার কি ঠিক আছে। ইস্কুল আর না-খুলতেও পারে। সেক্রেটারী তো এবার রায় বাহাদুর হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, ওয়ার

ফণ্ডে চাঁদা দিয়েছেন, ইস্কুল ফণ্ড থেকেও কিছু দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত ইস্কুলের বাড়িটাও বোধ হয় এ. আর. পির. জন্যে ছেড়ে দেবেন –

সদানন্দবাবু শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বড় সাধের ইস্কুল সদানন্দবাবুর। একটি দিনের জন্যে কখনও কামাই করেন নি সদানন্দবাবু। ক্লাসে ঢুকে এক মিনিটের জন্যে ফাঁকি দেননি সদানন্দবাবু। সেদিন ইস্কুলের সিঁড়ির ধাপগুলো গুণেছিলেন—তিরিশটা সবসুদ্ধ! বৈশাখী পূর্ণিমার দিন জলখাবার ঘরের কাছে দুবছর আগে একটা বট গাছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দারোয়ান সত্যনারাণকে প্রতিদিন তাতে জল দিতে বলেছেন। শুধু কি তাঁর চাকরি ওখানে, তাঁর যে নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই ইস্কুল।

সদানন্দবাবু কিছু না বলে পেছনে ফিরলেন। না, এবার বাড়ি ফিরতে হয়। তাঁর কিছু ভালো লাগলো না। তাঁর মনে হোল যুদ্ধ পৃথিবীতে কারা বাধায় কে জানে! হয়ত হিটলার কিম্বা হয়ত হিটলার নয়! হয়ত মুসোলিনীও নয়, তোজোও নয় – কেউ নয়। হয়ত যুদ্ধ বাধায় ওরা—ওই হৃষীকেশ, ওই রায় সাহেব ললিতবাবু—ইস্কুলের সেক্রেটারী······

কালকেই যাওয়া স্থির হয়েছে।

মৃন্ময়ী একবার এ-ঘরে এসেছিলেন। সদানন্দবাবু হিসেব করতে বসেছিলেন। আর হিসেব না করলে চলে না। অনেক অপব্যয়, অনেক বাজে খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার যেন আর এক বিরাট খরচ মাথার ওপর তরবারির মত ঝুলছে। এ-বাড়িটা না হয় ছেড়েই দিলেন তিনি। তাতে নয় কুড়িটি টাকা বাঁচলো। কিন্তু গাড়ি ভাড়াও অনেক পড়বে। সেখানে সস্তার দেশ হলেও —জিনিস-পত্রের দাম কি আর সেখানেও বাড়েনি!

সদানন্দবাবু মুখ তুলে বললেন—কিছু বলবে?

মৃন্ময়ী চারদিকে একবার চকিতে দেখে নিলেন। কেউ কোথাও নেই। মাথার ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দিলেন তিনি। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়েও মুখ দিয়ে তাঁর কিছু কথা বেরোল না। যেন স্মৃতির উজান ঠেলে বহুদিন আগেকার পরিচিত নাম ধরে করুণ সদানন্দবাবু তাঁকে ডাকছেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে মৃন্ময়ী বললেন—কালই তাহলে যাওয়া ঠিক

ঝংকার দিয়ে কথা বলা মৃন্ময়ীর অভ্যাস। কিন্তু আজ মৃন্ময়ীর অজ্ঞাত-সারেই তাঁর কণ্ঠে প্রীতির সুর কোমলে বেজে উঠলো।

সদানন্দবাবু কি বলবেন ভেবে পেলেন না। হিসেবের খাতাটা সহসা হাতে তুলে নিয়ে বললেন - হিসেব মিলছে না কিছুতেই—

—হিসেব মিলছে না তো সুরুচিকে ডেকে দিই· মৃন্ময়ী চলে যাবার উপক্রম করলেন।

—তুমিই না হয় একটু বসলে—

অনুযোগের সুর কম্পিত হোল সদানন্দবাবুর গলায়। তক্তপোশের বই-গুলো সরিয়ে একপাশে একটু বসবার জায়গা করে দিলেন। তারপর একরাশ বই খাতা নিয়ে এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন আর মৃন্ময়ীর দিকে চেয়ে দেখতে সময় পাবার কথা নয়। সহসা যেন তাঁর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। মুখটা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো। পকেটে হাত দিলেন। শিশিটার জল ফুরিয়ে এসেছে। দু'এক ফোঁটা যা ছিল তাই মাথায় থাবড়ে দিলেন।

তারপর মৃন্ময়ীর দিকে ফিরে বললেন—কেমন আছো ?

হঠাৎ এই অস্বাভাবিক প্রশ্নে মৃন্মীয় হেসে ফেললেন—হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছো ?

সদানন্দবাবু কী বলবেন ঠিক করতে পারলেন না।

বললেন – বলছিলাম, অনেক দিন বাইরে থাকতে হবে, কলকাতার কী রকম অবস্থা দাঁড়ায় · ···চট্টগ্রামে শুনছি বোমা পড়েছে······

তারপর খানিক থেমে মৃন্ময়ীর চোখের দিকে সোজা চেয়ে বললেন—খুব সাবধানে থেকো—

বিবাহিত জীবনে তাঁর মনে পড়ে না কবে মৃন্ময়ীকে ছেড়ে একলা কাটিয়েছেন। বোধ হয় কখনও না। দিন রাত্রি পাশাপাশি বাস করাতে হয়ত বাইরে থেকে কোনও আকর্ষণের নিদর্শন পাওয়া যেত না—কিন্তু কোথায় দুজনেরই অজ্ঞাতসারে এক সূক্ষ্ম ফল্গুধারা বয়ে চলতো, আজ বুঝি তা ধরা পড়লো।

মৃন্ময়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন—অনেক গোছানো বাকি রয়েছে—

সদানন্দবাবু বাধা দিলেন না। কিন্তু মৃন্ময়ীরও যেন হঠাৎ চলে যেতে বাধলো।

সদানন্দবাবু আস্তে আস্তে আরম্ভ করলেন—বিদেশ—বিভূঁই—শীত আসছে সামনে, মনটা আমার বিশেষ ভালো নেই মিনু—

মৃন্ময়ী উঠছিলেন, আবার বসে পড়লেন।

বললেন তোমার শরীরটা তো ভাল নয়, আমরা চলে গেলে তুমিই বা কেমন করে একলা থাকবে তাই ভাবছি—

মৃন্ময়ীরও কি ভাবনা কম! এই বিপজ্জনক আবহাওয়ার মধ্যে সদানন্দবাবুকে রেখে তিনি কি খুব শান্তিতে থাকবেন সেখানে! শহরের পর শহর যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আরামে থাকবেন বিদেশে—তাই কি তাঁর ভাল লাগবে?

মৃন্ময়ী বললেন—তুমি কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, কী করবে কে জানে, যদি বোঝ তেমন, তাহলে চলে এসো তখনি—

বাইরে কখন মেঘ করে এসেছে, ঝম ঝম করে বৃষ্টি শুরু হোল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তক্তপোশের একপাশে বসে সদানন্দবাবুর মনে হোল যেন বহুদিন পর্যন্ত আর তাদের দেখাশোনা হবে না। কাল এতক্ষণ ট্রেনে করে চলেছে ওরা। আর কলকাতা শহরে একলা পড়ে আছেন তিনি। ট্রেন চলেছে রাত্রির নিদ্রা ভেদ করে অনন্ত তিমির তীর্থ লক্ষ্য করে। সদানন্দবাবুর হঠাৎ মনে হোল—সমস্ত পৃথিবী যেন দুলছে। এই ঘরটা যেন একটা চলন্ত ট্রেনের কামরা। কামরাতে আর কেউ নেই। শুধু মৃন্ময়ী পাশে বসে রয়েছে।

সদানন্দবাবু নিজে থেকেই বলে উঠলেন—আমিও যেতুম সঙ্গে কিন্তু টাকা আসে কোত্থেকে—তা থাকবো কোনও রকমে মেসে টেসে—পান্নালালের বাড়িতে মাল-পত্তর কালকেই পাঠিয়ে দিতে হবে……

তারপর আবার বললেন—একটাকার পোস্ট কার্ড কিনে দেব, একখানা করে চিঠি দিও হপ্তা অন্তর—

আবার চুপ করে রইলেন সদানন্দবাবু। কিছু ভাল লাগছে না তাঁর! পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনে আজ প্রথম এই বিচ্ছেদ। সুরুচিও থাকবে না। ইস্কুলও বন্ধ—কোনও কাজই নেই তাঁর। জানালার বাইরে চেয়েছিলেন তিনি। একখানা মেঘ কালো হয়ে ভেসে আসছে জানালার সামনে। তাঁর মনে হোল—কালো মেঘখানা জানালা ভেদ করে ভেতরে আসবে চলে, আর

তারপর সদানন্দবাবুর জীবনে শুরু হবে তমিস্রার অভিযান। ভয়ে সদানন্দবাবুর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে এল।

বললেন—মিনু—

পাশে চেয়ে দেখলেন - মৃন্ময়ী নেই। কখন উঠে গেছে টের পাননি তিনি। তক্তপোশ ছেড়ে উঠলেন সদানন্দবাবু।

নিত্যানন্দ বলেছিল রেলের টিকিট কিনে দেবে। তার জানা শোনা লোক আছে, বেশি হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না! কিন্তু মুশকিল হয়েছে গাড়ি নিয়ে। একটা ঘোড়ার গাড়ি হাওড়া স্টেশনে যেতে কুড়ি টাকা চেয়ে বসে। ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত, পেট্রলের অভাব, তারা মিলিটারী সোয়ারী বেশি পছন্দ করে, ভাড়া পায় বেশি সেখানে। হয়তো একশো টাকা চেয়ে বসবে ভাড়া। রাস্তায় ফুটপাথে শুধু লোকের সারি চলেছে। সমস্ত জনতা শুধু চলেছে হয় হাওড়া স্টেশনে নয়তো শেয়ালদয়।

মৃন্ময়ী আবার ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—এই দেখ, পুরোন বাক্স প্যাঁটরার মধ্যে এটা খুঁজে পেলাম—

নিতান্ত পুরোন একটা পিজবোর্ড, তার ওপর অনেকদিন আগেকার তোলা সদানন্দবাবু আর মৃন্ময়ীর ছবি। বিয়ের সময়ে তোলা। হলদে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে দুজনের চেহারা চিনে নিতে হয়। তা ছাড়া মৃন্ময়ী তখন কত ছোট ছিলেন। সদানন্দবাবু তখন জেলে থেকে ফিরেছেন। খদ্দরের পাঞ্জাবির ওপর খদ্দরের চাদর দাড়ি গোঁফ কামানো নয়। হঠাৎ যেন সদানন্দবাবু পুরোন দিনের মধ্যে ফিরে গেলেন।

মৃন্ময়ী বললেন—জামা কাপড় বাক্স পোঁটলা সব গোছাতে গিয়ে পেলাম—একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—

সদানন্দবাবু ফটোখানা হাতে নিয়ে একদৃষ্টে দেখছিলেন।

বললেন—তখন তুমি অন্যরকম দেখতে ছিলে—

মৃন্ময়ী সত্যিই অন্যরকম দেখতে ছিলেন কিনা নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন।

বললেন—ছোট্ট বয়েসে সবাই অন্যরকমই থাকে, বড় হয়েই লোকে বদলে যায়—

সদানন্দবাবু মুখ তুললেন। বললেন—আমি বদলে গেছি?

—না, কেবল আমিই বদলেছি - বলে মৃন্ময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুরুচি তখনও জানালার ধারে বসে ছিল।

মৃন্ময়ী কাছে গিয়ে বললেন—তোর সে ফটোটা কোথায় গেল রে রুচি?

জনাই-এর মিত্তিরদের বাড়িতে যখন বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, তখন একটা ফটো তোলা হয়েছিল সুরুচির, সে-টা কোথায় গেল। ঘরের মধ্যে একরাশ কাপড়-চোপড় জড়ো হয়েছে। সুটকেশ ট্রাঙ্ক বাক্স বিছানা কিছু আর বাদ যাবে না। দুদিন একদিনের জন্যে তো নয়, ছমাসও থাকতে হতে পারে, আবার একবছরও থাকতে হতে পারে। সমস্ত মিটে যাবার পরই চলে আসা যায় না আর। সুরুচি যা মুষড়ে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত কী হবে কে বলতে পারে! এ লজ্জা কাউকে বলবার নয়, কারোর সাহায্য, কারোর সহানুভূতি পাবার উপায় নেই! যদি নির্বিঘ্নে সমস্ত মিটে যায়, গোপনে যদি সমস্ত সমাধান হয়, কেউ যদি টের না পায়, তখন আবার ফিরে আসা, এসে সুরুচির বিয়ের বন্দোবস্ত করা! নইলে যদি একবার সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে তা হলেই সর্বনাশ! মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর সেই অসহায় অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারেন না মৃন্ময়ী! কাজ করতে করতে ঘড়ির দিকে চাইতেই উঠে পড়লেন। সুরুচির আবার ডাবের জল খাবার সময় হয়ে গেছে।

গ্লাশটা এনে বললেন—খেয়ে নে এটা—

এক চুমুকে সমস্তটা শেষ করে দিয়ে সুরুচি আবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। পাশের বেনেদের বাড়ির গা দিয়ে সবজীবাগানের গলিটা বেঁকে গেছে। এখান থেকে রাস্তার একটু অংশ দেখা যায়। কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে নয়, কোন কিছু দ্রষ্টব্যকে কেন্দ্র করে নয়—শুধু সমস্ত দিনের ক্লান্তিকর অলসতায় সুরুচির মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে! কাল এতক্ষণ সে ট্রেনে চলেছে। কাল থেকে এই আবহাওয়া, ওই রাস্তার লোক চলাচল, সজীব পারিপার্শ্বিকের এই শব্দ, এই কোলাহল আর থাকবে না। রাস্তা দিয়ে অনেক রকমের লোক যায়। শুধু শেখরদার চেহারাটাই নজরে পড়ে না। এ-বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সত্যি, কিন্তু সুরুচির কী অবস্থা তা তো সে জানে। তার কি কোনও দায়িত্ববোধ থাকতে নেই। একবার তার দাবী নিয়ে সে যদি এসে দাঁড়াতো, কে তাকে বাধা দেবার ছিল। কিন্তু শেখরদা কেনই বা আসবে! সে তো মুক্তি পেয়েছে। চরম বন্ধনের,

চরম শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে তো সে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু তবু তার অপারগতা তার অক্ষমতা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে একটা চিঠি শেখরদা লিখতে পারতো !

মৃন্ময়ী বললেন—তোর সেই ফটোটা কোথায় গেল রে রুচি ?

· জানিনে তো মা —বললে সুরুচি।

মিথ্যে কথাই বললে সে। কয়েকমাস আগে হলে মিথ্যে কথা বলতে সুরুচির বাধতো, কিন্তু আজ বোধ হয় মিথ্যাচার ছাড়া গতি নেই তার। ভাল মন্দ বিচার করবার সময়ও নেই আজ। আজ তার মিথ্যাচারিণী হওয়ার জন্যে শেখরকে দায়ী করা যায় কিনা কেই বা তা বলতে পারে !

— কোথায় রেখেছিস বলনা, ছবিটা ?—মৃন্ময়ী আবার তাগাদা দিলেন।

— কেন তুমি অত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছো মা, আমি জানিনে তো বলছি—

—তুই বড্ড খিট্‌খিটে হয়েছিস রুচি, আগে তো এমন ছিলিনে—

সুরুচি উঠে দাঁড়াল। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মেজাজ তার খিট্‌খিটে হয়ে গেছে, সে কি অকারণে ! অনেকদিন আগেকার কথা, তখন প্রিন্স তাকে প্রেম নিবেদন করতো। সুরুচির একটা ছবি চেয়েছিল সে। ছবিটা তাকেই সুরুচি দিয়েছে। নিজের হাতে সুরুচি নিজের নাম সই করে দিয়েছিল ছবির নিচে। এতদিন পরে সেই পুরোন কথা মনে পড়তে কেমন যেন মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সুরুচি উঠে ঘরে এল। সদানন্দবাবু তখন বেরোচ্ছিলেন। জামা পরা হয়ে গেছে।

সদানন্দবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—কিরে রুচি, হঠাৎ কী হোল ? সব গোছানো হয়ে গেছে ?

চারিদিকে ষড়যন্ত্র। সদানন্দবাবুকে নিয়ে এতবড় একটা ষড়যন্ত্র চলছে মা আর পিসীমার - তার এক বর্ণও এই সরল সাদাসিধে মানুষটি জানেন না। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, চরিত্র। মনে হোল বাবার পায়ে হাত দিয়ে সে ক্ষমা চায়। অকপটে বাবাকে সমস্ত প্রকাশ করে বলে। সে বাবার শিক্ষা, বাবার আশা ও আদর্শের মর্যাদা রাখতে পারেনি। সে ভ্রষ্টা। সে তাদের বংশে কলঙ্ক লেপন করেছে।

—হ্যাঁরে কাঁদছিস নাকি ?—সদানন্দবাবু হাতের এটাচিকেস নামিয়ে সুরুচির মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

বললেন—আমার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? কিছু ভাবিসনে মা, আমি

ঠিক থাকবো, বোমা আমার কিছু করতে পারবে না, শীতকালের রাত্তিরে লাহোর জেলে আমার গায়ে বালতি বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলেছিল—আমি একবারও হাঁচিনি—বলে হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলেন সদানন্দবাবু।

সুরুচির মনে হোল—হাসি নয়, বাবা যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সদানন্দবাবু ভাবলেন—কাল চলে যাবার কথা ভেবে সুরুচির হয়ত মন কেমন করছে।

বললেন—তোরা সুখে থাক নিরাপদে থাক তাই হলেই হোল, আমার এর চেয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করা অভ্যেস আছে, গোয়ালিয়রে তিন দিন পয়সার অভাবে উপোস করে কাটিয়েছি, কষ্ট সহ্য করতেই আমাদের শেখান হোত সমিতিতে—তবে ওবিষয়ে গৌরদাসের কাছে আমি বারবার হেরে এসেছি—ও হোত ফার্স্ট—

তারপর একটু থেমে বললেন—হপ্তা অন্তর একখানা করে চিঠি দিস মা, তোর মার যদি অবসর না হয় তুই যেন দিতে ভুলিস নে—জানিস তো তোর মার হার্ট খারাপ—

সদানন্দবাবু চলে যাবার পর সুরুচি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে উঠতে পারলে না। মনে হয়—সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। শুধু প্রবঞ্চনা আর শুধু মিথ্যাচার দিয়ে এই পৃথিবী! দরকার নেই তার সুনাম। তার কুমারীত্বের অখণ্ড গৌরব নিয়ে তার মান হয়ত বাঁচানো হোল কিন্তু তার প্রাণ বাঁচবে কিনা কে বলতে পারে!

সদানন্দবাবু রাস্তা থেকে আবার ফিরে এসেছেন। কতকগুলো প্রুফ ছিল, সেগুলো নিতে ভুল হয়ে গেছে। সুরুচিকে তখনও সেই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেলেন—। বোধ হয় সদানন্দবাবুকে ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তার।

কাছে এসে বললেন—যেতে যদি তোর ইচ্ছে না করে খুব, তা হলে থাক না এখানে, দুজনে থাকবো কলকাতায়—থাকবি রুচি?

সুরুচি কিছু বলতে পারলে না। সদানন্দবাবুর দিকে মুখ তুলে চাইলে।

সদানন্দবাবু অভয় দিলেন—বেশ আরাম করে থাকবো দুজনে—তা হলে এ-বাড়িটা আর ছাড়িনে—

সুরুচি এবারেও কথা বলতে পারলে না। হয়ত এখানে থাকতে পারলেই

ভালো হোত! একদিন না একদিন শেখরদা আসতোই! শেখরদা এলে তাকে এমন করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে হয় না! সহজ হয়ে যায় সমস্ত! এই ষড়যন্ত্র তার কাছে ভাল লাগছে না। যা অন্যায় নয়, অবৈধ নয় তা শুধু একটু ভুলের জন্যে এমন মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে হবে কেন!

সদানন্দবাবু বললেন—এখনও ভেবে দেখ, তা হলে নিত্যানন্দকে তোর টিকিটটা কাটতে বারণ করে দিই—

—তা হয় না বাবা, আমায় যেতেই হবে—স্বরুচি মাথা নিচু করে বললে।

সদানন্দবাবু কী বুঝলেন কে জানে। যেমন জেদী মেয়ে! একবার জেদ করলে টলানো শক্ত ওকে! চলেই যাক না—ভালোই তো! নিরাপদে থাকুক ওরা। তিনি একলা বেশ থাকতে পারবেন এখানে। দুখানা বই-এর কপিরাইট্‌ বিক্রী করে কিছু টাকা এসেছিল—সব টাকাটা গিরিবালার হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজের হাতে আর কিছু রইল না। না থাক—তাঁর নিজের আর খরচই বা কি!

রাস্তার মুখেই গিরিবালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পুরোন একটা গরদের থান পরনে।

হাতের প্রসাদ দেখিয়ে বললেন—কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এলুম—

তারপর তালপাতার ওপর তেল সিঁদুর থেকে একটু সিঁদুর নিয়ে সদানন্দবাবুর কপালে ছুঁইয়ে দিলেন। একটা প্রসাদী জবাফুল নিয়ে সদানন্দবাবুর মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন।

বললেন—সেখানে গিয়েও তোর জন্যে মনটা কেমন করবে—কোথায় চলেছিস এখন?

সদানন্দবাবু বললেন—নিত্যানন্দর সঙ্গে দেখা করে আসি, তিনখানা টিকিটের জন্যে—

গিরিবালা বাড়িতে ঢুকলেন। ওই সরল সোজা মানুষটির জন্যে কষ্ট হোল গিরিবালার। কিসের দরকার ছিল এই সবের! কালীঘাটে গিয়ে মাকে সেই কথাই বার বার জানিয়ে এসেছেন। তুমি তো সব জানো মা। তুমি ত্রিকালদর্শী! তুমি সর্বজ্ঞ! তুমি অন্তর্যামী! কেন এমন হোল! এমন করে আমাদের সব ভাঙলো কেন মা! তুমি আমাদের ক্ষমা কোর। স্বরুচির

যেন কোন অনিষ্ট না হয়, বউ-এর যেন শরীর সুস্থ থাকে, আর সদা ? তাকে একলা রেখে যাচ্ছি, তাকে তুমি দেখো মা !

সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে হাতজোড় করে একবার প্রণাম করলেন।

নিত্যানন্দ টিকিট কেটে দেবে বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দেখাই পাওয়া গেল না। হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছিল। থার্ডক্লাশ পাল্কী গাড়ি কুড়ি টাকায় রফা করে কোন রকমে পৌছুল। কিন্তু জনসমুদ্র দেখে সদানন্দবাবু অকূলে তলিয়ে গেলেন।

সদানন্দবাবু দুখানা দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। হাতাহাতি করে মালপত্রগুলোও নামিয়ে দিলে গাড়োয়ান। কিন্তু তা-ও স্টেশনের সীমানা থেকে আধ মাইল দূরে। পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রণের ভার নিয়েছে।

সদানন্দবাবু বললেন—সব হাত ধরাধরি করে চলো - সুরুচি আমার ডান হাতটা ধর—

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় গুণে নিয়েছেন তেত্রিশটা গাঁটরি। এখানে আর একবার গুণে নিলেন। সব ঠিক আছে।

একটা কুলিরও কিন্তু সাক্ষাৎ নেই। মোট-মাটারি নিয়ে কোথায় কোন্-দিকে যাওয়া যায় ? কোন্‌দিকে ট্রেন, তারও ঠিকানা নেই। জনস্রোতে মিশে গড্ডালিকায় গা ঢেলে দিয়ে যাওয়া চলে—কিন্তু মালপত্র কে নিয়ে যায় ?

চীৎকার করে ডাকলেন সদানন্দবাবু—নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ আছো—ও নিত্যানন্দ—

সদানন্দবাবুর চীৎকার কলমুখর ভীড়ের চাপে চেপ্টে গেল। নিজের কণ্ঠের আওয়াজ তাঁর নিজের কানেই ক্ষীণাতিক্ষীণ মনে হোল। এক একটা ভীড়ের ঝাপটা ঝড়ের মত আসে আর সদানন্দবাবুর দলটাকে নাড়িয়ে দেয়।

সদানন্দবাবু চেঁচিয়ে বলেন—খুব সাবধান—হুঁশিয়ার—

গিরিবালা আরো হুঁশিয়ার। মৃন্ময়ীর গায়ে গয়না রয়েছে, সুরুচির গলায় হার, সকলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। কোমরে একটা ন্যাকড়ার থলিতে তিন শো টাকা বেঁধে নিয়েছেন।

—এই কুলি, কুলি—

ছুটো কুলির দুর্লভ মূর্তি দেখে সদানন্দবাবু চীৎকার করে ডাকলেন।

কেয়ার নেই।

হাতের পাঁচটা আঙুল তুলে জানিয়ে দিলে—পাঁচ টাকা করে দেবেন ?

রাজী কি রাজী নয় তা যেন তাদের জানবার দরকার নেই। তারা যেন টাকার প্রত্যাশী নয় এমনি ভাবেই তাচ্ছিল্যভরে ওদিকে চলে গেল।

আটটায় গাড়ি। আর আধ ঘণ্টা মাত্র হাতে আছে। সদানন্দবাবু অকূল সমুদ্রে পড়লেন। শেষকালে কি কুড়ি টাকা খরচ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে নাকি। নিত্যানন্দর খুব আক্কেল যা হোক। বিপদের সময় কেউ নয়।

সদানন্দবাবু বললেন—শেখর এ সময়ে থাকলে কি ভাবনা ছিল—কি বল সুরুচি ?

সুরুচি কথাটা শুনে বাবার দিকে চাইলে। নীরব তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার চোখ ছুটো যেন হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠলো।

—মশাই কোথায় যাবেন আপনারা ?—

রেলের পোশাকপরা একজন লোক এসে চুপি চুপি জিগ্যেস করলে।

—চক্রধরপুর।

—টিকিট পিছু দশ টাকা দিতে পারবেন ? আমি টিকিট কেটে দিতে পারি—

ভদ্রলোক পরোপকারী বটে।

গিরিবালার দিকে চাইলেন সদানন্দবাবু।

অর্থাৎ—তোমরা কি বলো ?

কিন্তু অত সময় ভদ্রলোকের হাতে নেই। পরামর্শ করার সময় তখন নয়। এমন লোক মিলবে যারা টিকিট পিছু কুড়ি টাকা দিতে রাজী। তেমন-তেমন যোগাড় করতে পারলে এক-একদিনে চারশো-পাঁচশো টাকা উপায় করা যায়। টাকার যেন ছিনিমিনি খেলা চলছে। ওদিকে হিন্দুস্থানীর দল কাপড়ের খুঁটের সঙ্গে কাপড়ের খুঁট বেঁধে মাথায় পোঁটলা, কোলে মেয়ে নিয়ে চলেছে। শহরের একপ্রান্ত থেকে হেঁটে আসছে ওরা। হাওড়ায় টিকিট না পেলে ওরা রেললাইন ধরে বরাবর হাঁটতে শুরু করবে। ভদ্রলোকদেরই বিপদ বেশি। ফুটপাথের পাশে স্টেশনের দেয়াল ঘেঁষে একটি পরিবার বসে আছে। পা ছড়িয়ে সংসার পেতেছে ওখানেই ! ওরা তিন দিন ধরে স্টেশনে এসে বসে

আছে। টিকিটও পায় না, ট্রেনেও জায়গা পায় না। একজন বলে—এইখানেই বসে যাও মা, মরি যদি একসঙ্গেই বোমার ঘায়ে মরবো সবাই—

—হ্যাঁ বাছা তোমরা কোত্থেকে আসছ গা?

—চেতলা। তোমরা?

—আমরা আসছি খিদিরপুর থেকে, তা মা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়েছি, তা মানভূম কি এখানে মা? নইলে তো পায়ে পায়েই চলে যেতাম—রাস্তায় দুর্গতির কি সীমে আছে, পাড়ার লোকে বললে—হারুর মা তোমার ঝাড়া হাত-পা, তুমি কার জন্যে প্রাণটা খোয়াবে? তা আমি বলি, হারু থাকলে কি আমার আজ দুধ বেচে খেতে হয়, হীরের টুকরো জামাই করেছিলাম—কপালে সইলো না মা—

বুড়ি কথা বলে আর কাঁদে হাউ হাউ করে।

গিরিবালা বললেন—ও সদা, সময় আছে তো? ট্রেন ফেল করবো না তো…

—ও মা জননী, একটি পয়সা দাও মা—দুদিন কিছু খাইনি মা, অন্ধ বুড়োকে কিছু দাও মা—

—সরো বাপু, তুমি আর জালিও না, বলে আমরা মরছি নিজের জালায়—গিরিবালা আড়াল করে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন। কোথাও রেহাই নেই। স্টেশনে পর্যন্ত এসেছে ওরা।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে একসারি মিলিটারী লরী একেবারে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে এলো। একটা নয় দুটো নয়—একেবারে অসংখ্য। খাকি উর্দি-পরা সব সাহেব ভর্তি। প্রকাণ্ড লোহার গেটের কাছে এসে থেমে গেছে। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। সার্জেণ্ট, লালপাগড়ী—হৈ-হৈ করে দৌড়ে এল। সময় ওদের কাছে ভারী দামী। এক সেকেণ্ড দেরী হলে যুদ্ধে হার হয়ে যাবে। সার্জেণ্টটা নিজে হাতে লোহার গেটটা ফাঁক করে দিলে। ঝন ঝন করে আওয়াজ হোল একটা, তারপর সারবন্দি গাড়ির দল পৃথিবী কাঁপিয়ে ঢুকতে লাগলো ভেতরে।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ করে একটা চীৎকার উঠলো।

তারপর সে এক বীভৎস দৃশ্য।

সদানন্দবাবুর প্রৌঢ় শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল যেন দ্রুত হয়ে

এল। একদল মেয়েমানুষ গেট খোলা পেয়ে ভেড়ার পালের মত ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল—আর তাদেরই উপর সার্জেণ্টদের সে কি অমানুষিক অত্যাচার।

হারুর মা বললে—হ্যাঁ গা মারছে নাকি ওদের? বেশ করেছে, তখনি বললাম মাগীদের, যাসনি তোরা ওদিকে—সাহেব-পুলিশ রয়েছে—ইজ্জত থাকবে না, আমার কথা তো শুনলে না হারামজাদীরা, বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—

আশেপাশের আর সকলেই যেন ঘটনাটাতে বেজায় খুশী হয়েছে মনে হল।

পাশের একটা মেয়ে বলে উঠলো—ওমা দেখ দেখ, মাগীটার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে গো—

প্রথম থেকে সুরুচির কিছুই ভাল লাগেনি। কেন এমন হচ্ছে। আজ অনেকদিন ধরে বার বার সুরুচির মনে হচ্ছে—যেন সব কিছুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষকে এরা ঘর-ছাড়া করে ছেড়েছে এবার। একবার তার মনে পড়লো, তাদের কলেজের বন্ধুদের কথা। অনেকদিন কোনও সম্পর্কই নেই তাদের সঙ্গে! এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ের ভেতর তাদেরও কেউ কেউ এখানে আছে নাকি? সেই মলিনা, শ্রীলতা, ইলার দল? সবাই যদি কলকাতা ছেড়ে চলে যায়, থাকবে কারা? সুরুচির বয়সী আরো একটা মেয়ে আগে আগে চলেছে।

হঠাৎ চমকে উঠেছে সুরুচি।

—কী ভাবছিস বলতো রুচি, এই হারিকেনটা ঝুলিয়ে নে হাতে—বললেন মৃন্ময়ী।

সুরুচি দেখলে কুলী পাওয়া গেছে। পাঁচ টাকা করে এক-একজন নেবে। তা নিক—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। এখন আর দর-কষাকষি করলে চলে না। চারটে কুলী কুড়ি টাকা নেবে!

আস্তে আস্তে জনতার মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো ওরা।

গিরিবালা বললেন—তুমি আর ওকে বোক না, বউ, সাবধানে তুই আমার সামনে সামনে চল—

অতি সন্তর্পণে কুলীকে সামনে নিশানা রেখে যাওয়া! যাওয়া সোজা কথা নয়। বিরাট টিনের চালার নিচে যেখানে একটু জায়গা যে পেয়েছে, সেইখানেই পা ছড়িয়ে ময়লা মেঝেতে পথের ওপর মোটঘাট রেখে বসে পড়েছে; শুয়ে পড়েছে। নিয়মকানুন মানার দিন-কাল নয়। অরাজক! বুদ্ধি করে প্ল্যাটফরম

টিকিট চারটে কিনে নিয়েছেন সদানন্দবাবু। এখন তো আসল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা যাক। একেবারে ট্রেনে উঠে বসলে তখন যদি টিকিট চায়, টাকা দিলেই চলবে। বুদ্ধিটা দিয়েছেন গিরিবালা। গেটের সামনে এক-এক করে লোক ছাড়ছে। ভীড়ের মধ্যে স্থরুচির মনে হোল, বড় ঘেঁষাঘেঁষি করে লোকগুলো দাঁড়িয়েছে তার আশেপাশে। যেন বড় বেশি রকমের অন্যায় সান্নিধ্য। স্থরুচি আলগোছে নিজেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে লাগলো।

আগে হলে হয়ত এমন সান্নিধ্য উপেক্ষা করেই যেত, কিন্তু সম্প্রতি স্থরুচির সমস্ত সত্তা যেন ভয়ানক রকমে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। সামান্যতম ক্রটির জন্যেও কাউকে আর ক্ষমা করা চলে না। বিশ্বাস করা যায় না কাউকে। পৃথিবী যখন তাকে ক্ষমা করেনি, সেই-বা কেন ক্ষমা করবে পৃথিবীকে। তার সগুজাগ্রত মন তার পরিবেষ্টনীকে যেন কেবল অবিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছে—

ছোট দলটি আস্তে আস্তে গেট পারও হয়ে গেল, কিন্তু প্লাটফরমের ভেতরে ঢুকে বোঝা গেল বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ট্রেনটার কাছে যেতেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার চলতে শুরু করেছে। কূলে এসে নৌকো বানচাল হয়ে যাওয়া। সদানন্দবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। গিরিবালা, মৃন্ময়ী আর স্থরুচিও বসে পড়লো—

কিন্তু মন্দের ভাল বলতে হবে। নিত্যানন্দ সেই বিপদের সময় এসে হাজির।

—আপনারা এখানে বসে আর আমি আপনাদের খুঁজে খুঁজে হাল্লাক—বললে নিত্যানন্দ।

সদানন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন—তোমার আক্কেল তো খুব নিত্যানন্দ—এখন ট্রেন ফেল করে বসে আছি—আমি আর কোনও ভরসা পাচ্ছিনে—যা করবার এখন তুমি কর—

প্যাসেঞ্জারের পর বম্বে মেল আছে বিকেল বেলা।

তাতে ভীড়ের ঠেলায় ওঠা মুশকিল হবে। তারপর তাতে আবার সাহেব মেমদের ভীড়, গোরা সৈন্যদের ভীড়, থার্ড ক্লাস ইণ্টার ক্লাস যে কয়েকখানা কামরা আছে, তাও সাঁত্রাগাছি থেকে স্থকৌশলে ভর্তি হয়ে আসে। মেল যদি ধরতে না পারা যায়, সন্ধ্যেবেলা রাঁচি প্যাসেঞ্জার আছে। সে ট্রেন চক্রধরপুর পর্যন্ত যাবে না, টাটানগর থেকে বেঁকে মুরীর দিকে যাবে। তাতে

টাটানগর পর্যন্ত অন্ততঃ যাওয়া তো যাবে। টাটানগরে নেমে সেখান থেকে চক্রধরপুর পর্যন্ত মাত্র উনচল্লিশ মাইলের মামলা। সেটুকু পরের দিন যে-কোনও গাড়িতে যাওয়া যেতে পারে।

কিছু ভাবনা নেই।

নিত্যানন্দ টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে আজ বাড়ি ফিরবে।

একটু পরে দেখতে না দেখতে নিত্যানন্দ ডাব কিনে নিয়ে এল, এক হাতে খাবার কিনে নিয়ে এল, একটা তালপাতার পাখাও।

হাজার কষ্টের মধ্যেও সদানন্দবাবু একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

মৃন্ময়ী বললেন—যা হোক লোকটা ছিল তাই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—

গিরিবালা পর্যন্ত বললেন—যা হোক লোকটি পরোপকারী বটে।

সুরুচি মনে মনে হাসলো।

কে ভালো কে মন্দ সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া চলে তখনই যখন পেছনে কোনও বিচার থাকে না। ভালো মন্দের স্থায়ী মাপকাঠি যে কী কে জানে।

সাঁত্রাগাছি, আন্দুল, আবাদা, নলপুর, ফুলেশ্বর……

ভীড়, গোলমাল, চীৎকার, কান্না কোলাহলের মধ্যে কারো কিছু খেয়াল ছিল না কোনও দিকে। ট্রেন ছাড়বামাত্র ট্রেনের আলোগুলো সব নিভে গেল। ব্ল্যাক-আউট। ভালো করে সকলের বসাও হয়নি। কে উঠল, কে না-উঠল দেখা হোল না, একবার হুইশল বাজিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে রাঁচি প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দিয়েছে।

মেয়ে কামরা দেখেই উঠেছেন তাঁরা। একটা ছোট মেয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু করেছে। গাড়িময় চীৎকার আর কোলাহল। সব যেন অপ-ব্যবস্থার মধ্যে চলছে। এমন করে হঠাৎ আলো নিভে যাবে জানলে আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া যেত।

—হ্যাঁ গা ন্যাড়ার মা উঠেছ তো?

—আমার বড় প্যাঁটরাটা কোথায় রাখলি গা, ও তারি—

তারি মানে বোধ হয় তারামণি।

তারামণি ও-কোণ থেকে জবাব দিলে—এই যে এইখেনে রেখেছি দিদ্মা, এই পায়খানার পাশে—

—হ্যাঁ গা হারিকেন একটা কারোর কাছে নেই—?

—বলি কে গা তুমি, আমার পা মাড়িয়ে দিলে, মরে গেছি মা, মরে গেছি—

অনেক কথা, অনেক চীৎকার, আর অনেক গালাগালি বহন করে রাঁচি প্যাসেঞ্জার চললো পশ্চিম দিকে। ছোট সেই মেয়েটি কী চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

—কাঁদে কেন গা, কী হয়েছে ওর— ?

—ওর মা পাশের গাড়িতে উঠেছে, ভীড়ের জ্বালায় উঠতে পারেনি এখানে—

হয়ত ভয়ে চেঁচাচ্ছে মেয়েটা। একে মা নেই কাছে, তায় অন্ধকার। কে আর সহানুভূতি দেখাবে! চীৎকার করলে ওইটুকু বিপদে যদি সহানুভূতিই আকর্ষণ করা যেত তা হলে তাদের মত বিপদে কতখানি চীৎকার দরকার—স্থরুচি এক কোণে বসে তাই ভাবলে।

পাশাপাশি তিনজন বসেছেন।

—একটু সরো না বাছা, সরে বসো না, আমি যে পড়ে গেলুম—

—সরবো কোথায় মা, মানুষের ঘাড়ে উঠবো নাকি ?

—বলি আমরা কি পয়সা দিয়ে টিকিট কিনিনি? একলা তুমিই পয়সা দিয়েছ বুঝি ?

—তা পয়সা দিয়ে টিকিট কাটতে আমি তো তোমায় মাথার দিব্যি দিইনি মা,—কিনলে কেন!

—অত পয়সা পয়সা কোর না বাছা, অত পয়সার গরম ভাল নয়—

—দেখলে মা, দেখলে তো সবাই—গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছে মাগী, আমি পয়সার গরমের কথা কিছু বলেছি? তোমরা পাঁচজনে বল মা—

অন্ধকারে আর একটা ছায়ামূর্তি বলে উঠলো—ঠিক তো বাছা, উনি তো পয়সার কথা কিছু বলেন নি—তুমি গায়ে পড়ে……

—তুমি কে শুনি, তুমি কেন আমাদের ডালে কাঠি দিতে আসছ, বসবার জায়গা পেয়েছ চুপ করে থাক না—

তারপর সেই অন্ধকারে ঝগড়া শুরু হোল।

ইতর ভাষায় গালাগালি, বাপান্ত, শাপান্ত, কান্না, অদৃষ্টকে ধিক্কার। চলন্ত ট্রেনের অন্ধকার কামরা। যেন কল্পান্ত কাল পর্যন্ত এমনি চলবে এদের

ইতরোমি। ট্রেনের চলার হয়ত এক জায়গায় গিয়ে বিরাম আছে, কিন্তু এই হিংসা, ঈর্ষা, কলহের যেন আর শেষ নেই।

গিরিবালা দু'জনকে আগলে নিয়ে বসে আছেন। নিরিবিলি এক কোণে জায়গা পেয়েছেন তাই রক্ষা। তা নইলে দুর্ভোগের আর অন্ত ছিল না। এক একটা স্টেশন যায় আর চকিতে একটা জলন্ত মশালের দাউ দাউ করা আলোয় কামরার ভেতরটা ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত হয়ে ওঠে। অস্পষ্টও নয় আবার স্পষ্টও নয়। প্রতিপক্ষকে একবার দেখে নিয়েই আবার শুরু হয় কলহ। জায়গা নিয়ে, স্থান নিয়ে, অধিকার নিয়ে পৃথিবীর সেই আদিমতম কলহ।

সুরুচির মনে পড়লো শেখরদার কথা—।

শেখরদা বলতো—অধিকার-বোধই পৃথিবীর যত অশান্তির মূল। অধিকার-বোধের সীমা যখন কোনও দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই দেশে দেশে যুদ্ধ বাধে। এই অধিকার-বোধের বেহিসেবীতেই মানুষে-মানুষে খুনোখুনি হয়। স্বামী-স্ত্রীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এখন ট্রেনের কামরায় যা ঘটছে, সেই একই ঘটনা তো ঘটছে ইংলণ্ডে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়। ওদিকে যখন ওই ঝগড়া চলছে তখন সুরুচি এই ভূয়োদর্শন আবিষ্কার করে এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

মৃন্ময়ী বসতে জায়গা পেয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

আপাততঃ টাটানগর পর্যন্ত তো যাওয়া যাক। তারপরে ওইটুকু রাস্তা যাবার অনেক গাড়ি আছে। কাল থেকে কী পরিশ্রমটাই না চলছে। জিনিস-পত্র গোছানোটাই তো এক সমস্যা। এতদিনকার সংসারে তিল তিল করে কি কম জিনিস জমেছে। সেই সমস্ত জিনিস একে একে নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখে এসেছেন। কালই সদানন্দবাবু বাড়ি বদলাবেন।

সেই ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই তখন আবার আর এক কাণ্ড ঘটলো।

মৃন্ময়ী প্রথমে চমকে উঠেছিলেন।

চমকে ওঠবারই কথা।

বাইরের দরজায় পিওন এসে ডেকেছিল—চিঠি আছে।

প্রথমে ভেবেছিলেন—চিঠি আর কার হবে। গিরিবালার। গিরিবালার চিঠির ওপর বাংলায় ঠিকানা লেখা থাকে।

কিন্তু এ ইংরিজীতে লেখা। হঠাৎ যে এমন হবে ভাবতে পারেন নি। অভ্যাস বশেই খামের চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছেন। তারপর চিঠির নিচে নাম সই দেখে অবাক হবারই কথা।

স্বরুচিকে চিঠি লিখেছে শেখর!

কী লিখেছে, কেন লিখেছে সে সব চুলোয় যাক, শেখরের নামটা দেখেই রেগে মৃন্ময়ীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছে।

তারপর আর কথাবার্তা নেই, দুই হাতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন চিঠিটা। উনুনে আগুন জ্বলছিল, সেই আগুনেই চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

গিরিবালা বললেন—বাসনের ঝুড়িটা কোথায় রেখেছ বউ, উঠেছে তো?

মৃন্ময়ী বললেন—এই তো আমার পায়ের কাছেই রয়েছে—

মৃন্ময়ী ভাবতে লাগলেন শেখরের চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছেন ভালোই করেছেন। তিনি যা পছন্দ করেন না তাই হয়েছে তাঁর কপালে। মৃন্ময়ী মামার বাড়িতে মানুষ। ছোটবেলা থেকে মামার সেবা করতে করতেই বড় হয়েছেন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মেশবার আর তাঁর সুযোগ হয়নি। তাঁর মামার এক অদ্ভুত রোগ ছিল। তাঁর মনে হোত সমস্ত পৃথিবীর লোক যেন তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে। কাউকে বিশ্বাস করতেন না তিনি, মামীমাকেও নয়। অন্য লোকের রান্না খেতেন না। সকাল বেলা উঠে নিজে চাল ধুয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে দিতেন, নিজেই আবার ভাত নামিয়ে কোনওদিন একটা তরকারী কোনদিন ডাল ভাজা একটা করে নিতেন। কী অমানুষিক পরিশ্রম করতেন সারাদিন, দোকানের খাবার খেতেন না।

ছোট মেয়ের শ্বশুর এসে সমস্ত দেখে শুনে তো অবাক।

বেয়াই বললেন—এত রান্নার হাঙ্গামা, আপনি ফল খেয়ে থাকুন বেয়াই মশায়, আপনার কষ্ট অনেক লাঘব হবে—

মামা উত্তরে বলেছিলেন—আপনি তবে কিছুই জানেন না বেয়াই মশাই, ওরা গাছের মধ্যেও বিষ ইনজেকশন করে দেয়—আর সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলোও যে বিষাক্ত হয়ে যায়—

সেই মামার সঙ্গে দিনরাত কাটাতেন মৃন্ময়ী। মামার সেই সন্দেহপ্রবণ

মন সংক্রামিত হয়েছিল মৃন্ময়ীর ভেতরে। কী জানি কেন, শেখর যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে আসে তখনই ভাল লাগেনি তাঁর। সুরুচির কলেজে পড়া তাও পছন্দ হয়নি। কিন্তু সদানন্দবাবুর খেয়াল, সুরুচির জেদ আর সবার ওপর সদানন্দবাবু আর সুরুচির ঘনিষ্ঠতা যাতে মৃন্ময়ীর অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনই ছিল না—সমস্ত বিষয়টা সহ্য করবার চেষ্টা, একটা আপোষের মনোভাব সৃষ্টি করবার প্রয়াস করছিলেন তিনি কিন্তু সেটা একান্তভাবে চেষ্টা বা প্রয়াসই ছিল। সে প্রয়াস তাঁর কোনও দিন সফল হয়নি।

এমন সময় একদিন সর্বনাশের সংবাদটা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই মনে হয়েছিল মৃন্ময়ীর।

আড়ষ্ট হয়ে বসে বসে কাল থেকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটাই ভাবছিলেন তিনি।

সদানন্দবাবুর কথা মনে পড়লো।

বিপদের মধ্যে তাঁকে ফেলে এলেন সবাই। কোথায় কোন ছাত্রদের বাড়ি থাকার ব্যবস্থা, আর কোথায় চেতলার মেসে দুবেলা খেতে আসা। অন্ধকার রাত্রিতে ব্ল্যাক-আউটের সময় এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়া আসা করা। কে তাঁর বই খাতাপত্র গুছিয়ে রাখবে। কে জামা কাপড়ের তদারক করবে। এত ভাবনা আগে আর কখনও হয়নি মৃন্ময়ীর।

গিরিবালা তখন অন্য কথা ভাবছিলেন।

চক্রধরপুরে রাঁচি রোডে একটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে সরোজের মাসতুতো ভাই।

কানাই লিখেছে—এক মাসের মধ্যেই আমাকে বদলি করে দিচ্ছে ওয়ালটেয়ারে কিন্তু তা হোক কাকীমা, আমি বাসা একটা ঠিক করে রেখেছি, তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না—.

তা কানাই-এর বদলি হওয়াটা সুখবর বৈকি।

কেউ চেনাশোনা লোক না থাকাই তো ভালো। একবার মনে হয়েছিল কাশীর কথা। কিন্তু কাশীতে যা চেনা লোকের ভীড়। কালীঘাটের রায় চৌধুরীদের বাড়ি আছে সেখানে। চেতলার হরিঘোষের বিধবা বোন থাকে। আরো কত লোক থাকে, একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলেই সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তারপর 'কোথায় উঠেছ' 'সঙ্গে কে এসেছে' নানান

প্রশ্ন—শেষকালে একদিন বাসায় এসে হাজির হবে। তখন কিছু কি আ
চাপা থাকবে! টি টি পড়ে যাবে চেতলায়। তার চেয়ে চক্রধরপুরই ভালো।

অন্ধকার ট্রেনের কামরায় তখনও ঝগড়া চলেছে পুরোদমে—

—যারা অমন আয়েস চায়, তারা ফার্স্ট কেলাসে সেকেণ্ড কেলাসে গেলেই পারে, পাখার তলায় পা ছড়িয়ে ঘুমোক না, কেউ কিছু বলবে না—কি বলো মা, অন্যায় বলেছি কিছু?

—না অন্যায় তুমি বলবে কেন বাছা, অন্যায় আমিই বলেছি, গরীব হওয়াই অন্যায় বাছা, আমাদের পয়সা থাকলে কি আর ওই গালাগালিগুলো দিতে পারতে, না এমন লাথি ঝ্যাঁটা মারতে—

—হ্যাঁ মা, গালাগালি তোমায় কখন দিলুম আমি, সবাই তো শুনছে, বলুক দিকি কেউ—

—গালাগালি দাওনি বাছা, আমাকে ফুল বিল্যিপত্তর দিয়ে পুজো করেছো, আমি কালা, আমি শুনতে তো আর পাইনে কিছু—

হঠাৎ টপ্ করে গাড়ির আলোটা জ্বলে উঠলো।

ব্ল্যাক-আউটের সীমানা পেরিয়ে গেছে বোধ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

ছোট মেয়েটা এতক্ষণ কান ফাটানো চীৎকার করছিল, সে-ও কী জানি কেন এখন হঠাৎ থেমে গেছে।

ওদিকে হিন্দুস্থানীদের একটা দল এতক্ষণ গান জুড়ে দিয়েছিল—তারাও হঠাৎ চুপ করে গেল। সবচেয়ে অবাক লাগলো স্বরুচির সামনের দলটিকে দেখে।

ওদেরই মধ্যে দুদলে ভাগাভাগি হয়ে ঝগড়া চলছিল। তাদের মধ্যে একজন অবাক হয়ে বলে উঠলো—ওমা ন'দিদি না?

তার সামনের মহিলাটি চোখ কপালে তুলে বললে—ওমা, তাই এতক্ষণ চেনা চেনা গলা লাগছিল—তুই কোথায় যাচ্ছিস ছোটবউ? নে পান খা—তোর দেওর কেমন আছে, কতদিন পরে দেখা—ছি ছি ছি—

—এইটি আমার ছোট মেয়ে আর ওইটি বড় ছেলে, ওই ট্রাঙ্কের ওপর বসে রয়েছে ও আমার ভাসুর পো—

—এস এস খোকা, সর খুদী সরে বোস—এখানে পাঁচজনের জায়গা খুব হবে
— এস তো বাবা-এস –

—বোমার ভয়ে পালাচ্ছি ন'দিদি, উনি রয়েছেন পুরুষদের গাড়িতে, তা কতদিন পরে আবার দেখা হোল – সংসারের জ্বালায় কারো খবর নিতে পারিনে দিদি—খুব আনন্দ হোল দেখে—

সুরুচি আর হাসি চাপতে পারছিল না।

গিরিবালার দিকে চাইলে সুরুচি। গিরিবালাও দেখছিলেন।

বললেন—আ মরণ, মাগীদের ঝগড়া করতেও যেমন, আবার আদিখ্যেতা করতেও তেমনি—

নৈশ তিমির ভেদ করে হাসি কান্নার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে রাঁচি প্যাসেঞ্জার হু হু বেগে ছুটে চলেছে। বাইরে দিকচক্রবাল-রেখায় চাঁদ উঠছে। ধূসর পটভূমিকায় জমাটবাঁধা অন্ধকারের মত দুপাশের গাছগুলো দ্রুতগতিতে পেছনে সরে যাচ্ছে। চারিদিকে নিথর নিস্তব্ধ পরিস্থিতি, ঘুমকাতর রাত্রি, তার মধ্যে দিয়ে একখানা বিনিদ্র ট্রেন পাহারাওয়ালার মত পৃথিবী পরিক্রমা করতে বেরিয়েছে।

সুরুচির চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে আসতে লাগলো।

—ও সিংজী, সিংজী—

পান্নালালের বাড়ির দারোয়ান সামনের ঘরটায় থাকে।

বাড়িটার সামনে একটু বাগানওয়ালা খোলা জায়গা। গেট দিয়ে ঢুকতেই পড়ে বাঁদিকে দারোয়ানের ঘর।

ঘরটার সামনে সিংজী একটা তোলা উনুনে কিছু তরকারী চাপিয়েছিল, আর লোহার থালায় আধ সের আটা মাখছিল।

—মাস্টার সাহেব, আসেন—সিংজী সসম্ভ্রমে হাতের কাজ ফেলে গেট খুলতে উঠে এল।

—একটা চাবি ফেলে গেছি সিংজী? আমার বাড়ির চাবি?

—চাবি? আপনার চাবি তো দেখিনি!—সিংজী গেটটার চাবি খুলে ফাঁক করে দিল।

—ভারি মুশকিল হলো তো! সদানন্দবাবু মাথায় হাত দিলেন।

তবে বোধ হয় মেসে ফেলে এসেছেন। হাওড়া স্টেশন থেকে এসে বাড়িতে একবার গিয়েছিলেন। সেখান থেকে এসেছিলেন এই পান্নালালের বাড়ি। ঘর দোরগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখা উদ্দেশ্য ছিল। ঘরটা পরিষ্কার করে মেসে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ফিরে গেছেন। বাড়িতে গিয়ে দরজা খোলবার সময় দেখেন পকেটে চাবি নেই।

—আর একবার খোলতো ঘরটা—সদানন্দবাবু গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

সিংজীর আলু পটলের তরকারী থেকে ফোড়নের সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। সিংজী কড়াটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখলে।

বললে—চলুন, ঘর খুলে দিই—

দারোয়ানের ঘরের মাথায় ছোট একটা ঘর। সেই ঘরটায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সে ঘরের আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন ক'র খোঁজা হলো।

কোথাও নেই।

তবে মেসে নিশ্চয়ই ফেলে এসেছেন। সেখানে মেসের অতুলবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে নিশ্চয়ই চাবি নিতে ভুলে গেছেন।

সদানন্দবাবু চলে আসছিলেন। সিংজী পেছনে পেছনে এসে বললে—মাস্টার সাহেব, আমার কথা মনে আছে তো ?

সদানন্দবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। কি কথা তাঁর মনে পড়লো না।

বললেন—কি কথা বলো তো ?

—আমার সেই লাঠি ?

—হ্যাঁ সেই লাঠি! একটা মোটা দেখে পাকা সিঙ্গাপুরী বেতের মজবুত লাঠি উপহার দিতে হবে। সিংজী বহুদিন থেকে চেয়ে আসছে। মনেই থাকে না তাঁর।

বললেন—দেব যখন বলেছি তোমাকে নিশ্চয় দেব সিংজী—

বহুদিন আগে ছাতা ফেলে এসেছিলেন একদিন পান্নালালদের বাড়িতে। সিংজী কুড়িয়ে রেখেছিল। তার বদলে একটা বেতের লাঠি চেয়েছিল। বেশ মোটা দেখে লাঠি! সিংজী খুব শৌখীন লোক। যেমন ডন্ বৈঠক কুস্তী করে চেহারাটা পোক্ত করেছে, তেমনি পোশাক পরিচ্ছদেরও বাহার আছে। বোধ হয় টাকা সুদে খাটায়। দ্বারভাঙ্গা জেলায় ঘর। দেশে বউ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে।

বলে—আমাদের এ ব্যবসা কি আজকের? তিন পুরুষের মাস্টার সাহেব, আমার ঠাকুর্দাদা, বাবা, আমি তিন পুরুষ ধরে বাঙালী বাবুদের নিমক খেয়ে আসছি, আমরা জাত দারোয়ান—আমার ঠাকুর্দাদার লাঠি ছিল বাঁশের, সেই লাঠি বাবার কাছ থেকে আমি পেয়েছিলাম, হোলির ছুটিতে মোকামা ঘাটে মুসাফিরখানায় সেই লাঠি চুরি হয়ে গেল মাস্টার সাহেব—

—তোমার লাঠি আবার তোমার ছেলেকে দিয়ে যাবে তো?

—ছেলে আমার নেই মাস্টার সাহেব।······

সিংজীর ছেলে নেই, মেয়ে আছে একটা। মেয়ের সাদি হলে জামাইকে দেবে সে লাঠি। বংশপরম্পরায় সেই লাঠি হাতে হাতে হাত-বদল হবে।

বলে—এইবার লড়াই মিটলে এক মাহিনার ছুটি নিয়ে দেশে যাব মাস্টার সাহেব, গিয়ে মেয়ের সাদি দেব—কবে লড়াই মিটবে মাস্টার সাহেব?

লাঠি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সদানন্দবাবু চলে আসেন।

চেতলা আর বালীগঞ্জ—ওপার থেকে এপারে আসতে আজকাল আর কালীঘাটের পুরোন পুল দিয়ে ঘুরে আসতে হয় না। মিলিটারীর প্রয়োজনে দেশবন্ধু স্মৃতি মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা কাঠের পুল তৈরী হয়েছে। ভারী সুবিধে হয়েছে সদানন্দবাবুর।

পান্নালালদের বাড়ি থেকে এই পথ দিয়েই আসছিলেন। কেওড়াতলা শ্মশানের গা ঘেঁষে রাস্তাটা।

—কে সদানন্দবাবু নাকি?

বিনোদবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্ল্যাক-আউটের রাত্রেও এড়ানো শক্ত। বিনোদবাবু নিজেই এগিয়ে এলেন।

বললেন—সেদিন সুবোধকে স্পষ্টই বলে দিলাম মশাই, আমি পাবলিক ওয়ার্ক করতে গেছি, আমার অত খোসামোদ করবার দরকারই বা কি—তা ছাড়া ও আবার আমার ক্লাসফ্রেণ্ড কিনা—

—সুবোধ কে? সদানন্দবাবু সবিনয়ে জিগ্যেস করলেন।

—ওই যে এস. এন. দে আপনাদের, আই. সি. এস. ও আবার এখন ইন-চার্জ হয়েছে কি না, বললে—কী বিনোদ, কী দরকার বল, বললাম—খুব বড় হয়ে গেছিস তুই, এ আমার পার্সনাল কাজ নয়, সমস্ত চেতলার আধিবাসীদের তরফ থেকে কথা বলতে এসেছি—অত খাতির না করলেও চলবে—

বিনোদবাবু থামলেন, তুজনে একই দিকে চলছেন।

সদানন্দবাবুর কাছ থেকে কোনও সপ্রশংস কৃতজ্ঞতার আভাস না পেলেও আরম্ভ করলেন—হেরম্ব ডাক্তার বলেছিল—ও বড্ড কড়া অফিসার, ও কিছুই করবে না—আমিও বলেছিলাম আমি করিয়ে তবে ছাড়বো। কেন করবে না মশাই? আমাদের ডিম্যাণ্ডস কিছু আনডিউ, বলুন?

সদানন্দবাবু আগাগোড়া বিষয়বস্তু কিছুই বুঝতে পারেন নি।

বললেন—ব্যাপারটা কি?

—এই কাঠের পুলটা নিয়ে মশাই, আমি সোজাসুজি বলে দিলুম তুই বড়লোক হয়েছিস, মটর চড়ে বেড়াস, তোর কী? আমরা পায়ে হেঁটে চলি, মিলিটারী লরী যাবার জন্যে যখন পুল তৈরী হবেই তখন মানুষ যদি যাতায়াত করে তাতে ক্ষতি কি! সে-ও করবে না, আমিও ছাড়বো না, আমার তো জেদ জানেন, শেষ পর্যন্ত অর্ডার করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়লুম—

সদানন্দবাবু বললেন—আমাদের খুব উপকার হয়েছে যা হোক—

বিনোদবাবু বললেন—চেতলার উপকার করতে নেই মশাই তা-ও আমি বলবো, চেতলার লোক অকৃতজ্ঞ—এই চেতলার ইস্কুলের কথাই ধরুন না, সেবার জয়বাবু .....

কথা বলতে বলতে তুজনেই এপারে চলে এসেছিলেন। হঠাৎ ওধার থেকে কারা যেন বিনোদবাবুকে ডাকলে—বিনোদ-দা আজ খেলার রেজাল্ট কী?

বিনোদবাবু বোধ হয় ফুটবল খেলা দেখেই ফিরছিলেন। আড্ডার গন্ধ পেয়ে সেই দিকেই চলে গেলেন। দূর থেকে সদানন্দবাবু গলা শুনতে পেলেন বিনোদবাবুর—

—ওকে তো এই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, ও আবার খেলবে কি, গোলের সামনে বল নিয়ে,ঘাবড়ে যায়। ওকে তো খেলা আমিই শেখালুম। আজ খুব ধমকে দিয়েছি। বললে—বিনোদদা গায়ে জ্বর নিয়ে খেলেছি আমার কি দোষ, আমি তো খেলতেই চাইনি—

সদানন্দবাবু সোজা চলে এলেন মেসে। সবজীবাগানের গলির মোড়ে মেস। দরজা নাড়তেই ঠাকুর দরজা খুলে দিলে।

অতুলবাবুর ঘরে তখনও আড্ডা চলছিল।

—একি ফিরে এলেন যে? ঘরের এক কোণে অতুলবাবু গড়গড়া টানছিলেন।

—চাবিটা ফেলে গেছি এখানে অতুলবাবু?—হতবুদ্ধির মত ঘরে ঢুকলেন সদানন্দবাবু।

গড়া গড়া বিছানা পাতা। এই ঘরটিতেই মোট সাতখানা বিছানা। বিছানার পাশে পাশে আবার প্রত্যেকের স্যুটকেস, অন্যান্য জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখা। যে-যার বিছানার ওপর বসে বসে গল্প করছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে, যেন এতক্ষণ কোনও একটা বিষয়ে ভীষণ আলোচনা চলছিল। সদানন্দবাবুর উপস্থিতিতে সব মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল।

অতুলবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

বললেন—দরজাটা বন্ধ করে দিন মাস্টার মশাই, নইলে এক্ষুনি আলো বেরুবে—আর সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে—

দরজা বন্ধ করে অতুলবাবুর বিছানাতেই গিয়ে বসলেন সদানন্দবাবু।

অতুলবাবু বললেন—আচ্ছা ভুলো লোক মশাই আপনি, এবার না হয় চাবি আমি পেলুম, এ-রকম করে কত ছাতা, কত মনিব্যাগ, কত কী হারিয়েছেন এ-পর্যন্ত বলুন তো?

—পেয়েছেন তা হলে?······শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল সদানন্দবাবুর।—আমি তো সারা পৃথিবী তোলপাড় করে এলুম। ভাবনা চুকলো অতুলবাবু—স্বস্তির একটি নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

চাবির গোছা সদানন্দবাবুর হাতে দিয়ে অতুলবাবু বললেন—এই তো সবে আজ ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিলেন বিদেশে, এখন কতদিন এমনি কাটাতে হবে কে জানে, হয়ত ছমাস, হয়ত্ বা এক বছর, এযুদ্ধ না মিটলে তো আর নিয়ে আসতে পারছেন না—এখন কত রকম বিপদ আসছে, হয়ত জাপানীরাই এসে পড়ল কলকাতায়, তখন তা হলে কাটাবেন কি করে?

পুব-পশ্চিম কোণের বিছানা থেকে আধ-শোয়া অবস্থায় ভূপতিবাবু বললেন—আমার তো এই চল্লিশ বছর তিন মাস মেস-বাস চলছে—নাইনটিন টু-র মার্চে এসেছিলাম এখানে—

—তখন কত করে মেসিং চার্জ পড়তো ভূপতিদা?—

মাঝের বিছানা থেকে এক ছোকরা প্রশ্ন করলে। হাতে একটা মাসিক পত্রিকা। ঘরের আলোচনায় ঠিক যে সে যোগ দিচ্ছে তা নয়। বইএর পাতার ওপরেই তার নজর।

পুব-পশ্চিম কোণ থেকে ভূপতিদা বললেন—সব নিয়ে পড়তো পাঁচ টাকা, কোন মাসে সাড়ে পাঁচ, তারই মধ্যে আবার ভালো ভালো পোনা মাছ, খাওয়ার শেষে খাঁটি দুধ একবাটি, হপ্তায় আবার একদিন করে মাংস—পূর্ণিমে একাদশীতে লুচি—

—অনেক দিন মাংস খাওয়া হয়নি ম্যানেজারবাবু—ও কোণ থেকে শ্রীপতি বললে। শ্রীপতি নতুন কেরানী।

ভূপতিবাবু বললেন—তা বটে, মাংসর কত করে দর কে জানে—সেদিন অফিস থেকে আসবার সময় দোকান থেকে মাংস রান্নার গন্ধ পেলুম—আঃ কি চমৎকার যে গন্ধ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে শুঁকলুম·· যা দর—

—মাংস রাঁধতো আমাদের দশরথ ঠাকুর। বেটার দোষ ছিল একটু চুরি করতো কিন্তু রান্না ছিল একেবারে······আজকের ঝোলটা একেবারে মাটি করে ফেলেছে ঠাকুর, কী যে রাঁধে। সেদিন কুমড়োর ডালনাতে নুনই দেয়নি বেটা—

আধ-শোয়া থেকে একেবারে চিত হয়ে পড়লেন ভূপতিবাবু। বোধ হয় হতাশায়। বললেন—যুদ্ধ না থামলে জিনিসের দামও কমছে না, আর খেয়েও সুখ নেই ভাই। সেই নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে যেবারে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স এল কলকাতায়, সেইবারে রাস্তায় এক মেড়োর দোকান থেকে খাজা কিনে খেয়েছিলুম—আঃ সে যেন এখনও মুখে লেগে আছে আমার······তারপর কতবার সেই দোকান থেকেই কিনে খেলুম সে-রকম আর লাগলো না—

—ভূপতিদা তোমার সেই ফর্দটা বের কর তো—ভূপতিদার একটা ফর্দ করা আছে জানেন মাস্টার মশাই—কি কি খেতে ভালবাসেন, আর যুদ্ধ মিটে গেলে দাম কমলে কি কি উনি খাবেন—বার কর না ভূপত্দা—উপন্যাস রেখে দিয়ে শশধর পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

বাইরে সব নিঝুম হয়ে আসছে। মেসের ঝি কলতলায় বাসন মাজা শুরু করে দিয়েছে। তার শব্দ আসছে। হঠাৎ কালীঘাট স্টেশনে ট্রেনের হুইশল্ বেজে উঠলো। সদানন্দবাবুর মনে পড়লো—অনেক দূরে সুরুচিরা

এতক্ষণ ট্রেনে করে চলেছে। হয়ত বসবার জায়গা পায়নি। শিরদাঁড়া সোজা করে চলেছে। কথাটা মনে পড়তেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি।

—একি উঠছেন নাকি ?—অতুলবাবু প্রশ্ন করলেন।

সদানন্দবাবু বিদায় নিয়ে চলে এলেন। হঠাৎ তাঁর যেন মনে হলো, কী যত বাজে কাজে সময় কাটছে তাঁর। কিন্তু করবারই বা আছে কি তাঁর! সুরুচিরা চলে যাবার পর মুহূর্ত থেকে যেন নিজেকে অকর্মণ্য মনে হচ্ছে। যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে মন। হাওড়া স্টেশন থেকে এসে একবার পান্নালালের বাড়ি, একবার মেস, একবার বাড়ি—এ শুধু তাঁর অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ। মনে হলো—আজ বাড়ি গিয়ে নতুন বইটা লিখবেন তিনি। বইখানার নাম 'ভারতের আদিম জাতি'। প্রাক্-ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার কথা। সিন্ধুর মহেঞ্জোদড়ো আর পাঞ্জাবের হরপ্পার মৃত্তিকাগর্ভ থেকে বেরিয়েছে প্রত্নতত্ত্বের প্রাচীনতম নিদর্শন। সার জর্জ মার্শেলের অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা। সেই সিন্ধু-সভ্যতা লৌহযুগ আর বৈদিক যুগের অনেক আগে যীশুখৃস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেকার সৃষ্টি। বেলুচিস্থান অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল দ্রাবিড় জাতি—যাদের বৈদিক-সাহিত্যে 'দাস' বা 'দস্যু' আখ্যা দেওয়া হয়েছে······

হঠাৎ চলতে চলতে সদানন্দবাবু বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

—কে ? কে ওখানে ?

মনে হলো তাঁরই বাড়ির সামনে কে যেন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল, তাঁকে দেখেই স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

—কে ? কে ওখানে ?

সদানন্দবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

আগন্তুক এগিয়ে এল। মুখময় দাড়ি-গোঁফের সমারোহ। ব্ল্যাক-আউটের রাতে ভালো করে নজর পড়ে না।

সদানন্দবাবু বললেন—কে আপনি ? কি চান ?

হঠাৎ আগন্তুক সদানন্দবাবুর পিঠে হাত দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললে—আমি গৌরদাস।

সমস্ত স্নায়ুর রক্তপ্রবাহ যেন হঠাৎ তুষারস্পর্শে জমাট বেঁধে কঠিন বরফে পরিণত হয়ে গেল। গৌরদাস! এই তো সেদিন তার নিরুদ্দেশ হবার

খবর পেয়েছিলেন তিনি। সুভাষ বোসের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর থেকে দলের সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করে ফেলেছে ; গৌরদাসের গ্রেপ্তারের জন্যে কত দিন ধরে পুলিস চেষ্টা করছিল।

গৌরদাস বললে—ভেতরে চল, সব বলছি –

সদানন্দবাবু কম্পিত হাতে চাবি খুললেন সদর দরজার। দরজা খুলতেই গৌরদাস ক্ষিপ্রপদে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। আলো জ্বালতেই গৌরদাস বললে—সদানন্দ, একটা রাত আমাকে থাকতে দাও তোমার বাড়িতে, আমার পেছনে পুলিস লেগেছে --

তক্তপোশের ওপর বসে পড়েছেন সদানন্দবাবু। বিস্ময় তাঁর তখনও কাটেনি। তিরিশ বছর আগেকার সেই স্বদেশ-সেবকের মূর্তিটা ভেসে উঠলো তাঁর চোখের সামনে। গৌরদাস হত স্কুলে ফার্স্ট, আর তিনি সেকেণ্ড। তারপর সরকারি চাকরী একদিনে ছেড়ে দিয়েছেন দুজনে। তারপর জেল থেকে ফিরে কোন্ ভাগ্যসূত্রে জড়িয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেললেন তিনি—আর গৌরদাস ?

গৌরদাসের আপাদমস্তক ভালো করে দেখলেন তিনি। আত্মঅনুশোচনায় একটু ম্রিয়মান হয়ে গেলেন, কিন্তু বন্ধুগর্বে বুকটা ফুলে উঠলো।

বললেন—একটা রাত কেন, যতদিন ইচ্ছে থাকো না গৌরদাস, কেউ নেই বাড়িতে এখন—

গৌরদাস একটু নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেললে।

শেষ রাত্রের দিকে রাঁচি প্যাসেঞ্জার টাটানগরে পৌছুলো।

অত বড় স্টেশন, কিন্তু নিঝুম নিস্তব্ধ। একটা আলো নেই। প্রথমে বোঝা যায়নি। গাড়ির মধ্যে অতগুলো মানুষ কিন্তু সবাই সারারাত জেগেই কাটিয়ে দিলে। প্রথমে যে-কলহের সূত্রপাত হয়েছিল, তার অবসান হয়েছে বটে। ব্যক্তিগত বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ এখন শান্ত হয়েছে। রাত্রি জাগরণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় সবাই পরিশ্রান্ত—সামান্য কারণ নিয়ে অভিযোগ করবার ক্ষমতাটুকুও যেন লোপ পেয়েছে।

—কটা বাজলো গা ?

—ঘড়ি আর কার কাছেই বা থাকবে, রাত তিনটে হবে হয়ত—

—এইবার টাটানগর। আপনারা তো টাটানগরে নামবেন ?

—ও বৌমা, ওরা টাটানগরে নেমে যাবেন, তুমি ওখেনে বিছানাটা পেতে ফেলে খোকাকে টপ্ করে শুইয়ে দিও—

গিরিবালার কোলের ওপর মাথা কাত করে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুরুচি। মৃন্ময়ী একতিল ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর শরীরও ভাল নয়। এই ভীড়, এই ট্রেনের ঝাঁকুনি, এই দুশ্চিন্তা—এসব কোনওদিন তাঁর সহ্য হয় না। ঘুম-জড়িত চোখে মৃন্ময়ী বললেন—কোথায় এল ?

গিরিবালা বললেন—টাটানগর। এইবার নামতে হবে—

মৃন্ময়ী শশব্যস্তে সোজা হয়ে উঠে বসেছেন। এখনি নামতে হবে। তেত্রিশটা মালের হিসেব করতে হবে।

গিরিবালা বললেন—তুমি ব্যস্ত হয়ো না বউ—আমি দেখছি, ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ থামবে—

তারপর সুরুচিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। বললেন—ও রুচি, ওঠ্ মা—এসে গেছি—ওঠ্—

এখানেও ভীষণ ভীড়। এই টাটানগরেও আছে বিরাট বিরাট কারখানা। গাড়ি থামতে না থামতেই ছেঁকে ধরেছে লোক। তারা পালাবে টাটানগর ছেড়ে অনেক দূরে।

কুলি এল। তেত্রিশটা মোট গুণে নামালে। গিরিবালা, সুরুচি, মৃন্ময়ী সকলকে নিয়ে নামলেন। নিচু প্লাটফরম। কাঁকর বিছানো। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে।

গিরিবালা বললেন—সামনেই ওই যে বারান্দা ওর নিচে দাঁড়াগে যা—

সুরুচি আর মৃন্ময়ী, পাঁচ সাত হাত দূরে এক সার ঘরের সামনে সরু বারান্দা, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুরুচি চেয়ে দেখলে—সেখানে অনেক লোক শুয়ে আছে সারি দিয়ে। একেবারে প্রথম ঘরটাই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম। ওয়েটিং রুমের সামনেই শুয়ে আছে একটা চাপরাশী।

কুলি মোট নিয়ে কাছে আসতেই বারান্দায় সেগুলো নামিয়ে নিলেন। কিন্তু গোল বাধলো পয়সা নিয়ে। এই পাঁচ সাত হাত রাস্তা একজন কুলি বার চারেক আসা যাওয়া করেছে। চেয়ে বসলো এক টাকা। গিরিবালা বললেন—আট আনার এক পয়সা বেশি দেব না—

সুরুচি বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। সামনের অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য সিগন্যালের আলো জ্বলছে। লাল নীল কত রং। ও-গুলোর কোনও অর্থ বোঝা যায় না। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে থেকে কয়েক মাইল চলবার পর হঠাৎ ওই রকম একটা সিগন্যাল নজরে পড়ে। তারপরই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা দুলে ওঠে আর খানিক পরেই একটা স্টেশনের মুখ দেখা যায়। ছোট ছোট এমন কত স্টেশন পার হয়ে ঠিক কোন্ জায়গাটায় কোন্ সিগন্যালের কোন্ সংকেতে থামতে হবে তার হয়ত নিয়ম আছে। সাঙ্কেতিক আলোর নির্দেশ মেনে চললেই নিরাপদ। নইলে, বিপদের নাকি অন্ত থাকে না। বহুদিন আগে স্কুলের সব মেয়েরা মিলে একবার পুরী গিয়েছিল। সেদিন এই ট্রেনে চড়ে যাওয়ার আনন্দ যেন আরো দশগুণ বেশী ছিল। তখনই লক্ষ্য করেছিল সুরুচি-স্টেশনের ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের একটা সিগন্যাল মাথা নিচু করে আর তারপরেই ট্রেন চলতে থাকে। সামান্য ওই সিগন্যাল-গুলোকে অমান্য করে এমন ক্ষমতা নেই ওই দৈত্যের মত ইঞ্জিনগুলোর।

কয়েকটা ইঞ্জিন স্টেশনের ইয়ার্ডের মধ্যে আসা যাওয়া করছে। অত রাত্রেও কামাই নেই কাজের। অন্ধকারে এক একটা ছোট বাতি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে লোকজন। মাঝে মাঝে সিগন্যালের আলোগুলোর রং বদলাচ্ছে। যেন রূপকথার রাজ্য। সুরুচির নিজের অস্তিত্ব এই পটভূমিকায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হোল। সত্যিকারের জীবন মানেই হয়ত এই। এই বিরাট ব্যস্ত পৃথিবীতে তার প্রয়োজন কতটুকু। অথচ তার জন্যে কি অশান্তিই না সৃষ্টি হয়েছে বাড়িতে। যদি বাঁচতে হয়, যদি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হয়, তবে এমনি সংগ্রাম এমনি দিবারাত্রব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম তাকে করতে হবে। কলকাতার সেই গলির সেই কলেজের শান্ত জীবনের সঙ্গে যেন এর কোনও যোগাযোগই নেই।

সুরুচির মনটা কঠিন হয়ে এল। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সব মোহ তাকে ত্যাগ করতে হবে। ভুলতে হবে অতীতকে। অতীতের ভগ্নস্তূপের ওপর প্রাসাদ তুলতে হবে ভবিষ্যতের। নতুন করে ভবিষ্য পৃথিবী জন্ম নেবে তার অভ্যন্তরে। এবার আর সে ভুল করবে না। এবার আর পদস্খলন হবে না। এবার সাবধান সতর্ক পায়ে চলবে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে।

পাশে চেয়ে দেখলে পিসীমা বেশ গুছিয়ে বসেছেন। পিসীমার ডাকে স্নুরুচির চমক ভাঙলো।

—ও রুচি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয় এখানে—

স্টেশনে শেড্‌এর নিচে এরই মধ্যে পিসীমা বিছানা পেতে ফেলেছেন। যুত করে একপাশে শোবার বন্দোবস্তও হয়ে গেছে। মালপত্রগুলো এক পাশে আড়ালে সাজিয়ে রেখেছেন গিরিবালা।

—গোপাল, বাবা এক গ্লাস জল আমাদের দিতে পারো?—গিরিবালা বললেন।

স্নুরুচি দেখলে এতক্ষণ দরজার সামনে যে-লোকটি বসেছিল সে উঠলো। উঠে ওয়েটিং রুমের ভেতরে গেল। গিয়ে কুঁজো থেকে একটা ঘটিতে জল গড়িয়ে নিয়ে এসে দিলে।

গোপাল বললে—বস্থন না দিদিমণি—

বলে কম্বলটাকে ভাল করে ছড়িয়ে পেতে দিলে। লোকটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে স্নুরুচি। বোধ হয় ওয়েটিং রুমের ভেতর যিনি আছেন তাঁরই চাকর হবে। বহুদিনের বিশ্বস্ত চাকর। চেহারাতে একটা তেল চক্‌চকে চাকচিক্য! স্নুরুচি বসল। শীতের কনকনে হাওয়া আসছে। তবু এমনি করে এখানে বসে রাত্রিটা কাটাতে হবে।

পিসীমা বললেন—শুয়ে পড়্ এখানে—

মৃন্ময়ী কিছু বলছিলেন না। যেন এই অপরিচিত আবেষ্টনীতে আড়ষ্ট হয়ে আছেন তিনি। কোথায় রইল তাঁর সংসার। চেতলার সেই অপরিসর গলির ছোট সংসার। সদানন্দবাবুকে তাঁর বিশ্বাস হয় না। বাড়ি খালি করা হয়েছে। তাঁর এক ছাত্রের বাড়িতে জিনিসপত্র তুলে দিয়ে এসেছেন। ভেঙে চুরে সব একশা হয়ে যাবে। আর ওই মানুষটি! চারিদিকে কেউ নেই ওঁকে দেখবার। কে তাঁর যত্ন নেবে! মেসের খাওয়া তাঁর সহ্য কি করে হবে কে জানে! আর তা ছাড়া বিদেশে তিনজনের খরচই কি কম? কোত্থেকে এসব খরচ আসবে!

স্নুরুচি দুজনের মধ্যে শুয়েছিল। গিরিবালা স্নুরুচির গায়ে ভাল করে আর একখানা চাদর চাপা দিলেন। মেয়েকে যদি বাঁচাতে হয় তবে এ-সময়ে তার শরীরের যত্ন নেওয়া দরকার। শরীর এ-সময় সুস্থ রাখতে হবে। তার ভাবী

সন্তানের জন্যে নয়—কিন্তু প্রসূতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে! শরীরের সমস্ত রক্ত তখন হিম হয়ে আসে। গিরিবালার সে-মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে। রক্তে ভেসে যায় বিছানা। রক্তের সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত ওঠে জীবনের পাত্রে, তা পান করবার সৌভাগ্য কজনের ভাগ্যে ঘটে। তা ছাড়া সুধাই কি সব ক্ষেত্রে ওঠে? বিষও ওঠে বই কি! সুরুচির জীবনের সুধার পাত্রে শুধু বিষই তো উঠবে! সেই বিষের ফেনায় সুরুচি যদি নীলকণ্ঠের মত নিজেকে অমর করে রাখতে পারে তবেই তো সে বিজয়িনী! নইলে সমস্ত মিথ্যে!

শুয়ে শুয়ে তবু সুরুচির ঘুম আসে না। সমস্ত প্লাটফরমময় এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কোথায় কোন্ বইতে পড়েছিল– এই পৃথিবী যেন একটা রেলের ইস্টিশান। গাড়ি আসে আর গাড়ি যায়—যাত্রীরা নামে ওঠে—সমস্ত একটা ধরা বাঁধা নিয়মের সূত্রে বাঁধা। এই অপরিচিতের রাজ্যে রেলের যাত্রীদের মতই সবাই যেন অপরিচিত। কারোর সঙ্গে কারোর হৃদ্যতা নেই—যোগাযোগ নেই—বন্ধন নেই। অথচ দুঘণ্টার পরিচিত একটি রেলের কামরার অভ্যন্তরে সবাই একই ইঞ্জিনের আকর্ষণে আকৃষ্ট! কথাটা ভাবলে সমস্ত মিথ্যে মনে হয়। সুরুচির মনে হয় রাজনীতি, সমাজনীতি, আর ব্যবহারনীতির গুরুত্বও সেই এক অমোঘনীতির কাছে কত ছোট।

প্রিন্সের কথা মনে পড়লো। প্রিন্স কোনও কিছু মানতো না। রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, প্রগতিবাদী কোনও শ্রেণীকেই সে স্বীকার করতো না। সে জানতো শুধু বর্তমান। প্রতি মূহূর্তের নিশ্বাস পতনের ছন্দকে সে বিশ্বাস করতো, স্তব করতো। তাই সেদিন সুরুচি প্রিন্সকে ভয়ে এড়িয়ে এসেছিল। ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল তাকে। প্রিন্সের চরিত্রের মধ্যে সে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে সর্বনাশ যে কোথা দিয়ে কেমন করে কখন আসে বোঝা যায় না। একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শেখরদা তাকে ···কিন্তু এই অন্ধকারে অস্বস্তিকর পটভূমিকায় শেখরের কথা মনে হতেই সুরুচির মনে হোল তার বিরুদ্ধে যেন কোনদিন এতটুকু অভিযোগ না ওঠে তার মনে! এ যেন ঠিক যুক্তি দিয়ে বোঝান যায় না। পৃথিবীর আদিম ও অন্তিম রহস্যের মত এ যেন অনন্ত। যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝতে যাওয়া বাতুলতা। কিন্তু তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সর্বনাশ হয়েছে। কোথায় সেই ছাত্রীজীবনের অতীত স্বপ্ন! আর ভবিষ্যতের দিকে চাইলেই

নজরে পড়ে কলঙ্ক-সঙ্কুল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বিস্তার। সেখানে নিঃসহায় সিন্ধু শকুনের মত নিরুদ্দেশ-যাত্রা!

গভীর রাত্রির বিনিদ্র পরিবেশে বোধ হয় কোনও যাদু আছে। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো তার।

কলেজ-জীবনের সেই লঘুপক্ষ দিন! দোতলা বাসের নিচের সীটে বসে কলেজে যাওয়া। সেই নিজের মনে বই পড়বার ভান করা কিন্তু চকিতে সমস্ত পরিবেশটিকে লক্ষ্য করে নেওয়া। সেই প্রীতির সঙ্গে সিনেমায় যাবার নাম করে মোটর নিয়ে যশোর রোড ধরে সীমাহীন যাত্রা—তারপর এক একদিন কলেজে প্রক্সির ব্যবস্থা করে ম্যাটিনির শো'তে সিনেমায় যাওয়া। ধর্মতলা স্ট্রীটে একদিন সুরুচি দেখেছিল এক অদ্ভুত দৃশ্য! একটি মহিলা রাস্তার ওপর কাপড় পেতেছে, তাতে একটি ছোট ছেলে অঘোরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। আর মহিলাটির মাথায় অনেকখানি লম্বা একটা ঘোমটা।

ওই দৃশ্য দেখে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল প্রীতি। বলেছিল—ওই ঘোমটার ভেতরেই খেম্‌টা নাচে ওরা—

আজ এতদিন পরে সেই দৃশ্যটা সুরুচির মনে পড়লো। হয়ত সত্যিই কোন দুঃস্থা! কিংবা হয়ত স্রেফ ব্যবসাদারি! লোকের দয়া মায়া মমতার ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে পয়সা কামানো! কিংবা হয়ত প্রীতি যা বলেছে তা-ই সত্যি! কিংবা হয়ত বিপদ আর কলঙ্কের বোঝা নিয়ে মহিলাটি নিরুপায় হয়ে পথে এসে বসেছে!

গম্ গম্ শব্দ করে ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে একটা মালগাড়ি চলে গেল। সেই ট্রেন চলার শব্দে থর্ থর্ করে স্টেশনের প্লাটফরম, নিচের মাটি কেঁপে উঠলো। সবাই ঘুমোচ্ছে। এই সুযোগে যদি সুরুচি সকলের অজ্ঞাতে ট্রেনের চাকার নিচে মাথা পেতে দেয়। অন্ধকার ইয়ার্ডের বুকে অসংখ্য পাঁজরার মত লাইন পাতা। তারই একটাতে ট্রেন আসবার আগেই যদি সে শুয়ে পড়ে! ভয়ে সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠলো সুরুচির! চাদরটাকে গায়ে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলে সুরুচি। বড় নিঃসহায় মনে হয় কথাটা ভাবলেই। বড় দুর্বল মনে হয় নিজেকে। চারিদিকে ভারি স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। এত শিগগীর শেষ হয়ে যাবে ভাবলে কষ্ট হয়। এতদিন কত কল্পনা ছিল সুরুচির। শেখরদা আসবার আগে ভাবতো সে বিয়ে করবে একজন

আই সি এস-কে। চারিদিকে বাগান ঘেরা একটা কোয়ার্টার। আশেপাশের উকিল মুন্সেফ পেস্কারের বউরা আসবে তাকে খোসামোদ করতে। চাকরির উমেদারী নিয়ে আসবে সার্কেল অফিসারের বউ। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সবাই পাঠাবে বড়দিনের ভেট! সার্কাসওয়ালা কিংবা সিনেমাওয়ালারা বাড়িতে বক্সের পাশ পাঠিয়ে দেবে। স্বামীর মনোগ্রাম করা চিঠির কাগজে বন্ধুদের লিখবে চিঠি। সে-সব ছোটবেলাকার কল্পনা। একটু বড় হবার পর একবার খেয়াল হয়েছিল সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় নামবে। সে বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক তাকে দেখবে। তার রূপের তারিফ করবে। কিন্তু শেখরদা আসার পর থেকে তার কল্পনার মোড় অন্য দিকে ঘুরে গিয়েছিল। তার মনে হোত সে হবে বিপ্লবী! বাবার বিগত জীবনের স্বপ্ন, গৌরদাসবাবুর কাহিনী, শেখরদার বক্তৃতা, সব শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠতো। মনে হোত রিভলবার নিয়ে কোনও দুঃসাহসিক কাজ করে। কাউকে খুন করে দেশকে স্বাধীন করবে সে। বিয়ে সে করবে না। তাই তো সে সেবার বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে দিয়েছিল। বিয়ের ওপর তার অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে। বিয়ের পরই একরাশ ছেলেমেয়ের বন্যা, স্বাস্থ্য যাবে ভেঙে, রান্নাঘর আর কাঁথা সেলাই নিয়ে দিন যাপন! সে অগৌরবের জীবন তার নয়। সুরুচির মহিমময় জীবন সাধারণ কাজে কলঙ্কিত হবে না।

কিন্তু কোথায় সব কল্পনা ফানুসের মত মিলিয়ে গেল। এর চেয়ে সাধারণ হওয়া যে ছিল ভাল। সকলের বিড়ম্বনা সে করেছে। যুদ্ধ বেধেছে পৃথিবীতে। যুদ্ধ বেধেছে সুরুচির জীবনে।

এমন কোনও লোক নেই চক্রধরপুরে যে তাকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে উদ্ধার করবে! কোনও ডাক্তার, কোনও নার্স—কিংবা কোনও…… । টাকা দেবে, জীবন দেবে সে। আজীবন ক্রীতদাসী থাকবে তার কাছে যদি সে তার এই উপকারটুকু করে! কোনও অবৈধ উপায় নেই? কাগজে কত বিজ্ঞাপন সে দেখেছে। তখন যদি ঠিকানাগুলো সে লিখে রাখতো। চিঠি লিখে টাকা পাঠিয়ে দিলে তারা নিশ্চয় ওষুধ পাঠিয়ে দেবে। তারপর সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে। আবার স্বাধীন সে! কেউ জানবে না। কেউ লজ্জা দেবে না। কেউ করুণা করবে না। সে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে। মাথা উঁচু

করে সে পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবে, কথা বলবে, চিঠি লিখবে! দিনের আলোয় আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আত্ম-ঘোষণা করবে! আপন গর্বে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে একলা। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

কখন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে সুরুচি। হঠাৎ পিসীমার ডাকে ঘুম ভাঙলো—

—ও রুচি, ওঠ মা, ওঠ্—বৃষ্টি পড়ছে—

ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠলো সে। অল্প অল্প ভোর হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির ঝাপটা এসে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। গিরিবালা নিজেই জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। চারিদিকের ঘুমন্ত জগতে হঠাৎ যেন বিদ্রোহের ঢেউ এসে সকলকে জাগিয়ে তুলেছে। কুলি, যাত্রী, খালাসী সব সন্ত্রস্ত। অসময়ে বৃষ্টি এসে সবাইকে বিব্রত করে দিয়েছে। যে-যার পোঁটলা পুঁটলি রক্ষা করতে ব্যস্ত!

গোপাল আকাশের দিকে চেয়ে বললে—এ বিষ্টি ছাড়বে না পিসিমা, আপনারা ঘরের ভেতরে আসুন—

গিরিবালা ইতস্তত করতে লাগলেন। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকালেন। তিনজনে তিনজনের মুখের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে রইলেন।

গোপাল বললে—আপনাদের টিকিট আছে তো?

গিরিবালাই জবাব দিলেন। বললেন—তা তো আছে কিন্তু থার্ডক্লাশের—

—তাতে কিছু আসবে যাবে না,—বলে গোপাল নিজে হাতেই মালপত্র তুলে নিলে।

তারপর বললে—চলে আসুন ভেতরে, ওই শীতে মানুষে বাইরে থাকতে পারে—?

তারপর মালপত্র এক ক্ষেপ ভেতরে রেখে এসে বললে—বেশি গোলমাল করবেন না, বাবুর ওঠবার সময় হয়ে এল—

গিরিবালা বললেন—কাজ কি গোপাল, ভেতরে সায়েব-সুবো আছে, মেয়ে নিয়ে ভেতরে না-ই বা গেলাম—

গোপাল জিভ কেটে বললে—সায়েব সুবো কোথায়?—আমার বাবু একলা

আছেন,—এই চারটের সময়ই আমি ওঁর পা টিপতে বসবো—রাতের ঘুম ওঁর হয়ে গেছে—

সুরুচির কিন্তু ভেতরে যেতে অনিচ্ছা। নিজের অধিকারের বাইরে কেন যেতে যাবে সে? যারা বড়লোক, যারা দামী টিকিট কিনেছে, ভেতরে যাবার অধিকার তাদেরই। কিন্তু বৃষ্টির তেজ আবার বাড়লো। ছাট এসে লাগছে গায়ে।

গোপাল আবার বললে—এখানে দাঁড়িয়ে ভেজা কি ভাল দিদিমণি—ভেতরে চলুন, বাবু ওই কোণে শুয়ে আছেন, আমি আড়াল করে পর্দা টাঙিয়ে দেবখন, আপনারা এদিক পানে শোবেন খন—

মৃন্ময়ী শীতে কাঁপছিলেন। তাছাড়া সুরুচিরই কি এ সময়ে ঠাণ্ডা লাগান ভাল? এ সময়ে যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে সুরুচির প্রাণ নিয়ে টানাটানি হওয়াও বিচিত্র নয়!

গিরিবালা বললেন—আহা বলছে ও অত করে—ভেতরে গেলে দোষটা কী? এখানে সব ভিজে যাবে তাই ভাল হবে?

গোপাল আবার বললে—তা ছাড়া আমার বাবু তো এখনি চা খেয়ে বেড়াতে বেরোবেন—

সুরুচি বললে—তার চেয়ে বলে দাও গোপাল, এখানে থার্ড ক্লাশ ওয়েটিং রুমটা কোন দিকে?

গোপাল বললে—সেখানে যেতে গেলেই তো ভিজে একসা হয়ে যাবেন—

মৃন্ময়ী এতক্ষণে কথা বললেন—তুই কী জেদী মেয়ে মা রুচি—

সুরুচি বললে—তোমরা সবাই যাও না মা ভেতরে—আমি বারণ করেছি? আমি যাব না—

মৃন্ময়ী বললেন—তুই দিনকে দিন এমন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছিস কেন বলতো—

কিন্তু বৃষ্টি যেন তখন একটু কমেছে। গোপাল বললে—আমি তবে ভেতরে যাই পিসীমা, চারটে বোধ হয় বাজলো—বাবুর পা টেপবার সময় হোল—তারপর চা করবো, চা করার পর বৃষ্টি যদি কমে তখন বাবু বেড়াতে বেরোবেন—

গিরিবালা অবাক হলেন। বললেন—এই রাত্তিরে চা? তোমার বাবুর বুঝি বাতের ব্যামো আছে?

—বাত কেন হবে পিসীমা, বাবুকে দেখেননি আপনি—দেখলে কে বলবে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস—মা মারা যাবার পর থেকেই তো আমি আছি, এক দিনের তরে বাবুর শরীর খারাপ দেখিনি। পা টেপানো বাবুর বহু দিনের অব্যেস—এদানি চা ধরেছেন—একটু চা করবো আপনাদের জন্যে ?

গিরিবালা বললেন—চা খাবি নাকি রুচি ?

সুরুচি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—গোপাল তুমি বরং ভেতরে যাও—পা টিপতে দেরী হয়ে গেলে তোমার বাবু আবার তোমায় জরিমানা করে না বসেন—যে-রকম নবাবী মেজাজ তোমার বাবুর

গোপাল বললে—তা বলতে হবে না দিদিমণি, আমি না থাকলে সংসার কে দেখতো শুনি ? বউ নেই, ছেলে মেয়ে নেই, চুরি করতেও আমি আর রাখতেও আমি !—আমি একবার রাগ করে দেশে চলে গিয়েছিলাম। দুদিন না যেতেই বাবু চিঠি লিখলে—গোপাল আমি মর মর, তোর ওপর সব ভার দিয়ে যেতে চাই, চিঠি পেয়েই চলে আয়—

গিরিবালা বললেন,—তারপর ?

গোপাল বললে আমি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলাম, এসে দেখি, অসুখ টসুখ বাজে কথা, বাবুর কাছে যেতেই বাবু বললে—পা টেপ বেটা, পা না টিপে টিপে পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে—

সুরুচি এবার মুখ খুললে। বললে—বাবু জুতো মারলেও তোমার মিষ্টি লাগবে বোধ হয় ?

একগাল হাসি হাসলে গোপাল। বললে—ঠিক ধরেছেন দিদিমণি—বাবুকে কি আর ছাড়তে পারবো ? খাটুনি খুব এখেনে, দিন নেই রাত নেই খাটুনি, অন্য চাকরিতে খাটুনি কম তাও জানি—কিন্তু ছাড়তে পারবো না বাবুকে—

সুরুচি বললে—পয়সা এমনি জিনিস গোপাল, জুতোও মিষ্টি লাগে—

গোপাল হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভেতর থেকে কার গলার আওয়াজ এল—গোপাল—

—আজ্ঞে, যাই বাবু—বলে গোপাল অপরাধীর মত জিভ কাটলে। তবু ঘরের ভেতরে যাবার আগে বললে—চা করে পাঠিয়ে দেবখন দিদিমণি—

গিরিবালা ভাবছিলেন—কাল এতক্ষণ সবাই চক্রধরপুরে। কানাই-এর স্টেশনে এসে নামিয়ে নেবার কথা ছিল। বম্বে মেলে যাবার কথা—হয়ত স্টেশনে সে এসেছিল। তাদের না দেখতে পেয়ে ফিরে গেছে। আর কি স্টেশনে আসবে? কেমন করে জানবে কখন তাঁরা আসবেন।

কাল যখন দুপুরবেলা চক্রধরপুর স্টেশনে ট্রেন গিয়ে পৌছবে, তখন হয়ত কারো চেনা মুখ নজরে পড়বে না। উদগ্রীব হয়ে স্টেশনের দুপাশে চাইবেন কিন্তু কানাই-এর হয়ত দেখা পাওয়া যাবে না। তার অবশ্য কোন দোষ নেই। তা ছাড়া তার কোয়ার্টার কোথায় তাও তাঁদের জানা নেই। রেলের লোককে জিগ্যেস করে তবে তার ঠিকানা জোগাড় করতে হবে। তেত্রিশটা পোঁটলা নিয়ে কুলির মাথায় চাপিয়ে কানাইএর বাসায় গিয়ে ওঠা। তারপর কিছুদিন পরেই কানাই যাবে ওয়ালটেয়ারে বদলি হয়ে, তখন নিরাপদ নিরিবিলিতে নির্বিঘ্নে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। আসবার দিন কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছিলেন তিনি। আঁচলে এখনো তাঁর সেই প্রসাদী ফুল বাঁধা। আর একবার মনে মনে গিরিবালা অলক্ষ্যে প্রণাম করে নিলেন। হে মা সর্ব-মঙ্গলা, রক্ষে কোরো তুমি—অনেক বিপদ থেকে তুমি রক্ষে করেছ, এবার এই চরম বিপদে তোমার আশীর্বাদ চাই মা—

সত্যিই এতদিন সমস্ত আপদে বিপদে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তিনি অফুরন্ত পেয়ে এসেছেন। স্বামীর মৃত্যু ছেলেমেয়ের মৃত্যু—সমস্ত মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বার বার তাঁর এই কথাটিই কেবল মনে হয়েছে—মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই হয়ত তাঁর জীবনের চরম প্রশ্নের সমাধান মিলবে। তাঁর বিধাতা তাঁকে ওই পথ দিয়েই চরমতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাতে চান। এ-সংসারের সকলের চেয়ে সম্বলহীন তিনি, কিন্তু সকলকে অভয় দেওয়ার কাজটা তার মত নিঃসহায়ের কাঁধেই ন্যস্ত! মৃন্ময়ী এত বয়সেও তাঁর পরামর্শ না নিলে অচল হয়ে পড়েন। সদানন্দ একলা সেই কল-কাতা শহরের জনবিরল গলিতে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে কে জানে! কত লোক তাকে ঠকাবে, কত লোক সুযোগ পেয়ে তাকে শোষণ করবে—যুদ্ধের বিপর্যয়ে শহরে অরাজকতা চলবে—সেই অরাজকতার রাজত্বে সে একলা! আর সুরুচি? এ-ভুল কেমন করে কখন হোল তা যদি তিনি জানতেন! তাঁর পক্ষ থেকে বোধ হয় একটু গাফিলতি হয়েছে। তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ছাদের ছোট ঘরটিতে নিজের গীতা আর পরলোক নিয়ে।

ওয়েটিং রুমের ভেতর এবার হঠাৎ আলো জলে উঠল। এবং খানিক পরেই স্টোভ জালাবার তীব্র শব্দ কানে এল। বোঝা গেল গোপাল চা চড়িয়েছে।

হি হি করে শীতের হাওয়া হাড়ের ভেতর এসে বেঁধে। মৃন্ময়ী কাঁপছিলেন। চারদিকে মালপত্র ছড়িয়ে মাঝখানে তিনটি প্রাণী—বন্যার্ত দেশের উদ্ধারপ্রাপ্ত তিনটি জীব যেন। যুদ্ধের বিড়ম্বনায় নিজেদের শান্তির নীড় ছেড়ে এসেছে এরা। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না এরা একদিন সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে লক্ষ্মীর অর্চনা করেছে। উৎসব, পুজো, পার্বণ একদিন এদের জীবনকে জড়িয়ে বিরাজ করেছে। মৃন্ময়ীর মাথার ঘোমটা শিথিল হয়ে পড়েছে। জড়সড় হয়ে বসে আলগোছে হেলান দিয়েছেন ওয়েটিং রুমের দেয়ালে।

খানিক পরে ভেতরে কার গম্ভীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বোঝা যায় গোপালের মনিব এবার উঠেছেন বিছানা ছেড়ে।

বাইরে বৃষ্টির তেজ থেমে এসেছে। মেঘ পাতলা হয়ে এল। আকাশের পূর্ব দিকের কোণটা ফর্সা হচ্ছে। আর কত দেরী! আরও কত দেরী চক্রধরপুরে পৌঁছতে! ওই পশ্চিম দিকের ধূসর লাইন জোড়া যেদিকে চলে গেছে ওইদিকে তাদের ট্রেন যাবে। সুরুচি নিতান্ত অসহায়ের মত সেইদিকে চাইলে। আগে হলে সুরুচি এই অল্পান্ধকারেও ওদিকে বেড়াতে যেত—ঘুরে ফিরে প্লাটফরমের চারিদিকটা দেখে শুনে আসত! কিন্তু আজ যেন নিজেকে বড় ছোট মনে হোল। মনে হোল—মা, পিসীমা হয়ত তার মত লেখাপড়া শেখেনি, কলেজে যায়নি, তবু ওরাই যেন আর এক দিক থেকে তার চেয়ে অনেক বড়। একপাশে মা আর একপাশে পিসীমা—দুজনের সান্নিধ্য তাকে যেন পরম নিশ্চিন্তের আবেষ্টনীতে ঘিরে রেখেছে! যেন কোন বিপদের অক্টোপাশ তাকে গ্রাস করতে পারবে না।

গোপাল একেবারে তিন বাটি চা নিয়ে হাজির। বললে—ঘরে তো গেলেন না, তা চা খেতে আর আপত্তি করবেন না দিদিমণি—

সুরুচি বললে—ঘরটা যদি তোমার হোত গোপাল, তা হলে আপত্তি করতুম না—যে কারণে ঘরে ঢুকিনি সেই কারণে চা-টাও খাওয়া যায় না এটা বোঝ না কেন—

কথাটা গোপাল বোধ হয় বুঝতে পারলে। মুখটা একটু কালো হয়ে গেল। কিন্তু সামলে নিয়ে বললে—

কিন্তু গোপালের কথা বলা হোল না। হঠাৎ ভেতর থেকে জুতোর শব্দ করতে করতে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর দিকে তিনজনের চোখ পড়তে তিনজনেই চমকে উঠলেন। ছ'ফুট দীর্ঘ মানুষ। বলিষ্ঠ গম্ভীর চেহারা। প্রত্যেক পদক্ষেপে যেন পৃথিবী কেঁপে ওঠে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি সমস্ত দেহ ওভারকোটে মুড়ে ছড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

সুরুচির কেমন মনে হোল—যেন চেনা মুখ! কোথায় যেন দেখেছে ওঁকে।

সুরুচি বললে তোমার বাবুকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে গোপাল—কলকাতায় থাকেন নাকি?

গোপাল গর্বিত মুখে বললে—কলকাতায় যাতায়াত আছে, কিন্তু থাকেন হাজারিবাগে, হাজারিবাগে গেছেন দিদিমণি—? তা বাবুকে আমার একবার দেখলে ভোলা মুশকিল—

হাজারিবাগ! ছাঁৎ করে উঠল সুরুচির বুকটা। আর একজনের কাছে হাজারিবাগের কথা অনেক শুনেছে সুরুচি। তাকে চেনে নাকি গোপাল?

সুরুচি জিগ্যেস করলে—হাজারিবাগে তোমার বাবুরা কতদিন আছেন গোপাল?

গোপাল বললে—হাজারিবাগে বাবুদের তিনপুরুষের বাস—তা যুদ্ধের ঠিকেদারীতে বাবুকে সব জায়গায়ই ঘুরতে হয়। এই তো টাটানগরে এসেছিলেন, এখন আবার যাচ্ছেন কলকাতায়—লাখ লাখ টাকার কারবার, কিন্তু এদিকে চা যে আপনাদের ঠাণ্ডা হয়ে গেল দিদিমণি—

হঠাৎ সুরুচি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হাজারিবাগ সম্বন্ধে বহু কথা শুনেছে শেখরদার মুখে। নিজের সম্বন্ধে শেখরদা কোনদিন কিছু বলেনি। কিন্তু কথা শুনে মনে হোত যেন বহুদিন শেখরদা হাজারিবাগে কাটিয়েছে। হয়ত শেখরদা আবার হাজারিবাগেই ফিরে গেছে! ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমের ভদ্রলোকটিকে দেখে শেখরদার কথাই মনে পড়ে যায়। ভদ্রলোকের বলিষ্ঠ শরীরের পেছনে একটা বলিষ্ঠ মনের পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক নয়। শেখরদার মতই ও-চেহারা যেন আকর্ষণ করে কেবল। নিজের অজ্ঞাতে কখন সুরুচি চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে টের পায়নি।

খালি চায়ের কাপগুলো নিয়ে গোপাল বললে—বাবুর নাম বিলাসভূষণ চৌধুরী, কিন্তু চৌধুরী সাহেব বললেই সবাই চিনতে পারবে। ওদিকে গেলে যাবেন একবার দয়া করে—

গিরিবালা এতক্ষণ কথা শুনছিলেন। বললেন—তোমার মনিবটি ভাল পেয়েছ গোপাল—

—ভালোটি আর কী দেখলেন পিসীমা—গোপাল বললে—এক মিনিট বাইরে থেকে কী আর বুঝতে পারবেন। আমার বাবুকে আমার মতন তো আর কেউ চিনবে না। একবার তবে কি হয়েছিল শুনুন—একবার এক সায়েব এসেছে সদরে, অমন কতো সায়েবস্থবো আসে।. শিকার করে, মদ খায়, ছুচার দিন থাকে আবার চলেও যায়। অতিথিদের থাকবার ব্যবস্থাও আছে সেই রকম। সায়েব এসেছে শিকারে যাবে বলে। খানশামা, বাবুর্চির ব্যবস্থা আছে। তারা দিনরাত সায়েবের স্থখ স্থবিধে দেখছে। একদিন রাত্তিরে হোল কি, সায়েব মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে মারলে গোবিন্দর পেটে এক লাথি—লাথি খেয়ে গোবিন্দর মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। বাবুর কাছে খবর গেল। সেদিন বাবুর একাদশী। সারাদিন না-খাওয়া না-দাওয়া—খবর শুনেই বাবু দৌড়ে এলেন—

গিরিবালা বললেন—তোমার বাবু আবার একাদশীও করেন নাকি গোপাল?

গোপাল বললে—সে বাবুর বহুদিনের অব্যেস্। বাবু বলেন—রোজই তো খাই, এক দিন না হয় না-খেলুম। বাবুর নিয়ম আছে একাদশীর দিন বাবু নিজে খাবেন না, কিন্তু সেইদিন যত গরীব, ভিখিরীদের পেটপুরে খাওয়াবেন—বাবুর গিন্নী যতদিন বেঁচেছিলেন. বরাবর ওই জিনিসটে করতেন, তিনি মারা যাবার পর থেকে বাবু তাঁর কাজটা নিজে নিয়েছেন—

—তারপর কী হোল গোপাল?—জিগ্যেস করলেন গিরিবালা।

গোপাল বললে—শেষকালে সায়েবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, বেশ হোমরা-চোমরা সায়েব তিনি, কিন্তু বাবুর সেদিন সেই মূর্তি দেখে আমাদেরও ভয় হোয়ে গেল। অপমান করে ইংরিজীতে কী সব বললেন, আমরা কি বুঝি? মনে হোল—খুব গালাগাল দিচ্ছেন যাচ্ছেতাই করে—শেষে বিশ্বেস করবেন না পিসীমা, সেই লালমুখো সায়েব গোবিন্দর পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইল, পাঁচটি

হাজার টাকা গুণে দিয়ে তবে ছাড়ান্! তারপরে এমনি বাবুর প্রতাপ, শুনি নাকি সে-সায়েব দেশ ছেড়ে চাকরি ছেড়ে বিলেত চলে গেছে—

তারপর খানিক চুপ করে থেকে গোপাল জিগ্যেস করলে—চা কেমন খেলেন দিদিমণি ?

সুরুচি কোন উত্তর দিলে না। গিরিবালা বললেন—খুব ভাল হয়েছে !

গোপাল বললে—আপনি তো ভাল বললেন, আর বাবুকে যদি জিগ্যেস করতুম, বাবু বলতেন—কিছছু হয়নি, বাজে চা হয়েছে – অথচ যদি বলি আমার ও-কাজ নয়, আমি ও-সব রান্নার কাজ পারবো না, তা হলেই চিত্তির। তার পরদিন থেকেই আমার সঙ্গে কথা বন্ধ, বলেন—তুই এখনি দূর হয়ে যা – বেরো —তোর মুখ দেখতে চাই নে –

গিরিবালা বললেন—তা তোমাকে কি রান্নার কাজও করতে হয় নাকি ?

—তবে আর মজাটা হোল কি পিসীমা – গোপাল বললে—আমার হাতের রান্না না হলে কি বাবু খাবেন নাকি ? অথচ কেমন হয়েছে জিগ্যেস করলেই বাবু বলবেন—বাজে ! তা রান্না করতেও এই গোপাল, আর জুতোর ফিতে বেঁধে দিতেও এই গোপাল—তা থাক্ না চোদ্দটা চাকর কুড়িটে ঠাকুর।

গিরিবালা বললেন—তা মাইনে তো পাও বললে দশ টাকা।

—দশ টাকা তো দেখছেন, কিন্তু একশো টাকা নিলেই বা কে কী বলছে— বাবুর টাকা তো আমার কাছেই থাকে, সংসার খরচের পুরো টাকা তো আমার হাতে, নিলে কে আর জানছে বলুন—একবার বিশ্বনাথের কি হোল শুনবেন ?

তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে উঠে বললে—দাঁড়ান, বাবু আবার এখনি ফিরবেন, চান করবার জলের জোগাড় করে রেখে আসি, স্টোভটা জ্বালিয়ে এক কেট্‌লি গরম জল করলেই হয়ে যাবেখন—

গোপাল গরম জলের ব্যবস্থা করতে গেল।

গিরিবালা বললেন—আচ্ছা গল্পবাজ লোকটা জুটেছে যা হোক, যাক্ তবু সময়টা এক রকম করে কাটছে, এই ঠাণ্ডায় চা-ও তো করে দিলে তবু— তাই বা কে দেয় বউ ?

মৃন্ময়ী কথা বললেন না। শীতে আড়ষ্ট হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন।

গিরিবালা আবার জিগ্যেস করলেন—বউ কি ঘুমোলে নাকি ?

—না,—বললেন মৃন্ময়ী।

—শরীরটা ভাল আছে তো? গিরিবালা প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, চাদরের ভেতর থেকে উত্তর এল।

গিরিবালা স্নুরুচিকে ডাকলেন—কী ভাবছিস মা রুচি?

—কিছু না তো—স্নুরুচি বললে।

—ঘুম পাচ্ছে খুব বুঝতে পারছি, আর একটু কষ্ট হবে তোর, কী করবি বল, কপালে গেরো আছে কে খণ্ডাবে? চা খেয়ে একটু আরাম হোল, না রে?

স্নুরুচি কোন উত্তর দিলে না। তার কেবল মনে হতে লাগলো এই পৃথিবীর আর একটি জায়গার কথা! এখানে নয়, হয়ত কলকাতায়ও নয়! কিন্তু এই আকাশেরই তলায় এই রাত্রির অন্ধকারেরই আশ্রয়ে। সেখানে কি এমনি জিজ্ঞাসার চিহ্ন অনুচ্চারিত কান্নায় নতমুখ! কিন্তু তা ছাড়া আর কিই বা কল্পনা করা যায়! এক একবার মনে হয়—চুলোয় যাক সব। আস্নুক ঝড়—আস্নুক আঘাত—তবু মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে সে। স্পষ্ট ঘোষণা করবে সে নিজের দুর্বলতা, নিজের ফাঁকি, তাতে বোধ হয় শান্তি আছে। তাতে আর কিছু না থাক সত্য-নিষ্ঠা আছে, গৌরব আছে! যদি কোনও দিন এমন হয়—রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হয়ত শ্রীলতার সঙ্গে দেখা। শ্রীলতা হয়ত প্রশ্ন করবে—সঙ্গে এ কে রে? স্নুরুচি কি বলতে পারবে—এ আমার ছেলে! তারপর শ্রীলতা চেয়ে দেখবে স্নুরুচির সিঁথির দিকে। তখনকার সে কৌতূহল সে মেটাবে কেমন করে? তার চেয়ে ভাই বলে পরিচয় দেওয়া অতি সহজ। স্নুরুচির নিজের সন্তান স্নুরুচিকে দিদি বলে ডাকবে! একে একে দিন যাবে, মিথ্যায়, প্রবঞ্চনায় ভারি হবে স্মৃতি—আর স্নুরুচি চেয়ে থাকবে প্রতীক্ষায়। শবরীর প্রতীক্ষা! নিষ্ঠুর কর্তব্য সাধনের যান্ত্রিক আনন্দ শুধু—তার বেশী কিছু নয়। যা কখনও কল্পনা করেনি, স্বপ্নেও ভাবেনি, জীবনের সেই অসুস্থ বাঁ দিক!

গোপাল আবার এল। বললে—পিসিমা আপনাদের গরম জল করব? আপনাদের গাড়িও তো সেই দুপুর নাগাদ—যা শীত, ঠাণ্ডা জলে চান করবেন কেমন করে—

গিরিবালা বললেন—তোমাকে আর কী বলবো গোপাল, তুমি তো কতই কষ্ট করছ আমাদের জন্যে…

গোপাল গরম জলের ব্যবস্থা করতে আবার ভেতরে চলে গেল।

স্টেশনের প্লাটফরমে ধীরে ধীরে কর্মব্যস্ততা সুরু হয়েছে—ভোর হোল। দু একটা খালাসী পোর্টার এদিক ওদিক ঘোরাফেরা শুরু করেছে। দূরে টাটানগরের কারখানা থেকে সোঁ সোঁ আওয়াজ আসছে। স্টেশনের প্লাটফরমের ধারে দু একটা ঘেয়ো কুকুর লেজ গুটিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছে। চাঁদটা হেলে একেবারে কখন ডুবে গেছে আর দেখা যায় না। ভিজে স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। চারিদিকে ফর্সা আর নীল একটা আমেজ। প্লাট-ফরমের আলোগুলো একসঙ্গে দপ্ করে নিবে গেল। ওপাশে দেয়ালের গা ঘেঁষে একগাদা লাগেজ। তার ওপাশে আগাগোড়া চাদর কম্বল ঢাকা কয়েকটা মূর্তি নড়ে চড়ে উঠে বসলো।

গিরিবালা ভাবছিলেন—আর বেশি দেরি নেই, হয়ে এল—

মৃন্ময়ী ভাবছিলেন—কোথায় এর শেষ কে জানে—

সুরুচি ভাবছিল—এই তো সবে যাত্রা শুরু··· এখনও অনেক অনেক দূর—

ভোরবেলা ঘুম ভাঙে সদানন্দবাবুর। রোদ উঠতে তখন অনেক দেরি। সকালবেলা সারা গায়ে চটাপট্ সরসের তেল চাপড়ালে শীত কোথায় পালাবে ঠিক আছে? ছোট একটি শিশিতে করে গায়ে মাখবার তেল রেখে দিয়ে গেছেন মৃন্ময়ী। সমস্ত গায়ে তেল মাখা শেষ করে বাইরে এসেই অবাক হয়ে গেছেন। সদর দরজায় কাল রাত্রে কি খিল বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন? দরজা যে হাট করে খোলা! গেছে সর্বস্ব চুরি হয়ে নিশ্চয়ই। সদর দরজায় খিল দিয়ে আশে পাশে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কোথাও কিছু নজরে পড়লো না। প্রায় সমস্ত জিনিসই পান্নালালদের বাড়ি সরিয়ে ফেলেছেন। শোবার খাটখানাই শুধু বাকি আছে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়লো। গৌরদাসের কথা এতক্ষণ মনে ছিল না।

গৌরদাসের শোবার ব্যবস্থা পাশের ঘরে হয়েছিল। সে ঘরের দরজাও খোলা!

সদানন্দবাবু ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন—গৌরদাস—ও গৌরদাস—

সাড়া পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। ঘরের ভেতরে ঢুকে আলোর সুইচটা টিপে আলো জ্বাললেন। বিছানা ফাঁকা। কোথায় গেল গৌরদাস।

কাল রাত্রে গৌরদাস ক্লান্ত ছিল—বেশি কথা হয়নি। সদানন্দবাবু ভেবে-ছিলেন যে ভোরে উঠে কথা হবে। কোথায় গেল। কম্বল সরিয়ে দেখলেন। গৌরদাসের দাড়িগোঁফমণ্ডিত বিরাট চেহারা নজরে না পড়বার কথা নয়। অবাক হয়ে গেলেন সদানন্দবাবু। তবে কি স্বপ্ন দেখেছিলেন নাকি ? কতদিন রাত্রে গৌরদাসকে স্বপ্নে তিনি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মনে পড়লো রাত্রের অন্ধকারে গৌরদাস ঠিক এসে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভেতরে নিয়ে এসে বসিয়েছিলেন তিনি। তারপর গৌরদাস এখানে কয়েকদিন থাকবেও বলেছিল।

গৌরদাস জিগ্যেস করেছিল—কালীঘাট রেলস্টেশন এখান থেকে কতদূর সদানন্দ ?

—কেন ?

গৌরদাস বলেছিল—ওখান থেকে ট্রেন ধরে বজবজে একবার···ওখানে একটা দল আছে—

তারপর অনেক কথা হয়েছিল। এই যুদ্ধের মধ্যে কেমন করে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাবার। বে-অব্-বেঙ্গল থেকে শুরু করে বজবজের ঘাট পর্যন্ত ঘাঁটিতে ঘাটিতে লোক তৈরী আছে—আর খবর দেওয়া-নেওয়া চলছে বাইরের জগতের সঙ্গে। সমস্ত ভারতবর্ষময় কেমন করে জাল পেতেছে গৌরদাস। হাজার হাজার ছেলে প্রাণ দেবার জন্যে প্রস্তুত।

গৌরদাসের কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন ভয় করেছিল সদানন্দবাবুর। এ তো ইতিহাস লেখা নয়। এ যে বিপ্লব। এ বয়সে আর যেন ও সব সয় না। অবাক লেগেছিল সদানন্দবাবুর। তারপর গৌরদাসের শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে সদানন্দবাবু নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই কোথায় গেল গৌরদাস।

হঠাৎ বিছানার এককোণে একটুকরো একটা কাগজ নজরে পড়লো।

গৌরদাসের হাতের লেখা—"চললুম। আমাকে খুঁজোনা, ইচ্ছে ছিল কয়েকদিন এখানে থাকবো, কিন্তু জরুরী কাজে এই রাত্রেই চলে যাচ্ছি। এ-চিঠিটা পড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বে।"

সমস্ত যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল সদানন্দবাবুর। ভেতরে ভেতরে এ-সময় কী চলছে ! শহরের রাস্তায় লাল মুখ সৈন্যদের দল দেখা যায়। আকাশ

দিয়ে এরোপ্লেনের ঝাঁক উড়ে চলে। খবরের কাগজে ব্রিটিশের সসম্মানে পলায়নের কাহিনী থাকে। কিন্তু এ-সব কী? এ-সব কথা তো কারুর কাছে শোনেন নি। অতুলবাবুর মেসে অনেক খবর অনেকে বলে। ট্রামে কতরকম গুজব শোনা যায়। সত্যি কোথায় যেন মহা গ্রন্থি বেঁধেছে। ঠিক আগেকার মত মসৃণ গতি বোধ হয় আর থাকবে না।

কলতলায় গিয়ে গঙ্গাস্তোত্রটা চীৎকার করে আবৃত্তি করতে করতে মাথায় জল ঢেলে দিলেন। কোথায় শীত গেছে পালিয়ে। স্নান করতে করতে সদানন্দবাবুর মনে হয় ট্রেন যদি ঠিক সময়ে পৌঁছে থাকে তো এতক্ষণ তারা বোধ হয় টাটানগরের স্টেশনে। সুরুচির যা চায়ের নেশা, কে তাদের চা এনে দেবে কে জানে!

বাইরে হঠাৎ কে ডাকলে—মাস্টার মশাই, মাস্টার মশাই—

বাড়িওয়ালা দত্ত মশাইএর গলা। ভিজে কাপড় ছেড়ে বাইরে আসতেই দত্তমশাই বললেন—প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম,—ভোরবেলাই এলাম, আপনাকে তো অন্য সময়ে পাওয়া যায় না আর—

সদানন্দবাবু বললেন—তাহলে এ-মাসের শেষ তারিখেই বাড়ি খালি করে দেব—কী বলেন দত্তমশাই—

দত্তমশাই ঘরের ভেতরে ঢুকে তক্তপোশে চেপে বসে পড়লেন। বললেন—শীতটা গিয়েও যাচ্ছে না এবার—

চেতলার হাটে দত্তমশাই-এর মাছ ধরবার বঁড়শী, ছিপ আর তালা-চাবির দোকান। নিজে থাকেন টিনের বাড়িতে। কিন্তু চোদ্দ বছর ভাড়া দিচ্ছেন এ-বাড়ি। গায়ে একটা ফতুয়া, তারই ওপর আলোয়ানটা আলগোছে জড়ানো। মনে হয় যেন সকাল বেলাই একচোট প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। বাড়ি ফেরবার পথে একবার বাড়িটা দেখতে এসেছেন।

তারপর সদানন্দবাবুর কথার উত্তরে বললেন—বাড়ি আপনাকে ছাড়তে দেব না মাস্টার মশাই—চোদ্দ বছর আছেন এ-বাড়িতে, এ একরকম আপনারই বাড়ি বলতে পারেন—সবাই যদি পাড়া ছেড়ে চলে যায়—তাহলে কার ভরসায় আমরা চেতলায় থাকি বলুন তো—

সদানন্দবাবু হঠাৎ যেন নির্বাক হয়ে গেলেন। দত্তমশাই কিছু অন্যায় তো বলেন নি।

অনেকক্ষণ পরে বললেন—কিন্তু মুশকিল হয়েছে দত্তমশাই, আমার ইস্কুল-টিস্কুল বন্ধ, মাইনে পাচ্ছিনে—ছাত্ররাও চলে যাচ্ছে একে একে—মাসে মাসে এতগুলো টাকা ভাড়া—

দত্তমশাই দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—ছি ছি ছি, তা বেশ তো, ভাড়া আপনি দেবেন না—ভাড়া আমি নেব না এক পয়সা—হল তো ?

কিন্তু বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে সদানন্দবাবুর মনে হল তা-ই বা কেমন করে হয়! ভাড়া দেবেন না অথচ বাড়ি অধিকার করে থাকবেন—কাজটা ভাল নয়। তা ছাড়া সত্যিই তো, যুদ্ধ না থামলে তো আর ওরা ফিরে আসতে পারছে না। ততদিন পান্নালালদের বাড়িতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা তো হয়েছে। আর মেসের লোকেরা কেউ পালাচ্ছে না, তাদের এখানে চাকরি, মেস তাদের রাখতেই হোত! সুতরাং খাওয়া ওখানে তাঁর জুটবেই। গলাবন্ধ কোটের ওপর সিল্কের চাদরটা বেশ করে বাগিয়ে নিলেন। বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। কোথায় যাবেন ঠিক করেন নি তো! না বেরোলেও হোত! চুপ চাপ ঘরে বসে বই লিখতে পারতেন তিনি। কিন্তু তিনি যেন আজ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেছেন। তাঁর ইস্কুল নেই, সংসার নেই, বই লেখা নেই—তাঁর করবার আছে কি ?

এতক্ষণ বোধ হয় সুরুচিরা চক্রধরপুরের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে!

হঠাৎ যেন কেমন আত্ম-সচেতন হয়ে পড়লেন। এমনভাবে দিশেহারা হলে তাঁর চলবে না। পৃথিবীতে আগুন লেগেছে যখন, নিজের ঘর তাঁকে যেমন করে হোক সামলাতেই হবে। বেপরোয়া হতে গৌরদাস পারে। গৌরদাসের পোষায়। কিন্তু সদানন্দবাবুর সব আছে। বিরাট সংসারের ভার একা তাঁর ওপর। তারপরে আর একটা নতুন প্রাণী আসছে তাঁর সংসারে। সংসারে আর একটি সংখ্যা বাড়লো। সুরুচির ছোট বেলার কথা মনে পড়লো। এক মাথা চুল—লাল টুকটুকে চেহারা ছিল সুরুচির। দোলনায় যখন শুয়ে থাকতো, সদানন্দবাবু তার দিকে চাইতেই সুরুচি মুখ হাঁ করে হেসে উঠতো। সেই সুরুচি দিনে দিনে বড় হয়েছে—একদিন তার বিয়েও দিতে হবে।

চলতে চলতে কখন কালীঘাটের ব্রীজের কাছে এসে পড়েছেন হুঁস ছিল না। হঠাৎ দেখলেন উল্টোদিকের ফুটপাথ দিয়ে রাখালবাবু চলেছেন

সদানন্দবাবু চীৎকার করে ডাকলেন—ও রাখালবাবু—রাখালবাবু—

রাখালবাবু শুনতে পেলেন না। আর একবার ডাকতে এদিকে ঘাড় ফেরালেন।

বললেন—সময় নেই—বড্ড ব্যস্ত আছি—

সদানন্দবাবু দ্রুত পায়ে রাখালবাবুর নাগাল ধরে ফেলেছেন। রাখালবাবু তো বহুদিন ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছেন বাইরে—ইস্কুলও বন্ধ, তবে কিসের এত ব্যস্ততা !

সদানন্দবাবু বললেন—ভোর বেলা এত ব্যস্ত কিসে মশাই ?

রাখালবাবুর যেন কথা বলবার সময় নেই। বললেন--মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ধরবো—

ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি চড়বার লোক তো রাখালবাবু নন! সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। পাশাপাশি চলতে চলতে সদানন্দবাবু বললেন—আপনার কথামত ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিলাম রাখালবাবু—

—পাঠিয়ে দিয়েছেন ? ভালই করেছেন—বললেন রাখালবাবু।

রাস্তার দুপাশের কয়েকটা দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। খদ্দের কমে গেছে —দোকানের মালিকরাও পালিয়েছে। সমস্ত শহরে যেন কেবল অস্বস্তির ছায়া।

সদানন্দবাবু আবার কথা বললেন। বললেন—ইস্কুলের খবর কি, রাখালবাবু ?

রাখালবাবু ইস্কুলের কথায় যেন রসিকতার বিষয় পেলেন। বললেন—ইস্কুল উঠে গেছে বাঁচা গেছে মশাই, ইস্কুল থাকলে কি আর এ-দিকে মন যেতো, মাস্টারী আর করছিনে সদানন্দবাবু এই আপনাকে বলে রাখলুম—

তারপরে হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেছে এমনি ভাবে রাখালবাবু বললেন—একটা কাজ করতে পারেন সদানন্দবাবু, কিছু ঝাঁটার কাঠি জোগাড় করে দিতে পারেন ?

—ঝাঁটার কাঠি ! সদানন্দবাবু বললেন—আমার বাড়িতে খুঁজলে পাওয়া যাবে—ঘর ঝাঁট দেবার ঝাঁটা করবেন তো ?

—ওতে আমার হবে না, আমার সবসুদ্ধ তিন টন ঝাঁটার কাঠি চাই—অন্তত মন কয়েক দিলে চলবে—কিছু শেয়ার পাবেন অবিশ্যি—ধরুন লাভের

ফাইভ পার্সেণ্ট—তা-ও কম করে শ' খানেক টাকা বেকসুর থাকবে—রাখাল-বাবু চলতে চলতে বলতে লাগলেন।

সদানন্দবাবু কিছুই বুঝলেন না। তিন টন ঝাঁটার কাঠি! তা ছাড়া রাখালবাবু অত ঝাঁটার কাঠি দিয়েই বা করবেন কি!

রাখালবাবু আবার বললেন—ঝাঁটার কাঠি যদি না দিতে পারেন তা হলে অন্য জিনিস দিন। আমার সব রকমের অর্ডার আছে। তেঁতুলের বিচি দিন—তেঁতুলের বিচি। অবাক হয়ে দেখছেন কি?—পারবেন দিতে? দেখুন, তা হলে কয়েক শো টাকা পাইয়ে দিতে পারি—

—এই ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ডাকলেন রাখালবাবু। ট্যাক্সিটা নির্দেশ পেয়েই গতিবেগ থামিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়াল। রাখালবাবু দরজাটা খুলে উঠে বসলেন। বললেন—আসি তা হলে—

সদানন্দবাবুর কৌতূহল তখনও মেটেনি। বললেন—অত ঝাঁটার কাঠি কী করবেন রাখালবাবু—

ট্যাক্সি তখন চলতে সুরু করেছে। ট্যাক্সিতে বসে রাখালবাবু বললেন—যুদ্ধের কাজে লাগবে—

—আর তেঁতুল বিচি?

কিন্তু রাখালবাবু কানে সে-প্রশ্ন আর পৌঁছল না। সদানন্দবাবুর নাকে মুখে পেট্রলের ধোঁয়ার গন্ধ আর ধুলো এসে লাগলো। কাঁধের সিল্কের চাদরটা আবার যথাস্থানে ঠিক করে রাখলেন। মনে পড়লো সেদিনের হৃষীকেশের কথা। টন টন পেরেক কিনেছে সে! কে জানে কয়েকদিন থেকে যেন সদানন্দবাবুকে সবাই হতাশ করছে। হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামে উঠে বসলেন। বড় ক্লান্ত মনে হল নিজেকে! ট্রামের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বাইরের রোদের দিকে চেয়ে দেখলেন! সূর্যের ওই রোদ যুদ্ধের সময়ে তা-ও বুঝি কেউ পছন্দ করে না। সবাই চায় ব্ল্যাক-আউটের রাত। লম্বা রাত পেলে ভালো করে বোমা ফেলে মানুষ মেরে আরাম। দেয়ালে কতক-গুলো পোস্টার আঁটা হয়েছে। লেখা রয়েছে—'গুজবের সৃষ্টি করিবেন না, শত্রুর গুপ্তচর নিকটেই আছে।'

পাশের এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন—দেশলাই আছে আপনার কাছে?

সদানন্দবাবু পকেটে হাত দিলেন কিন্তু তখনি মনে পড়ল তিনি সিগারেট খান না, সুতরাং দেশলাইও কাছে রাখেন না। ভাল করে চেয়ে দেখলেন সদানন্দবাবু! জাপানীদের গুপ্তচর কি না কে জানে! যুদ্ধের সময় যার তার সঙ্গে যা তা বলতে বারণ করা হয়েছে। বেশ ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালী ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক বললেন—বেটারা কেবল 'সম্মানের সহিত পশ্চাদপসরণ' করতে পারে—আর যত তেজ আমাদের কাছে—

সদানন্দবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

ভদ্রলোক আবার বললেন—ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এল, গ্রীস থেকে পালিয়ে এল আবার আফ্রিকাতেও রোমেল এদের ওই দশা করে ছাড়বে—এদিকে শুনছি কি জানেন—

ভদ্রলোক চারিদিকে একবার দেখে নিলেন। ট্রামের অন্যান্য লোকজন সবই প্রায় অফিসযাত্রী। এদিকে বিশেষ কারো দৃষ্টি নেই। ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—শুনছি এরা নাকি সমস্ত ভারতবর্ষটাই আমেরিকার কাছে বাঁধা রেখেছে—মানে আমাদের মনিব এখন আমেরিকা—রাস্তায় ঘাটে দেখছেন না কেবল আমেরিকান সৈন্য আসতে আরম্ভ করেছে—

সদানন্দবাবু বললেন—বলেন কি?

—আর বলি কি! দেখবেন কিছুদিন বাদে আপিসে টাপিসে নিগ্রোতে একেবারে ছেয়ে যাবে—আমরা যেন লুটের মাল মশাই, হাতে হাতে ঘুরছি—ভদ্রলোক অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

তারপরে ভদ্রলোক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বললেন—আপনাদের কলকাতার খবর কী?

সদানন্দবাবু কিছু বুঝলেন না। বললেন—আপনি বুঝি কলকাতার লোক নন?

ভদ্রলোক বললেন—আমি বেহারে থাকি—এই তো আজ সকালে এসে পৌঁছলুম কলকাতায়—তা আপনাদের এখানে কিছু তোড় জোড় চলছে না?

—কিসের?

—কেন, আপনি শোনেন নি কিছু? স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো গান্ধীজী প্রোগ্রাম সুরু করে দিয়েছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া'—চারদিকে জানাজানি হয়ে গেছে—বেহারে আমাদের এবার প্রচুর—

সদানন্দবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে সদানন্দবাবুর সারা শরীর শিথিল হয়ে এল। যেন তাঁর যৌবনের সেই সব দিনের কাহিনী শুনছেন। একদিন তাঁদেরও সেই স্বপ্ন ছিল। সমস্ত অচল হয়ে যাবে। ট্রেনের লাইন ভেঙে দেবে। টেলিগ্রাফের তার দেবে কেটে। ব্রীজ দেবে উড়িয়ে, পোস্ট অফিস, থানা সব দেবে পুড়িয়ে। জেলখানার দরজা ফেলবে খুলে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত বসিয়ে বিচার ব্যবস্থা চলবে। কী ভয়ানক সর্বনাশের কথা সব।

ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের কলকাতায় কিছুই হচ্ছে না? বলেন কী—এখানে এত বিপ্লবী ছেলে থাকতে কিচ্ছু হবে না—আপনি নিশ্চয়ই কিছু খবর রাখেন না, অথচ ওদিকে ইউ. পি.-তে সবাই যে প্রস্তুত হচ্ছে—

বাইরে আবার নজর পড়তেই সদানন্দবাবু দেখলেন দেয়ালের গায়ে পোস্টার আঁটা রয়েছে—'গুজবে বিশ্বাস করিবেন না, শত্রুর গুপ্তচর নিকটেই আছে—'। যেন সন্দেহ হল সদানন্দবাবুর। কে জানে কত রকমের চর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু আর ভাল লাগে না সদানন্দবাবুর। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে অশান্ত গতিতে ঘুরতে সুরু করেছে। সদানন্দবাবু ট্রাম থেকে হঠাৎ নেমে পড়লেন।

আর একখানা ট্রামে উঠে সোজা চলে এলেন বনমালীবাবুর দোকানে।

এ-পাশে ছাপাখানা আর ওপাশে বই-এর দোকান। খালি গায়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসে ছিলেন। বনমালীবাবু এক টিপ্ নস্যি নাকে গুঁজে দিলেন। ভারি ধীর মস্তিষ্কের মানুষ এই বনমালীবাবু। মাথার ওপর পাখাটি খুলে দিয়ে পরম নিরুদ্বেগে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

সদানন্দবাবু বললেন—কাল ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিলাম বাইরে—সকলে যা ভয় লাগিয়ে দিলে—

বনমালীবাবু বললেন—যত সব পাগলের দল, কিস্সু হবে না, কোনও ভয় নেই—এই আমি বলে রাখলাম—মনে করে রাখুন—

সদানন্দবাবু যেন আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন—কিন্তু বোমা যদি পড়ে?

—যদি পড়ে, পড়বে—তা বলে আমার আপনার মাথাতেই যে পড়বে তার

কি মানে আছে? আমার মশাই এক কথা—আমি বাইরে যাবো না, এক-তলায় একটা ঘর বানিয়েছি—এ. আর. পি. শেণ্টার—যখন সাইরেন বাজবে তখন তার ভেতরে গিয়ে সেঁধোব—

সদানন্দবাবু পরম বিস্ময়ে বনমালীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে-ভাবনায় অস্থির এই লোকটিকে যেন তা স্পর্শ করে না। তা হলে শহরের এত লোক পালাবার জন্যে স্টেশনে গিয়ে ভীড় করে কেন! কেন তবে এত খরচপত্র করে সুরুচিদের পাঠানো! সবাই বোকা আর বনমালীবাবুই চালাক! সদানন্দবাবু আবাব জিগ্যেস করলেন—এ-ধারণা আপনার কেমন করে হোল বনমালীবাবু?

—তা জানিনে, তবে আমার মন বলে কিছু হবে না। আমার কুষ্টিতে আছে এ-সময়টা আমার ভাল যাবে—আমার উন্নতিযোগ আছে—বহু আয়—ব্যবসায় খুব পয়সা হবে—বনমালীবাবু আত্মসুখে খানিকটা হেসে পুরো এক টিপ নস্যি নিলেন।

বনমালীবাবু খানিক থেমে আবার বলতে লাগলেন—আমায় যদি জিগ্যেস করেন মশাই, তবে আমি বলবো আপনার কোনও ভয় নেই মাস্টার মশাই—এতদিন কী ব্যবসার বাজারই গেছে কী বলবো—এইবার যুদ্ধ এল, এইবার দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাবো—যুদ্ধ হলেই দেশের লোকের অবস্থা ভাল হয় তা জানেন না -

সদানন্দবাবু আরো অবাক হয়ে বনমালীবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। পরম নিশ্চিন্ততার প্রলেপ মাখানো মুখ। এ কী অদ্ভুত কথা শোনালেন তিনি। চারিদিকে যখন সবাই ভয় দেখাচ্ছে তখন নিঃশঙ্কচিত্ত বনমালীবাবুর কাছে অভয় মিলবে এ-কথা কে জানতো। এতদিন তো এ-যুদ্ধকে ভয় করেই এসেছেন সদানন্দবাবু—কিন্তু এমন লোকও আছে যারা এই যুদ্ধের আশায় বসে আছে! এতদিনে বুঝতে পারলেন কেন হৃষীকেশ—শিক্ষিত আদর্শ-চরিত্র হৃষীকেশ—হেড মাস্টারী ছেড়ে পেরেকের ব্যবসা সুরু করেছে। রাখালবাবু কোথায় ঝাঁটার কাঠি, কোথায় তেঁতুলের বিচির সন্ধানে ঘুরছেন, কেন এই হট্টগোল ডামাডোলের মধ্যেও বনমালীবাবু এ আর. পি. শেণ্টার তৈরী করে এখানেই পরিবার নিয়ে রয়ে গেলেন। এই তো সুযোগ। জীবনে হয়ত আর এ সুযোগ আসবে না! একটা জীবনে কটা যুদ্ধই বা আসে।

সদানন্দবাবু একদৃষ্টে বনমালীবাবুকে দেখতে লাগলেন। এক নাক নস্যি নেওয়া বনমালীবাবুকে এতদিন পরে সদানন্দবাবুর যেন বড় কদর্য মনে হল। ছি, ছি! হোক্ ঐশ্বর্য, হোক সৌভাগ্য—কিন্তু সে যেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শ্মশানের পথ ধরে না আসে। কত হাজার মরেছে ফ্রান্সের ফ্লাণ্ডার্সে আর কত গ্রীসে, কতই বা পোল্যাণ্ডে, কে হিসেব রাখবে তার। সদানন্দবাবুর আবার মনে হল—ছি—ছি—

তখন মৃন্ময়ীর স্নান সারা হয়েছে। গিরিবালা প্লাটফরমের একধারে আহ্নিকটা সেরে নিয়েছেন। সুরুচি মুখ হাত পা ধুয়ে ওয়েটিং রুমের দেয়ালে হেলান দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে ছিল।

স্টেশনের চারিদিকে ব্যস্ততার অন্ত নেই। শুধু এই ক'জন যেন পৃথিবীর চলমান জনতার পরিত্যক্ত ভগ্নাংশ। এরা পারেনি। এরা পরাজিত! হার স্বীকার করে পিছিয়ে পড়েছে।

গিরিবালা বললেন—চাকরটা কী বকর্ বকর্ করতেই পারে মা—কথার আর কামাই নেই—

মৃন্ময়ী বললেন—তেমনি তার মনিবটি—একেবারে চুপ—

একঘণ্টা আগে গোপাল আর তার মনিব বিলাস চৌধুরী কলকাতার ট্রেনে চলে গেছে, কিন্তু এখনও যেন তাদের ছায়া এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা যত বাজে কথাই বলুক—গিরিবালার সঙ্গে এই ক'ঘণ্টার পরিচয়েই বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। কোথাকার কে! পরিচয় নেই, নাম ধাম জানা নেই, তবু একটু চা করে দিয়ে, গরম জল করে দিয়ে যেন কৃতার্থ। এতটুকু সেবা করতে পারার জন্যে আকুল। যাবার সময় গিরিবালার আর মৃন্ময়ীর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে গেছে। বড় মিষ্টি কথা যা হোক!

একটা ভিখিরী এসে দাঁড়াল সামনে।

—মা, বামুনের ছেলে আমি, দুদিন কিছু খেতে পাইনি—কিছু খেতে দাও মা—

গিরিবালা কিছু দিতেন কিনা কে জানে। কিন্তু সুরুচি চেঁচিয়ে উঠল।

—দূর, দূর—বেরো এখান থেকে—কী বামুন তোরা—

—আমরা চক্রবর্তী বামুন মা—

সুরুচি বললে—তবে হবে না, আমরা বারেন্দ্র বামুন না হলে ভিক্ষে দিই নে—যা পালা এখান থেকে—

গিরিবালা হেসে উঠলেন, বললেন—ও কী কথা—

সুরুচি বললে—দেখ না, বামুনের ছেলে না বললে যেন আমাদের দয়া হবে না, ওরা ভেবেছে কী—

মৃন্ময়ী এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন।

হঠাৎ বললেন—এটা কী রে সুরুচি—কাদের জিনিস এটা ?

সুরুচি দেখলে।

গিরিবালা দেখতে উঠলেন।

ছোট একটা স্থটকেস !

তাদের নয়।

অথচ এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি।

সুরুচি বললে—এ ওই গোপাল ফেলে গেছে—কী হবে এখন—সর্বনাশ—

বিলাস চৌধুরীর নাম লেখা স্থটকেস। যাবার আগে সমস্ত মালপত্র জড়ো করেছিল এখানে। তারপর ট্রেনে ওঠবার সময় তাড়াতাড়িতে এটি ফেলে রেখে চলে গেছে।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন গিরিবালা। সারারাত্রি জাগরণের পর মৃন্ময়ীর শরীরটা ভাল ছিল না। তিনিও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তা হলে ওরাই ভুলে ফেলে গেছে—

সুরুচি বললে—বড়লোকদের অমন ছু একটা জিনিস হারালে কিছু আসে যায় না—

গিরিবালা বললেন—কি জানি বাপু, কি জিনিস আছে ভেতরে—দামী জিনিসও থাকতে পারে হয়ত—

মৃন্ময়ী একটু উৎসাহ পেলেন ! বললেন—দামী জিনিস কেউ কি আর রাখে ওতে—

দেখে বোঝা গেল চাবি দেওয়া। জিনিসটা পুলিশের হাতে কিম্বা স্টেশন মাস্টারের হাতে গচ্ছিত রেখে দিয়ে আসা উচিত। কিন্তু কেই বা দেয় !

মৃন্ময়ী বললেন—থাক বাপু, ও যেখানকার জিনিস যেমন পড়ে আছে, তেমনি পড়ে থাক, হাত দিয়ে কাজ নেই মা—যাদের জিনিস তারা বুঝবে—

গিরিবালার মনে হল, ওই চাকরটারও দোষ। দশবার করে তাদের প্রণাম করা, চা করে দেওয়া, গরম জলের ব্যবস্থা করা, মালপত্র সরিয়ে রাখা,—সেই গোপালই তো করলে। লোকটা ভাল বলতে হবে! আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কেউ নয়। মাইনে করা চাকরও তো নয়, নেহাৎ রাস্তারই পরিচয়। গায়ে পড়ে আলাপ করলে। সেধে সেধে কথা বললে! যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কেমন করে উপকার করবে, তাই কেবল দেখেছে। লোকটার বোধ হয় স্বভাবই ওই! শেষ পর্যন্ত আসল কাজেই ভুল করলে! এতক্ষণ গাড়ি পরের স্টেশন ছাড়িয়ে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে। খাবেখ'ন বকুনি বাবুর কাছে!

একটু মায়া হতে লাগলো গোপালের জন্যে! এই তিনটে লোকের স্নান করবার জলের ব্যবস্থা, ভিজে কাপড় শুকোতে দেওয়া,—সবই তো সে করেছে।

দু একটা মালগাড়ি এলো গেল। এখন এই সকাল বেলার দিকে আর ট্রেন নেই।

বেলা বাড়ছে।

ঘণ্টা দু এক আগে গোপালরা চলে গেছে কলকাতার দিকে। একটু পরেই একটা ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ি ছাড়বে বোধ হয়। বাইরের রাস্তা থেকে লোক এসে সার বেঁধে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসছে। দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

একটা খাবার ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে ওদিকে।

গিরিবালার পা দুটো আর কোমরটা ব্যথায় টন টন করে উঠল, মৃন্ময়ীর মাথা ধরাটা আবার মাথা চাড়া দিতে সুরু করেছে।

সুরুচি দেয়ালে হেলান দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

যে জীবনের সুরুতেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তার শেষে আরো কত দুর্ঘটনা জমা আছে, কে বলতে পারে!

প্লাটফরম দিয়ে দু একজন সুরুচির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে চলে যাচ্ছে। শাণিত তীরের মত সে দৃষ্টি এসে সুরুচির শরীরে যেন বিঁধছে।

কলেজের সেই সব দিনগুলোতে এমন দৃষ্টি হয়ত রোমাঞ্চ আনত কিন্তু আজ তার মনে হয়, কে যেন ক্ষত-বিক্ষত দেহের ওপর পীড়ন করছে। সমস্ত শরীর তার চাদর দিয়ে ঢাকা—তবু মনে হয়, সতর্ক আবরণের মধ্যেও বুঝি ত্রুটি রয়ে

গেছে কোথাও! বোধ হয় এখনি কেউ সন্দেহ করবে। এখনি কেউ ধরে ফেলবে তার ফাঁকি! ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই সুরুচি তাই নিজেকে ঢেকে ফেলেছে। আত্মকেন্দ্রী করেছে নিজের মনকে। কখন যে সে এই প্লাটফরম, এই জনতা, এই দিবালোক ছেড়ে চক্রধরপুরের ছোট একটা ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারবে। সেইখানে শুরু হবে সুরুচির সাধনা। যদি সিদ্ধি হয়, তবেই আবার সে মুখ তুলে চাইবে, সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সূর্যবন্দনা করবে।

—পিসীমা, একটা স্যুটকেস ফেলে গেছি? দৌড়তে দৌড়তে গোপাল এসে হাজির।

—ওমা, গোপাল যে! তুমি কোত্থেকে?—গিরিবালার অবাক হবারই কথা!

মৃন্ময়ী ও সুরুচি দুজনেই অবাক হয়েছে। গোপাল ফিরে এসেছে।' এই ঘণ্টা দুই আগে যে তারা কলকাতার ট্রেনে উঠে চলে গেল!

ব্যাপার কী?

স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে গোপাল বললে—ভাগ্যিস ছিলেন আপনারা, নইলে সর্বনাশ হয়ে যেতো—

তারপর গলা নিচু করে গোপাল বললে—বাবু আমার ওপর খুব রাগ করেছেন দিদিমণি—ওই যে বাবু আসছেন—

তিনজনেই দূরে দৃষ্টি দিয়ে দেখলে—সেই ওয়েটিং রুমের ভদ্রলোকটি এই দিকেই ব্যস্ত হয়ে আসছেন। লম্বা চেহারার মানুষটি, উদ্বিগ্ন হয়েছেন, বোঝা গেল এখান থেকে।

— কিসে করে এলে গোপাল? জিগ্যেস করলেন গিরিবালা।

ততক্ষণে অনেকখানি অশান্তি নিয়ে বিলাস চৌধুরী কাছে এসে পড়েছেন। গোপালের হাতে স্যুটকেস দেখেই উদ্বেগ কেটে গিয়েছিল তাঁর, কিন্তু ক্লান্তি কমেনি। গোপাল তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে চেয়ার এনে বাইরে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বসতে গিয়ে বিলাসের যেন বাধলো! বললেন—শেষ পর্যন্ত পেয়েছিস তাহলে—

অপরাধীর মত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গোপাল বললে—কুলিদের হট্টগোলে মাথার ঠিক ছিল না—বেটারা যা কাণ্ড করে—

সত্যিই বিলাস চৌধুরী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। টাটানগরে সারাদিনই কাল পরিশ্রম গেছে, তারপর আবার কলকাতায় যাওয়া। রাস্তায় হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর টেণ্ডারের কাগজপত্র, হাজার হাজার টাকার বিল, ভাউচার সমস্ত সমেত আসল স্যুটকেশটাই নেই। অর্থাৎ যে-কাজের জন্যে কলকাতায় যাওয়া, তাই-ই হবে না। তারপরই খোঁজা শুরু হল। পরের স্টেশনেই নেমে পড়েছেন। এবং ভাগ্য তাঁর ভাল বলতে হবে। একটা আপ্ মালগাড়ি তখন টাটানগরে আসছিল। স্টেশন-মাস্টারকে দিয়ে বলিয়ে গার্ডকে খুশী করে দিয়ে এত শীঘ্র চলে আসতে পেরেছেন। জিনিসটা পাওয়া গেছে যা হোক। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পরের গাড়িতে কলকাতায় যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

সমস্ত মালপত্র নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন। সেগুলো আবার কুলিরা এসে নামিয়ে রাখল!

কয়েক ঘণ্টার মত আবার এখানে থাকতে হবে।

গোপালের দেওয়া চেয়ারে বসতে গিয়ে বিলাস চৌধুরী কেমন যেন একটু দ্বিধায় পড়লেন!

সকালবেলা ওদের ঠিক ওইখানে দেখেছেন।

গোপাল ততক্ষণে পায়ের সামনে বসে পড়েছে। জুতো খুলে দিয়ে অন্য হাল্কা জুতো পরিয়ে দিতে হবে!

বিলাস চৌধুরী বাধা দিলেন।

বললেন—থাক্ এখন, তুই একটা চুরুট দে—

মৃন্ময়ী আর গিরিবালা এতক্ষণ সমস্ত শুনছিলেন। কিন্তু চোখ ছিল তাঁদের অন্য দিকে। সুরুচি নিজের একটা লক্ষ্যকেন্দ্র ঠিক করে নিয়ে তাইতে নিবিষ্ট।

হঠাৎ গোপালের ডাকে তিনজনেই একসঙ্গে এদিকে চেয়ে দেখলেন—

গোপাল ডাকলে—পিসীমা—

গিরিবালা এদিকে চাইতেই বিলাস চৌধুরীর চোখের উপর চোখ পড়ল। মাথার ওপর ঘোমটা বেশ করে টেনে দিলেন।

মৃন্ময়ীও এদিকে চেয়ে বিলাসের চোখ দুটোই দেখলেন।

সুরুচিও চেয়ে দেখলে—কিন্তু চেয়ে দেখবার মত যেন কিছু নয়, এইভাবেই আবার চোখ ফিরিয়ে নিলে।

গোপাল বিলাসের দিকে ফিরে বললে—এঁদের কথাই আমি বলছিলাম আজ্ঞে, আমি জানি পিসীমারা আছে, ও সুটকেস কিছুতেই হারাতে পারে না—

গিরিবালাকে উদ্দেশ করে বিলাস চৌধুরী হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে যুক্ত করলেন।

বললেন—গোপালের কাছেই শুনছিলাম আপনাদের কথা, আশা করিনি সুটকেসটা পাওয়া যাবে আবার, অথচ ওটা হারালে কী যে ক্ষতি হোত!··· আপনারা চক্রধরপুর যাচ্ছেন শুনলাম—

গিরিবালা ছোট করে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ—

তারপর খানিকক্ষণ কোন কথাই কোনও পক্ষ থেকে হোল না। এখানে আবার কয়েক ঘণ্টা থাকতে হবে। সুতরাং বাক্সপত্র আবার খুলতে হবে। আয়োজন করতে হবে খাওয়া দাওয়ার।

বাক্স-বিছানা গুছোতে গুছোতে গোপাল বললে—বাবু আপনি তো বলেন আমার চা করা খারাপ—কিন্তু দিদিমণি তো ভাল বলেছেন—

এবার সুরুচির দিকে চেয়ে দেখলেন বিলাস চৌধুরী। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রয়েছে মেয়েটি। কলকাতার পালিয়ে-আসা দল এটি। কিন্তু সঙ্গে কোনও পুরুষমানুষ নেই। গিরিবালার দিকে চেয়ে বুঝলেন তিনিই এদের চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। নিশ্চয়ই খুব শক্ত মানুষ। নইলে এতখানি রাস্তা এই ভীড়ের মধ্যে আসা কম সাহসের পরিচয় তো নয়।

গিরিবালাও এক ফাঁকে আরও ভালো করে দেখে নিলেন বিলাস চৌধুরীকে। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম ধাপে পৌঁছে গেছেন। খুঁজলে পাকা চুল মাথা থেকে হয়ত বেরুতে পারে। একটা কঠিন কর্কশ আবরণ মুখের ওপর ভাসছে। সকালবেলা ট্রেনে ওঠবার সময় অন্তত এ লোকটিকে ঠিক এ রকম মনে হয়নি। ওই লোকটির মুখ দিয়ে ঠিক ওই সব কথা বেরুনো যেন অস্বাভাবিক। শুনতে বেশ ভাল লাগলো।

বিলাস চৌধুরী আবার কথা বললেন—গোপালের মুখে আপনাদের সব কথাই শুনেছি—সারারাত খুব কষ্ট হয়েছে আপনাদের,—অথচ—

গিরিবালা কথাবার্তায় যোগ দিলেন—আপনার প্রশংসা কিন্তু ওর মুখে ধরে না—সমস্তক্ষণ আপনার গুণগান করেছে—

গোপাল অপরাধীর মত পেছনে দাঁড়িয়েছিল।

বিলাস চৌধুরী বললেন—ওর অত বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, কোনটা প্রশংসা কোনটা নিন্দে তা বুঝতে পারে না—কিন্তু ওর কথা থাক—

গিরিবালা বললেন—সুরুচিই প্রথমে দেখলে সুটকেসটা, কিন্তু আমরা পুলিসের হাতে দেব, কি ইস্টিসন-মাস্টারের হাতে দেব বুঝতে পারছিলাম না—

বিলাস চৌধুরী সুরুচির দিকে চেয়ে বললেন—তা হলে কৃতজ্ঞতাটা আপনারই প্রাপ্য দেখছি—এখন দেখছি গোপাল মিথ্যে কথা বলেনি—

সুরুচি কোনও উত্তর দিলে না, কিন্তু ভদ্রলোকের এই গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টাটা ভাল লাগল না তার। বিলাস চৌধুরীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার তখুনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে।

বিলাস চৌধুরী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একটু কৃতজ্ঞতা বা একটু উপকার করতে পারলে মনের মধ্যে বেশ খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যেত। কিন্তু হঠাৎ কৃতজ্ঞতা জানানো যেন বেমানান ঠেকছে। অথবা কোনও উপকার করবার প্রস্তাব করতেও যেন বাধছে!

বিলাস চৌধুরী আর একবার আলাপ করবার চেষ্টা করলেন :

—আমি একবার গিয়েছিলুম চক্রধরপুর, জায়গাটা বেশ ভালো নিরিবিলিও বটে।

গিরিবালা বললেন—কাছাকাছির মধ্যে জানাশোনা আছে তাই ওখানে যাওয়া, নইলে কলকাতা ছেড়ে তো আমাদের আসারই ইচ্ছে ছিল না—পাড়া এমন ফাঁকা হয়ে গেল যে, ভয় করতে লাগল ওখানে থাকতে—

বিলাস চৌধুরী বললেন—কটার সময় আপনাদের গাড়ি?

গোপাল কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে—এগারটায়—

কব্জির ঘড়িটা দেখে নিয়ে বিলাস চৌধুরী বললেন—তবে তো আর সময় বেশী নেই—আধঘণ্টা পরেই ট্রেন আসবে, আপনাদের খাওয়া দাওয়া সব সেরে নিতে হবে তো তারই মধ্যে—গোপাল, তুই সব ব্যবস্থা করে দে তা হলে—

সুরুচি যেন হঠাৎ বিলাস চৌধুরীর দিকে চেয়ে একটা কটাক্ষ করলে। স্পষ্টই বোঝা গেল এ সব ভাল লাগছে না তার! সে যেন এই পরিস্থিতি পছন্দ করছে না।

গিরিবালা বললেন—সে আমরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করবোখন। গোপালকে আর কষ্ট করতে হবে না।—

বিলাস চৌধুরী বললেন - করলেই বা, আপনারা আমার যে উপকার করেছেন, তার জন্যে তো আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত—তা ছাড়া গোপালেরই তো দোষ, ওই তো এই বিপদে ফেলেছিল আমাকে—

বিলাস চৌধুরীর কলকাতায় যাবার গাড়ি সেই রাত নটায়। তার আগে আর গাড়ি নেই। সমস্ত দিন স্টেশনে বসেই কাটাতে হবে। কিন্তু এখানে তাঁর বসে থাকতে যেন নিজের কাছেই অশোভন লাগছে। এটা অনুভব করলেন তিনি। তা ছাড়া বোধ হয় সবাই অস্বস্তি বোধ করছে তাঁর উপস্থিতিতে। বিলাস চৌধুরী উঠে ওয়েটিং রুমের ভেতরে গিয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন।

কাজ তাঁর অনেক। কলকাতায় এখুনি একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হবে!

গোপালকে একবার ভেতরে ডাকলেন বিলাস চৌধুরী।

বললেন—ওরে, ওদের দেখা শোনা করিস্—গাড়িতে বোধ হয় খুব ভীড় হবে—মালপত্তর তুলে দিস নিজে—আর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে তো?

গোপাল বাইরে চলে গেল।

খবরের কাগজটা পড়া হয়ে গিয়েছিল। সুটকেশ থেকে একখানা বই বার করলেন। বিলাস চৌধুরীর জীবনে এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত দিনের সমস্ত কর্তব্য কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে যেতে চান। আজ হয়ত সেই মুহূর্ত এসেছিল। দিনগুলো ঝড়ের গতিতে তাঁকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করে। কাজের মানুষ তিনি। সমুদ্রের ঢেউ দেখে পিছিয়ে যাবার লোক তিনি নন্। ঢেউকে যে স্বীকার করে নিতে পারে, জয়ী হয় সে-ই! সেই জয়লাভের আস্বাদ তাঁর প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের আস্বাদ। সেখানে যে-আনন্দ সে আনন্দের তুলনা নেই। কিন্তু তা ছাড়া ট্রেনের কামরার একাকিত্বের মধ্যে প্লাটফরমের ওয়েটিং রুমের প্রতীক্ষার মধ্যে আর তাঁর হাজারীবাগের বাড়ির বারান্দার পায়চারির মধ্যে কোথায় কোন্ ফাঁকে এক একদিন একটা

সৃষ্টিছাড়া হঠাৎ এসে চোখের সামনে মনের সামনে আবির্ভূত হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সমস্ত কর্তব্য ভুলে যেতে চান। আজ স্যুটকেশ ফেলে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার পর হঠাৎ ওই পরিবারটির পথাশ্রয়ী পরিবেষ্টনীতে আকৃষ্ট হয়ে কয়েক মিনিটের বিভ্রান্তি তাঁকে যেন আবার আক্রমণ করেছে। একটি শিক্ষিতা মেয়ে আর সঙ্গে আরো দুটি মহিলা সম্পূর্ণ অপরিচিতা, কিন্তু ঘটনাচক্রে একই ছাদের তলায় আশ্রিত হয়ে কী অদ্ভুত নিবিড় যোগসূত্রে বেঁধে দিলে বিলাস চৌধুরীকে !

ঘরের ভেতরে বিলাস চৌধুরী একান্ত একাকী বসেছিলেন। হঠাৎ গোপাল এসে পাঁচটা টাকা চাইলে।

টাকা নিয়ে গোপাল চলে যাচ্ছিল, বিলাস চৌধুরী আবার ডাকলেন—গোপাল—

গোপাল ফিরে দাঁড়াল !

বিলাস চৌধুরী বললেন—চুরুটটা নিবে গেছে, দেশলাইটা দে তো একবার।

জামার পকেট থেকে দেশলাই বার করে গোপাল চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিলে।

কব্জির দিকে চেয়ে দেখলেন বিলাস চৌধুরী।

রাত নটা। লম্বা সময়।

গোপালকে লেখবার প্যাড আর কলমটাও বার করতে বললেন। টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে কলকাতায়।

আধ ঘণ্টা সময় দেখতে দেখতে কেটে যায়। গোপাল টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে আসতেই ঢং ঢং করে প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠলো।

লাইন ক্লিয়ার দেওয়া হয়েছে !

প্রস্তুত হও সবাই। গিরিবালা গুছিয়ে নিলেন সমস্ত। মৃন্ময়ী আর সুরুচি উঠে দাঁড়াল।

গোপাল ছুটে এসে হাত লাগিয়ে দিলে—ও কী হচ্ছে পিসিমা, দাঁড়ান আমি গুছিয়ে দিচ্ছি—

তেত্রিশটা গাঁটরিকে গুছিয়ে বাঁধবার দরুণ গোপাল সেগুলো ষোলটায় দাঁড় করিয়ে দিলে। ভীড় যে খুব হবে, তার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। এতক্ষণ ফাঁকা ছিল, কিন্তু গাড়ি আসবার সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা

থেকে যে দলে দলে যাত্রী এসে প্লাটফরম ছেয়ে ফেললে কে বলবে! মৃন্ময়ীর এতক্ষণে ভয় হোল। এখন গাড়িতে উঠতে পারলে হয়! হাওড়া স্টেশনে না হয় নিত্যানন্দ এসে উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিল! এখানে যদি উঠতে না পারেন!

মৃন্ময়ী গিরিবালাকে জিগ্যেস করলেন—গাড়ি এখানে কতক্ষণ দাঁড়ায় দিদি?

গোপাল পোঁটলা বাঁধছিল।

বললে—আমি আছি, কিছু ভয় নেই মা, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াবে—ইঞ্জিন জল নেবে যে এখানে—

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি যখন ট্রেন এসে পৌঁছল তখন দেখা গেল আর আশা নেই। গাড়ির জানালা-দরজা-পাদানি কোথাও এতটুকু তিল ধারণের জায়গা নেই।

ইঞ্জিনটা গাড়ি টানতে টানতে এসে সোঁ সোঁ শব্দে মুখর করে দিলে জায়গাটা।

গোপাল নিজে দুটো ট্রাঙ্ক মাথায় করেছে, হাতে ঝুলিয়েছে একটা পোঁটলা! আর একটা কুলি নিয়েছে সঙ্গে।

গিরিবালাকে বললে—আসুন আপনারা পেছন পেছন—

সুরুচি, মৃন্ময়ী আর গিরিবালা গোপালের অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। কিন্তু যে কামরার সামনেই যান, সব কামরাই ঠাসা। কোথাও আর এক ইঞ্চি জায়গা কেউ ছাড়বে না। চলতে চলতে একেবারে ইঞ্জিনের কাছ পর্যন্ত খুঁজেও ফল হোল না। লোকের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে আর একবার পিছনের অংশের গাড়িগুলো দেখতে হোল। গোপাল কয়েক জায়গায় ঢোকবার চেষ্টাও করলে। শেষকালে ছুটতে ছুটতে খুঁজতে হোল। গাড়ি হয়ত এখনি ছেড়ে দেবে।

চলতে চলতে গিরিবালা বললেন—কী হবে গোপাল? গাড়ি যে ছেড়ে দেবে এখুনি—

—কিছু ভয় নেই পিসীমা—আসুন না, ও-দিকটা একবার দেখি চেষ্টা করে —সামনে চলতে চলতে গোপাল অভয় দেয়।

কিন্তু আর বোধ হয় হোল না। ট্রেনে ওঠার কোনও আশা নেই। এখনি ছাড়বার ঘণ্টা বাজলো হয়ত! হতাশ হয়ে ছুটোছুটি করছেন সবাই। মৃন্ময়ীর

অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরতে শুরু হয়েছে চোখের সামনে। মনে হয়, এখনি বুঝি আছাড় খেয়ে পড়ে যাবেন তিনি।

গোপাল ওদিক থেকে হঠাৎ ডাকলে—পিসীমা, অ পিসীমা—এদিকে আসুন—

গোপালকে দেখা যায় না। তবু কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে গিরিবালা সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

তবে কি একটু জায়গা পাওয়া গেছে নাকি!

খানিকদূর যেতেই দেখা গেল, গোপাল একটা কামরাতে ক্ষিপ্রগতিতে মাল তুলে দিচ্ছে, আর গোপালের মনিব বিলাস চৌধুরী কাছেই চুরুট মুখে দিয়ে নির্লিপ্তের মত দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রেনের গার্ড কামরার হাতল ধরে দরজা পাহারা দিচ্ছে। হাঁ হাঁ করে অসংখ্য লোক কামরার ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে—কিন্তু গার্ড সকলকে বাধা দিচ্ছে।

গোপাল বললে—উঠে পড়ুন—উঠে পড়ুন পিসীমা—উঠে পড়ুন দিদিমণি—

নিচু প্লাটফরম। দুটো ধাপ উঠে তবে কামরায় পা দিতে হয়।

গিরিবালার মুখে চোখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠলো। মৃণ্ময়ীকে তুলে দিয়ে গিরিবালা স্বরুচিকে নিয়ে উঠলেন।

কিন্তু গাড়ির ভেতরে পা দিয়েই চমকে উঠলেন।

বললেন—একি! আমাদের যে থার্ড ক্লাসের টিকিট—

কামরার বেঞ্চিতে চামড়ার নরম মসৃণ গদি আঁটা। মাথার ওপর পাখা।

উদ্বিগ্ন মুখে বিলাস চৌধুরীর দিকে চাইতেই, বিলাস চৌধুরী তেমনি অচঞ্চল কণ্ঠে বললেন—গার্ডকে আমি বলে দিয়েছি—আপনার কিছু ভয় নেই—

পাশেই গার্ডসাহেব দাঁড়িয়েছিল। ফিরিঙ্গী গার্ডসাহেব মুখে কিছু বললে না। কিন্তু চোখের দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে—ভাবনা করবার কিছু নেই।

গোপাল পিসীমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে দরজা বন্ধ করে ততক্ষণে নেমে এসেছে। গার্ডসাহেব লম্বা করে হুইসল্ বাজিয়ে দিলে। চলতে আরম্ভ করল গাড়ি!

গিরিবালা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন।

মৃন্ময়ীর মুখখানা ঘোমটার ফাঁকে একটুখানি অংশ দেখা গেল। তাঁরও দৃষ্টি এদিকে।

কিন্তু ট্রেনে উঠে বসবার সময় সুরুচি সেই যে উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল—গাড়ি চলবার পরও সে মুখ আর এদিকে ফেরেনি।

কলকাতার সেই কলমুখর দিন আর চক্রধরপুরের এই মন্থরগতি দিনগুলোর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই যেন।

এইখানে আকাশ নিচু হয়ে এসে ঠেকেছে দক্ষিণদিকের ওই পাহাড়টার মাথায়। খুব ভোরবেলা ওখানে ধোঁয়া ওঠে। রাত্রিবেলা এক একদিন আগুনের শিখা দেখা যায়। শহরের গুটিকতক বাড়ি, পায়রার খোপের মত কয়েক সারি রেলের কোয়ার্টার, মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের হুইসল্ আর নিয়ম করে ট্রেন আসা যাওয়ার ছন্দ!

সামনে প্রকাণ্ড একটা পোড়ো মাঠ, বিকালবেলা তারই ওপর একটা ছেলে হয়ত সাইকেল চালানো শিখছে। কোনও কাজ না থাকলে ওই সমস্ত চেয়ে দেখতে ভাল লাগে। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে তিন চারজন ছত্রিশগড়ী মেয়েমানুষ পাড়ায় পাড়ায় কয়লা বেচতে আসে। সোজাসুজি দরজার সামনে এসে চেঁচায়
—কয়লা লিবি মা—

কোল মেয়েরা হাটে যায় রাঁচি রোড ধরে।

কিছু বেগুন আর শাকসবজী কিনলে বাজারে যেতে হয় না।

কানাই প্রথম প্রথম খুব সাহায্য করেছিল। বাড়ির ব্যবস্থা করা, ঝি-এর বন্দোবস্ত করা, মাঝে মাঝে বাজার করে আনা।

এখন সে-ও চলে গেছে। বদলি হয়ে গেছে ওয়ালটেয়ারে। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা—এখন পরিচিত কেউ নেই আশেপাশে। গিরিবালা তো তা-ই চেয়েছিলেন। সমস্ত দিন নিজে হাতে মৃন্ময়ীর আর সুরুচির দেখাশোনা করে কতটুকু সময় হাতে থাকে।

কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল।

এখানে এসে মৃন্ময়ীর স্বাস্থ্য যেন আরও ভেঙে পড়ল। তবু বাঁধা ওষুধ আছে মৃন্ময়ীর। ভয়ের বিশেষ কারণ নেই। ও তো মৃন্ময়ীর বহুদিনের পোষা রোগ।

রাচি রোডের ওপর দিয়ে সারি সারি মিলিটারী লরীগুলো চলতে শুরু করে। দড়ির জাল দিয়ে ঢাকা গাড়ি। কোনওটাতে থাকে পাঞ্জাবী সৈন্য, কোনটাতে হাবসী। কত দূর দেশ থেকে এসেছে ওরা। রাঁচি রোড ধরে কোথায় কতদূরে যাবে কে জানে। তবু রাস্তার দুপাশে এ-দৃশ্য দেখতে ভীড় জমে যায়। বাড়ির মেয়েরা জানালায় এসে দাঁড়ায়।

বাড়িটার ডানদিকে কাদের একটা পড়ো বাগান, বাঁদিকে থাকে ড্রাইভার ডি'সুজা।

সাতটা কালো কুৎসিত কুকুর, একপাল মুরগী, কটা হাঁস আর একটা বেড়াল।

প্রথমেই গিরিবালা বলেছিলেন—ও কানাই, ফিরিঙ্গী সাহেবের পাশে থাকা —আর বাড়ি পেলে না?

কিন্তু বাড়ি তাঁরা পেয়েছেন, সেই এক সৌভাগ্য বলতে হবে। একে একে কলকাতা থেকে লোক আসতে শুরু হয়েছে। ভীড় বেড়েছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম চড়তে শুরু হয়েছে। বাড়ি আর কোথাও খালি পড়ে নেই।

গয়লা পাঁচ সের করে টাকায় দুধ দেবে কথা হয়েছিল। দিচ্ছিলও তাই কিন্তু একদিন এসে বললে—সাড়ে চার সেরের বেশী দিতে পারব না মাইজী!—খোল ভূষির দাম বেড়ে গেছে—

ঠিকে চাকর পদ্মলাল এসে বলে—আর দুটো পয়সা দাও পিসীমা—কেরোসিন তেলের দাম বেড়ে গেছে—

মৃন্ময়ীর হাত থেকে থার্মোমিটারটা পড়ে ভেঙে গেল সেদিন। কিন্তু দোকানে কিনতে গিয়ে আর পাওয়া গেল না। সাবু পাওয়া যায় না। হোল কি? পয়সা দিলেও কোন জিনিস্ পাওয়া যায় না, এমন জানলে কি আসতেন এখানে।

দুখানা ঘর। ছোট উঠোন একপাশে, সামনে একটুখানি খালি জমি। সুরুচির মনে হয় এখানকার এই ছোট বাড়িটার চারটে দেয়ালের আড়ালে সে যেন প্রচুর আরাম পেয়েছে। অনেকদিন আগে মনে পড়ে তার পরীক্ষার দিনগুলোর কথা। ভারি দুর্ভাবনায় ভরা ছিল সে-দিনগুলো। রাত জেগে পড়েও মনে হোত তার কিছুই যেন মনে থাকছে না। পরীক্ষার দিন সকালবেলা বাসে

যেতে যেতে যদি একটুখানি বসবার জায়গা সে পেত—মনে হতো অনেকখানি সে পেয়েছে।

তার পরীক্ষার চরম দুর্ভাবনার মধ্যে বাসে উঠে একটু বসবার জায়গা পাওয়ায়, দুর্ভাবনার কিছু লাঘব হবার কথা নয়।

তবু সেই এতটুকু আরামই সেই সময়ে পরম সামগ্রী বলে মনে হোত।

এখানে জানালার পাশে বসে বসে বাইরের ওই ক্রম-বর্ধমান সকালের দিকে চেয়ে তার মনে হয় যেন শান্তি পেয়েছে সে। অতীতটা তার অন্ধকারই বলা যায়, ভবিষ্যৎ আরো নৈরাশ্যময়—শুধু এই বর্তমানই যেন একটু শান্তিদায়ক। সারা পৃথিবীর লজ্জার হাত থেকে সে এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছে!

সকালবেলার প্যাসেঞ্জারটা যখন পশ্চিম দিকে চলে যায়, জানালায় অসংখ্য ছোট ছোট মুখ অস্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে।

ইয়ার্ডের একধারে একটা ইঞ্জিন ক্লান্তভাবে নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ে।

পেট্রোল কোম্পানীর ম্যানেজারের বউ মিসেস গুপ্ত ফিট্‌ফাট সেজে বাজার করতে যায় রাঁচি রোড দিয়ে। সিকি মাইল পেছন পেছন ছত্রিশগড়ী ঝি তার মেয়েকে নিয়ে চলে।

অটুট স্বাস্থ্যের বোঝা নিয়ে তিন চারটি কোল মেয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে কোরাস গান গাইতে গাইতে চলেছে।

এ-রাস্তায় হয়ত দিনে একবার ঝাঁট দেওয়া হয়। তবু সকাল বেলা যদি-বা পরিষ্কার থাকে, বিকেলে হলদে হলদে ফুলে রাস্তা ভরে যায়।

সামনের পিয়াল গাছটার গুঁড়িতে একটা কাঠবিড়ালী গর্ত করেছে। যখন চারদিক নিরিবিলি—সুড় সুড় করে গাছের গা বেয়ে নেমে আসে নিচেয়।

মাঝে মাঝে নদীর ওপারে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধৈর্যের মত সমস্ত শহর কাঁপিয়ে একটানা হুইসল্‌-এর শব্দ করে। প্রবেশাধিকারের দাবী জানাবার ওই বুঝি রীতি।

এখানকার দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্য নেই কিন্তু একঘেয়েমি আছে, তাও যেন বলা যায় না।

ডি'সুজাকে কোনদিন বাড়িতে দেখা যায় না। কখন চাকরি করতে যায়, আবার কখন আসে, পাড়ার লোক জানতেও পারে না।

মাঝরাত্রে এক একদিন ইংরেজি গান শুনে বোঝা যায় সাহেব বাড়ি ফিরেছে।

পাড়ার লোক বলে—ডি'সুজা সাহেব বিয়ে করেছিল, কিন্তু সে-বউ পালিয়েছে—

লোকটা মদ খায় কি না কে জানে, কিন্তু মাতলামি করতে দেখা যায় না কোনও দিন। মাঝে মাঝে রিক্সা করে একটা মেম সাহেবকে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

বাবুর্চিটাকে সেদিন পেছনের খিড়কীতে দেখতে পেলেন গিরিবালা। সরু চালের ভাত ছড়ানো আঁস্তাকুড়েতে।

গিরিবালা জিগ্যেস করলেন—এত সরু চাল তোমার সায়েব কোথায় পায় বলো তো—

ছোকরা চটপটে।

বলে—অনেক দূরে-দূরে যায় কিনা সায়েব—সেখান থেকে নিয়ে আসে—এই চাল চার টাকা করে মন—

—বল কী—চার টাকা? সস্তাতো খুব—

চক্রধরপুরের চাল মোটা—দামও বেশী। ডি'সুজা সাহেব বাইরে থেকে সস্তায় জিনিসপত্র আনে। উপায়ও করে খুব—খরচ করবারই লোক নেই। ছোকরাটাই চুরি চামারি করে দু'হাতে!

গিরিবালার ভাবনার আর অন্ত নেই। সদানন্দ কোথা থেকে এ সংসারের খরচ পাঠাবে! যেমন সস্তার জায়গা হবে ভাবা গিয়েছিল—মোটে তেমন নয়! জিনিসপত্রের দাম চড়ছে। একটা লোহার কড়া দুটাকার কমে দেয় না। ঘি-এর দাম চড়া। মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ। তার পথ্য সুলভ নয়। সুরুচির এ সময়ে সাবধানে থাকা উচিত। গিরিবালার ভাবনার আর অন্ত নেই। কেমন করে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যাবে, কে বলতে পারে।

বর্ষাকাল এসে পড়েছে। এখানে এক একদিন এমন বৃষ্টি হয় যে, দু'তিন দিন ধরে আর থামে না। চারিদিকে বৃষ্টির আচ্ছাদনের মধ্যে জানালায় বসে সুরুচি নিজের মনের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। সেখানে শুধু ভয় লজ্জা আর সংশয়। কোন অপরিচিত পরিবেশে যেন তার নির্বাসন হয়েছে!

কিম্বা সে যেন অজ্ঞাতবাস করতে এসেছে এখানে। তার বিগত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আর কোনও জিনিস দেখা চলবে না। এবার থেকে নতুন দৃষ্টিকোণ আবিষ্কার করতে হবে! এই বিদেশের লাল মাটিতে তার নতুন জীবনের বীজ রোপণ করবে সে! আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতাই হবে তার মূলমন্ত্র! ভাবতান্ত্রিক হবার যুগ শেষ হয়েছে তার। বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আত্মঘোষণা করবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করবে।

কিন্তু আবার যখন রোদ ওঠে চারিদিকে, পিয়াল গাছের গুড়ি বেয়ে কাঠ বিড়ালীটা সুড় সুড় করে নিচে নেমে আসে, তখন মনে হয় বেশ প্রশান্তির নীড়ে সে ঠাঁই পেয়েছে! হয়ত এমনি নির্বিবাদ আর নিশ্চিন্ত নিটোল দিন তার চিরস্থায়ী হবে। কাছে দূরে চারিদিকে অলস কর্মময়তা! ওই দ্রুতগতি ট্রেনের আসা যাওয়া, ওই নিরাসক্ত সূর্যের উদয়াস্ত, ওই পোড়ো মাঠে ছেলেটার সাইকেল চালাতে শেখা আর তার এই জানালায় বসে পরম ঔদাস্যের সঙ্গে চেয়ে থাকা—সমস্তটা নিয়েই এই পৃথিবী। এই কর্মময়তাও সত্যি—আর এই আলস্যও সত্যি!

এখানে এই চক্রধরপুরে দুয়ে মিলে একাকার হয়ে গেছে।

বিগত জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে স্বরুচির লজ্জা হয়। কী ছেলেমানুষই যে ছিল সে। শ্রীলতার য়্যাডোনিসের গল্প, প্রিন্সের বেহিসেবিতার গল্প, তার রূপের প্রশংসা,—আজ যেন স্বরুচির কাছে সে সব নিরর্থক হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিকারের বস্তু যে কী তাও আজ তার কাছে কোনও রূপ পরিগ্রহ করেনি। এইটুকু শুধু বুঝেছে যে, এতদিন যা করেছে তা ভুল—এইবার থেকে অন্য পথে চলতে হবে তাকে!

এক একবার মৃন্ময়ী ডেকে পাঠান।······

—একটু এখানটায় হাত বুলিয়ে দেতো মা—

মৃন্ময়ীর বুকটায় যেন এক মন ভারী পাথর বাঁধা রয়েছে। কথা বললে কষ্ট হয় বেশ। তবু স্বরুচির কথা ভেবে তাঁরও শান্তি নেই।

কথা তো কেউ শোনে না তাঁর! একটু বড় হবার পর থেকে—যেদিন থেকে কলেজে যেতে শুরু করেছে—স্বরুচি তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। সদানন্দবাবুও কিছু বলতেন না। তারপর যেদিন থেকে শেখর এল—সেদিন থেকে মৃন্ময়ীর কথার মূল্যই বা কে দিয়েছে।

সেদিন রাত্রে শান্ত ভদ্র ডি'সুজা সাহেব হঠাৎ ভয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করলে।

এ বাড়ির লাগোয়া বাড়ি। সব শব্দই স্পষ্ট কানে আসে। সন্ধ্যে থেকেই ভীষণ চীৎকার শুরু হোল। বোঝা গেল সাহেব প্রকৃতিস্থ নেই। গান ধরেছে বেসুরো বেতালা। কোনও দিন এমন করে না সাহেব। ঘটি বাটি ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। খাঁচার মুরগীগুলো ভয়ে চীৎকার শুরু করে দিলে। ছোট জাতের কুকুর হলে কি হবে, তাদের গলার আওয়াজ কিন্তু পাওয়া গেল না। রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের উন্মত্ততা যেন বাড়তে লাগল। গিরিবালা ভয় পেয়ে গেলেন। তখনই কানাইকে বলেছিলেন—ফিরিঙ্গীর বাড়ির পাশে থাকা—আর বাড়ি পেলে না কানাই—

সমস্ত রাত ডি'সুজা সাহেবের সে কি আস্ফালন! ছোকরা বাবুর্চিটাকে বোধ হয় কিছু মার খেতেও হোল। ঘুমের ঘোরের মধ্যে সাহেবের চীৎকার সারারাত গিরিবালার কানে এসেছে। কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গিরিবালা দেখলেন সমস্ত শান্ত। কাল যে পাশের বাড়িতেই অত ঝড় বয়ে গেছে, আজ এখান থেকে তার কোনও চিহ্নই পাবার উপায় নেই।

এক ফাঁকে বাবুর্চিটাকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন গিরিবালা।

—ও ছোকরা, কাল তোমার সায়েবের কী হয়েছিল, আমরা যে এদিকে ভয়ে মরে গিয়েছিলুম—

যেন কিছুই ঘটেনি কাল, এমনি নির্লিপ্ত ভাব তার মুখে। বললে—বছরে একটা দিন আমার সায়েব একটু বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে মাইজী,—মেম-সায়েবের কথা মনে পড়ে যায় হয়ত—

বছরে একটি দিন! গিরিবালা বললেন—কেন? তোমার মেমসায়েব পালিয়ে গেছে নাকি সায়েবকে ছেড়ে?

ছোকরা বললে—পালিয়ে যাবে কেন মাইজী, সায়েবই তাড়িয়ে দিয়েছে—যে-তারিখে তাড়িয়ে দিয়েছে, বছরের সেই তারিখটাতে সায়েব খুব মদ খায়—মাতলামি করে—

পরের দিন দেখা যায় সাতটা কুকুর নিয়ে শিষ দিতে দিতে ডি'সুজা সাহেব স্টেশনের দিকে চলেছে। শান্ত, ভদ্র, শিষ্ট মানুষটি। সুরুচিদের বাড়ি কিম্বা অন্য কোনও বাড়ির দিকেই নজর নেই। কাল রাত্রের চীৎকার

যেন ওই লোকটির দ্বারা সম্ভবই নয়। ও যেন আলাদা আর একজন মানুষ।

এক একদিন দেখা যায় মিসেস গুপ্ত ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেড়াতে চলেছে। পাশে পেট্রোল কোম্পানীর ম্যানেজার মিস্টার গুপ্ত হাফপ্যাণ্ট পরা পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে চলেছেন। লোকে জানে আড়াই শ টাকা মাইনে পান মিস্টার গুপ্ত। কিন্তু মিসেস গুপ্তের সাজপোশাকের বহর দেখে রেলের কণ্ট্রাক্টার পালা সিংও চম্‌কে ওঠে!

মিসেস গুপ্ত দুধের সঙ্গে কমলা লেবু বেটে তাই দিয়ে স্নান করে। গায়ের রং নাকি ফর্সা হয় তাতে। চোখে অলিভ অয়েল মাখিয়ে ঘুমোয়। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। গিরিবালার তো বিশ্বাসই হয় না।

কিন্তু দুদিকে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে বাগানের মধ্যে লোকে মিসেস গুপ্তকে পালা সিং-এর সঙ্গে ব্যাড্‌মিন্টন খেলতে দেখেছে।

সুরুচির কানেও সব খবর আসে। কিন্তু তার নিজেরই মনে হয়—ও-সব আলোচনা করবার অধিকারই বা তার কতটুকু।

পাড়ার বুকিং ক্লার্কের বউ বেড়াতে এলেন অযাচিতভাবেই একদিন।

—শুনলাম নতুন এসেছেন আপনারা, আমারও বাপের বাড়ি কলকাতায়, এক দেশেরই লোক—আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারিনে—

—এসেছেন ভালোই তো, সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকি, বউ-এর অসুখ, সময়ই বা কোথায় পাই যে···বললেন গিরিবালা।

—কী অসুখ দিদি?

কয়েকদিন গেল। কিন্তু দিনকতক পরেই গিরিবালা বুঝতে পারলেন। এ-পাড়ায় কেমন করে জানি না রটে গেছে থাইসিস্ নামে একটি ছোঁয়াচে আর কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত রোগী এখানে এসেছে গোপনে বায়ু পরিবর্ত্তনে। গিরিবালার পক্ষে ভালোই হোল। পাড়ার কেউ আর আসবে না। বেশ নির্বিবাদে নিশ্চিন্তেই কাটে কয়েকটা দিন।

সন্ধ্যেবেলার প্যাসেঞ্জারে খবরের কাগজ আসে।

যুদ্ধ যেন হাজার পায়ে লাফিয়ে চলেছে। রাশিয়া জার্মানীর হাতে এবার

হারে বুঝি। কেমন যেন সমস্ত গুলিয়ে গেল সুরুচির মাথায়। যুদ্ধটা ভারী সোজা ছিল প্রথমে। সুরুচি যে এবার কার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবে ভাবতে পারা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-ই জিতুক গ্রেট বিটেন যেন কেমন কাবু হয়ে পড়েছে। এদিকে ভারতবর্ষ ওদিকে ইজিপ্ট, ওখানে প্যালেস্টাইন—সব যেন বারুদখানা হয়ে রয়েছে। একটা দেশলাই কাটির তোয়াক্কা। কে জানে কি আছে এদেশের কপালে—কিন্তু সত্যি সত্যিই জাপান এখানে এই দেশে আসবে নাকি ? কিন্তু সমস্তই তো নির্ভর করছে জার্মানীর ওপর ! জার্মানী যদি এমনি ধারা জয়যাত্রা বজায় রাখতে পারে, তবেই জাপানের ওপর ভরসা।

অবাক করলেন কিন্তু মিসেস গুপ্ত।

এক গাদা হ্যাণ্ডবিল আর চাঁদার খাতা নিয়ে তিনি সোজা এসে হাজির। জর্জেট শাড়ি পরনে। ফিটফাট, আঁটসাঁট পোশাক। বললেন—এখানকার 'মহিলা আত্মনির্ভর সমিতির' তরফ থেকে আমি আসছি—

চক্রধরপুরের মেয়েরা একটি সমিতি করেছে। নাম দিয়েছে 'মহিলা আত্মনির্ভর সমিতি'।

গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। যাতে মেয়েরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, জীবনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, তাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এমন অনেক কুমারী মেয়ে আছে যাদের বিয়ে হয়নি, এমন অনেক বিধবা আছে যাদের পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়……

ভাল ভাল কথা হ্যাণ্ডবিলে লেখা আছে।

মিসেস গুপ্ত লম্বা বক্তৃতা দিয়ে চাঁদার খাতা বাড়িয়ে দিলেন।

চক্রধরপুরের সমস্ত মহিলাকে মেম্বর হতে হবে এই সমিতির। দেশের এই দুর্দিনে যখন বাইরে থেকে শত্রু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, তখন দেশের মেয়েদেরও কিছু কর্তব্য আছে বৈকি !

আজ সন্ধ্যায় গার্লস্কুলে মিটিং বসবে। সেখানে সুরুচির উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয় !

সন্ধ্যেবেলা সুরুচির মনে পড়লো—'মহিলা আত্মনির্ভর সমিতি'র মিটিং এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলার আপ প্যাসেঞ্জারটা আজ এক ঘণ্টা লেট। মাঠের ওপার দিয়ে ট্রেনটা শব্দ করতে করতে চলে গেল। পূজারীর দোকানে রেডিও চালিয়ে দিয়েছে—এখান থেকে শোনা যায়।

রাঁচি রোড প্রায় নির্জন। এ-অন্ধকারে একলা চলতে ভয় করে। স্টেশনের ইয়ার্ডে কিন্তু খুব আলোর ছড়াছড়ি। শান্টিং-এর শব্দ আসছে অত দূর থেকে। আকাশময় অপার নীরবতা। সুরুচির মনে হোল—আবার সেই চারিদিকের অলস কর্মময়তা তাকে পরিবেষ্টিত করেছে। কী প্রয়োজন তার মিটিং-এ গিয়ে। নিজের আত্মরক্ষা নিজেকেই করতে হবে। এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সে যেন আপন অন্তর্যামীকে আবিষ্কার করবে!

ডি' সুজা সাহেবের বাবুর্চি সেদিন পাঁচ সের সরু চাল দিয়ে গেল।

গিরিবালা বললেন—দাম কত দিতে হবে—চার টাকা করে মন হলে পাঁচ সেরের দাম—

ছোকরা বললে—দাম দিতে হবে না মাইজী—সায়েব দাম নিতে মানা করেছে—

অনেকদিন ডি' সুজা সাহেবকে দেখা যায়নি। গাড়ি চালিয়ে একশ-দেড়শ মাইল দূরে চলে যায়, আবার যখন সবাই ঘুমোচ্ছে, তখন দুদিন পরে হয়ত রাত দুটোর সময় বাড়ি ফিরে আসে। সাতটা কুকুর একপাল মুরগী, কয়েকটা হাঁস আর একটা বেড়াল। বিরাট সংসার ডি' সুজা সাহেবের।

সেদিন গিরিবালা নিজে গিয়েছিলেন বাজারে। ফেরবার সময় সরকারী ডাক্তারকে নিয়ে একেবারে ফিরলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার যখন ঘর থেকে বেরুল, গিরিবালা ডাক্তারের হাতে আটটি টাকা গুঁজে দিলেন।

দুটি টাকাই রেট কিন্তু বেশী নিতেও আপত্তি করলে না ডাক্তার। ডান দিকের ইনসাইড পকেটে টাকাটা পুরে রেখে রিক্সায় উঠে বসলো।

পদ্মলাল চললো পেছন পেছন, ওষুধ আনবে সে।

মৃন্ময়ী চুপি চুপি ইঙ্গিতে ডাকলেন গিরিবালাকে—ডাক্তার কী বললে দিদি?

গিরিবালা বললেন—সব ঠিক আছে, কিছু ভয় নেই—দুটো ওষুধ দিয়েছে। দিনে তিনবার করে তাই খেতে হবে—

শেষ রাত্রের দিকে গিরিবালা ডাকতে লাগল—রুচি রুচি—কি বলছিস মা—ভয় কি। এই যে আমি—

স্থরুচি যেন বিড়বিড় করে কী সব ঘুমের ঘোরে বলছে।

গিরিবালার ঠেলাঠেলিতে ঘুম সত্যিই ভেঙে গেল স্থরুচির।

মনে হল এতক্ষণ যেন সে স্বপ্ন দেখছিল। খুব ভীষণ স্বপ্ন। চক্রধরপুরের নদীর ধারে সে বেড়াতে গেছে, হঠাৎ নজরে পড়ল—চারিদিকে যেন অসংখ্য সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপের বেড়াজালে সে আটকে পড়েছে। ফেরবার রাস্তা নেই।

সকাল বেলা একবার পিওন আসে। রাস্তায় বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সদানন্দবাবু।

এবার অনেকদিন স্থরুচিদের কোনও চিঠি আসেনি। বনমালীবাবুর কাছ থেকে কিছু আগাম নিয়ে সেদিন পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে টাকা পাবার রসিদও এসেছে। এবার অবশ্য সদানন্দবাবুরই চিঠি দেওয়ার কথা।

কিন্তু তাদেরও তো বুদ্ধি করে চিঠি দিতে হয় একটা!

সিংজী সদানন্দবাবুকে দেখেই বেরিয়ে এল।

বললে—মাস্টার সাহেব, ধোপা রোজ এসে এসে কদিন থেকে ফিরে যাচ্ছে—

নিজের জামা কাপড়ের দিকে নজর পড়ল। ময়লা হয়েছে বটে! সত্যি এ পরে ভদ্রলোকদের কাছে যাওয়া যায় না আর।

কাল দুপুর বেলা ধোপা আবার আসবে। সমস্ত জামাকাপড়গুলো দিতে হবে ধুতে। একটা সাবানও কিনে আনতে হবে। গেঞ্জীটা, রুমালটায় নিজে হাতেই সাবান দিতে হবে। এখন থেকে তো নিজের হাতেই সব করতে হবে। অনেকদিন দাড়ি কামানো হয়নি।

সেদিন অতুলবাবু বলেছিলেন—আবার কি দাড়ি রাখতে শুরু করলেন নাকি মাস্টার মশাই—

আয়নাতে মুখ দেখে সদানন্দবাবু বুঝেছেন—মুখে অনেক বড় বড় দাড়ি বেরিয়ে গেছে। চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে। শরীরে যেন সেই আগেকার মত সামর্থ্য নেই আর। সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেও আগে ক্লান্তি আসতো না। এখন মনে হয়—চুপ করে শুয়ে থাকলে বেশ ভালো লাগে যেন।

রাস্তায় চলতে চলতে সিংজীর কালকের কথাগুলো মনে পড়লো।

বলিষ্ঠ বেহারী দারোয়ান।

বাংলা দেশে এসেছে ভাগ্য-অন্বেষণে। তবু ওদের দেশকে ভুলতে পারে না।

সিংজীর মেয়ে একটা আছে। সদানন্দবাবু একটা বেতের লাঠি কিনে দিয়েছেন সিংজীকে। লাঠিটা বোধহয় কাজে লাগলো না আর।

সিংজী বলে—দেশ ওদের স্বাধীন হয়ে গেছে। ওদের দেশওয়ালী লোকেরা এসে বলেছে যে সেখানে আর ইংরেজ রাজত্ব নেই। থানা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। ট্রেনের লাইন উপড়ে ফেলেছে। সব কংগ্রেস-রাজ হয়ে গেছে চারিদিকে।

কদিন ধরে চারিদিক থেকেই খবর আসছে গোলমালের। হাঙ্গামায় অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোনের লাইন বন্ধ—তার কেটে দিয়েছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়েছে।

খবরের কাগজে সব খবর ছাপে না। মুখে মুখে অনেক গুজব চলছে। বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে কারা সব কত কী লিখে রেখে দিয়েছে। ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল, প্যাম্ফ্লেট বিলি হতে শুরু হয়েছে গোপনে।

সেদিন একখানা প্যাম্ফ্লেট দেখেছিলেন সদানন্দবাবু। অতুলবাবুর মেসে শ্রীপতি এনেছিল। পড়লে গায়ের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে আসে। লাল কালিতে ছাপা। রক্তের স্বাক্ষর।

তাতে ছিল বেহার ফ্রণ্টের কাহিনী। কতগুলো ওদের ফ্রণ্ট? কী ওদের প্রোগ্রাম?

সদানন্দবাবুর ভয় করে। এ কি সেই গৌরদাসের দলের কাজ! কে জানে কোথায় ছিল এতদিন এ শক্তি!

কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি কলকাতায় ওই রকম শুরু হয়ে যায়। যদি চক্রধরপুরের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তা হলে স্নরুচিরা আসবে কেমন করে! তা ছাড়া ট্রেনই যদি না চলে, খবরই বা পাবেন কি করে!

চিঠিও তো আসতে পারবে না।

তিনি রইলেন এক জায়গায় আর তারা সবাই রইল আর এক জায়গায়—কেউ কারো খবর জানতে পারবে না যে!

মেস থেকে সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখনও ইস্কুলের কয়েক মাসের মাইনে বাকি পড়ে আছে।

অতুলবাবু বললেন—আজ যে এত সকাল সকাল খেতে বসেছেন মাস্টার মশাই—?

ঢালা লম্বা রোয়াক। এক সঙ্গে চোদ্দ পনেরো জন খেতে বসা যায়।

ভূপতিবাবু কলতলায় স্নান করতে করতে গামছা কাচছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন—একি, খেতে বসে গেছেন নাকি! এ হে বড্ড মিস্ করলেন, আজ যে মাংস হচ্ছে মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবু বললেন—তা হোক্—আমার দেরী হয়ে যাবে—

অতুলবাবু বললেন—কমাস থেকে সবাই বলছে অনেকদিন মাংস হয়নি, তাই রবিবার দেখে মাংস আনলুম—

সদানন্দবাবু নির্লিপ্তভাবে বললেন—বেশ করেছেন, ভালো করেছেন—

অতুলবাবু ভাতের থালার দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন—চালগুলো কেমন খাচ্ছেন মাস্টার মশাই? বড় মোটা না? ওই চালই সাড়ে আট টাকা করে নিলে—

সদানন্দবাবু বললেন—সেদিন ট্রামে এক ভদ্রলোক বলছিলেন, এবার চালের দাম বারো টাকা পর্যন্ত উঠবে দেখবেন—

অতুলবাবু বললেন—আশ্চর্য নয় কিছুই—কিন্তু বাইরে যা ঘটছে, তাতে প্রাণে বাঁচলে বুঝি···ইউ. পি. বেহার, আর মেদিনীপুরে কি হচ্ছে শুনেছেন?

এতক্ষণে মুখ তুললেন সদানন্দবাবু। বললেন—নতুন কিছু শুনেছেন নাকি?

অতুলবাবু বললেন—আমাদের অফিসের এক ছোকরার দেশ ওদিকে, যা শুনলুম তার কাছে, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ভয়ের কথা মশাই—সোলজার ডেকেছিল ভলেন্টিয়ারদের ওপর গুলি করবার জন্যে, সোলজাররা রাজী হয়নি, শেষে নাকি গুর্খা নিয়ে এসে···একটা রেলের স্টেশন নাকি আজ দশদিন ধরে পুড়ছে···ম্যাজিস্ট্রেটকে হাতকড়া দিয়ে জেলে পুরে রেখেছে আর তার চেয়ারে বসেছে একজন কংগ্রেসওয়ালা—

সদানন্দবাবু উঁচু হয়ে পিঁড়ির ওপর উঠলেন।

বললেন—বলেন কী?

—আর বলবো কী! এসব কথা কি আর খবরের কাগজে বেরোবে? কিন্তু এদিকে গান্ধীকে সদল-বলে জেলে পুরে যে কোথায় রেখেছে কেউ টের পাচ্ছে না—এ-সময় সুভাষ বোস কী করছে কোথায় কে জানে—

ভূপতিবাবু কলঘর থেকে চীৎকার করে উঠলেন—মাংস কদ্দুর হল ঠাকুর—

খানিক পরে অতুলবাবু বললেন—আসছে মাস থেকে চার্জ একটু বেশি পড়বে মাস্টার মশাই—চালের দাম বেড়ে গেল, ঘি, চিনি সবই বাড়তে শুরু করেছে—শেষ পর্যন্ত কী যে হবে—

মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে সদানন্দবাবু সেই কথাই ভাবছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কী যে হবে! স্বাধীনতা আসছে দেশে! ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে হবে।

সমস্যাসঙ্কুল জীবন!

মেসের ফুডিং চার্জ বাড়বে। চক্রধরপুরের ট্রেন বন্ধ হয়ে যাবে। কোর্ট, থানা, পুলিশ—কিছু নেই—ভাবতেই কেমন লাগে।

একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্যে ইলেকট্রিক আলো নিবে গেলে কত অসুবিধে হয়—আর ওই অরাজক অবস্থার কথা ভাবতেই কেমন ভয় লাগে সদানন্দবাবুর! তাঁর মনে হয়, স্বাধীনতা আসুক কিন্তু তার জন্যে রক্তপাত কি অনিবার্য? সংসার পরিবার সমস্ত নিয়ে কোথায় থাকবেন তিনি! হয়ত খেতেই পাওয়া যাবে না কয়েকদিন। সিংজী বেহারী মানুষ—ওদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। কথা বলার ভঙ্গীতে কত গর্ব ফুটে ওঠে।

স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়ে দেখা হোল না।

রবিবারেও অফিসে গেছেন।

কেরানীকুলচূড়ামণি। সাধারণ কেরানীরা ছুটিতে অফিসে না গেলেও চলবে কিন্তু তাঁর না গেলে চলে না।

এতদূর যখন এলেন তখন স্কুলটা দেখে গেলে হয়। জলখাবার ঘরের কাছে একটা অশথ গাছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। দারোয়ান সত্যনারায়ণকে রোজ জল দেবার কথা বলে দিয়েছেন। কত ছেলে ওই স্কুল থেকে তাঁরই হাত দিয়ে মানুষ হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে—স্কুলের প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি বেঞ্চ, প্রতিটি ছাত্র কত আদরের, কত স্নেহের সামগ্রী!

গেটের সামনে গিয়ে কিন্তু থেমে যেতে হল।

ডুজন যুদ্ধের পোশাক পরে পাহারা দিচ্ছে দরজা।

সামনের সাইন বোর্ডটা দেখে বোঝা গেল স্কুলটা এ. আর. পি-র অফিস হয়েছে। সদানন্দবাবুকে ওরা কেউ চেনে না। ওখানে হয়ত ঢোকবার অধিকার নেই আর।

খাকি পোশাক পরা একটা ছেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

—নমস্কার মাস্টার মশাই—

অদ্ভুত পোশাক। মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ, পায়ে বুট!

অনেকক্ষণ পরে চিনতে পারলেন।

ক্লাস নাইনের ছেলে রঙ্গলাল! রঙ্গলাল ছেলেটি গরীব—কিন্তু লেখা পড়ায় ভালো।

বললেন—তুমিও এ. আর. পি. হয়েছো নাকি?

রঙ্গলাল বললে—হ্যাঁ স্যার—

—কত করে দেয়?—জিগ্যেস করলেন সদানন্দবাবু।

—তিরিশ টাকা আর ডিয়ারনেস এলাউন্স—সব মিলিয়ে…

ছোট ছেলে রঙ্গলাল। পোশাক পরিচ্ছদ পরে যেন খুব কৃতার্থ হয়েছে মনে হোল।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—বেশ বেশ—।

কিন্তু মনের সায় পেলেন না। বিহারেও কি ওই রকম এ আর. পি. হয়েছে! সেখানেও কি ছাত্রেরা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এ. আর. পি-তে ঢুকেছে! সারা ভারতবর্ষময় কত ছাত্রের লেখাপড়া নষ্ট হোল! ওরা সব সোনার ছেলে—ওরাই একদিন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে। কোটি কোটি ভারতবাসীর ওরাই ভরসা। ওদের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে ভারতবর্ষ! এতগুলো বছর আর কী ওদের পূরণ হবে!

•

ট্রামে উঠেছিলেন। ফেরার পথে ভীড় কিছু হয়েছে। ফাঁকা দেখে সামনের সীটে বসেছিলেন। পকেট থেকে নোট বই বার করে লিখতে লাগলেন।

সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছেন তিনি। ১৮৫৭ খৃঃ মে মাসে মীরাটের সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করে সিপাইরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে

চলল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে তারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করল। কাণ-পুরের নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে প্রচার করলেন। লক্ষ্ণৌতে নিহত হলেন স্যার হেনরী লরেন্স। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বহ্নি। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তাঁতিয়া টোপি আর ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ……সমস্ত ভারতবর্ষে সেই ইংরেজ-বিদ্বেষ, সেই 'ভারত ছাড়' রব চরম পরিণতি পেলে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে……

হঠাৎ চারিদিকের চীৎকারে সদানন্দবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—

—আগুন—আগুন—

ট্রাম থেকে সবাই নেমে পড়েছেন।

ট্রাম থেমে গেছে।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে চারিদিক। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

এই আকস্মিক বিপৎপাতের মধ্যে কী যে তাঁর কর্তব্য যেন ভেবে পেলেন না তিনি। নোট বই, পেন্সিল, সিল্কের চাদর সমস্ত নিয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। একি হোল! কলকাতাতেও শুরু হল নাকি?

—ও মশাই নেমে আসুন—বাইরে থেকে কে চীৎকার করে উঠলো।

পুলিশ এসে গেছে চারিদিকে। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সদানন্দবাবুর নিঃসহায় সম্বলহীন মনে হোল নিজেকে।

একান্তে সরে এলেন তিনি।

তারপর যেন যন্ত্রচালিতের মত চলতে লাগলেন নিজের আস্তানা লক্ষ্য করে। এখানেও শুরু হবে নাকি বিহারের মত, মেদিনীপুরের মত, সাতারা জেলার মত!

কবেকার সেই যৌবনের দিনের অলক্ষিত স্বপ্ন।

গৌরদাসের আজীবন সাধনার ফল!

কিন্তু এখন যে বড় দেরী হয়ে গেছে। এত দেরীতে তো আর সহ্য হবে না তাঁর। এখন যে শান্তি চায় মন। সংগ্রামের সে তেজ নেই আর শরীরে।

মাথাটা গরম হয়ে গেছে।

সদানন্দবাবু পকেট থেকে শিশিটা বার করলেন, তারপর একটু ঠাণ্ডা জল বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে মাথায় থাবড়ে দিলেন।

সিপাহী বিপ্লবের নতুন এক পরিচ্ছেদ বুঝি আবার রচনা হচ্ছে। এবার যদি আবার সিপাহী বিপ্লব হয়।

শুধু একটা নয়। রাস্তায় আরো কয়েকটা ট্রাম পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভীড় জমেছে জায়গায় জায়গায়। বৃহৎ পৃথিবীতে যে-আগুন লেগেছে তারই কিছু টুকরো যেন কলকাতায় এসে পড়েছে। সে আগুনের তুলনায় এ তো যৎসামান্য।

এক জায়গায় অনেক লোকের ভীড়। সদানন্দবাবু ভীড় ঠেলে গিয়ে দেখলেন—ভেতরে কিছু হচ্ছে নাকি ?

একজনকে জিগ্যেস করলেন—ভেতরে কী হচ্ছে মশাই ?

লোকটি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সদানন্দবাবুর মুখের দিকে।

তারপর একমুখ দাড়ি আর ময়লা জামা কাপড় দেখে হয়ত কৃপা হোল, বললে—এখানে আর কি দেখছেন, দেখে আসুন নর্থ ক্যালকাটায়······

—সেখানে কী হয়েছে মশাই······কৌতূহলী সদানন্দবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

কিন্তু সে ভদ্রলোক বোধ হয় এমন অর্বাচীনের সঙ্গে কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার সদানন্দবাবু ফিরে এলেন।

পৃথিবীব্যাপী কী দুর্যোগই শুরু হয়েছে। আজীবনের সমস্ত আদর্শবাদ ভেঙে চুরে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ওপর দিয়ে একটা মিছিল চলেছে। কী যেন তারা চীৎকার করে বলছে। কাছে আসতেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

মিছিল বটে—কিন্তু ছোট মিছিল। জন কয়েক লাল ঝাণ্ডা নিয়ে শ্লোগান বলতে বলতে চলেছে—

একজন চীৎকার করে বলছে—জাপা-ন্‌কে—

আর সবাই শেষ করছে সমস্বরে—রুখতে হবে।

এ আবার কারা! কাদের এ বাণী! জাপানকে ভারতবর্ষে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ঢুকতে আমরা দেব না। নইলে জাপান আমাদের ওপর অত্যাচার করবে!

ভালো কথা!

কিন্তু যারা ঢুকে পড়েছে, ঢুকে যারা রয়েছে, তাদের কি রুখবো না? তাদের

কি তাড়াবার চেষ্টা করবো না। সদানন্দবাবু বুঝতে পারলেন না। ওই ট্রাম যারা পোড়াচ্ছে ওরাই বা কারা আর এই মিছিলের দল—এরাই বা কারা!

বড় সমস্যা। চারিদিকে যেন সমস্যা বড় ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, মেসের চার্জ বেড়ে যাবে—অতুলবাবু বলেছেন। ওদিকে ট্রাম পোড়াচ্ছে! নর্থ ক্যালকাটায় নাকি আরো ভীষণ কাণ্ড। আর এদিক থেকে জাপানকে রুখতে হবে। সকলের ওপর জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত! বাড়ির সামনে ব্যফল্ ওয়াল তুলেছে। স্লিট ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে। বোমা পড়বে শহরে। কতদিকে নজর দেওয়া যায়!

বাড়ির সামনে আসতেই সিংজী বললে—মাস্টার সাহেব, আপনার টেলিগ্রাম—

টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম কেন? কে টেলিগ্রাম করতে যাবে? সুরুচিদের খবর অবশ্য পেয়েছেন—এবং এবার সদানন্দবাবুরই উত্তর দেবার পালা। কিন্তু বিপদ না হলে কে আর টেলিগ্রাম করে।

খামটা ছিঁড়ে ফেললেন।

পাঠিয়েছে দিদি। গিরিবালা চক্রধরপুর থেকে জানিয়েছে, মৃন্ময়ীর শরীর খারাপ। যদি সুবিধে হয় সদানন্দবাবু যেন চলে আসেন।

সকাল থেকে যে-সমস্ত বিপদ একটার পর একটা আসতে শুরু হয়েছিল, তারপর এই টেলিগ্রাম যেন চরম একটা পরিণতির আকার দিলে।

এখন কী করা যায়। কিছু টাকা! কিছু টাকাও তো সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখান থেকে গেলে কি তাঁর চলবে। অনেক ক্ষয় অনেক ক্ষতি সামনে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে। অসুখ তো মৃন্ময়ীর অমন হয়েই থাকে।

কিন্তু এবারের ব্যাধি যে তার অন্য রকম। বহুদিন পরে আবার জীবন-মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়ানো। আবার সেই আলো-আঁধারের ষড়যন্ত্র! আবার সেই নতুন করে প্রাণ সঞ্চার। পৃথিবীর সেই আদিমতম সত্যোপলব্ধি!

কিন্তু সদানন্দবাবু সেখানে গিয়েই বা কী করবেন? কাকেই বা চেনেন তিনি? কেন এমন হল।

যদি আবার সকলকে নিয়ে এখানে ফিরে আসতেই হয়, তখন? আবার এই কলকাতায় সেই সবজীবাগানের বাড়িতেই বাস করতে হবে নাকি!

সদানন্দবাবু কিছু ভেবে পেলেন না কী তাঁর কর্তব্য! যদি যেতেই হয় তবে কখন কেমন করে যাবেন তাও যেন তাঁর অজ্ঞাত!

সিংজী অবাক হয়ে দেখছিল সদানন্দবাবুর মুখের দিকে।

বললে—বাবুজী কিছু খারাপ খবর আছে?

—কিছু না—বলে সদানন্দবাবু ওপরে নিজের ছোট ঘরে উঠে গেলেন।

জামা কাপড় কিছু আছে কি না কে জানে। তা ছাড়া কখন ট্রেন ছাড়ে তাও জানা নেই! তারপর ট্রাম বাস সব বন্ধ!

কেমন করে যাবেন হাওড়া স্টেশনে। সমস্ত বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে এল তাঁর চোখের সামনে। এ-বিপদে কে যে তাঁকে সাহায্য করবে জানা নেই!

বনমালীবাবুর কাছে এই সেদিন টাকা নিয়ে এসেছেন। সেখানে আর হাত পাতা যায় না। ইস্কুলের বাকি মাইনেটা যদি পাওয়া যেত। এদিকে অতুল-বাবুকেও কিছু দিয়ে যেতে হবে! মেসের খাওয়া প্রায় এমাসের অর্ধেক হয়েছে। আধ মাসের দামটা মিটিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল।

কোনও কিছু ঠিক করতে না পেরে সদানন্দবাবু সেই ছোট ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

যেন কোন সমস্যার সমাধান আর হবার নয়।

তারপর নিতান্ত নিরুপায়ের মত পকেট থেকে কাচের শিশিটা বার করলেন। তারপর চীৎকার করে ডাকলেন—সিংজী ও সিংজী—

সিংজী খানিক পরে এল। সদানন্দবাবু বললেন—সিংজী, এই শিশিটাতে একটু জল ভরে আনতে পারো, ঠাণ্ডা জল—

পুলিশ ফাঁড়ি থেকে রাত্রি বেলা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে অনেকবার বেজে উঠলো। পূজারার দোকানের চড়া পেট্রোম্যাক্স বাতিটা তখন নিবে গেছে। দূরে, অনেক দূরে পাহাড়ের ঢালু গায়ে আগুন ধরে গেছে। কোলদের গ্রাম থেকে অস্পষ্ট মাদলের আওয়াজ ভেসে আসে। চক্রধরপুর নিস্তব্ধ।

কেবল দু একটা নিশাচর পথচারী কুকুর রাত্রির জমাট অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে চীৎকার করে ওঠে।

প্রথমে অস্পষ্ট।

নীলিমার পটভূমিকায় ক্লান্ত বাদুড়ের পক্ষ-সঞ্চালনের মৃদু শব্দের মত অস্পষ্ট!

মনে হয় ভূমিকম্পের আগে পৃথিবীর নিম্নতম প্রান্তে যে অস্ফুট গুঞ্জন, যে অব্যক্ত আলোড়নের স্পন্দন ওঠে—এ-ও যেন তেমনি।

খেয়ে দেয়ে প্রতি রাত্রের মত স্বরুচি শুয়েছিল এবং ঘুমিয়েও পড়েছিল।

তারপর সেই ক্ষীণতম যন্ত্রণার অনতিতীব্র আঘাতে ঘুম ভেঙে গেছে তার! কে যেন তার ঘুমের সমুদ্রে হঠাৎ তরঙ্গের আন্দোলন তুলেছে।

স্বরুচি আস্তে আস্তে চোখ মেললো! ও-ঘরে শুয়ে আছে মা। আর এ-ঘরে তার পাশেই গিরিবালা।

অন্ধকার ঘর।

স্বরুচির ক্লান্ত শরীরে বহু বেদনার সমাবেশ। শরীরের মাংস, অস্থি, মজ্জা ভেদ করে একটা বোবা যন্ত্রণা মাথা কুটে মরছে।

সে আসছে! সে আসছে!!

পদ্মলাল তৈরীই ছিল।

গিরিবালা তাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রিক্সা করে যাবে পদ্মলাল—আবার রিক্সা করেই ডাক্তারকে নিয়ে আসবে।

গিরিবালা ও-ঘরে গিয়ে মৃন্ময়ীকে ডাকলেন—ও বউ—বউ—

মৃন্ময়ীর রোগকাতর অসুস্থ শরীর অজ্ঞাত আতঙ্কে এক ডাকে শিউরে উঠেছে।

উঠে বসলেন মৃন্ময়ী।

তাঁর মনে পড়লো—বহু বৎসর আগে একদিন এমনি রাত্রে ঠিক এমনি সময়ে তাঁর জীবনে এমনি এক বেদনার আলোড়ন উঠেছিল। মৃন্ময়ী বুঝতে পারলেন। তাঁর পরিচিত যন্ত্রণা। একে তিনি চেনেন।

মৃন্ময়ী উঠলেন।

গিরিবালা বললেন—ও বউ, তোমার অসুখ শরীর নিয়ে তুমি আর উঠো না—

কিন্তু মৃন্ময়ী গিরিবালার কথা শুনলেন না। স্বরুচির এই সন্ধিসময়ে মৃন্ময়ী কেমন করে বিছানায় শুয়ে থাকেন!

তারপর চক্রধরপুরের সেই ছোট একতলা বাড়িটির এককোণে একটা দোদুল্যমান মুহূর্ত কালের অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে খসে পড়লো।

ডাক্তার এসে গেছেন।

পদ্মলাল কাজের লোক বটে।

স্টোভ জ্বালার সোঁ সোঁ শব্দ, উচ্চকিত ছায়ামূর্তি, অন্ধকার কাঁপছে, ভীরু পাখীর কলরব স্তব্ধ রাত্রির প্রচ্ছদপটে আশঙ্কার উদ্রেক করে। গুমোট আবহাওয়া—পৃথিবীতে কোথাও বুঝি বায়ু নেই। কিম্বা নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষায় সমস্ত উদগ্রীব!

কে জানে কাল সকালে সূর্যের পৃথিবী সুরুচির নাগাল পাবে কি না।

মৃন্ময়ীর অসুখের খবর জানিয়ে সদানন্দবাবুকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত তাঁর আসার কোনও আভাস নেই।

না এসেছেন ভালোই করেছেন। মৃন্ময়ী এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন। এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ। এ-সময়ে তিনি যেন আবার না এসে পড়েন।

কালই সকালে তাঁকে আসতে বারণ করে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হবে।

গরম জল, স্টোভ, পাখা, বোরিক তুলো ওষুধের তীব্র গন্ধ আর সেই অনন্ত-কালের ভাণ্ডার থেকে খসে পড়া একটি মুহূর্ত!

শুরু হল জীবন-দ্বন্দ্ব!

মৃত্যুর ওপার থেকে কানে এল ক্ষীণ কান্নার শব্দ। সেই কান্নার শব্দের সঙ্গে এল গতি। ভ্রূণের অবয়বে রক্তসঞ্চালন শুরু হলো, শুরু হলো প্রাণলীলা—সেই জীবনের সূত্রপাত হলো বুঝি কান্না দিয়ে।

কান্না হয়ত জীবনেরই পূর্বাভাষ!

গিরিবালা শাঁখ বাজিয়ে দিলেন এক ফাঁকে।

হয়ত এ ওর অনধিকার প্রবেশ! তা হোক, তবু গিরিবালার মনে হলো, জীবনের সম্মান না দেখানো যেন মহা অপরাধ। যে আগন্তুক নিঃসহায় তাকে অভ্যর্থনা করতে দোষ কী!

মৃন্ময়ী তবু নিজের অসুস্থ শরীর নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। এখনই তো বিপদ। রক্তের সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। আগুনের উত্তাপে

বেদনার উপশম করতে হবে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে যে বাইরে এসেছে হঠাৎ, বাইরের আবহাওয়ায় তার ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

মৃন্ময়ীর হাসি এল। ক্ষীণ দুর্বল প্রাণহীন হাসি!

তাঁর মনে হলো—বাঁচবার যার অধিকার নেই তারই জন্যে এত প্রাণান্তকর চেষ্টা!

সমস্ত রাত্রির ক্লান্তি জমে জমে ভোরবেলা কখন ঘুমের বন্যায় সব ভেসে গেছে কেউ জানতে পারে নি। সমস্ত রাত গিরিবালা সুরুচির পাশে জেগে বসেছিলেন। পাহারা দিয়েছেন একটানা। বড় সাবধান হতে হয় এই সময়ে। ঘুমের অবহেলায় অনেক ক্ষতি অনেক ক্ষয় অজ্ঞাতে ঘটে যায়।

আর মৃন্ময়ী—তাকে বার বার গিরিবালা বিশ্রাম নিতে বলেছেন, ও-ঘরে গিয়ে শুতে বলেছেন—কিন্তু তাঁর কি আজ শোবার সময়! বার বার তিনি নিজে উঠে ঘড়ি দেখেছেন, আবার অকারণে গিয়ে গরম জল চড়িয়ে দিয়েছেন, তারপর যখন কোন কাজ নেই, খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন আকাশের দিকে চেয়ে।

সেখানে অসংখ্য তারার ভীড়! তা ছাড়া মনের মধ্যে তাঁর ঝড় উঠেছে আজ! এর পর কী হবে! এখানে এই অপরিচিত পরিবেষ্টনীতে না হয় নির্বিবাদে কাটলো সমস্ত বিপদ! না হয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এখনকার মত! কিন্তু পরে কলকাতার বৃহত্তর সমাজে! সেখানে একদিন তো আবার ফিরে যেতে হবে!

ভোর বেলা ডাক্তার রিক্সায় উঠে বসলো! গিরিবালা আগেই গুণে গুণে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিয়েছেন। এই অপরিচিত দেশে কে এমন করে! টাকা দিয়েই কি পরোপকার পাওয়া যায়!

পদ্মলাল সঙ্গে গেল—সে ওষুধ নিয়ে আসবে।

ডাক্তার অভয় দিয়ে গেছে। ভয়ের সব লক্ষণ দূর হয়েছে। এখন বিশ্রাম, সেবা, খাওয়া আর ঘুম!

সকালবেলা ওই হট্টগোলের মধ্যে গিরিবালা সদানন্দকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। এখন মৃন্ময়ী ভাল আছে—এখন সদানন্দের খরচপত্র করে এখানে আসার দরকার নেই।

সত্যিই তো, এই বিপর্যয়ের মধ্যে তিনি এসে পড়লে সে আবার আর এক কাণ্ড!

যখন সমস্ত শান্ত হয়ে গেছে, চুপি চুপি ঘরে ঢুকলেন মৃন্ময়ী।

স্থরুচি ক্লান্তিতে ঘুমে আচ্ছন্ন! গিরিবালা পাশে বসে আছেন। কাল প্রথম রাত থেকেই দুজনের ঘুম নেই। আর একটা কম্বলে জড়ানো একটা মাংসপিণ্ড!

অতটুকু!

কিন্তু ভাল করে নজর দিয়ে দেখলে বোঝা যায় বড় বড় চোখ দুটো। সাদা ধপ্ধবে গায়ের রং। এখনও স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু মনে হয়, মুখের চোখের আকার সবই স্থরুচির মতো!

মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ যেন তাঁর বুকের মধ্যে আবার সেই ব্যথাটা শুরু হল। সেই আগেকার ব্যথা! এতদিন প্রায় ভাল হয়ে উঠেছিলেন। মনে হলো আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বেশ ছিলেন—হঠাৎ হয়ত কাল সমস্ত রাত জাগার জন্যে আবার অস্থখটা বেড়ে উঠেছে। মাথা ঘুরতে লাগলো। আর একটু হলেই পড়ে যেতেন। মৃন্ময়ী আর্তনাদ করে উঠলেন—দিদি—ও দিদি—

গিরিবালা মৃন্ময়ীর দিকে চাইতেই অবস্থা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—কী হলো বউ—কী হলো—

কিন্তু মৃন্ময়ী ততক্ষণ মাটিতে বসে পড়েছেন! আর তিনি যেন পারছেন না। বুকের ওপর কে যেন ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। আবার তাঁর সেই অস্থখটা হলো বুঝি!

সারা গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়িয়ে বসে গড়গড়া টানছিলেন অতুলবাবু। ভারিক্কী গোলগাল মানুষটি। সদনন্দবাবুকে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—একি মাস্টার মশাই এখনও কলকাতায় আছেন—কাল যে চক্রধরপুর যাবার কথা ছিল—?

দেখে বোঝা গেল, সন্থ এক চক্র ঘুরে এসেছেন। সিঁড়ির ওপরেই সদানন্দবাবু বসে পড়লেন।

বললেন—যাওয়া হলো না অতুলবাবু—যাবো বলেই ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলো না—

অতুলবাবু এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন। অর্থাৎ যাওয়া যে হবে না, তা যেন তিনি জানতেন। অথচ চক্রধরপুর যাবেন বলে কাল অনেক চেষ্টার পর দাড়ি কামানো হয়েছিল। সামান্য দু-একটা কেনাকাটাও করেছিলেন।

অতুলবাবু বললেন—এক কাজ করুন, টিকিটটা আজ হাজরা রোডের বুকিং অফিস থেকে কিনে আনুন, তা হলে আপনার যদি যাওয়া হয়—

সদানন্দবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন। ভাবনা কি তাঁর একটা! যেতে তো হবেই। একটু সুসংবাদ এই যে, এই কিছুদিন আগে সেখানকার খবর পেয়েছেন। যাওয়ার তো তাঁর খুবই ইচ্ছে। বনমালীবাবুর কাছে কালই সেজন্যে গিয়েছিলেন তারপর বইটা এখনও শেষ হয়নি। সিপাহী বিপ্লবের মূল কারণ আর তার বিস্তারের পিছনে যে রাজনৈতিক, সামাজিক আর তৎকালীন অর্থনৈতিক কারণগুলো ছিল, তার একটা বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে!

শুধু কি তাই, এ মাসে দত্তমশাইকে বাকি ভাড়াটা দেওয়া হয়নি। অবশ্য ভাড়া দত্তমশাই নেবেন না বলেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক মাসেই নিচ্ছেনও।

অতুলবাবু বললেন—এদিকে এক কাণ্ড শুনেছেন—?

সদানন্দবাবু কিছুই শোনেন নি। বললেন—কিসের কি কাণ্ড?

অতুলবাবু বললেন—পাশের বাড়ির দেবেশবাবুকে চেনেন? দেবেশ চাটুজ্যে —কোন্ মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করেন—

সদানন্দবাবু চিনতে পারলেন। পাড়ায় চলতে ফিরতে দেখা যায় তাঁকে। অল্প বয়েস—মাথার চুল পেকে গেছে কিছু। বেশ গম্ভীর চালের মানুষ! রামকৃষ্ণ মঠের পাণ্ডা একজন।

অতুলবাবু বললেন—সেই দেবেশবাবুর মেয়ের কাণ্ড—সাধে কি বলি মশাই! আমরা পাড়ার সবাই যাই অফিসে আদালতে, উনিও যান। দুপুরবেলা যে যার কাজে ব্যস্ত। কে আর বাড়িতে থাকে মশাই! তা ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় এ. আর. পি. হয়েছে—আগে তবু ছেলে ছোকরারা বেকার থাকতো, আজকাল যুদ্ধের হিড়িকে কেউ তো আর বসে নেই—সবাই চাকরি করছে। পাড়ায় পাড়ায় এ আর. পির দল—পাড়া গুলজার করে আড্ডা দেয়, আর

চাকরি করাও হয়। বসে বসে পয়সা উপায়ও হচ্ছে, যা হোক, ধরুন বিড়ি সিগারেটটা তারপর বায়োস্কোপ দেখাটা বেশ নির্বিবাদেই চলছে—তার মধ্যে—

বলে অতুলবাবু গড়গড়ায় টান দিলেন—

সদানন্দবাবু বললেন—তাহলে কি দেবেশবাবুর মেয়েও এ.আর পি. হয়েছে নাকি?

অতুলবাবু বললেন—শেষ পর্যন্ত তা হলেও আশ্চর্য হবো না মাস্টার মশাই, এদিকে দিনকে দিন যে রকম বাজার পড়ছে, তাতে সদর অন্দর কিছু থাকবে ভেবেছেন? কিন্তু ওই দেবেশ চাটুজ্যে যিনি পরের বাড়ির চালচলন নিয়ে টিটকিরি দেন, শেষকালে তাঁর মেয়ের এই কাণ্ড! না মশাই আমাদের পাড়াগাঁয়ে আমরা বেশ আছি—আপনাদের শহরের মত এমন কেলেঙ্কারি হয় না সেখানে—ছি-ছি—

কথার মাঝখানে ভূপতিবাবু এলেন। বাজার থেকে ফিরছেন। বাজারটা ভূপতিবাবু নিজের হাতেই করেন। পছন্দমত জিনিস নিজে বাজারে না গেলে আসে না।

বললেন—কার কথা বলছেন ম্যানেজারবাবু? আমাদের দেবেশ চাটুজ্যের মেয়ের?

অতুলবাবু বললেন—মেয়েটা শুনলাম বহুদিন থেকে ছেলেটার সঙ্গে মেলামেশা করতো—এতদিন কেউ টের পায়নি—

ভূপতিবাবু বললেন—আমি শুনলাম ছেলেটারই দোষ। ও ছেলেটা নাকি ওমনি সব বাড়িতে ঢুকেই বেশ দুদিনে মা মাসী পাতিয়ে নিতে পারে—মেয়েদের পশম কিনে দেয়, বায়োস্কোপ দেখায় নিজের পয়সা খরচ করে—

অতুলবাবু বললেন—হোক্ ছেলেটা খারাপ—তা বলে মেয়েটা কী বলে নিজের বাপ মাকে ছেড়ে চলে যাবে? আমার নিজের মেয়ে হলে আমি তো চুলের মুঠি ধরে……

বলে উত্তেজিত ভাবে অতুলবাবু গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন।

ভূপতিবাবু বললেন—আপনি ম্যানেজারবাবু কেবল মেয়েটারই দোষ দেখলেন, কিন্তু মেয়েদের হলো গিয়ে আপনার নরম মন—তা না হলে হিন্দু সমাজে অত বিধিনিষেধ রয়েছে কেন—কিন্তু আমি বলি ছেলেটাকে ও-বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে দেবেশবাবুর—

অতুলবাবু বললেন—দেবেশবাবু অফিসে যাবেন, না বাড়িতে বসে মেয়ে পাহারা দেবেন ?

—কিন্তু দেবেশবাবুর স্ত্রী, তিনি তো সেকালের মেয়ে—

আলোচনার বিষয়বস্তু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না সদানন্দবাবু ! কিন্তু তবু যেটুকু বুঝতে পারলেন তাতে যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। যাই হয়ে থাক, হয়ত কোথাও বিরাট সামাজিক একটা অন্যায় ঘটে গেছে।

চটি ঘষতে ঘষতে শশধর এল। এসেই সিঁড়িতে বসে পড়ল।

বললে—শুনে এলুম সব ম্যানেজারবাবু—

ভূপতিবাবু উদগ্রীব হয়ে বললেন—কী কী শুনে এলে শশধর—

অতুলবাবুরও আগ্রহ কম ছিল না। মুখরোচক খবর বটে ! শুষ্ক মেস-জীবনে খবরের কাগজের দু-একটা নারীহরণের কাহিনী পাড়ার দু-একটা পরিচিত মেয়ের কেলেঙ্কারির ঘটনা তবু রোমাঞ্চের আস্বাদ আনে। যুদ্ধের বাজারে কলকাতার সমাজ প্রায় নারী বর্জিত। ইভ্যাকুয়েশনে কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। মাসান্তে কিংবা সপ্তাহান্তে একবার এরা দেশের মাটীতে পা দিয়ে পরিজন পরিবারের পরিবেশে উপবাসী মনকে তৃপ্ত করে আসে।

শশধর, ভূপতিবাবু, অতুলবাবু, তখনও সেই রহস্যময়ীর অন্তর্ধান-কাহিনী নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত।

অতুলবাবু বলছেন—আমি শুনলাম নাকি দেবেশবাবুর স্ত্রী কদিন কিছু খাচ্ছেন না—দিনরাত কান্নাকাটি করছেন—

শশধর বললে—কে বললে আপনাকে ? আমি শুনলাম দেবেশবাবুর স্ত্রীর নাকি অনিচ্ছে ছিল না, তাই মেয়েটাই পালিয়ে গেছে বাবার ভয়ে—

ভূপতিবাবু বললেন—আরে না না—যত নষ্টের গোড়া ওই ছেলেটা। দেখেন নি লম্বা পাজামা পরে, রুক্ষু রুক্ষু চুল—হাতে কি সব কাগজপত্তর নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো—ওরা সাংঘাতিক ছেলে মশাই—

সদানন্দবাবু উঠে পড়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

বললেন - ঠাকুর, ভাত হয়েছে ?

ভাত খেয়ে উঠে সদানন্দবাবু বেরিয়ে আসছিলেন। একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে !

আবার তো একে একে সবাই কলকাতায় ফিরে আসছে। কতদিন আর

সকলকে বাইরে রাখা যায়। এইবার মৃন্ময়ীর স্বাস্থ্যটা ভাল হয়েছে, এবার ফিরে আসা যাবে।

তাছাড়া অর্থব্যয়ের তো পরিসীমা নেই। অনেক দেনা হয়েছে। সিংজী অবশ্য তাগাদা দেয় না। তার তো টাকা ধার দেওয়াই ব্যবসা। কিন্তু সুদও তো দিতে হচ্ছে মাসে মাসে। পান্নালালরাও শিগগীরই ফিরে আসছে। আরও দুএকজন ছাত্র ফিরে আসবে লিখেছে। তখন আবার কিছু আয় হতে পারে।

তবু যে-দেনাটা হয়ে গেছে, তা কেমন করে শোধ করবেন—কতদিনে শোধ করতে পারবেন কে জানে।

পান্নালালেরা ফিরে আসবার আগেই জিনিসপত্র আবার সমস্ত সব্জী-বাগানের বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। এই ট্রেনে ওঠা, বাড়ি বদ্লানো—এ সমস্ত কাজে যেন তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। আজকাল সময়মত দাড়ি কামানো, ধোপার বাড়ি কাপড় দেওয়া,— তা-ই মনে পড়ে না ঠিক সময়ে।

আর ভাল লাগে না এই দিনগুলো।

সুরুচিদের অনেকদিন দেখেন নি। কবে যে আবার সব আসবে। সেই আগেকার মত আবার সেই রাত্রে একসঙ্গে সভা করা। শেখর ছিল তখন। বেশ লাগতো তিনজনে।

শেখরের কথা অনেকদিন পরে মনে পড়লো। কোথায় যে গেল। একটা চিঠি দিলে পারতো সে। আর চিঠি যদি সে দিয়েই থাকে তা হলে সব্জী-বাগানের বাড়ির ঠিকানাতেই হয়ত দিয়েছে। সুতরাং সে-চিঠি তিনি আর কি করে পাবেন। কতদিন সব্জীবাগানের বাড়িতে যাননি সদানন্দবাবু। ও-বাড়িতে ঢুকতে আর ভাল লাগে না তাঁর। তালা-চাবি দেওয়া পড়ে আছে। সুরুচিরা না এলে ও-বাড়িতে আর মন টিকবে না।

সদানন্দবাবুর মনে হয় সুরুচিরা চলে যাবার পর ক'মাসে যেন তাঁর বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন বেশী দিন বাঁচবেন না আর।

সিংজীর কাছে গিয়েই আবার হাত পাততে হলো।

ভোর বেলা তার পুজো-আহ্নিক খাওয়া দাওয়া হয়ে যায়। সিংজী তখন নিজের কাজে বেরুবার বন্দোবস্ত করছিল।

সদানন্দবাবু বললেন—শ'খানেক টাকা আমায় দিতে হবে সিংজী—

সিংজী প্রস্তুতই থাকে সব সময়। দ্বিধা সে করে না। মাস্টার সাহেবকে বিশ্বাস না করবার কারণ নেই তার। তবু সদানন্দবাবু নিজেই যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন। ধার চাওয়া মাত্রেই যেন হাত পাতা। ভিক্ষেরই সামিল।

বলেন—টাকা আমি তোমার শিগগীরই সব শোধ করে দেব সিংজী—এই ইস্কুলের মাইনেটা পেলেই—

চক্রধরপুরে কিছু নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। সামনে পুজো আসছে। স্বরুচি আর ওদের কাপড় একখানা করে অন্তত নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ক'মাসের মধ্যে কিছুই পাঠানো হয়নি ওদের।

তাছাড়া গত কমাস ধরেই তো যাবার চেষ্টা করছেন। একটা না একটা বাধা আছেই। হঠাৎ ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায় এক একদিন। তখন ভয় হয়। ভয় হয় যদি গণ্ডগোল বাড়ে। গুলি চালায় পুলিশ! রাস্তার মধ্যে তখন কে কোথায় কাকে দেখে!

কাপড় কিনতে যাবার পথে ভোলানাথের সঙ্গে দেখা।

ভোলানাথই পেছন থেকে ডাকে—ও সদানন্দবাবু—সদানন্দবাবু—

সদানন্দবাবু ভোলানাথকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তোমারই দোকান নাকি ভোলানাথ?—

চালের দোকান করেছে ভোলানাথ। বহুদিন আগে সরকারী অফিসের চাকরি চলে যায় তার। খেতে পায় না এমনই অবস্থা হয়েছিল। সদানন্দবাবু বাড়িতে থাকতে দিয়ে হাতখরচ দিয়ে উপোসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

তারপর সে দেশে চলে গিয়েছিল। ভোলানাথ সে-কথা জীবনে ভুলতে পারবে না। মৃন্ময়ী নিজের হাতে সাবান-কাচা করে দিয়েছেন তার কাপড়। কার্বঙ্কল হয়েছিল ভোলানাথের—মৃন্ময়ীই তখন সেবা করেছিলেন।

সদানন্দবাবু বললেন—খুব ভাল হয়েছে—এইতেই তোমার উন্নতি হবে দেখো—সৎভাবে ব্যবসা করলে তার মার নেই এইটি মনে রেখো ভোলানাথ—

ভোলানাথ গদির ওপর জোর করে বসিয়ে খাতির করলে।

বললে—আপনাদের আশীর্বাদই আমার মূলধন মাস্টার মশাই—আমার এখান থেকে চাল টাল নেবেন আপনি—

—আমার মেয়ে-টেয়েরা সব বাইরে গেছে—তবে যে-মেসে খাচ্ছি এখন—

সেখেনে মাসে মাসে অনেক চাল লাগে, তোমার এখান থেকে নিতে বলবো—বললেন সদানন্দবাবু।

বাইরের কোন্ জেলা থেকে চাল আনে ভোলানাথ। নানান বস্তায় হরেক রকমের চাল সাজিয়ে রেখেছে।

দু-একটা নমুনাও দেখালে সে। সদানন্দবাবু ওসব কিছু বোঝেন না। কিন্তু সুখী হলেন তিনি। ভোলানাথ ব্যবসায়ে উন্নতি করুক। বড় হোক। আশীর্বাদ করে, উৎসাহ দিয়ে উঠলেন।

সন্ধ্যে বেলা ট্রেন। পছন্দ করে কাপড় কেনা বড় শক্ত। দোকানদারই পছন্দ করে দিলে কাপড়গুলো। টিকিটও একখানা কিনে নিলেন ফেরবার পথে।

আগে একটা খবর দিলে ভালোই হতো। অচেনা জায়গা। বাসাটা খুঁজে নিতে পারবেন কিনা কে জানে। তা হোক, ঠিকানাটা তো জানাই আছে।

অতুলবাবু বললেন—শেষ পর্যন্ত যাওয়া তা হলে আপনার হলো মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবুর সেই কথা মনে হলো। শেষ পর্যন্ত যে আজ তাঁর যাওয়া হবে কে জানতো? কত মাস পরে আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে। এবার গিয়ে সকলকে নিয়ে আসবেন তিনি। অনেক দিন হয়ে গেল—সবাই যেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিছুই তো হোল না। মিছিমিছি অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁকে দেখে সবাই খুব অবাক হবে যাহোক! কলকাতায় ফিরে এসে আবার সেই একসঙ্গে থাকা—এক সংসারের নিবিড় পরিবেষ্টনীতে। মেসের জীবন কেমন যেন ছন্নছাড়ার মত মনে হয় তাঁর কাছে।

ট্রামের একপ্রান্তে বসেছিলেন সদানন্দবাবু। পাশেই রেখেছিলেন স্যুটকেসটা আর একটা বিছানার বাণ্ডিল। ট্রেন ছাড়বে আটটায়। তবু একটু আগে-আগেই বেরিয়েছেন।

হঠাৎ সমস্ত কলকাতা চকিত সচকিত হয়ে উঠলো।

চমকে ওঠে সবাই।

তীব্র একটা একটানা শব্দ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে আকাশমুখী হয়ে চারিদিকে কেঁপে কেঁপে ফেটে পড়তে লাগলো!

ট্রামটা থেমে গেছে।

দুপাশের দোকান-পাট নিমেষের মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে উঠেছে চারিদিক। লোকজন যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। শব্দটা তখনও একটানা কেঁপে কেঁপে বেজে চলেছে। কালান্তক প্রলয়ের সূচনা হলো বুঝি, তারই আহ্বান! ভয়ে শিউরে ওঠে শরীর!

সাইরেন! সাইরেন!

আর সকলের সঙ্গে সদানন্দবাবুও সুটকেসটা আর বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। দুপাশের বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই কোথাও। এতগুলো লোক দাঁড়ায় কোথায়। একটা পানের দোকানের টিনের চালের নিচে একটুখানি জায়গা ছিল। আরো চার-পাঁচজন লোক সেখানে আগে থাকতে মাথা গলিয়েছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সদানন্দবাবু। মাড়োয়াড়ীর বিরাট বাড়িটায় কোলাপ্সিবল্ গেট বন্ধ হয়ে গেছে। জনকতক নিরুপায় হয়ে ফুটপাতের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল। খানিক দূরে একটা খাবারের দোকানের ভেতর তখনও কিছু জায়গা ফাঁকা ছিল।

সদানন্দবাবু সেখানে গিয়ে ঢুকলেন।

অতি মন্থর মুহূর্তের পদধ্বনি।

মাথার ওপর দিকে কয়েকটা এরোপ্লেনের গোঙানি কানে আসে। পাশের বাড়ির তেতলার জানালা থেকে কে যেন জলন্ত সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেললে রাস্তায়।

অনন্তকালের প্রবাহ যেন হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এখানে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে।

এখানে এই পটভূমিকায় সদানন্দবাবু যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। এখুনি যে স্টেশন থেকে তাঁর ট্রেন ছাড়বার কথা, আজ যে তাঁর আর ট্রেন পাবার আশা সুদূরপরাহত, সে-কথা তাঁর মনে এল না। মনে হলো যেন সেই বহু আশঙ্কিত দিন এসে গেছে।

আর রক্ষা নেই।

এবার রাখালবাবুর কথাই সত্যি হলো। কলকাতার একখানা বাড়ির একখানা ইটও আস্ত থাকবে না। যত শীঘ্র এখান থেকে এদেশ ছেড়ে চলে

যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। দরকার নেই তাঁর এখানে। আবার যুদ্ধ থেমে গেলে আসবেন তিনি। এ কলকাতা নয়, এ আজ মৃত্যুতীর্থ! অপমৃত্যু হবে এখানে থাকলে। এখনও যে সদানন্দবাবুর অনেক কাজ বাকি! এখনও বাঁচতে হবে তাকে।

সেই ভয়াবহ আবহাওয়ার মধ্যে অতি সন্তর্পণে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে লাগলেন।

সাইরেন তখন থেমে গেছে কিন্তু সেই একটানা বীভৎস তীব্র শব্দের রেশ যেন তখনও বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে। শহরের সান্ধ্য বাতাসে যেন বারুদের গন্ধ!

পরের দিন সদানন্দবাবু যখন চক্রধরপুরে পৌঁছুলেন তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

এদেশে অল্প অল্প শীত পড়তে শুরু হয়েছে। সারাদিন ট্রেনে কিছু খাওয়া হয়নি। আর একটু হলেই কাপড়ের বাণ্ডিলটা ভুলে ট্রেনের কামরায় ফেলে আসছিলেন।

কিন্তু প্লাটফরমে নেমে দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি।

প্লাটফরমের পেছনে বড় বড় গাছের সারি। লোকের তেমন ভীড় নেই।

কুলি নিয়ে রেলের হোটেলের দিকে গেলেন।

ম্যানেজারবাবু তখনও প্লাটফরমের ওপর খদ্দেরের আশায় দাঁড়িয়েছিলেন।

সদানন্দবাবুকে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন—খাবেন নাকি স্যার?

সদানন্দবাবু জানালেন তিনি খাবেন না। তারপর ম্যানেজারবাবুকে জিগ্যেস করলেন—এখানে 'তারা নিকেতন' বাড়িটা কতদূর হবে?

ম্যানেজার বাবু বললেন—বাইরে রিক্সা করে নিন—এই সোজা দক্ষিণমুখো চলে যান—তারপর রাঁচি রোড-এ পড়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে……

সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন ম্যানেজারবাবু কোথা দিয়ে গিয়ে কোন্ রাস্তা ধরে চললে 'তারা নিকেতন' পাওয়া যাবে।

ধন্যবাদ দিয়ে সদানন্দবাবু রাস্তায় এসে রিক্সা নিলেন।

দু'পাশে বড় বড় গাছের সারি। চমৎকার একরকম গন্ধ নাকে আসছে। দু'পাশের কোয়ার্টারগুলো অন্ধকার। শুধু রাস্তার কয়েকটা আলো অনেক

উঁচুতে জ্বলছে। ঠিক পথে চলেছেন কি না কে জানে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। যদি সমস্ত রাতই এমনি নিরুদ্দেশের মত সারা শহর ঘুরতে থাকেন। তখন হয়ত স্টেশনেই আবার ফিরে আসতে হবে। রাত্রিটার মত ওয়েটিং রুমের মধ্যেই কাটাবেন। তারপর সকালবেলা দিনের আলোয় ঠিকানা খুঁজে নিতে পারবেন।

একটা রাস্তার মাথায় এসেই মুশকিলে পড়তে হলো।

এবার পশ্চিম দিকে যেতে বলে দিয়েছেন হোটেলের ম্যানেজারবাবু।

এক ভদ্রলোককে দেখে সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—'তারা নিকেতন' এখানে কোনদিকে বলতে পারেন ?

ভদ্রলোক বললেন—এই খানিক দূর গিয়ে বাঁকের মুখে বাগানওয়ালা বাড়িটার পাশেই 'তারা নিকেতন'—

নির্দেশটা রিক্সাওয়ালাও বোধ হয় বুঝে নিলে।

রিক্সার ওপর বসে সদানন্দবাবু যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

অনেকদিন পরে আবার সকলের সঙ্গে দেখা হবে। সুরুচিরা সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। একটা খবর দিয়ে আসলেই ভাল হতো।

কিন্তু তাঁর যে আসা হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই তো যথেষ্ট। কত বাধা অতিক্রম করে তবে আসা। কাল তো রাস্তায় বেরিয়েও আসা হয়নি। শেষ পর্যন্ত সাইরেন বেজে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।

কিন্তু মৃন্ময়ীও তো একটা চিঠি দিতে পারতো। কলকাতা শহরের বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর দিন যে কেমন করে কেটেছে এ কেবল তিনিই জানেন। যা হোক এখানে এখন কিছুদিন তাঁর শান্তিতে কাটবে। চারিদিকের আবহাওয়া দেখে বেশ ভালো মনে হয়। বেশ ফাঁকা জায়গা এদিকটা।

রিক্সার ওপর সোজা হয়ে বসলেন সদানন্দবাবু। যুদ্ধের আবহাওয়ার বাইরে এই উপযুক্ত জায়গা।

এখানে সাইরেনের উপদ্রব থেকে জীবন মুক্ত। এখানে কিছুদিন থাকতে পারলে স্বাস্থ্য তাঁর ফিরে যাবে আবার। কিন্তু বেশী দিন থাকবার উপায় কই তাঁর। এখানে কে তাঁকে বসিয়ে খাওয়াবে। এত বড় সংসার তাঁর মাথায়। তাঁর কি চুপচাপ বিশ্রাম করলে চলে নাকি ?

এত রাত্রে দরজা ঠেলার শব্দ পেয়ে হয়ত ভয় পাবে সবাই !

হয়ত সুরুচি আসবে দরজা খুলতে, কিম্বা গিরিবালা।

মৃন্ময়ী হয়ত সন্ধ্যাবেলাই শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু সত্যি সত্যি 'তারা নিকেতনে'র দরজায় গিয়ে যখন কড়া নাড়লেন সদানন্দবাবু, কারও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

যেন বাড়িতে জনপ্রাণী নেই কেউ। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। আতঙ্ক হলো মনে মনে।

অনেকক্ষণ ডাকবার পর ভেতর থেকে গিরিবালার গলা শোনা গেল —কে?

সদানন্দবাবু উত্তর দিলেন—আমি—

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়ে গিরিবালা এক তীব্র আর্তনাদে চীৎকার করে উঠলেন।

হাউ হাউ করে কান্না।

চক্রধরপুরের নিশীথ রাত্রি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো বেদনার্ত ক্রন্দনের রোলে।

ক্রন্দনরত গিরিবালা সেই সেখানেই মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

সদানন্দবাবু হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। কী হলো তাঁর সংসারে। তবে কি ... কিন্তু কোন সম্ভাবনাই তাঁর কল্পনায় স্থান পেতে চাইলে না। সারা দিনের ট্রেনযাত্রার শেষে এ কী অমঙ্গল ঘোষণা! গিরিবালার শোকাচ্ছন্ন মূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে সদানন্দবাবু চেয়ে রইলেন—কী হলো! হলো কী!

কাকে প্রশ্ন করবেন—কে উত্তর দেবে! সেইখানে সেই অন্ধকার ঘরের দরজার ভেতরে দাঁড়িয়ে সদানন্দবাবু যেন চরম কোন বিপর্যয়ের বার্তা শোনবার জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলেন নিজেকে!

নিঝুম নিশুতি রাত—সেই রাত্রের পটভূমিকায় গিরিবালার শোকার্ত চীৎকারে, কোন্ এক অজ্ঞাত কিন্তু অপরিহার্য বিপদের আশঙ্কায় শিউরে উঠতে লাগলেন তিনি।

প্রশ্ন করতেও আতঙ্ক হয়।

মাথাটা আবার টন্ টন্ করে উঠলো। হাতের কাপড়ের বাণ্ডিলটা টপ করে আচমকা পড়ে গেল হাত থেকে।

সদানন্দবাবু সাহস করে প্রশ্ন করলেন—সুরুচি—সুরুচি কোথায় ?

প্রশ্ন করা বৃথা।

ওপাশে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। সদানন্দবাবু সাহস করে সেই ঘরের দিকেই গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা হারিকেন থেকে অস্পষ্ট আলো আসছে।

সদানন্দবাবু দেখলেন বিছানার ওপর বসে আছে সুরুচি।

আর বিছানার ওপর ঘুমিয়ে আছে একটি ছোট শিশু !

সুরুচি একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেয়ালের দিকে।

সদানন্দবাবু স্বপ্নাবিষ্টের মত ডাকলেন—রুচি—

সুরুচি মুখ ফিরিয়ে সদানন্দবাবুর দিকে একবার দেখলে, তারপর আবার দেয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

সুরুচির দৃষ্টি দেখে কিছু বুঝতে পারলেন না সদানন্দবাবু।

তবে কি· ···তবে কি··· ··সদানন্দবাবু আবার বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

গিরিবালার কণ্ঠস্বর তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। গোঙানির মত এক রকম করুণ আর্ত শব্দ বেরুচ্ছে তাঁর গলা থেকে।

সদানন্দবাবুকে দেখে গিরিবালা আর একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—

—তুই আর একদিন আগে এলে দেখতে পেতিস সদা—তোকে খবর দিতে পর্যন্ত সময় পাইনি—কে জানতো এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে—আজ সকালে টেলিগ্রাম করেছি তোকে—কান্নায় বোবা হয়ে এল গিরিবালার কণ্ঠস্বর।

এতক্ষণে সদানন্দবাবু যেন উপলব্ধি করতে পারলেন। এ বড় মর্মান্তিক উপলব্ধি! একটা অস্পষ্ট চাপা বুকফাটা আর্তি তাঁরও বুক ভেদ করে যেন বাইরে আসতে চাইছে।

তিনি দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরলেন। এখনি যেন পড়ে যেতেন তিনি।

তারপর হঠাৎ তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতে জলের শিশিটার জন্যে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন।

দিনগুলো যেন অর্থহীন। কোন মানে হয় না ওই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের। একটার পর একটা দিন যায়, অনন্তকালের অক্ষয় ভাণ্ডারে তাদের সঞ্চয় ভারী

হয়ে আসে—আর এখানে সদানন্দবাবুর চোখের সামনে একটা একটা করে পাতা ঝরে যায় শালগাছটার, মাঠের ঘাসের ওপর শুক্‌নো পাতার ভীড় জমে ওঠে। আর দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে আসে কখন। কখন রাঁচি রোডের তেলের বাতিগুলো অন্ধকারে টিম টিম করে জ্বলে ওঠে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে—যেন কয়েক বছরের অন্ধ পরিক্রমা ওই ক'টি ঘণ্টায়ই শেষ হয়ে যায়।

বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে সদানন্দবাবুর সকাল-বিকেল-সন্ধ্যে সব একাকার হয়ে যায়।

প্রথম যেদিন এখানে এসেছিলেন, সে আজ কতদিন হয়ে গেল।

তবু এখানকার মাটির সঙ্গে কেমন জড়িয়ে গেছেন তিনি।

এক একদিন নদীর ধারে যেখানে শ্মশান, সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কয়েকটা পোড়া কাঠের টুকরো, ভাঙা কলসী, একটা কাঁচা বাঁশের খণ্ড। কাছেই একটা বেদী বাঁধানো। অশথ গাছের তলায় বসে থাকেন। আস্তে আস্তে ওই পাহাড়টার ওপর থেকে এলোমেলো হাওয়া আসে। কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ করে অশথ গাছের পাতাগুলো কাঁপিয়ে চলে যায়।

কখনও পুলের ওপর দিয়ে ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করতে করতে ট্রেন চলে গেল।

তারপর ফেরবার পথে কখনও স্টেশনে গিয়ে হয়ত একটা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে আসেন।

অনেকদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে চীৎকার করে ওঠেন—কে—কে—কে—

মনে হয় অন্ধকার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে একটা অস্পষ্ট মূর্তি যেন তাঁর বিছানার কাছে এগিয়ে আসছে।

খাওয়ার সামনে বসে সেদিন গিরিবালা বললেন—আর কতদিন এখানে থাকবো সদা, এবার কলকাতায় ফিরে চল—

কিন্তু ফিরে না গেলেই যেন ভাল হয়। এখানকার মাটির সঙ্গে যেন আত্মীয়তার যোগাযোগ হয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে যাবার কথা মনে হলেই খাঁ খাঁ করে ওঠে সারা মনটা।

এখানে আসবার দিন মৃন্ময়ীর একটা কথা মনে পড়লো সদানন্দবাবুর। বহুদিনের একটা ফটো নিয়ে দেখিয়েছিলেন।

মৃন্ময়ী ফটোটা দেখিয়ে বলেছিলেন—তুমি বড্ড বদলে গিয়েছো—

এবার কলকাতায় ফিরলে একজন কমে যাবে।

দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের জীবন-সঙ্গিনী,—সে থাকবে না সঙ্গে!

এই একটি লোকের অভাবই যেন সদানন্দবাবুর ব্যক্তিসত্তাকে মহাশূন্যের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। কোনদিকে আশ্রয় নেই—অবলম্বন নেই। চারদিকে কেবল শূন্য—অসীম শূন্য—অন্তহীন নিরবলম্ব অনুভূতি।

দক্ষিণের রোয়াকে ছোট ছেলেটাকে রোদে শুইয়ে রাখেন গিরিবালা।

উদ্দেশ্যহীনভাবে আকাশের দিকে মুখ তুলে সে পা ছুঁড়তে থাকে।

ছোট শিশু—সদানন্দবাবুর সহানুভূতিতে সমস্ত অন্তরটা ভিজে আসে। তাঁর মনে হয়— জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মমতা থেকে যে বঞ্চিত হলো, তারই বুঝি এই নির্বাক প্রতিবাদ! হাত-পা ছুঁড়ে তাই বুঝি সে আকাশের দেবতার কাছে বার বার অভিযোগ জানায়!

এক একবার হয়ত চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তখনই সুরুচি ছুটে আসে। সুরুচি এলেই চুপ করে যায়। সুরুচিই খোকার সমস্ত ভার নিয়েছে।

গিরিবালা খোকার নাম দিয়েছেন—লক্ষ্মীকান্ত—

সদানন্দবাবুর ও-নাম পছন্দ হয় না।

তিনি বলেন,—ওর নাম থাক—পার্থ।

যদি বেঁচে থাকে, একদিন পার্থের মতই কর্মনিষ্ঠায়, ত্যাগে, বীরত্বে মহান হয়ে উঠবে।

কিন্তু কেউ যখন কাছে থাকে না, সুরুচি একলা খোকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অপূর্ব সুন্দর লাগে খোকার মুখ। সুরুচি খোকার নাম দিয়েছে উদয়। দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকারে আলোর বাণী নিয়ে যার আবির্ভাব হলো— তার উদয় স্মরণীয় বৈকি!

খোকার মুখের দিকে চেয়ে সুরুচির অনেক কথা মনে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

গিরিবালাও যেন কেমন হয়ে গেছেন। সংসারের সমস্ত অপরিহার্য কাজের অবসরে তিনি আবার তাঁর গীতা নিয়ে বসেন।

নিজের স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর পর ওই গীতার মধ্যেই তিনি শান্তি খুঁজেছিলেন।

আর আজ মৃন্ময়ীর মৃত্যুর পরও মনে হলো ও-ছাড়া তাঁর গতি নেই।

সদানন্দবাবু যখন সন্ধ্যাবেলা দু-একটা জিনিসপত্র কিনতে বাইরে বেরিয়ে গেছেন, সুরুচি পাশের ঘরে মশারির ভেতর খোকাকে নিয়ে শুয়ে আছে, তখন রান্নাঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে গিরিবালা গীতা নিয়ে বসলেন। মনে হলো, মিছিমিছি তিনি জড়িয়ে আছেন সংসারে।

যত তিনি সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, তত আরো বন্ধনের মধ্যেই টেনে আনছেন নিজেকে!

সেদিন আবার বসলেন কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে।

ভাসুর-পোকে লিখলেন—কাশী যাবার ব্যবস্থা করে দিতে। সুরুচি আর সদাকে কলকাতায় রেখে এবার তিনি কাশীতে গিয়েই বাস করবেন।

এবার থেকে তাঁর জীবন বিশ্বনাথের পায়ের তলায়ই অতিবাহিত হোক।

সদানন্দবাবু সেদিন সত্যি সত্যিই গিরিবালার তাগাদায় কলকাতার টিকিট কিনে আনলেন। ভোর রাত্রে গাড়ি। বাড়িওয়ালার ভাড়া শেষ পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হলো! সন্ধ্যেবেলা গয়লাও এসে দুধের দাম নিয়ে গেল।

রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই তৈরী হলেন। সদানন্দবাবু ভাল করে দেখলেন সুরুচিকে। সুরুচির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। চক্রধরপুরে এসে পর্যন্ত সুরুচির স্বাস্থ্যই যেন বেশী খারাপ হয়ে গেছে। সে এত রোগা হয়ে গেল কেন! সে-ই তো খোকাকে দেখাশোনা করছে। সুরুচি না থাকলে কে তাকে মানুষ করতো।

আবার সেই ট্রেনে ওঠা!

আবার সেই ভীড়, সেই উৎকণ্ঠা!

তা হোক্—এবার কলকাতা ছেড়ে আর নড়বেন না সদানন্দবাবু! কিছুই হলো না,—অথচ শুধু এই জন্যেই মৃন্ময়ীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল—এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আর সহ্য করতে পারেন নি।

সব রকমে সর্বস্বান্ত হয়েছেন তিনি। সিংজীর কাছে অনেকগুলো টাকা দেনা হয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে আবার পূর্ণ উদ্যমে পরিশ্রম করতে হবে। তা না হলে কেমন করে চালাবেন এই সংসার।

ট্রেনের কামরায় বসে স্বরুচি বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

বাইরে পাতলা হয়ে আসছে অন্ধকার। আকাশের একটা তারা অন্য সকলের চেয়ে যেন বেশী উজ্জ্বল। ওইটেই বুঝি শুকতারা। শুকতারাটা যেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে।

মেয়ে-কামরায় একজন বললে—ওগো বাছা, তোমার ছেলের যে ঠাণ্ডা লাগছে—ভাল করে ঢাকা দাও—

অল্প ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছে। স্বরুচি খোকাকে ভালো করে ঢাকা দিলে চাদর দিয়ে।

গিরিবালা পাশেই বসেছিলেন—বললেন—ও ওর ছেলে নয়—ও ওর ভাই—

মহিলাটি বললেন—ছেলে নয়, ভাই? তা ছেলের মা কোথায়?

গিরিবালা বললেন। স্বরুচি বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বসলো।

ক্রমে বেলা বাড়ছে।

খড়গপুরের কাছে আসতেই টের পাওয়া গেল।

দুপাশের গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে। সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কামরার কয়েকজন বলতে লাগলো এদিকে কয়েকদিন আগে নাকি ভীষণ ঝড়-জল বন্যা হয়ে গেছে। ভীষণ ঝড় যে হয়ে গেছে তার প্রমাণ আরো পাওয়া গেল। লাইনের দুপাশের জল তখন কমে গেছে—কিন্তু আশেপাশের গাছ একটাও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ট্রেন আস্তে আস্তে চলছে। বেশ বোঝা গেল কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরের এই দিকটা দিয়ে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা হয়ে গেছে।

খানিকদূর আসতেই দেখা গেল বীভৎস দৃশ্য। লাইনের দুপাশে মানুষ আর গরু-ছাগলের মৃতদেহ ভেসে এসে ঠেকেছে। বাতাস বিষাক্ত হয়েছে দুর্গন্ধে।

সদানন্দবাবু চমকে উঠলেন।

এসবের তো এতটুকু আভাস পাওয়া যায়নি চক্রধরপুরে! মানুষে দেবতায় মিলে এ কি শুরু করেছে! মৃন্ময়ীর মৃত্যু দিয়ে যে দুর্ভোগের সূচনা হলো,—তার পরিণতি কি এই মহামারী-মড়কে!

মানুষের মৃত্যু বড় সস্তা হয়ে গেছে যেন। এমন করে চোখের সামনে

এত বীভৎস মৃত্যু সদানন্দবাবু আগে দেখেননি কখনও। কলকাতার জন্যে উদগ্রীব আগ্রহে উন্মুখ হয়ে রইলেন সদানন্দবাবু। সেখানে কি হয়েছে কে জানে।

কলকাতায় যখন গাড়ি পৌছুল, তখন সাত ঘণ্টা লেট।

কলকাতায় আবার লোক আসতে শুরু করেছে। সদানন্দবাবু সব্জী-বাগানের বাড়িতে উঠে এলেন।

গিরিবালার ভাসুর-পো এসে একদিন গিরিবালাকে নিয়ে গেছে। এ সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁর কত বছর কাটলো, এখন তাঁকে মুক্তি দেওয়াই তো উচিত।

সদানন্দবাবুও হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন। ট্রেনে তুলে দিয়ে রাত্রিবেলা ফিরে এলেন।

দরজার কড়া নাড়তেই সুরুচি ভেতর থেকে জিগ্যেস করলে—কে? —বাবা?

সদানন্দবাবু বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকেন না। একলা সুরুচি সমস্ত দিন সংসারের কাজে ডুবে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খোকার কাজ কি কম! ঘড়ি ধরে দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, স্নান করানো। তার ওপর রান্না, কাপড় কাচা, বাসন মাজা।

চলতে ফিরতে কলেজের সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। হঠাৎ যদি আবার সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

সেই শ্রীলতা—তার বিয়ে হয়েছে কিনা কে জানে। তার য়্যাডোনিস—সুরুচিদের প্রিন্স—সবাই কি তেমনি আছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় সব কিছুরই যখন পরিবর্তন হয়েছে,—তখন ওরাই কি তেমনি থাকতে পারে নাকি।

কেমন করে আবার সকলকে মুখ দেখাবে সুরুচি। তার সেই আগেকার রূপের জৌলুস যেন উবে গেছে।

খোকা যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে চোষে, সুরুচি পাশে শুয়ে চেয়ে দেখে।

সমস্ত মায়া-মমতা যেন ওইভাবে রূপ নিয়েছে। খোকার মধ্যে যেন চরম পরিণতি পেয়েছে তার অন্তরের ভালবাসা।

দত্তমশাই সেদিন সকালবেলাই এসেছেন। মাসের পয়লা।

ডাকলেন—মাস্টার মশাই—ও মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবু নিজেই দরজা খুলে দিলেন। বললেন—আসুন দত্তমশাই—

দত্তমশাই সকালবেলাই প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে এসেছেন। তক্তপোশের ওপর বসে পড়লেন।

সদানন্দবাবু বললেন—ভাড়াটা আজকে দিতে পারবো না দত্তমশাই—মাপ করতে হবে—

দত্তমশাই বললেন—না না, তাতে কি—আমি কি ভাড়ার জন্যে এসেছি—ছি ছি—

সদানন্দবাবু বললেন—ভাড়া আজই দিতুম, কিন্তু অনেক খরচ হয়ে গেল—আমার দিদিকে কাশী পাঠিয়ে দিলুম—

দত্তমশাই বললেন—পাঠিয়ে দিলেন নাকি? ভালই করেছেন—শেষ জীবনে ধর্ম-কর্ম ওসব না হলে চলে না—তা বাড়িতে রইল কে?

—আমার মেয়ে সুরুচি আর ছেলেটা—

দত্তমশাই অবাক হয়ে গেলেন—আপনার ছেলে?—আপনার ছেলে কবে হলো মাস্টার মশাই? আপনার তো এক মেয়েই জানতাম—

কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন সদানন্দবাবু।

বললেন—ছেলে আমার নতুন হয়েছে, এই তো মাস তিন-চারেক বয়েস,—সেই যে চক্রধরপুরে আমার স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলাম, এই ছেলে হবার পরই আমার স্ত্রী মারা গেলেন—

তারপর খানিক থেমে বললেন—আপনাকে আসতে হবে না দত্তমশাই—দু-একদিনের মধ্যেই আপনার ভাড়া দিয়ে আসবো—

কিন্তু সুরুচির ভয় হলো হয়ত বাবা কথা রাখতে পারবেন না।

সেদিন সদানন্দবাবুকে সুরুচি বললে—বাবা, তুমি হিসেবটা আমাকে রাখতে দিও—

সদানন্দবাবু যেন কৃতার্থ হলেন। অনেক ভাবনা, অনেক কাজ তাঁর বেড়ে গেছে। মৃন্ময়ী নেই। তেমন কিছু সাহায্যও মৃন্ময়ী করতেন না। তবু কেমন যেন একটা নির্ভরস্থল ছিলেন তিনি। এখন যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছেন। মানসিক পঙ্গুতা। উৎসাহ তো নেই-ই বরং চুপ চাপ বসে বসে আকাশ পাতাল

ভাবতেই ভাল লাগে। তবু কাজ না করলে চলবে না। সিংজীর দেনাগুলো শোধ না করলে আর চলে না। ছাত্ররা দু-একজন ছাড়া কেউ-ই এখনও ফিরে আসেনি। রাত জাগতে পারেন না তেমন। নইলে সমস্ত রাত জেগে বই লেখা যেত। মাসে মাসে একটা করে বই লিখলেও মন্দ হয় না।

সদানন্দবাবু বললেন—তুই যদি টাকাকড়ির হিসেবটা দেখিস,—তা হলে—

বহুদিন আগে মৃন্ময়ীও প্রথম বধূ হয়ে এসে তাঁর কাছ থেকে ক্যাশবাক্সের চাবি নিয়েছিলেন নিজের হাতে। সেদিনও নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। আজও যেন অনেকখানি হাল্কা মনে হলো নিজেকে।

কিন্তু হিসেব দেখে সুরুচি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দেনার অঙ্ক বেড়ে বেড়ে যেখানে পৌঁচেছে, সেখান থেকে নিচে নামানো অসম্ভব।

সদানন্দবাবু বললেন—না না, ওতে ভয় পাসনে—ও আমি সব ঠিক করে নেব—আমার শরীরটাকে একটু সুস্থ হতে দে—তখন দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে—

সেদিন অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে সুরুচি দেখে, বাবার ঘর থেকে আলো আসছে। সুরুচি বাবার ঘরে গিয়ে দেখে, মশারির মধ্যে বসে বসে প্রুফ দেখছেন। সুরুচি যে ঘরে এসেছে তা টের পাননি তিনি।

সুরুচি মশারির কাছে গিয়ে ডাকলে—বাবা—

চমকে উঠলেন সদানন্দবাবু। বললেন—এই যে মা এই পাতাটা শেষ করেই শুয়ে পড়ছি—

—কটা বেজেছে তা জানো?

—কটা?

—ভোর চারটে, এই সারা রাতটাই জাগলে—আবার সারাদিনই ঘোরাঘুরি করবে তো—

সুরুচি নিজের ঘরে চলে এল। খোকাকে দুধ খাওয়াতে হবে। দুধের দাম বেড়েছে। টিনের দুধ আজকাল পাওয়া দুষ্কর। অনেক কষ্টে, অনেক ঘোরাঘুরি করে নিয়ে আসেন সদানন্দবাবু। আর কত দিনে যে ভাত খেতে শিখবে খোকা! হাঁটতে শিখবে! কথা বলতে শিখবে! মানুষ হবে। কিন্তু ততদিন কেমন করে চলবে!

বাবা সকালবেলা বেরিয়েছেন। আবার ফিরবেন সেই রাত্রে। ঘণ্টা দু-এক এখন ঘুমোবে ও। দরজায় তালা দিয়ে স্নুরুচি রাস্তায় উদার আকাশের তলায় আবার এসে দাঁড়াল। সেই বহুদিন পরে আবার মুক্তি!

সব্‌জীবাগানের গলিটা কোন রকমে পার হয়ে কাঠের পুলটা পার হলো।

শরীরটা এখনও দুর্বল। বহুদিন রাস্তায় হাঁটার অভ্যেস ছিল না। পা দুটো যেন কেমন টলে! কোনওদিকে না চেয়ে স্নুরুচি সোজা চলতে লাগলো!

মালতীদির বাড়িটা রসা রোডের ঠিকানায়। নম্বরটা মনে নেই।

কিন্তু বাড়িটা দেখলে চিনতে পারবে।

চলতে চলতে স্নুরুচির মনে হলো বহুদিন পরে মালতীদির বাড়ি যাচ্ছে। বেশী দেরী করতে পারবে না সে। খোকার জাগবার বেশী দেরী নেই!

কিন্তু মালতীদির কাছে চাকরির জন্যে উমেদারি করতে কেমন যেন লজ্জাও করছে। হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস। সেক্রেটারীর সঙ্গে খুব মাখামাখি ছিল মালতীদির। কয়েকজনকে চাকরি করেও দিয়েছিলেন তখন।

তখন অবশ্য স্নুরুচি স্নুনজরে দেখত না মালতীদিকে।

তা ছাড়া স্কুলের মিস্ট্রেসগিরি করা কোনওকালেই পছন্দ করেনি স্নুরুচি।

কিন্তু এখন চল্লিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পেলেও নিজেকে ধন্য মনে করতে হবে! অন্তত খোকার দুধের খরচ আর স্নুরুচির নিজের সামান্য খরচগুলোও চলে যায় তাই থেকে!

মালতীদির সেই পাঁউরুটি রংএর বাসাটা ঠিক এক রকমই আছে। ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়াল তুলে দিয়েছে। ওপরের জানালায় একটা শাড়ি ঝুলছে।

সাহস করে কড়া নাড়লে স্নুরুচি।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে স্নুরুচি আগে কখনও দেখেনি। ছোকরা বয়েস। স্নুরুচিকে দেখে সে-ও যেন অবাক হয়ে গেছে।

জিগ্যেস করলে—কাকে চান আপনি?

স্নুরুচি একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—মালতীদি থাকেন এখানে? মালতী সেন?

লোকটি বললে—তিনি আগে এখানে থাকতেন বটে, কিন্তু তিনি বিয়ে করার পর এখন······

বিয়ে !

মালতীদিও শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন।

যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না ! অত বয়সে বিয়ে !

স্বরুচি জিগ্যেস করলে—আর চাকরি ?

—চাকরি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন—চাকরি ছেড়ে কোন এক মফঃস্বলে আছেন—খুলনা কিংবা যশোর—ঠিক মনে পড়ছে না—ছোকরাটি বললে।

স্বরুচি ফিরে এল।

চাকরি হত, কি হত না,—সেটা পরের কথা।

কিন্তু মালতীদির বিয়ের খবরটা শুনে কেমন অবাক লাগলো স্বরুচির। স্বরুচির মা'র বয়সী না হলেও বয়েস হয়েছিল মালতীদির। কাঁধ কাটা ব্লাউজ পরে এই সেদিন পর্যন্ত মালতীদিকে ইস্কুলে যেতে দেখেছে সবাই। দেখতে ভালো ছিলেন না—কিন্তু ভালো দেখানোর প্রচেষ্টা ছিল বরাবর। ছাত্রীর দল নিয়ে সমুদ্রের ধারে কিংবা পাহাড়ে বেড়ানো। বিয়ে যে একদিন মালতীদি করবেন, একথা তিনি নিজেই জানতেন নাকি।

বাড়ি ফিরে আসতে বেশী দেরী হলো না।

চাবি খুলে আবার ঘরে ঢুকলো স্বরুচি ! খোকা তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঘড়ি দেখলে স্বরুচি। এখনি দুধ খাবার সময় হয়েছে।

সেদিন কিন্তু সদানন্দবাবু খুব ভাবিয়ে তুলেছিলেন।

এমনি সদানন্দবাবু রাত করে আসেন। ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে রাত করে বাড়ি ফেরা সকলের অভ্যেস হয়ে গেছে।

আবার সেই আগেকার মত রাত করে ট্রাম বাস চলছে। আসবার সময়ে সদানন্দবাবু বাজার ঘুরে জিনিসপত্র কেনা কাটা শেষ করে তবে বাড়ি ফেরেন। স্বরুচি অবশ্য সকাল সকাল রান্না শেষ করে নেয়। সন্ধ্যের মধ্যেই সব কাজ সেরে সেলাই নিয়ে বসে।

শীত পড়ছে। খোকার শীতের জামা নেই। শীতের কাপড়ের দামও বেশী পড়ে। সদানন্দবাবুর পুরোন কোট কেটে ছোট শার্ট করে দেয় স্বরুচি। পশম আর কিনতে পাওয়া যায় না। একটা সোয়েটার তৈরী করে দিলে হত !

সেদিন এমনি সেলাই করছিল স্বরুচি, হঠাৎ সমস্ত কলকাতা কাঁপিয়ে সাইরেন বেজে উঠলো !

স্বরুচি জীবনে এই প্রথম সাইরেন শুনলো !

হঠাৎ যে কি করতে হবে, কিছুই বুঝতে পারলে না।

বাবাও বাড়িতে নেই কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিতে তার শুধু মনে হলো খোকাকে কোলে নিয়ে কোথাও নিরাপদ-আশ্রয় নেওয়া দরকার।

তাড়াতাড়ি খোকাকে নিয়ে স্বরুচি ছোট ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইল।

বাইরে কী ঘটছে কিছু বোঝা যায় না। সমস্ত দিক নিস্তব্ধ। গলি দিয়ে হুইসল্ বাজিয়ে কারা চলে গেল।

ওরা এ. আর. পি। সতর্ক করে দিচ্ছে—

মিনিট কুড়ি পরে কোথায় যেন দুম দাম করে শব্দ হতে লাগলো। তবে কি বোমা পড়ছে !

কোন্ দিকে পড়ছে ঠিক আন্দাজ করা শক্ত! যদি এই বাড়িতে ঠিক মাথার ওপরেই পড়ে! খোকাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে স্বরুচি সেই অন্ধকার ঘরের ভেতর নিঃশব্দে কান পেতে রইল।

মনে হলো যেন খিদিরপুরের দিক থেকে শব্দটা আসছে ! কিন্তু এরোপ্লেনের শব্দ কোথাও নেই। শুধু বহু উর্ধ্বে অস্পষ্ট একটু আওয়াজ। কিন্তু এ যেন অচেনা শব্দ।

স্বরুচির এতক্ষণে বাবার কথা মনে পড়লো। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান! এখন এই অবস্থায় কী করছেন কে জানে। মায়া হলো ওই লোকটির ওপর। শুধু এই সংসারের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। অর্থের জন্যে রাত্রে ঘুম নেই চোখে। রাত্রে কোন্ ছাপাখানা থেকে প্রুফ নিয়ে আসেন। সারারাত সেই প্রুফ দেখে আবার সকাল বেলা দিয়ে আসেন ফিরিয়ে।

যদি স্বরুচির একটা চাকরি হয়ে যায়, তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন সদানন্দবাবু। সদানন্দবাবু নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন।

—খোকা!

অস্ফুট শব্দ করে ডাকলে সুরুচি।

ছোট ছেলে। কিছু বুঝতে পারলে না। শুধু চোখের পাতা দুটো একবার খুলে আবার বন্ধ করলে।

কতক্ষণ পরে খেয়াল নেই, আবার সাইরেন বেজে উঠলো ঘন ঘন।

এবার সব নিরাপদ। সন্তর্পণে সুরুচি বেরিয়ে এল দরজা খুলে। এবার মাথার ওপর অনেক এরোপ্লেনের শব্দ পাওয়া গেল।

এতক্ষণ সব কোথায় ছিল ওরা।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হলো। ঘড়ি দেখে সুরুচি চমকে উঠল। সদানন্দবাবু এখনও এলেন না।

নানা রকম বিপদ কল্পনা করে সুরুচির বুকটা ভয়ে শিউরে উঠলো। আপন-ভোলা মানুষ, কোথায় আছেন কে জানে। যদি রাস্তার মধ্যে সাইরেন বেজে থাকে, তা হলে বাবা কি করবেন!

রাস্তার ধারে জানালার কাছে এসে অন্ধকারে দৃষ্টি দিলে।

আঁকা বাঁকা গলি। বেশী দূর নজর চলে না।

রাতও অনেক হয়ে আসছে।

যখন নিরুপায় হয়ে সুরুচি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, তখন হঠাৎ বাইরে রিক্সার আওয়াজ শোনা গেল।

ছুটে গিয়ে সুরুচি জানালার কাছে দাঁড়ালো! কিন্তু রিক্সা করে তো বাবা কখনও আসেন না।

দরজা খুলে দিয়ে সুরুচি ডাকলে—বাবা—

রিক্সায় বসে সদানন্দবাবু বললেন—আমি পড়ে গিয়েছিলাম রুচি কিন্তু লাগেনি বেশী—

লাগেনি বললেন বটে, কিন্তু রিক্সা থেকে নামতেও পারলেন না একলা।

সুরুচির অন্তর দুরদুর করতে লাগলো। নিজে গিয়ে সদানন্দবাবুর হাত ধরলে সে! তারপর সদানন্দবাবুর একটা হাত ধরে বললে—বাবা আমার হাত ধরে আসতে পারবে?

তারপর রিক্সাওয়ালা আর সুরুচি দুদিকে দুজনে ধরে সদানন্দবাবুকে ঘরে এনে শুইয়ে দিলে।

সত্যি বেশী রকম লেগেছে সদানন্দবাবুর। সাইরেন বাজবার সময় চারি-

দিকে যখন ব্যস্ততা আর হুড়োহুড়ি, তখন অন্য লোকের ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সদানন্দবাবুকে শুইয়ে দিয়ে সুরুচি খোকাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে দেখলে খোকা কখন নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ও ঘর থেকে সদানন্দবাবু ডাকলেন—রুচি—রুচি—

সুরুচি বাবার ঘরে এসে বললে—ডাকছিলে আমাকে?

সদানন্দবাবু বললেন—পা'টায় বড্ড ব্যথা হয়েছে,—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—

বাবার মুখের দিকে চেয়ে সুরুচি বুঝতে পারলে, যন্ত্রণায় তাঁর মুখটা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

খুব যন্ত্রণা না হলে তো সদানন্দবাবু অমন করেন না।

হঠাৎ কী যে করা উচিত, সুরুচি কিছুই বুঝতে পারলে না। যদি পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে!

কথাটা মনে হতেই সুরুচি বললে—বাবা, ডাক্তার ডেকে আনবো?

সদানন্দবাবু অত যন্ত্রণার মধ্যেও বারণ করলেন—না না—আনতে হবে না, —একটু এখানটায় হাত বুলিয়ে দিবি—

কিন্তু সদানন্দবাবুর বোধ হয় লেগেছিল খুব বেশী। অনেক সহনশীলতা তাই এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হয়ত এখন ব্যথাটা বাড়ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন সদানন্দবাবু।

সুরুচি নিঃশব্দে বাবার পাশ থেকে উঠলো। সারা গায়ে ভালো করে শাড়িটা জড়িয়ে নিলে। তারপর খোকার ঘরে গিয়ে খোকাকে একবার দেখে এসে সদানন্দবাবুকে বললে—বাবা আমি আসছি—

সদানন্দবাবু প্রতিবাদ করবার আগেই সুরুচি দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়। যুদ্ধ কোথায় শুরু হয়ে কোথায় এসে কোন্ দিকে মোড় ঘুরছে বোঝা শক্ত।

অনেক বোমা, অনেক এরোপ্লেন আর অনেক বারুদ নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তবু যেন শান্তি আসবেনা পৃথিবীতে।

তক্তপোশের ওপর শুয়ে শুয়ে সদানন্দবাবু ভাবেন, একটা হিংসার প্রতিরোধ করতে দশটা হিংসা করতে হয়। হিটলারকে মারতে হলে কি হিটলারের

চেয়েও মারাত্মক হতে হবে মানুষকে? ভেবে ভেবে সদানন্দবাবু কূলকিনারা পান না কোনও। হিটলারের বোমার চেয়ে আরো মারাত্মক বোমাই কি হিটলারের পতন ঘটাতে পারবে! তাই যদি হয়, তা হলে এখন একটা হিটলার আছে আর তখন যে হাজার হিটলার জন্মাবে!

দত্তমশাই এলেন সকাল বেলা।

সদানন্দবাবু তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন। দত্তমশাইকে দেখে সদানন্দবাবু যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেলেন।

বললেন—আসুন দত্তমশাই—আসুন—

দত্তমশাই বসলেন।

বললেন—কেমন আছেন আজ বলুন—

আজ দুমাস ভাড়া দেওয়া হয়নি। আজকেই আসতে বলেছিলেন দত্তমশাইকে! কিন্তু টাকা তো জোগাড় হয়নি! কি বলে আজ দত্তমশাইকে ফেরাবেন, ভেবে পেলেন না!

একদিন দত্তমশাই বাড়ির ভাড়া নিতেই রাজী হননি। তখন কলকাতা ফাঁকা হয়ে গেছে। বাড়ি দেখাশোনা করবারই লোক পাওয়া যায় না।

আজকাল শহরে লোক ধরে না। এখন টাকা দিলেও খালি বাড়ি পাওয়া যায় না আর।

দত্তমশাই মাসের পয়লা তারিখেই আজকাল তাগাদা দিতে শুরু করেছেন আবার।

দত্তমশাই আবার বললেন—শরীরটা কেমন আছে আপনার মাস্টার মশাই—

সদানন্দবাবু বললেন—ভাল থাকলে কি আর বিছানায় শুয়ে থাকি? সেবার পা ভেঙে গিয়ে ক-মাস বিছানায় পড়ে রইলাম তারপর আর সারতে পারিনি। বেশী পরিশ্রম করলেই মাথাটা ঘোরে। বুকটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। সুরুচি আমায় বিছানা থেকে উঠতে দেয় না, তাই বাড়ির ভেতরে থেকেই যেটুকু পারি, করি—

সদানন্দবাবুর স্বাস্থ্যের অবস্থা জানবার জন্যে দত্তমশাই-এর তেমন আগ্রহ নয়।

শেষ পর্যন্ত কথাটা তাঁকে তুলতেই হলো।

বললেন—আজকে আমার আসার কথা ছিল মাস্টার মশাই, বাকি ভাড়াটা—

ব্যস্ত হয়ে সদানন্দবাবু বললেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

তারপর ডাকলেন—রুচি ও রুচি—

ভেতরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুরুচি। সাড়ে নটায় অফিস, তার আগে খোকাকে স্নান করিয়ে খাইয়ে, বাবার কাছে রেখে যেতে হয়। তারপর বাসে ট্রামে আজকাল যা ভীড়! অনেকখানি সময় হাতে না থাকলে ঠিক সময়ে অফিসে গিয়ে পৌছুনো যায় না।

দুহাতের হলুদের দাগ মুছতে মুছতে এসে সুরুচি এ ঘরে ঢুকলো। দত্তমশাইকে দেখেই ব্যাপারটা বুঝে বললে—আপনি একটু দাঁড়ান আমি টাকা আনছি—

খানিক পরেই ফিরে এল সুরুচি। গুণে গুণে পাঁচখানা নোট দত্তমশাই-এর হাতে দিয়ে বললে—বাবার অসুখের জন্যে গত মাসে দিতে পারিনি এবার থেকে মাসে মাসে পাবেন—

দত্তমশাই চেতলার হাটে বঁড়শী, তালাচাবি, ছিপ্ বিক্রি করে সম্পত্তি করেছেন। সুতরাং পয়সা কেমন করে আদায় করতে হয় জানেন।

বললেন—তাতে কি হয়েছে মালক্ষ্মী? বিপদ-আপদ মানুষের আছেই—কিন্তু আমাকে তো বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়—

সুরুচি চলে আসছিল। তার অত কথা শুনতে গেলে ওদিকে অফিসে লেট হয়ে যাবে। কিন্তু দত্তমশাই ডেকে থামালেন।

বললেন—একটা কথা ছিল মালক্ষ্মী, আসছে মাস থেকে পাঁচটি টাকা ভাড়া বাড়াতে হবে—নইলে আর পারিনে—বৃহৎ সংসার—চালের দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা মন—

সুরুচির হঠাৎ মুখে কিছু কথা যোগালো না।

সদানন্দবাবু বললেন,—বলেন কি, আরও পাঁচ টাকা বেশী দিতে হবে?

দত্তমশাই বললেন—মাস্টার মশাই, আপনার কাছে আমি মিথ্যে বলবোনা—গাদাগাদা লোক আসছে আমার কাছে বাড়ির জন্যে—আপনার এই পঁচিশ টাকার বাড়িই পঞ্চাশ টাকা বললে লুফে নেবে সবাই—নেহাত ঠিক মালিক-ভাড়াটে সম্পর্ক নয় আপনার সঙ্গে তাই···

সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কি করা যায় এখন! স্বরুচির চাকরির ওপরেই ভরসা। ষাট টাকার চাকরি তার। তার মধ্যে বাড়ি ভাড়ার জন্যে তিরিশ টাকা দিলে থাকবে কি!

স্বরুচি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেনা। এখনও অনেক কাজ বাকি। চট করে রান্নার কাজটা সেরে ফেলেই খোকার স্নান আর কাপড়গুলো সাবান কাচা করে নিতে হবে।

অল্প অল্প কথা ফুটেছে খোকার। বলে—মাম্মা—মাম্মা—

অমূল্যবালা বেড়াতে এসেছিল রবিবার। দেখে অবাক হয়ে গেল।

বলে—ওমা, তোমাকেই যে মা বলে ডাকছে—আহা, মা কেমন জিনিস দেখতে পেলে না—

মানদা এসে সেদিন যাহোক দুকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল।

বললে—বলিহারী আক্কেল বটে তোমার পিসীর, তোমার ঘাড়ে ওইটুকু ছেলের ভার দিয়ে কাশী গিয়ে ধম্মে কম্মে মন বসাবে কেমন করে কে জানে মা—

কেউ কেউ বলে—ধন্যি মেয়ে পেটে ধরেছিল বটে তোমার মা—এক হাতে কোলের ভাইকে মানুষ করা, একহাতে বুড়ো অথর্ব বাপকে সেবা করা, আবার আর এক হাতে অফিসে গিয়ে টাকা রোজগার করা—

আজকাল চেতলার বহু মেয়ে অফিসে চাকরি করে। কাঠের পুল পার হয়ে সোজা রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে গিয়ে বাস ট্রাম ধরে।

কিন্তু খোকাকে বাবার কাছে একলা রেখেও মনে শান্তি থাকে না স্বরুচির।

আশে পাশের বাড়ির লোকজনকে বলে যায় স্বরুচি—আপনাদের ভরসায় খোকাকে আর বাবাকে রেখে যাই—যদি দরকার-টরকার হয় একটু দেখবেন—

চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে আর কিছু দেখবার সময় থাকে না। খোকার মুখে লম্বা করে একটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে স্বরুচি। রাস্তার ভিখিরীর সংখ্যা বড় বেড়েছে। অফিস যাবার পথে চারিদিক থেকে ছেঁকে দাঁড়ায়।

প্রথম বাসটায় ওঠা যায় না। কয়েকটা বাস ছাড়তে হয়। শেষে যেটাতে ওঠা গেল তাতে লেডিজ সিটেও জায়গা নেই। দাঁড়িয়েই সব দিন অফিসে যেতে হয়।

অফিসে গিয়ে যখন পৌঁছুল তখন সারা শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে।

নিজের সিটে যেতেই চাপরাসী বললে—একটু আগেই আপনার টেলিফোন এসেছিল—

টেলিফোন!

নিশ্চয়ই শ্রীলতার টেলিফোন! শ্রীলতা জীবনে সুখী হয়নি। তার স্বপ্নের য়্যাডোনিস্ বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে। সেখানে সেদিনকার য়্যাডোনিসের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। য়্যাডোনিস রাত্রে এক একদিন বাড়ি আসে না, য়্যাডোনিস মদ খায়, য়্যাডোনিস জুয়া খেলে! শ্রীলতার গায়ের অর্ধেক গয়না কেড়ে নিয়েছে সে। কয়েকদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ছিল!

সুরুচির বেশী সময় হাতে নেই। তবু এক একদিন অফিস ফেরতা শ্রীলতার বাড়ি যায়। দুচার মিনিট বসে গল্প করে, চা খায়।

শ্রীলতা কাঁদে।

তার ভাগ্যের জন্যে নয়, তার স্বপ্ন ভাঙার জন্যে!

তার যে অনেক সাধ ছিল। ছোটবেলা থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ সে। তবু য়্যাডোনিসের সঙ্গে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল বৌবাজারের এক গলিতে। ভাঙাঘরের দারিদ্র্যের মধ্যে ভেবেছিল সে স্বর্গ রচনা করবে। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তার দুদিনও লাগল না! সেদিন সুরুচি গিয়ে দেখেছে ঘরে চাল নেই। শুধু আলু সিদ্ধ আর চা খেয়ে তার দিন কাটিছে!

টেলিফোন থাকে সেক্রেটারীর টেব্‌লে।

সুরুচি টেলিফোন তুলে নম্বর বললে।

খানিক পরে উত্তর এল। সুরুচি বললে—দেখুন আপনার পাশের বাড়ির একতলার শ্রীলতাকে একবার ডেকে দেবেন?······আমি তার বন্ধু সুরুচি কথা বলছি······

ওপার থেকে উত্তর এল—আপনি সুরুচি দেবী—একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম—আপনি এখনি চলে আসুন—ভীষণ বিপদ—

—কীসের বিপদ?

সুরুচি অবাক হয়ে গেছে যেন। শ্রীলতার আবার কি বিপদ হলো নতুন করে।

ওপার থেকে উত্তর এল—আপনার বন্ধু ·······আপনার বন্ধু আত্মহত্যা করেছেন······

—কী বললেন ?

—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন আপনার বন্ধু, শিগগীর চলে আসুন—

মাথার ওপর যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে সুরুচির। টেলিফোনের রিসিভারটা হাত থেকে নামাতে ভুলে গেল।

যখন সচেতন হয়ে পেছন ফিরে চাইলে সুরুচি দেখলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন তাকেই লক্ষ্য করে।

চোখে চোখ পড়তেই বাসু সাহেব বললেন—এখুনি আমার ঘরে একবার দেখা করবেন—

বলে বাসু সাহেব নিজের কামরায় চলে গেলেন।

সুরুচি বুঝতে পারলে না কী জন্যে তার এই ডাক। তবু ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে ভাল লাগে না তার! কতদিন অফিস থেকে বেরুবার মুখে গাড়িতে তুলে নিয়েছেন, তারপর সোজা রাস্তায় নিয়ে যাবার বদলে নিয়ে গেছেন কোনও জনবিরল হোটেলে।

আজ টেলিফোনটা করবার পর থেকেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

বাসু সাহেবের ঘরে যেতেই বাসু সাহেব বললেন—অফিসের টেলিফোন ফ্রি নয় এটা বোধ হয় আপনার জানা আছে—আর কোম্পানী তার জন্যে মাসে মাসে বিল্‌ও পাঠায় আর, আমরা টাকা দিয়েও থাকি, কিন্তু প্রাইভেট কল্······

সুরুচি বুঝলো আজকের এই অপমানটা অকারণ নয়। সেদিন গাড়িতে করে বাসু সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে না-যাওয়া এবং আরও অনেকদিনের অর্থপূর্ণ আচরণের প্রতিঘাত এটা!

সুরুচি বললে—বিপদ আপদ হলে টেলিফোন করেই থাকে সবাই—এ-অফিসের প্র্যাক্‌টিসও তাই—আপনিও করেন পারসোন্যাল কল্—

বাসু সাহেব পাইপ বেঁকিয়ে ধরলেন। কটাক্ষপাত করে বললেন—আমার সঙ্গে তুলনা করবেন না—অফিসের ডিসিপ্লিন বলে একটা পদার্থ আছে—

স্বরুচি বললে—আজ যদি অফিসের একটা দরোয়ানের কলেরা হয়, এবং খবর পেয়েও যদি টেলিফোনে হাসপাতালে খবর না দিই—তা হলে আপনার ডিসিপ্লিনের গর্ব থাকবে? কিম্বা ধরুন যদি আগুন লাগে দু'শ গজ দূরে—

বাসু সাহেব পাইপটা এমনভাবে ধরে আছেন যেন গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলাচ্ছেন। বললেন—তর্ক করবেন না—সিট-এ যান—

—সিট-এ আর যেতে চাইনে—বলে স্বরুচি পার্স খুলে চার আনা পয়সা টেব্‌লের সামনে রেখে দিয়ে বললে—রইল আপনার টেলিফোনের দাম, আমার আর সময় নেই—আমি চললুম—

বাসু সাহেব একবার ব্যস্তভাবে ডাকলেন—শুনুন, শুনুন—

—শোনবার সময় আমার নেই—বলতে বলতে স্বরুচি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়ল। বহুদিন থেকে ছাড়বে ছাড়বে করছিল সে, কিন্তু আজ এ ভালোই হলো!

এ-অফিসটা ভাল নয়।

বাসু সাহেব লোকটা প্রথম তাকে দেখেই চাকরি দিয়েছিল একরকম। প্রথম প্রথম অত্যন্ত ভালো ব্যবহারই করতো। প্রথম থেকেই নজরটা তারই ওপর পড়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই বোঝা গেল এখানে চাকরিতে উন্নতি করতে চাইলে কিম্বা চাকরি স্থায়ী করতে চাইলে আর একটা জিনিসের প্রয়োজন যেটা করা স্বরুচির পক্ষে অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে স্বরুচির মনে পড়লো চালের মন পঁয়তাল্লিশ টাকা—এক এক সময়ে পয়সা দিয়েও পাওয়া মুশকিল।

দত্তমশাই মাসের পয়লা তারিখেই আসবে আবার। বাড়ি ভাড়া আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়েও দেবে হয়ত! তা হোক—শেষ পর্যন্ত সে সংগ্রাম করবে। একদিন সফল সে হবেই! নইলে বৃথাই সে লেখাপড়া শিখেছে! মার গয়নাগুলো একে একে সবই হয়ত বন্ধক দিতে হবে! সামান্য কখানাই আছে! তবু বাবাকে সে বিশ্রাম করতে দেবে। খোকাও একদিন মানুষ হবে তার!

ধর্মতলার মোড়ে চলতি বাসে উঠতে গিয়ে হয়ত পড়েই যেত। কিন্তু কোনরকমে সামলে নিয়েছে।

লেডিস্ সিট ভর্তি। পুরুষেরা কেউ উঠে দাঁড়াবে তাও সুরুচি চায় না। আশে পাশের পুরুষদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই চলতে হচ্ছে! বাসের ঝাঁকুনীতে ব্যালেন্স ঠিক থাকবার কথা নয়। তবু তাতে এমন কিছু জাত যাবে না সুরুচির।

শ্রীলতার কথা ভাবতে লাগলো সুরুচি। কেন সে এমন করলে! বড় সেন্টিমেণ্টাল ছিল ও বরাবর। বড় বেশী আশা করতো ও, তাই বড় বেশী ঠকলো।

সুরুচি এতদিনে বুঝেছে এ-পৃথিবীতে কান্নার কোন মূল্য নেই! যে কাঁদে সেই হারে! কান্না দিয়ে, আত্মহত্যা দিয়ে কি আর জয় করা যায়! জয় করতে হলে চাই দুঃখ সহ্য করবার শক্তি। তোমাকে কে মনে রাখে বলো যদি তুমি মনে রাখাতে না পারো? আর কাঁদতেই যদি হয় তবে আড়ালে কাঁদো, তোমার কান্না দেখলে লোকে হাসবে যে!

বৌবাজারের মোড়ে এসে বাস থেকে নেমে পড়লো সুরুচি।

কিন্তু শ্রীলতার বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলে ভীষণ ভীড় জমে গেছে এরই মধ্যে! পুলিশও এসে গেছে।

এখানে শ্রীলতাকে সে কেমন করেই বা দেখবে! এলই বা সে কেন এখানে —যে মারা গেছে, সারা জীবনে যার সঙ্গে আর দেখা হবে না, তাকে নিয়ে তার কী প্রয়োজন।

সকাল সকাল বাড়ি ফেরাতে সদানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন —আজ যে এত সকাল-সকাল এলি রুচি,—শরীর খারাপ হলো না তো—

সুরুচি খোকাকে চুমু দিয়ে বললে—না, ছুটি নিয়ে এলুম—

তারপর থেকে অফিসে যাবার নাম করে প্রত্যেক দিন বাড়ি থেকে বেরুতে হয়, কিন্তু অফিসে যায় না সুরুচি।

এখানে সেখানে ঘুরে চাকরি একটা শিগগীর যোগাড় করতেই হবে। কয়েক জায়গায় দরখাস্ত করে দিয়েছে।

বহুদিন পরে প্রীতির সঙ্গে দেখা।

প্রীতি বললে—হ্যাঁ রে, শ্রীলতা নাকি সুইসাইড করেছে—

তারপর এ-কথা সে-কথার পর বললে—শুন্‌লাম তুই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস্—এখন করছিস্ কি ?

স্বরুচি বললে—একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারিস্—তোদের অফিসে এখনও রিক্রুট হচ্ছে ?

প্রীতি বললে—চাকরি তো এখন ছড়াছড়ি কিন্তু তুই চাকরি করিস্ কোন্ দুঃখে স্বরুচি, বিয়ে করে ফেল না—তোর মত চেহারা পেলে কি ষাট টাকার চাকরি করতাম—সত্যি ভাই বিয়ে করা এর চেয়ে ঢের আরামের—

বেশী সময় ছিল না।

প্রীতির অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় বললে—দিস একখানা য়্যাপ্লিকেশন লিখে আমার হাতে - আর একটা নতুন অফিস হচ্ছে কলকাতায়, সেখানেও মেয়ে নেবে—এক কাজ করতে পারিস—স্টেনোগ্রাফিটা শিখে নে না, ওটা শিখলে খুব ব্রাইট্ ফিউচার—

প্রীতি চলে গেল।

স্বরুচি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। মার যে ক'টা গয়না ছিল একে একে সব তো প্রায় খরচ হয়ে এল। নতুন করে যদি আবার শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হয় তা হলে আরো টাকা খরচা। কিন্তু দুপুরবেলা যদি একটা চাকরি থাকতো তা হলে বেশ হতো। সারাদিন চাকরি করার পর একঘণ্টা শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশ, কয়েক মাস কষ্টই না হয় করা গেল।

মাস শেষ হয়ে আসছে।

ও-মাসের পয়লাই আবার দত্তমশাই বাড়ি ভাড়ার তাগাদায় আসবেন। চাল পাওয়া ক্রমেই দুর্ঘট হয়ে উঠছে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভিখিরীর দল বাড়ির সামনে চীৎকার করে - ভাত চাইনে মা, শুধু ফ্যান্ দাও একটুখানি—

সদানন্দবাবুর এক-এক সময় আর সহ্য হয় না। বাড়িতে স্বরুচি নেই, অফিসে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বলেন—কোন্ জেলায় বাড়ি তোমাদের বাছা—

একজন হাড়-লিক্‌লিকে ঘোমটা দেওয়া মূর্তি এগিয়ে এসে বলে—বাবা আমরা কিছু খেতে চাইনে, এই আমার শাশুড়ীকে আপনারা বলে কয়ে কিছু খাওয়ান—

শাশুড়ী বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে পুরো একটা সংসার একেবারে চলে এসেছে। গ্রামে ভাত নেই।

সদানন্দবাবু দেখলেন আধমরা বুড়ী শাশুড়ীর একটা হাত ধরে পুত্রবধূ ভিক্ষে চাইছে।

বউটি বলে—আমরা দুমুঠো এদিক-ওদিক থেকে পাচ্ছি খাচ্ছি, কিন্তু শাশুড়ীকে খাওয়াতে পারছিনে বাবা……তিন দিন ধরে কিছু খায়নি—

সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন—খায়না কেন তোমার শাশুড়ী? হয়েছে কী?

—শাশুড়ী বলে চোখের সামনে জলজ্যান্ত ছেলে না খেতে পেয়ে মরে গেল—আর আমি কিনা খেয়ে বেঁচে থাকবো—

ছেলেদের পেটগুলো ফোলা, চোখ বসা। সরু পা দুটোর ওপর মস্ত দেহটা কেমন খাপছাড়া লাগে।

বেশীক্ষণ দেখতে পারেন না সদানন্দবাবু। চোখ দুটো দুহাতে বন্ধ করে ঘরে চলে আসেন। সহ্য হয় না। কিন্তু কোথায় যে প্রতিকার তা-ও ভেবে ঠিক করতে পারেন না।

সেদিন রবিবার। সদানন্দবাবু সুরুচিকে বললেন—আজ একটু বেশী করে ভাত রাঁধতে পারিস রুচি—এই দু'তিন জনের মত—ওদের দেখলে বড় কষ্ট হয়—

ভাত সেদিন বেশী করেই রাঁধলে সুরুচি। কিন্তু পরের দিন ভীড় আরো বাড়লো।

সুরুচি বললে—নিজেদেরই আর কুলোবে না বাবা—যা চাল ছিল ভাঁড়ারে, সব তো শেষ হয়ে এল—

সুরুচির একটা ছুটির দিন দেখে সদানন্দবাবু বেরুলেন। চালের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এতটুকু হাঁটতে বড় বেশী কষ্ট হয়। রাস্তায় চেতলার বাজারে লম্বা লাইন লাগিয়েছে চালের। এরা কাল থেকে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে। এরপর টিকিট বিলি হবে। টিকিট যারা পাবে, তারাই পাবে চাল। এখানে দাঁড়িয়ে চাল নেওয়া কি সম্ভব।

হাজরা রোডে ভোলানাথের দোকান। একদিন ভোলানাথই ডেকে খাতির করে দোকানে বসিয়েছিল সদানন্দবাবুকে। আজ আবার ভোলানাথের

দোকানে গেলেন। ভোলানাথ সদানন্দবাবুর উপকার ভুলতে পারবে না তার যখন চাকরি যায় তখন সদানন্দবাবুই বাড়িতে বসে খাইয়েছেন। মৃন্ময়ী ভোলানাথের কার্বঙ্কল হওয়ার সময় নিজে হাতে তার সেবা করেছেন। সাবান দিয়ে কাপড় কেচে দিয়েছেন।

ভোলানাথের দোকানেও বেশ ভীড়।

সদানন্দবাবুকে দেখে ভোলানাথ অনেক ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল।

বললে –আসুন সদানন্দবাবু—আসুন—

সদানন্দবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন।

বললেন—তুমি বলেছিলে তোমার দোকান থেকে চাল নিতে, তাই এলুম—

সদানন্দবাবু দেখলেন এরি মধ্যে ভোলানাথের যেন চেহারা বদলে গেছে। কয়েকটা ভদ্রলোককে নিয়ে ভোলানাথ কথাবার্তা কইতে ব্যস্ত। অনেকক্ষণ বসে রইলেন সদানন্দবাবু। কথা আর শেষ হয় না ভোলানাথের।

সকলের সঙ্গে কথা শেষ করে সকলকে বিদায় দিয়ে ভোলানাথ সদানন্দবাবুর কাছে এল।

বললে—ক'মন চাই আপনার? বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবোখন—

কথা বেরুল না সদানন্দবাবুর মুখ দিয়ে। এতখানি আশা করেন নি সত্যি সত্যি।

বললেন—বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে তুমি—কত করে মন নেবে?

—বাজার দরের চেয়ে কম দেবেন কিছু—

সন্ধ্যাবেলা মুটের মাথায় চাল পাঠিয়ে দিলে ভোলানাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিল পাঠিয়েছে।

আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বিলটা দেখে সুরুচি চমকে উঠলো—পঁচানব্বই টাকা চালের দাম আর মুটে ভাড়া এক টাকা।

সদানন্দবাবু বললেন—ভোলানাথ ঠকাবে না, ও বাজার দরের চেয়ে কম নেবেই—

সুরুচি মুটেকে বলে দিলে—তুমি যাও, বাবুর কাছে কাল আমরা টাকা পাঠিয়ে দেব—

মৃন্ময়ীর আর একখানা গয়না কালই বাঁধা রেখে টাকা আনতে হবে।

রাত্রে ঘুমোবার আগে খোকাকে পাশে শুইয়ে সুরুচি নিজের আনুপূর্বিক জীবনটা ভাববার চেষ্টা করে। শুধু ক্ষতির অঙ্কটাই স্ফীত হয়ে চারিদিক থেকে গ্রাস করতে চাইছে তাকে! প্রতি পদক্ষেপ তার কাছে দিন দিন দুরূহ হয়ে উঠছে। মার স্নেহনিবিড় পক্ষপুটে ছোটবেলার বিগত দিনগুলো এখন স্মৃতির পর্দায় ধূসর। ঘুমের ঘোরে খোকা হেসে ওঠে! রাত্রে দু-একবার খোকাকে ঘুম ভাঙিয়ে ওঠাতে হয়। সারা রাত তরল ঘুমের সমুদ্রে সুরুচি দোল খায়। তারপর সকালে যখন ওঠে, তখন অল্প অল্প অন্ধকার। আগে রাত থাকতে মা উঠতো সংসারের কাজ করতে। পিসীমা ছিল। তখন সুরুচি বেলা করে উঠেছে ঘুম থেকে। চা খেয়েছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তখন অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে হোত না। কোথা থেকে টাকা আসে, কোথা থেকে রান্না-খাওয়া চলে কিছু খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি!

সকাল বেলা উঠেই একটার পর একটা কাজ করতে করতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়। সময় হয়ে যায় বেরুবার। বিকেল বেলা শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশ ছিল আগে। কোন রকমে পাস করে বেরিয়েছে সুরুচি। কিন্তু ভাল চাকরি একটা জোগাড় হয়নি। মার গয়নাগুলো একে একে সব শেষ হয়ে গেছে। খোকার জামা কিনতে হবে। সুরুচির নিজের কাপড় নেই। তা ছাড়া চাল ডাল কিনতেই আর খোকার দুধের জন্যেই সব খরচ হয়ে যাচ্ছে।

সদানন্দবাবু আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই শুয়ে থাকেন।

বাইরে ভিখিরীদের চীৎকার—একটু ফ্যান্ দাও মা—একটু ফ্যান্ দাও—

সেদিন রাস্তায় এক অভিনব দৃশ্য দেখে থেমে গেল সুরুচি। বৌবাজারের মোড়ে অনেক ভিখিরীর দল জমেছিল। একজন আমেরিকান এসে একটা পুলিশকে ডেকে একটা টাকা দিয়ে সকলকে টাকাটা ভাগ করে দিতে বললে।

আমেরিকানটা চলে গেল। পুলিশটা টাকা ভাঙিয়ে বারো আনা নিজে নিয়ে চার আনা পয়সা দিলে ভাগ করে। এক পয়সা দুপয়সা ভাগে পড়লো। তাতেই খুশি সবাই।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা দেখছিল তারা কিছুই বললে না। অবাক হয়ে যে যার মুখের দিকে চাইলে শুধু।

অনেকগুলো পয়সা বাসে ট্রামে বাজে খরচ হয় আজকাল।

চার পাঁচটা জায়গায় দরখাস্ত করে দিয়েছে। প্রীতির অফিসেও দিয়েছে

একটা পাঠিয়ে। সব জায়গায় এক একবার করে খবর নিয়ে আসতে হয়। একশো টাকার নিচে হলে তার চলবে না। বাড়ি ভাড়া, খোকার দুধ, বাবার ওষুধ—কেমন করে সব চলবে তার!

দুখানা দরখাস্তের উত্তর এল সেদিন। মাইনের কথা কিছু লেখেনি। তবু দেখা করতে লিখেছে।

ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিসের নম্বর দেখে সুরুচি সকালে গিয়েই হাজির হলো। লিফ্‌টে উঠে চারতলায় গিয়ে দেখা করলো। সামনে বসে ছিল একজন কেরানী। সুরুচি তাকে গিয়েই জিগ্যেস করলে—চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম এই অফিসে, এই উত্তর পেয়েছি এখান থেকে। কার সঙ্গে দেখা করবো বলতে পারেন?

কেরানী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে চশমা পরে পড়লেন। বললেন—আসুন আমার সঙ্গে—

সুরুচি সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। অফিসে সবই পুরুষ। মুখ তুলে দেখলে সুরুচিকে। একটা চেম্বারের সামনে এসে ভদ্রলোক বললেন—একটা স্লিপে আপনার নাম লিখে এই দরোয়ানের হাতে ভেতরে সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিন—আপনার ডাক আসবেখন—

ভদ্রলোক চলে গেলেন।

সুরুচি দাঁড়িয়ে রইল। উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। এই এখানে এই ছাদের নিচে বসে তাকে দিনের পর দিন কাজ করতে হবে! আশে পাশের লোকগুলো লুকিয়ে সুরুচির দিকে দেখছে। নিজের কাছে নিজেকে যেন খুব ছোট মনে হলো। চারিদিকে তার যেন অগ্নিগোলক—তাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরছে। অপমানের আগুনে মুখটা তার রাঙা হয়ে উঠলো। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হলো না তাকে!

ভেতর থেকে স্লিপ ফিরে এল। স্লিপে লেখা—রিগ্রেট্—

দরোয়ানটা বোধ হয় সুরুচির মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিল।

বললে—কাল সাহেব একজন মেম সাহেবকে চাকরি দিয়ে দিয়েছে—আপনি দেরীতে এসেছেন বড়—

এক মুহূর্তও দেরী করা আর উচিত নয়। সুরুচি মুখটা নিচু করে বাইরে

বেরিয়ে এল। পেছনে অনেক লোকের নিঃশব্দ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে নিশ্চয়ই। লিফ্‌টে নামা আর হলো না। সিঁড়ি দিয়ে তর্‌ তর্‌ করে নেমে একেবারে রাস্তায় দিনের আলোর সামনে জনতার ভীড়ে এসে দাঁড়াল সুরুচি।

মনে হলো আর দরকার নেই। আর একটা অফিসের চিঠি ছিল হাতে। কিন্তু এত দেরী করে গেলে কিছুই হবে না জানা কথা!

ফিরেই আসছিল সুরুচি কিন্তু একটা পানের দোকানের আয়নাতে হঠাৎ নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে কী যেন ভাবলে একবার। কোথায় গেল সেই কলেজ জীবনের মুখের জৌলুষ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গায়ের রং। রোদে ঘুরে তামাটে হয়েছে মুখ। আজ এক বছর ধরে একটানা যে পরিশ্রম যে কৃচ্ছ্রসাধন চলছে—কলকাতার ভীড়ে সে যে হারিয়ে যায়নি এই তো যথেষ্ট!

প্রীতির অফিসটা কাছেই।

এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে গিয়েই বা করবে কী! প্রীতির অফিসে যাবার জন্যে মুখ ফেরাতেই হঠাৎ নজর পড়লো একটা অফিসবাড়ির দিকে!

ওই নম্বরেই তো তার যাবার কথা।

গেট দিয়ে ঢুকে ওপরে চলে গেল সুরুচি। ছুতোর মিস্ত্রী চারিদিকে কাজ করছে।

দেখে বোঝা যায় নতুন অফিস হচ্ছে। কয়েকজন লোক কাজকর্ম শুরু করেছে। ভালো করে সাজ-সরঞ্জাম তৈরী হয়নি এখনও।

কাকে গিয়ে যে জিগ্যেস করবে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। চুপ করে সুরুচি দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। একবার মনে হলো ফিরেই যায়। প্রথম অফিসের মত এখানেও হয়ত ওই একই উত্তর আসবে! আগে থেকে সমস্তই ঠিক থাকে, শুধু শুধু কাগজে এরা বিজ্ঞাপন দেয়।

সুরুচি সিঁড়ির দিকে আবার ফিরে এল। দরকার নেই এখানে।

হঠাৎ সিঁড়ি থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—দিদিমণি—

চিনতে একটু দেরীই হলো সুরুচির। তবু খানিক পরে চিনতে পেরে সুরুচি অবাক হয়ে বললে—গোপাল, তুমি এখানে?

গোপালও কম অবাক হয়নি। সুরুচির চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে

গোপাল বললে—আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি দিদিমণি—

স্থরুচি বললে—তুমি এ অফিসে কবে ঢুকলে ?

গোপাল বললে—এ তো আমার বাবুরই অফিস—

—তোমার বাবু ? কী নাম বলো তো—মনে পড়ছে না ঠিক—স্থরুচি অবাক হয়ে গেল।

গোপাল বললে—ভুলে গেলেন সেই টাটানগর স্টেশনে ? বাবুর নাম বিলাসভূষণ চৌধুরী—

বিলাস চৌধুরী !

সেই ছফুট দীর্ঘ চেহারার মানুষটির মুখটা আবার ভালো করে মনে করতে চেষ্টা করলে স্থরুচি। তাঁরই অফিস! তাঁরই কাছে কাজ করতে হবে! নিজের দীনতা নিয়ে আবার তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে প্রার্থী হয়ে! যা হোক, ভালোই হয়েছে! তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি ভালোই হয়েছে যেন!

স্থরুচি জিগ্যেস করলে—তোমার বাবু কি তা হলে হাজারিবাগে থাকেন না আর ?

গোপাল বললে—বাবু তো কলকাতায় একটা বাড়ি কিনেছেন—এখানেই এখন অফিস করেছেন বাবু—

স্থরুচি চুপ করে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো !

গোপাল বললে—বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন না দিদিমণি ?

—তোমার বাবু কোথায় ?

—এখুনি অফিসে আসবেন, আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। ছুতোর মিস্ত্রী খাটছে—আমিই তো সব দেখা শোনা করছি—গোপাল বললে।

—তবে আমি চললুম—বলে স্থরুচি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

তারপর খানিক থেমে বললে—গোপাল—শোন—

গোপাল কাছে এল।

স্থরুচি বললে—আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছিল তা তোমার বাবুকে বলবার দরকার নেই—বুঝলে—

কিন্তু সামনের দিকে মুখ ফেরাতেই স্থরুচি দেখলে সেই ছফুট দীর্ঘ লোকটিই তার দিকে চেয়ে ওপরে উঠে আসছেন।

গোপাল বললে—ওই যে আমার বাবু এসে পড়েছেন—

কী করা উচিত এখন স্থরুচি ভেবে ঠিক করতে পারলে না। হয়ত কর্তব্য

বোধে কিম্বা নিজের আড়ষ্টভাব এড়াবার জন্যেই সুরুচি দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে।

বিলাস চৌধুরীও সামনে এসে দুহাতে নমস্কার জানালেন।

তারপর বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

কী জবাব দেবে সুরুচি বুঝতে পারলে না। চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

সুরুচিকে পাশ কাটিয়ে বিলাস চৌধুরী ওপরে উঠতে উঠতে বললেন—আসুন—আমার অফিসে বসে কথা হবে—

সুতরাং সুরুচির ওপরে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না। বিলাস চৌধুরীকে আসতে দেখে সামনের দিকের কেরানীরা সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলাস চৌধুরী চলতে চলতে বললেন—আমি তো বলে গিয়েছিলাম আপনি এলে বসতে বলতে—বলেনি কেউ— ?

সুরুচি এবারও কোনও জবাব দিলে না। ঘটনার এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে সে যেন হতবাক হয়ে গেছে।

বিলাস চৌধুরী একটা ঘরের ঝোলানো দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন—

সুরুচি ঢোকার পর বিলাস চৌধুরী একটা চেয়ারে গিয়ে বসে বললেন—আপনি এখানে এসেছিলেন অথচ দেখা না করে ফিরে যাচ্ছিলেন কেন বুঝতে পারলুম না—

সুরুচির শরীর যেন ভেঙে পড়ছিল। আর সে দাঁড়াতে পারবে না। তার মনে হলো সে যেন ধরা পড়ে গেছে। তার সমস্ত দৈন্য আজ আর অনাবিষ্কৃত নেই। সেদিনকার সেই গর্ব আর আত্মাভিমান আজ নিঃশেষে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুরুচি বসে পড়লো!

রোজ অফিস যাওয়ার প্রয়োজন হয়না বিলাস চৌধুরীর।

তবু নতুন অফিস। নিজে একবার সব কাজ চালু করে দিলে তখন বাড়িতে বসে শুধু চালনা করা। অফিসে যাওয়ার চেয়ে বেশী দরকার সপ্তাহের মধ্যে দু-তিনবার আসল কাজের জায়গায় গিয়ে তদারক করে আসা।

মিলিটারীর ব্যাপার—কাজ যেমন-তেমন হোক, ঠিক সময়ে কাজ শেষ করা চাই।

হাজার হাজার ফুট রাস্তা—কিম্বা কয়েক হাজার খড়ের ছাউনি তৈরী করা—কিম্বা এরোড্রোমের কাজ। কাজের যেন শেষ নেই। কাজ করে ওঠা শক্ত। লক্ষ লক্ষ টাকা মিনিটে মিনিটে ব্যয় হয়।

ভারতবর্ষকে জাপানের হাত থেকে যে-করে হোক বাঁচাতেই হবে!

তারপর বিলাস চৌধুরী আবার নতুন কাজ পেয়েছেন আর একটা।

চাল, আটা, চিনি রেশন হয়ে যাচ্ছে—তারই এজেন্সি পেয়েছেন। সুতরাং অফিস করতে হয়েছে বিশেষ করে সেই কারণে।

সকালবেলা বিশেষ কাজে আজ অফিস যেতে হবে বিলাস চৌধুরীকে। জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে।

চাকরকে বললেন—গাড়ি বার করেছে কিনা দেখ্‌তো—

গাড়ি একটু পরেই বেরুল।

কিন্তু নিচে নেমেই বিলাস চৌধুরীর মনে পড়ল—গোপাল তো এখনও এল না।

ভোর বেলাই গোপালকে পাঠানো হয়েছে। এত দেরী করলে আর অপেক্ষা করা চলে না। নিচে নেমে গাড়িতে আর উঠলেন না।

টবের ফুলগাছগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। এবার ঝড়বৃষ্টির জন্যে ক্রীসান্থিমাম্ ভাল হলো না। গোলাপের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিতে হবে।

বড় মুশকিল করে চড়াই পাখীরা।

বাড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। পুরোন বাড়িই কিনেছিলেন—কিন্তু এখন আর পুরোন বলে চেনা যায় না।

গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভার দাঁড়িয়েছিল।

বিলাস চৌধুরী বাগান পেরিয়ে গেট খুলে রাস্তার ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘড়ি দেখলেন।

এবার পুজোর সময় হাজারিবাগে যেতে হবে এক ফাঁকে! সব দিকে না দেখলে চলে না। মোটরে যাওয়াই ভালো। একটা দিন থাকবেন সেখানে। গোপালের ওপর সব কাজের ভার ছেড়ে দিলে কি চলে।

কিন্তু এই বয়স কি তাঁর চিরকাল থাকবে। একদিন তিনি যখন বিশ্রাম নেবেন—সমস্ত পরিশ্রম আর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন···কিন্তু সে কথা এখন ভেবে লাভ কী।

সে তো এখনও বহুদিন!

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গোপাল এল। বললে—দিদিমণির বাড়িতে বড় বিপদ—আসতে পারবে না এখন—

বিলাস চৌধুরী বললেন—তোর দিদিমণির সঙ্গে দেখা হলো?

—দেখা হলো—গোপাল বললে।

—কি বল্‌লি তুই?

—আমি বললুম—পয়লা তারিখে আপনার জয়েন্ করার কথা আর আজ পনেরো তারিখ হয়ে গেল দেখা সাক্ষাৎ নেই, একটা খবরও দেননি, তাই বাবু আমাকে পাঠালেন।—দিদিমণি বললে—বাবার অসুখ, এখন অফিসে যেতে পারবো না—

গাড়িতে উঠে বিলাস চৌধুরী বসলেন। গোপালও উঠলো।

যেতে যেতে বিলাস চৌধুরী জিগ্যেস করলেন—বাবুর কি খুব অসুখ দেখলি গোপাল—

গোপাল বললে—দেখলুম শুয়ে আছেন—উঠতে পারেন না বিছানা থেকে, শুয়ে থাকেন দিনরাত—কথা বলতে কষ্ট হয়—

অফিসে বিলাস চৌধুরীর ঘরের পাশেই স্রুচির জন্যে একটা ঘর তৈরী করা হয়েছে। সাজসরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত। পয়লা তারিখ থেকে স্রুচির অফিসে আসার কথা। আজ পনেরো তারিখেও তাকে অনুপস্থিত দেখে বিলাস চৌধুরী গোপালকে পাঠিয়েছিলেন।

অফিসে গিয়ে কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌লেন না। গোপালকে বসতে বলে নিজে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

গাড়ি যশোর রোড ধরে চললো। এক একবার গাড়ির গতি কমে আসে আর একটা মিলিটারী লরী পাশ দিয়ে বিপরীত দিকে চলে যায়। কোটের বোতামটা এঁটে দিলেন। গাড়ি যখন বেশী জোরে চলে তখন শীত করে সমস্ত শরীরে। ফাঁকা রাস্তায় পড়ে গাড়ির স্পীড আরো বাড়লো। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়লো। হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় আসার পথে

একবার এক মোটর দুর্ঘটনা হয়েছিল। তখন বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলেও তখন কাছে নেই। বিলাস চৌধুরী যখন ভাঙা মোটরের কাছে গেছেন তখন বেঁচে কেউ নেই। আধমরা অবস্থায় যে-মেয়েটি তখনও একটু একটু বেঁচে ছিল তাকে দেখতে অনেকটা স্বরুচির মত। টাটানগরের সেই প্লাটফরমের কথাটাও আবার মনে পড়লো। সেদিনের আচরণের মধ্যে অন্যায় কিছু হয়নি তাঁর!

গাড়ি ভীষণ জোরে চলতে শুরু করেছে। অনির্দিষ্ট যাত্রা। আজ আর কাজ তাঁর ভাল লাগছে না। হাজারিবাগের বারান্দায় সেই একক পায়চারি, আর এখানে এই কলকাতায় অফিস যাওয়া আর আসা নয়ত বাড়িতে বাগানের সামনে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোন। প্রথম বিয়ের দিনগুলো বেশ ছিল। একটিমাত্র ছেলেকে নিয়ে মায়ার ছিল যত ভাবনা। তিনি নিজে তখন তাঁর কাজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। অত বড় জমিদারী, মাথার ওপর কেউ নেই, সাহায্য করবারও কেউ নেই—ছেলের লেখাপড়া, কোথায় কার সঙ্গে মিশছে, কী পড়ছে, কিছুই খোঁজ রাখবার সময় ছিল না। মাস্টার রেখেছিলেন ছেলের লেখাপড়ার জন্যে। কর্তব্য সেখানেই শেষ বলে ধরে নিয়েছিলেন। সেই ছেলে যে একদিন অমন হবে কে জানতো।

হঠাৎ এক জায়গায় আসতেই বিলাস চৌধুরী গাড়ি ঘোরাতে বললেন ড্রাইভারকে।

—কলকাতায় ফিরে চল নাগেশ্বর।

অফিসে ফিরে এলেন বিলাস চৌধুরী। গোপাল টিফিন তৈরী রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসের কাগজপত্র দু একটা দেখতে লাগলেন। অনেক-গুলো ফাইল এসে টেব্‌লে জমেছে। সব কাগজ আজ দেখা হবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

গোপালকে বললেন—আমার সঙ্গে একবার চেতলায় চল।

তখন বিকেল শুরু হয়েছে বলা যায়। গোপালই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বিলাস চৌধুরী এদিকে আগে কখনও আসেননি। চেতলার হাটের টিনের চালা পেরিয়ে সবজিবাগানের গলির মোড়ে এসে গাড়ি থামল। বিলাস চৌধুরী গাড়ি থেকে নামলেন। বললেন—গাড়ি এখানে থাক নাগেশ্বর।

অল্পবিত্ত সমাজ, ছোট বড় পুরোন নতুন বাড়ি, কয়েকটি নারকোল গাছ, একটা পানা-ওয়ালা পুকুর—কলকাতার ধারে কাছেই যে এমন না-শহর না-গ্রাম আছে বোঝা শক্ত। কলকাতা করপোরেশনের ভেতরে এমন জায়গা বোধ হয় দুটি নেই।

তবু বিলাস চৌধুরীর ভালো লাগলো। উন্নাসিক বালিগঞ্জিয়ানার চেয়ে এ ঢের ভালো।

নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে গোপালই প্রথমে ঢুকলো। বিলাস চৌধুরী বাইরে দ্বিধান্বিতভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিক পরে গোপাল বেরিয়ে এসে ডাকলে—আসুন ভেতরে—আসুন—

ছোট একটি ঘর। ঘরের পুব দিকে একটা তক্তপোশ পাতা। তারই ওপর শুয়ে আছেন সুরুচির বাবা! বিলাস চৌধুরী কথা বলবার পূর্বেই সদানন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওঠবার ক্ষমতা নেই সদানন্দবাবুর। তবু শুয়ে শুয়েই যেন অভ্যর্থনা করতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বিলাস চৌধুরী নিজেই এগিয়ে গিয়ে বললেন—ব্যস্ত হবেন না আপনি—

সদানন্দবাবু বললেন—সুরুচি বাড়ি নেই, আমার ওষুধ আনতে গেছে, এমন সময়ে এলেন—আমি উঠে বসে আপনাদের······

বিলাস চৌধুরী বললেন—আপনি বেশী কথা বলতে চেষ্টা করবেন না—সকালে আমি গোপালকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, শুনলাম আপনার খুব অসুখ, তাই নিজেই এলাম একবার—

সদানন্দবাবু চিত হয়ে শুয়েছিলেন, এবার বিলাস চৌধুরীর দিকে পাশ ফিরে শুলেন—

বললেন—আগের চেয়ে অনেকটা ভাল হয়ে এসেছি, আর কিছু দিন শুয়ে থাকলেই সুস্থ হবো······সব ওষুধ পাওয়াও যায় না আজকাল—

খানিকক্ষণ বিলাস চৌধুরীও কিছু কথা বলেন না।

কী কথা বলতে হবে যেন ভেবে পেলেন না। কেমন করে এ-পরিবারটির সঙ্গে টাটানগর স্টেশনে আলাপ হয় এবং ঘটনাসূত্রে কেমন করে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়, তারপর এতদিন পরে চাকরির চেষ্টায় আবার দৈবাৎ কেমন করে সুরুচির সঙ্গে বিলাস চৌধুরীর যোগাযোগ ঘটেছে, সকালবেলা সে-খবর গোপাল নিজে সদানন্দবাবুকে জানিয়ে গেছে।

অনেকদিন পরে পাশে একটি সহানুভূতিশীল শ্রোতা পেয়ে অনেক গল্প শুরু করলেন সদানন্দবাবু। তার মধ্যে নিজের এই শোচনীয় দুরবস্থার কথাটাই বার বার ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো। তাঁর বিগত জীবনের আদর্শনিষ্ঠা, সরকারি চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে জেল খাটা, লাহোর জেলের ভেতর সেই অমানুষিক অত্যাচার তারপর সংসার জীবনের দৈনন্দিন বিড়ম্বনা, স্কুলজীবনের মানুষ গড়ার স্বপ্ন, শেষে এই যুদ্ধ, এবং এই যুদ্ধের পটভূমিকায় পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট, সবশেষে তাঁর নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য—যার জন্যে অনন্যোপায় হয়ে সুরুচিকে চাকরির জন্যে পরের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে! উপরন্তু একটি নাবালক শিশুর ভার নিতে হয়েছে সুরুচিকে! অবশ্য সদানন্দ-বাবুর স্ত্রীর মৃত্যুই এই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে দায়ী তা-ও জানালেন তিনি!

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব, আমি করতে পারি—আমি আপনাদের পরিবারে ঋণী রয়েছি, কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি থেকে এঁরা বাঁচিয়েছিলেন আমাকে—তাই খবর নিতেও এসেছিলাম যে পয়লা তারিখে জয়েনিং ডেট আর আজ পনেরো দিন হয়ে গেল কোনও খবরাখবর নেই……

সদানন্দবাবু বললেন—আমাকে কিন্তু সে-কথা জানায়ও নি সুরুচি……কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করে এলেন, আমি ওকে পাঠিয়ে দেব কাল, কাল নিশ্চয়ই যাবে—দেখবেন নিশ্চয় যাবে—

এইবার ওঠা উচিত হবে কিনা সেই কথাই ভাবছিলেন বিলাস চৌধুরী।

হঠাৎ ভেতর থেকে ছোট শিশুর কান্নার শব্দ এল।

সদানন্দবাবু বিব্রত হয়ে উঠলেন—খোকা উঠেছে!

গোপাল বললে—ওই খোকা উঠেছে—বলে ভেতরে চলে গেল। এবং খানিক পরেই খোকাকে কোলে করে এনে হাজির। নতুন লোক দেখে কান্না থেমে গেছে তার। বাড়িতে এত অচেনা মুখ কখনও দেখেনি খোকা!

গোপাল জিগ্যেস করলে—আমাদের বাড়ি যাবে খোকা?

সদানন্দবাবু বললেন—সুরুচিকে ছেড়ে মোটে থাকতে পারে না খোকা, রাত্রে আমার কাছেও কিছুতেই শোবে না—

খোকার ছোট ছোট দাঁত বেরুতে শুরু হয়েছে। অল্প অল্প কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু কী যে তার অর্থ বোঝা ভার। গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল গোপালের সঙ্গে।

বিলাস চৌধুরী বললেন—এবার আমরা উঠি তাহলে সদানন্দবাবু……

সদানন্দবাবু উঠে বসতে পারলেন না, তবু বললেন—আবার আসতে বলবো এমন সাহস হয় না—কিন্তু আমি জানি আপনি আসবেনই—তা হলে কালকে কি স্বরুচিকে আপনার অফিসে যেতে বলবো—?

—নিশ্চয়ই বলবেন—যদি অস্থবিধে না হয় তা হলে কালই যেন যান—আর তাঁকে বলবেন—এই পনেরো দিন যে গেলেন না এটা আমরা ছুটি হিসেবেই ধরবো—এর জন্যে মাইনে থেকে কাটা যাবে না টাকা—

বিলাস চৌধুরীর কথা শেষ হলো না। কথার মাঝখানে স্বরুচি ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠেছে।

গলির মোড়ে বিরাট গাড়িটা দেখে খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পেরেছিল। তবু নিজের অস্বস্তিটুকু ঢেকে নিয়ে বাইরে মিষ্টি হাসির ছদ্মবেশ টেনে জিগ্যেস করলে—কতক্ষণ হলো এসেছেন আপনি ?

স্বরুচিকে দেখে খোকা গোপালের কোল থেকে লাফিয়ে উঠলো—দিদি—দিদি কাছে যাবো—

খোকাকে কোলে নিয়ে স্বরুচি বললে—ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ যে আপনি—

বিলাস চৌধুরী বললেন—সকলবেলা গোপালের কাছে আপনার বাবার অস্থখের খবর শুনে চলে এলাম—তা ছাড়া আপনার কাছে আমারও একটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার আছে। অফিস আদালত যা-কিছু বলুন সবই একটা বিধিনিয়ম মেনে চলে—

সদানন্দবাবু বললেন—নিশ্চয়ই, নিয়ম মানে না কে ? সবাই মানে—গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য সৌরমণ্ডলীই বলুন আর এত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই বলুন……

স্বরুচি হঠাৎ যেন কঠোর হয়ে উঠলো।

বললে—চাকরি করলুম না একদিনও, অথচ কৈফিয়ৎ দিতে হবে—এ কি রকম বিধি ?

বিলাস চৌধুরী তেমনি হাসিমুখেই খানিকক্ষণ স্বরুচির দিকে চাইলেন। তারপর বললেন—যে-বিধানে প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশী সাহায্য করতে দৌড়ে আসে, যে বিধান বলে 'মানুষের সংসারে কোনও মানুষই পর নয়' অন্য বিধান না মানুন এ বিধানটা তো মানবেন ?

সুরুচি বললে—আমি ঠিক-দিনে না যাওয়াতে যদি আপনার অফিসের কাজের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তো আপনি কৈফিয়ৎ চাইবেন বৈকি—

বিলাস চৌধুরী বললেন—এটা রাগের কথা হলো আপনার, কিন্তু তা থাক —কাল অফিসে যাচ্ছেন তো—

সুরুচি এ প্রশ্নের হঠাৎ কোনও জবাব দেবার আগেই সদানন্দবাবু বিছানা থেকে বলে উঠলেন—নিশ্চয়ই যাবে—কাল তুই যাবি রুচি, আমি ভাল আছি, আমার জন্যে ভাবতে হবে না—

সুরুচি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। সদানন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন—সে তোকে কিছু ভাবতে হবে না। বিলাসবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, কাল তুই খেয়ে-দেয়ে সাড়ে দশটায় অফিসে যাবি—

হঠাৎ বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

—কে—বলে সুরুচি দরজার বাইরে গিয়ে উঁকি দিলে। ফিরে এসে বললে—সিংজী এসেছে বাবা—

সিংজী!

যেন অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন এমনিভাবে বললেন—সিংজীকে বলে দে মা রুচি যে ওর টাকা আমি দেব—একটু সুস্থ হয়েই সব টাকা শোধ করে দেব—আর একটা মাস……

সুরুচি যেন ঠিক অল্প-পরিচিতদের সামনে এ-প্রসঙ্গের অবতারণা চায়নি। বাবার এতটুকু মাত্রা বোধ নেই।

সিংজী জানালে টাকার তাগাদায় সে আসেনি। এ-পথে যাচ্ছিল, মাস্টার সাহেব কেমন আছেন দেখতে এসেছে।

বিলাস চৌধুরীরও ঠিক এই প্রসঙ্গের মধ্যে থাকা যেন ভাল লাগছিল না। তিনিও নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

সবাই চলে যাওয়ার পরে সুরুচি বললে—বাবা, তুমি পরের সামনে সব ঘরের কথা নিয়ে আলোচনা করো কেন বল তো?

সদানন্দবাবু বললেন—পর কে! তবে যে বিলাসবাবু বললেন, তোদের সঙ্গে টাটানগরে খুব আলাপ হয়েছিল—তোদের খুব ভাল রকম চেনেন—সব মিথ্যে নাকি?

চারদিকে ফাইল! প্রকাণ্ড টেব্‌লের সামনে বসেছে স্থরুচি। সকাল সাড়ে দশটায় আসতে হয়, তারপর পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করেও শেষ হয় না। সাতটা এরোড্রোমে কাজ চলেছে এক সঙ্গে।

পানাগড়ের কুলিরা ম্যালেরিয়ায় পড়েছে দলকে দল! কেউ যেতে চায় না সেখানে। সাহেবকে বলে কুলিদের দৈনিক রেট বাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

রেলের ওয়াগন ঠিক সময়ে পৌছোয় না। আর্মেনিয়ান ঘাটে তিনদিন ধরে লোক গিয়ে ফিরে ফিরে আসছে। অদ্ভুত ওই রেলের বাবরা। কথায় কথায় ঘুষ। ঘুষ না দিলে একটা কথা তাদের মুখ দিয়ে বের করা শক্ত।

কলিং বেলটায় একটা টোকা মারলে স্থরুচি।

আওয়াজ পেয়ে ছোকরা চাপরাসী ঘরে ঢুকলো।

স্থরুচি জিগ্যেস করলে—সাহেব অফিসে এসেছে কি না দেখ্‌তো—

চাপরাসী ফিরে এসে জানালে, সাহেব আসেনি।

অনেকগুলো ফাইল আটকে রয়েছে সাহেবের অভাবে। একলা স্থরুচির ঘাড়ে সমস্ত অফিসের ভার ছেড়ে দিয়ে সাহেব বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। চার-পাঁচ দিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে কোথাও চলে যান অফিসের কাজে—আবার একদিন হঠাৎ অফিসে এসে হাজির। নতুন কনট্রাকটের সময় সাহেব নিজে হাজির থাকেন।

প্রথম প্রথম ভয় লেগেছিল স্থরুচির। সমস্ত অফিসের পরিচালনা ভার নিজের হাতে নেওয়া শক্ত বৈ কি! এ অফিসটা নতুন। তবু বুড়ো ক্যাশিয়ার রঘুনাথবাবু সামনে এসে মাথা চুলকোন।

বলেন—এ চেক দুটো ডিসঅনার্ড হয়ে ফিরে এসেছে—

রাগ হয়ে যায় স্থরুচির।

বলে—তা হলে পার্টিকে লিখতে হবে। আমার কাছে রেখে যান আমি চিঠি ড্রাফট করে দেবখন—

দু-মিনিট পরই রঘুনাথবাবু আবার ঢোকেন।

বলেন—এই এখানটায় একটা সই দিয়ে দেবেন—

আরো রাগ হয়ে যায় স্থরুচির। বলে—সই করেছি দেখতে পাচ্ছেন না—?

চশমা তুলে ভালো করে নজর দিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রঘুনাথবাবু নীরবে চলে যান।

তারপর আসে অফিসের দরোয়ান চাপরাসী আর বেয়ারারা। চাঁদার খাতাখানা এগিয়ে ধরে বলে—পুজোর পার্বণী দিতে হবে—

সুরুচি ফাইল থেকে মাথা তুলে বলে—পুজোর পার্বণী আমি দেবার কে? —সাহেব এলে বলো।

—আপনিইতো দিতে পারেন—আপনিই আমাদের মনিব—

ওরা কেমন করে বুঝেছে সুরুচির এখানে অনেকখানি ক্ষমতা। কিন্তু সে ক্ষমতা যে কতটুকু তা সুরুচি নিজেই জানে না। তবু বিলাস চৌধুরী সুরুচিকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে এতটুকু অপ্রিয় কথা শোনান নি কোনও দিন।

একজন ডেসপ্যাচ ক্লার্কের পোস্ট খালি ছিল। বুড়ো রঘুনাথবাবুর ছোট ছেলে ম্যাট্রিক ফেল। বুড়োমানুষ ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন হাজির।

বললেন—ইটি আমার ছোট ছেলে, আপনার কাছে এসেছিলুম চাকরির জন্যে···

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা দরখাস্তও দিলেন।

সুরুচি বললে—আমার কাছে কেন, সাহেব এলে সাহেবকে দেবেন—

রঘুনাথবাবু বললেন—সাহেবের কাছে গিয়েছিলুম, সাহেব আপনার কাছে আসতে বললেন, আপনি যা বলবেন সাহেব তাতে না বলবেন না—

অফিসের চাপরাসী দরোয়ান থেকে শুরু করে বুড়ো ক্যাশিয়ার রঘুনাথাবাবু পর্যন্ত জেনে গেছেন।

কিন্তু সুরুচি এর জন্যে একটুকু দায়ী নয়। আড়াই শ টাকা মাইনের পরিবর্তে সুরুচি মনে প্রাণে অকুণ্ঠভাবে অফিসের কাজ নির্বাহ করে আসছে।

সকালবেলা নিজে হাতে ভাত রেঁধে খোকাকে খাইয়ে রুগ্ন বাবাকে পরিচর্যা করে বাসে ঝুলতে ঝুলতে এসে সকাল সাড়ে দশটায় অফিসের চেয়ারে বসে তারপর দুপুর বেলা নিজের হাতে ঘরের মধ্যে একটু চা করে নেয়। সেই সময়টুকু যা বিশ্রাম। তারপর ঘড়িতে পাঁচটা বাজলে খোঁপাটা ঠিক করে কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে ভীড় ঠেলে আবার বাড়ির দিকে যাত্রা।

বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে তার মনিব ভৃত্যের তো সম্পর্ক।

বিলাস চৌধুরী বলে দিয়েছেন—অফিস সম্বন্ধে তুমি সমস্ত দেখবে, আমি আউট-ডোর কাজগুলো করবো—

বিশেষ দরকার থাকলে টেলিফোন করতে হয় বাড়িতে।

বিলাস চৌধুরী ওদিক থেকে বলেন—স্পিকিং…কে? সুরুচি?

সুরুচি বলে—চাঁদপুর থেকে রায় খবর পাঠিয়েছে মাল শর্ট পড়েছে, পেমেণ্ট আটকে দিয়েছে—কী করবে জানাতে বলেছে—

—এখুনি 'তার' করে দাও রায়কে—ক্যাম্প ছেড়ে যেন কালই আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

সুরুচি বলে—আর একটা কথা, অফিস স্টাফ-এর সবাই এসেছিল আমার কাছে, বলছিল এক মাসের মাইনে পুজোর সময় বোনাস চায়—পরশু থেকে পে-বিল তৈরী হবে—

বিলাস চৌধুরী বিরক্ত হন।

বলেন—অফিস সম্বন্ধে তুমি যা ভাল বুঝবে করবে, আফিসের আয় বুঝে খরচ করবে—আমাকে আর ও-সব বিষয়ে বিরক্ত করো না—

এতখানি স্বাধীনতা অবশ্য সুরুচির ভাল লাগে না।

নিজের মাথা খাটিয়ে বিলাস চৌধুরীর ভালো দেখতে হয়। সুতরাং সমস্ত দিন অফিসের কাজে আর তার মাথা তোলবার সামর্থ্য থাকে না।

দুপুরবেলা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ডালহৌসী স্কোয়ারের খণ্ড আকাশটার দিকে জানালার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখে।

এতক্ষণ খোকা হয়ত ঘুম থেকে উঠে বাবাকে জ্বালাতন করছে। তবু যা হোক—সুরুচি এখন দুটো পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে বলতে হবে। নইলে দত্তমশাইকে বাড়ি ভাড়ার তাগাদায় এসে শুধু হাতে ফিরতে হোত। সিংজীর দেনাটা কিছু কিছু করে শোধ হচ্ছে। তবু জিনিসপত্রের যা দাম। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে চাকরিটা না পেলে হয়ত সুরুচিকেও কোনও লঙ্গরখানায় গিয়ে পাতা পাততে হোত।

তারপর অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার পথে বাবার জন্যে ফল, ওষুধ, খোকার জন্যে দুধ কিনে আনতে হয়। এক এক সময় মনে হয়, এমন করে আর কতদিন চলবে কে জানে! প্রতীক্ষায় সমস্ত অন্তর শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। একদিন খোকা বড় হবে। জন্ম থেকে যে মিথ্যা তার জীবনে শুরু হয়েছে তাই হবে চিরস্থায়ী। তখনও সুরুচি পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ঘোষণা করবার সাহস খুঁজে পাবে না।

কিন্তু সে যদি আসে। শেখরদা যদি কখনও আবার ফিরে আসে। কোথায়, কতদূরে, কীভাবে সে আছে কে জানে। বেঁচে আছে কিনা কে বলবে।

লেডীস্ সীটে বসে বাইরের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে স্বরুচি নিজের মনেই এই সব ভাবে।

বিকেল চারটের সময় সেদিন টেলিফোন এল! অফিসের কাজ বিশেষ ছিল না! সকাল সকাল বাড়ি গেলে ভাল হয়। বাবার শরীর কয়েকদিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। আজ সকালে বাবার শরীর খারাপ দেখে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে স্বরুচি বললে—হ্যালো—

ওপাশে ছিলেন বিলাস চৌধুরী।

বললেন—এখনি একবার আমার এখানে চলে এসো স্বরুচি—আমার গাড়ি যাচ্ছে—

একটু দ্বিধা হলো স্বরুচির। আজ সকাল সকাল বাড়ি যাওয়ার কথা। ডাক্তারকেও ডেকে নিয়ে যেতে হবে।

বললে—আজ বাড়িতে একটু সকাল সকাল যেতাম, বাবার অসুখটা একটু বেড়েছে আজ—

—সেই সম্বন্ধেই ডেকেছি—আমার গাড়ি গিয়ে পৌছলেই চলে আসবে—বললেন বিলাস চৌধুরী।

—আচ্ছা—বলে স্বরুচি ফোন ছেড়ে দিলে।

মাঝে মাঝে অফিসের জরুরী কাগজপত্র নিয়ে সাহেবের বাড়ি যেতে হয় অবশ্য। দাসত্ব যখন তখন যেতেই হবে।

রঘুনাথবাবুকে দু একটা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের জরুরী কাজ সেরে নিলে স্বরুচি। বিলাস চৌধুরীর গাড়ি খানিক পরেই এসে পৌছুল। নতুন গাড়িটা পাঠিয়েছেন।

নাগেশ্বর সেলাম করে দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল। স্বরুচি উঠতেই দরজা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বিকেলের শহর। তবু অফিস ছুটি হয়নি এখনও। গত বছরের দুর্ভিক্ষের

চিহ্ন শহরে এখন নেই। সেই দল বেঁধে মৃত্যু, সেই মৃত্যু-মিছিল এখন অবশ্য আর দেখা যায় না। তবু এখানে ওখানে দু-একটা ক্লান্ত নিরন্নের পদক্ষেপ এখনও নজরে পড়ে। অনেক কষ্টে সেই মৃত্যু-মন্থর দিনগুলো অতিক্রম করে এসেছে সুরুচিরা। সামনে এখন প্রত্যাশার প্রশান্তি। সুরুচির জীবনে যে মৃত্যুমেধ শুরু হয়েছিল আজ যেন তার কিছুটা নিঃশেষ হয়েছে।

বিলাস চৌধুরীর নতুন বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। একটা মানুষ সংসারে—। তবু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই বাড়ির অনেক ঘর। প্রয়োজন কম হতে পারে, কিন্তু তা বলে প্রয়োজনটাই সব নয়।

সুরুচি গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ নীরব পরিবেশ, পরিপাটি পরিচ্ছন্নতা। চারিদিকের সাজানো ঐশ্বর্য চোখে আঙুল দিয়ে আত্মঘোষণা করে।

সামনে দু-একটা চাকর এসে অপ্রস্তুত হয়ে সসম্মানে পাশে সরে দাঁড়ায়।

কোনও দিকে দৃকপাত না করে সুরুচি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো।

নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে সুরুচি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে।

অনেক কাগজপত্র নিয়ে বিলাস চৌধুরী বসেছিলেন!

সুরুচিকে দেখে বললেন—এসো—

সুরুচি সামনের চেয়ারে গিয়ে বসলো।

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমি হাওড়া স্টেশনে আজই এসে পৌঁচেছি—পৌঁছে একবার ভবানীপুরের দিকে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে তোমার বাবাকে একবার দেখে এলাম—

সুরুচি কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কানের দুল দুটো একবার দুলে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল।

বিলাস চৌধুরী সেদিকে একবার দেখলেন। পশ্চিমের রোদ দুলের ওপর পড়েছে—চিক চিক করছে সোনার দুল।

বিলাস চৌধুরী মুখ সরিয়ে বললেন—তোমার বাবার কাছ থেকে একবার ডাক্তার সেনের কাছে গিয়েছিলাম—

এবারও সুরুচি কোনও কথা বললে না।

বিলাস চৌধুরী বললেন—বাবার অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এলাম—

সুরুচি কোনও উত্তর দিলে না।

বিলাস চৌধুরী আবার বললেন—আমার একটা প্রস্তাব আছে স্বরুচি, ডাক্তার সেনেরও তাই মত—

স্বরুচি বললে—বলুন—

—আমার মতে তোমার বাবাকে আমার এখানে নিয়ে এলে ভাল হয়। এখানে সব রকম স্থবিধা আছে, তা ছাড়া ডাক্তার সেনের বাড়িরও কাছে পড়বে, তাঁর দেখাশোনা করাও স্থবিধা হবে—

বিলাস চৌধুরী চুপ করেলেন। স্বরুচির দিক থেকে কোনও উত্তর হয়ত প্রত্যাশা করছিলেন।

খানিক পরে বিলাস চৌধুরী আবার বললেন—ভালো করে ভেবে দেখো, ওখানে ওই চেতলায় একলা পড়ে থাকা আমি ভাল বুঝছি না—আর এখানে আমি নিজেও তো দেখাশোনা করতে পারবো—তা ছাড়া……

বলতে গিয়ে যেন কী বললেন না বিলাস চৌধুরী।

স্বরুচি চুপ করে রইল।

চেতলার সংসার তুলে নিয়ে এখানে আসা—সে কেমন করে সম্ভব! তা ছাড়া খোকা।

বিলাস চৌধুরী বললেন—যতদিন বাবা অসুস্থ থাকেন ততদিন তুমি আর খোকাও এখানে থাকবে—তারপর বাবার শরীর ভাল হলে তখন আবার তোমরা চেতলায় গিয়ে উঠবে—

স্বরুচি কী যে করবে ভেবে কূলকিনারা পেলে না। কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যবোধ, সমস্ত বোধের আইনে এমন ব্যবহার বাধে কিনা কে জানে।

বিলাস চৌধুরী শেষকালে বললেন—আপত্তি করো না স্বরুচি, অন্তত তোমার বাবার জীবনের মুখ চেয়ে আপত্তি তোমার করা উচিত নয়—তা ছাড়া সামাজিকতার দিক থেকে তোমার যদি আপত্তি হয়ই আশা করি তুমি সে আপত্তি মানবে না। মানুষের বাঁচা-মরা, জীবনের সুখ-দুঃখ, তার অভিজ্ঞতা, অনুভূতি কিছুই আইন বা সংস্কারের বাঁধা-ধরা পথ ধরে চলে না—জীবন বড় ব্যাপক—এই পৃথিবী এই সৌর মণ্ডলের মত অখণ্ড, একে গণ্ডী টেনে সীমাবদ্ধ করা চলে না—তুমি তো সব বোঝ…

বিলাস চৌধুরীর মুখে এতখানি লম্বা বক্তৃতা কোনও দিন শোনেনি স্বরুচি।

শুনে একটু অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনও উত্তরও বেরুল না।

এক এক সময় সদানন্দবাবুর জ্ঞান থাকে না। মনে হয়, বুঝি সেই সবজিবাগানের বাড়িতেই আছেন।

বিকারের ঘোরে চীৎকার করে ওঠেন—কে? দত্তমশাই—দত্তমশাই—

বিলাস চৌধুরী সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন—আমি,—মাস্টার মশাই,—আমি—

—আমি কে? নাম নেই?—সদানন্দবাবু বিছানায় শুয়ে তুটো চোখ কটমট করে চেয়ে থাকেন।

বিলাস চৌধুরী মাথা নিচু করে সদানন্দবাবুর কপালে হাত বুলিয়ে দেন। চাকরকে ডেকে পিকদানিটা পরিষ্কার করে দিতে বলেন। শরীরের অর্ধাংশ সদানন্দবাবুর অচল হয়ে গেছে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। ছ'মাস ক্রমাগত শুয়ে থাকতে থাকতে এখন যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে গেছে।

ভাত খেয়ে আবার তখুনি বলেন ভাত খাবো।

তুজন লোক রাখা হয়েছে—দিনে তুবার করে সমস্ত শরীর মালিশ করে দিয়ে যায়। নানা জায়গা থেকে নানা ডাক্তার আসে! প্রচুর টাকা নিয়ে যায়। দামী ওষুধের তালিকা তৈরী করে দেয় তারা।

কিন্তু এক এক সময় অদ্ভুত সুস্থমস্তিষ্কের পরিচয় দেন সদানন্দবাবু।

ডাকেন—রুচি—ও রুচি—

গোপাল কাছাকাছি কোথাও থাকলে সামনে ঝুঁকে বলে—দিদিমণিকে ডাকছিলেন বড়বাবু?

সদানন্দবাবু চিনতে পারেন স্পষ্ট।

বলেন—তোমার দিদিমণি কোথায় গোপাল?

গোপাল বলে—দিদিমণি কালীঘাটে গেছেন—

—কালীঘাটে? সে যে অনেকদূর!—

—দিদিমণি যে রবিবারে রবিবারে কালীঘাটে যান্—পুজো দিয়ে আসেন—

যখন সদানন্দবাবু চেতলায় ছিলেন, তখন কালীঘাটের পাশ দিয়ে যাবার

সময় কতদিন মন্দিরের ভেতরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে এসেছেন। গিরিবালা শনিবারে শনিবারে যেতেন। কিন্তু স্থরুচিও আবার যেতে শুরু করেছে!

কিছুক্ষণ পরে স্থরুচি ফিরে আসতেই সদানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন।

বললেন—কালীঘাটে কী করতে যাস্ রুচি?

—পুজো দিতে বাবা। আমি যে রোববার করি—

সদানন্দবাবু হাসলেন।

বললেন—আয় এখানে বোস—আমার মাথার কাছে—

বিলাস চৌধুরী নতুন বাড়ির দক্ষিণ অংশটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন স্থরুচিদের জন্যে। আর পশ্চিম অংশটা রেখেছেন নিজের ব্যবহারের কাজে।

প্রকাণ্ড একটা ঘর। দক্ষিণ দিকের আলো-বাতাসে ঘরটা ভরা। মাথার ওপর পাখা ঘোরে। ওষুধ, পথ্য, ডাক্তার, কবিরাজ—কোনও ত্রুটি কোথাও নেই।

বিলাস চৌধুরীর সজাগ দৃষ্টি সব দিকে।

স্থরুচির লজ্জা হয়। এতখানি ঋণী থাকা ভাল নয়। সামান্য একটু পথের পরিচয়ের সূত্র থেকে, শেষ পর্যন্ত তারই আশ্রয়ে এসে ওঠা প্রথমটা ভাল লাগেনি। কিন্তু বাবার স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে অস্বীকারও করতে পারেনি। তা ছাড়া এ ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কী?

সদানন্দবাবু বললেন—হ্যাঁরে, তোর সেই কবিতাটা মনে আছে 'অয়ি ভুবন-মনমোহিনি!'

বেশী দিনের কথা নয়। তবু স্থরুচির মনে হয় সে-সব যেন অনেক্ পুরোন দিনের কথা! আজ কতকাল যেন কেটে গেছে তারপরে। এই কটা বছর যেন বয়েসের হিসাবে বিচার করা চলে না। অনেক দুঃখ-ভোগের ঝড় বয়ে গিয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। এমন করে শেষ পর্যন্ত স্থরুচি বেঁচে আছে এবং আত্মহত্যা করেনি এইটেই তো আশ্চর্য! সে-সব দিনের কথা মনে হলে নিজেকে কত ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। সত্যিই শিশু ছিল সে তখন। শ্রীলতার প্রেমের গল্প শুনে তখন রোমাঞ্চ হোত শরীরে। প্রিন্সের সঙ্গে দেখা হলে বুকটা কেঁপে উঠতো! শেখরদাকে দেখে বিচারবুদ্ধি বিবেচনা সব হারিয়ে ফেলত। এখন সব জিনিস যাচাই করে মূল্য বিচার করতে শিখেছে সে!

স্থরুচি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলে।

এক একটা করে রাস্তার বাতি জ্বেলে দিচ্ছে, ব্ল্যাক-আউট উঠে গেছে আর খানিক পরেই আলোয় আলো হয়ে যাবে সারা রাস্তা।

এতদিন ঘোমটা ঢাকা শহর শুধু অন্ধকারেই হোঁচট খেয়েছে। বিলাস চৌধুরীর অফিসে মিলিটারীর কাজও কমে এসেছে। এখন অন্য কাজ আবার শুরু হয়েছে। চুপ করে বসে থাকবার লোক নন্ চৌধুরী সাহেব।

সেদিন দত্তমশাই এ-বাড়িতে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

সদানন্দবাবুর ঘরে ঢুকে আরো অবাক হয়ে গেছেন।

বললেন—কেমন আছেন মাস্টার মশাই ?

—আমার আর থাকা—

সদানন্দবাবু এক হাতেই জলের শিশি থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন নিজের মাথায়।

দত্তমশাই বললেন—ভালো হয়ে যাবেন নিশ্চয়—অত ভাববেন না আপনি—

এক এক সময় সদানন্দবাবুর নিজেরও তাই মনে হয়।

সিপাহী-বিপ্লবের বইটা তিনি শেষ করে ফেলবেন। সমস্তই তো তাঁর তৈরী হয়ে রয়েছে। একমাত্র অযোধ্যাই শুধু এই বিদ্রোহে কার্যকরীভাবে যোগ দিয়েছিল। সেখানে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবে পরিণত হয়। গোয়ালিয়রের দিনকর রাও, নিজামের সালার জঙ্গ, নেপালের জঙ্গ বাহাদুর আর পাঞ্জাবের শিখরা যদি বিদ্রোহে বাধা না দিত, তাহলে সেইদিনই ইংরেজের ভাগ্যবিপর্যয় !……

ভাবতে ভাবতে সদানন্দবাবুর মাথাটা আবার গরম হয়ে ওঠে !

এই যুদ্ধের ওপর অনেকখানি ভরসা ছিল তাঁর ! এবারের সৈন্যরাও বিদ্রোহ করেছিল। বর্মার পথে আসামের মণিপুর দিয়ে ওরা যদি আসতে পারতো— !

গৌরদাস কোথায় গেল ! সেই একদিন রাত্রে শুধু দেখা হয়েছিল !

সুরুচি এসে নোট কখানা গুণে দত্তমশাই-এর হাতে দিলে।

দত্তমশাই বললেন—আর গুণতে হবে না মা লক্ষ্মী……

তারপর নোট কখানা ফতুয়ার পকেটে রেখে বললেন—একটা কথা বলবো

মাস্টার মশাই—বাড়িতো আপনার দেড় বছর দুবছর ধরে তালা চাবি বন্ধ পড়ে আছে······আর ভাড়াও গুণছেন মাসে মাসে···

সদানন্দবাবু বললেন—তা হোক দত্তমশাই······আমার অসুখটা ভাল হলেই আবার ও-বাড়িতে গিয়ে উঠবো—একটু চলতে ফিরতে পারলেই আমি যাবো······

দত্তমশাই বললেন—না, অনেকেই এসে ভাড়া চাইছে কিনা ·····জানেন তো কলকাতায় এখন বাড়ি পাওয়াই মুশকিল—আপনারা যদি চেতলায় আর না যান—

সুরুচি বললে—বাবা একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওখানে চলে যাবো আমরা—

দত্তমশাই আবার অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। সুরুচির অফিসের মনিবের বাড়ি এটা।

যতবারই আসেন, ততবারই দেখেন। দেখে আর তাঁর আশ মেটে না। মনে মনে হিসেব করেন, এতবড় বাড়িটার ভাড়া কত হতে পারে। বাড়িতে থাকতে দিয়েছে কিন্তু ভাড়া লাগে কিনা কে জানে!

বিলাস চৌধুরী ফিরে আসতেই সদানন্দবাবু সেদিন জিগ্যেস করলেন—ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন বিলাসবাবু—

বিলাস চৌধুরী টুপিটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন—ডাক্তার বললেন আর মাস খানেকের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠবেন—

সদানন্দবাবু বললেন—বাড়ি যেতে পারবো কবে, কিছু বললেন—

বিলাস চৌধুরী পাশের চেয়ারটায় বসে বললেন—বাড়ি যাবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, মাস্টার মশাই? এখানে কিছু অসুবিধে হচ্ছে— ?

সদানন্দবাবু বললেন—ব্যস্ত আমি ঠিক হচ্ছিনে, কিন্তু সুরুচি যে আর থাকতে চাইছে না—আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি—এই এক বছরের ওপর হয়ে গেল······তিনজনে মিলে ·····

প্রত্যেকদিন বিলাস চৌধুরী হাজার কাজের মধ্যেও একবার করে এসে সদানন্দবাবুর কাছে বসে কেমন আছেন জিগ্যেস করে যান।

সুরুচি অফিসে যায় আর আসে। কিন্তু সময় ঠিক থাকে না তার।

অফিসের ফেরতা নানা জায়গা ঘুরে যখন আসে, তখন এক একদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়।

বাড়িতে পা দিয়েই সদানন্দবাবুর ঘরে এসে আগে দাঁড়ায়। বলে—আজ কেমন আছো বাবা?

ঘামে সারা গা ভিজে গেছে। মাথার ওপর থেকে কপালের ওপর চুলগুলো উড়ে এসে পড়ে, হাতে ফলের ঠোঙা কিম্বা খোকার জন্যে খেলনা। জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সারা দিনের কাজের পর ক্লান্তিতে শরীর ঢুলে আসে। স্থরুচির গলার আওয়াজ পেয়েই খোকা দৌড়ে কাছে আসে।

বলে—দিদি আমার বল—

—তোমার বল আজকে আনতে ভুলে গেছি সোনা—বলে খোকাকে দুহাতে কোলে তুলে নেয়।

স্থরুচির আসার খবরটা আর কেউ না পাক গোপাল ঠিক পায়। ঠিক সময়ে চা করে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকে।

বলে—দিদিমণি আপনার খোকার কীর্তি শুনেছেন?

তারপর খোকার দিকে চেয়ে বললে—বলবো দিদিমণিকে? বলে দিই?

খোকা তখন স্থরুচির কোলে মুখ লুকিয়েছে।

—বলো তো গোপাল, কী বলেছে খোকা?—চায়ের কাপ হাতে নিয়ে স্থরুচি বললে।

খোকা তবু মুখ লুকিয়ে শুয়ে আছে।

স্থরুচি বললে—বলো তো কী বলেছে গোপাল?

গোপাল বললে—খোকা আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে কি জানেন, বলেছে যে ওই লোকটা ভারী বজ্জাত—আমার বাবুকে বজ্জাত বলেছে। আর বলেছে—ওই লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো—

—ছি ছি খোকা—বলেছ তুমি?—বলেছ ওই কথা?

হঠাৎ গোপাল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে জুতোর শব্দ শোনা গেল। বিলাস চৌধুরীর পায়ের শব্দ গোপাল চিনতে পারে ঠিক।

গোপাল এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বললে—যাই, বাবুর পা টিপতে হবে—

তিনবার টেলিফোন করেও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত বিরক্তি ধরে গেল। অফিস থেকে বেরিয়ে সুরুচি বাড়ির দিকে না গিয়ে আবার সেই ভবানীপুরের বাস ধরলো। ভদ্রলোকের ঠিকানাটা লেখা আছে। বাসে উঠে একবার ভাবলে—হয়ত গিয়ে কোনও লাভই হবে না, শুধু শুধু পণ্ডশ্রম।

কোথায় কোথায় শেখরদা যেত, কোন্ লাইব্রেরীর মেম্বর ছিল কোনদিন কিছুই জানায়নি শেখরদা।

তা ছাড়া সুরুচিই কি কোনদিন তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে! কলেজের জীবন তখন কত রোমাঞ্চময়! আর শেখরদা যতক্ষণ সামনে থাকতো কেবল ততক্ষণই তাকে নিজের বলে মনে করা চলতো, কিন্তু চোখের বাইরে গেলে সমস্ত সে যে ভুলে যেত!

তবু দুএক জায়গার নাম শেখরদার কাছে যা শুনেছে সেখানেই চেষ্টা করে দেখেছে সুরুচি।

শ্যামবাজারেও এক লাইব্রেরীতে যেত শেখরদা!

লাইব্রেরীতে গিয়েও খোঁজ করেছিল সুরুচি।

যে-লোকটি সামনে টেবিল নিয়ে বসে ছিল, তিনি বললেন—কী নাম বললেন? শেখরনাথ দত্ত?

সুরুচি বললে—হ্যাঁ—

ভদ্রলোকটি বললেন—চিনতে পেরেছি, অনেক দিনের কথা, তার পরে কত কাণ্ড হয়ে গেল। তা তিনি তো আর এখন এখানে আসেন না—

তারপরে খানিকটা ভেবে বললেন—আপনি আর এক কাজ করুন বরং—

তালতলায় এক ভদ্রলোকের ঠিকানা দিলেন। ওদের দলের লোক। ওখানে গেলে হয়ত খবর পাওয়া যেতে পারে। এক সঙ্গে মেলামেশা করত ওরা।

সুরুচি একদিন সেখানেও গিয়েছিল। তিন চার বছর আগের ঘটনা সব। কোথায় সব কী পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু খুঁজে খুঁজে বার করেছিল সুরুচি।

সেদিন তিনি বাড়ি ছিলেন না।

পরের দিন সুরুচি গিয়ে জিগ্যেস করতে বললেন—মাপ করবেন, আমি যুদ্ধ বাধার পরেই সেই যে ইরাকে গিয়েছিলাম আর যুদ্ধের পরে তবে বাড়ি

আসবার ছুটি পেয়েছি—বন্ধু বান্ধব কারোর খোঁজ রাখবার সুযোগ পাইনি—আপনি বরং এক কাজ করুন—শেখরের সঙ্গে যার বেশী মেলামেশা ছিল তার ঠিকানা আপনাকে দিচ্ছি—

শেষ পর্যন্ত একদিন সুরুচি নিজেকে সকালবেলা খড়দ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

যেখানেই থাকুক শেখরদা, অন্তত তাকে খবরটা দেওয়া দরকার। সেদিন শেখরদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সুরুচির সমস্ত দায়িত্ব সে নেবে। এখন সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুক। এখন তো আর মা নেই, পিসীমাও নেই! শেখরদার আসার আর কোনও বাধাই নেই। কবে আবার শেখরদা আসবে! প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে আজ দিগন্ত যে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

সত্যকে সে তখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে। এক একদিন রাত্রে কেমন যেন সুরুচির মনে হয়, তার দুর্যোগের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এবার সে মাথা তোলবার অবকাশ পাবে! ফিরে পাবে তার সেই আত্মবিশ্বাস!

যখন সকালবেলা বিলাস চৌধুরীর বাড়ির ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন কলকাতা শহরের উত্তরাংশের চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে যায়।

যুদ্ধোত্তর কলকাতা এখানে বড় ঘেঁষাঘেঁষি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। বাড়ি ঘরের অভাবে দোতলার ওপর তেতলা উঠেছে। চেতলার সঙ্গে এ চেহারার যেন কিছুই মেলে না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে সুরুচি।

খড়দ'য় যে-ভদ্রলোকের খোঁজে গিয়েছিল সুরুচি, সে ঠিকানায় তিনি নেই। এখন তিনি ভবানীপুরে।

সেই ভবানীপুরের ঠিকানাতেই গিয়ে হাজির হলো সুরুচি।

পাশেই একটা মন্দিরে তখন কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। কিছু কানে শোনা যায় না।

তবু অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর সুধীরবাবু বেরুলেন।

বললেন—আপনি তার কে?

সুরুচি বললে—আমি তার আত্মীয়, আজ বছর তিন চারেক তার কোনও খবর নেই—

সুধীরবাবু বললেন—কিন্তু শেখরের মুখে শুনেছি তার কোনও আত্মীয় ছিল না—

পাশের মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা তখন থেমে গেছে। সুরুচি যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না।

খানিক পরে সুরুচি বললে—আমি বলছি, আমি তার আত্মীয়—কিন্তু সে জবাবদিহি আমি তার কাছেই করবো—আমি জানতে চাই শেখরদা কোথায় আছে! আপনি জানেন?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি রবিবারে এমনি সময়ে এখানে একবার আসবেন, তখন আপনাকে বলতে পারবো কোথায় তিনি আছেন—কবে দেখা হতে পারে……

বিরক্ত হয়ে নমস্কার করে চলে এল সুরুচি। তবু রবিবার একবার আসতে হবে! যদি শেষ পর্যন্ত দেখা হয়ই তার সঙ্গে!

বাসে করে আবার চলে এল বিলাস চৌধুরীর বাড়ি।

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে আসতে যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো।

কয়েকটা মটর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য এ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবু এই সন্ধ্যাবেলা যেন কেমন সন্দেহ হলো।

বাইরে আসছিল গোপাল। সুরুচিকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

বললে—কোথায় ছিলেন এতক্ষণ দিদিমণি?

সুরুচি বললে—কেন গোপাল, কী হয়েছে—

—বড়বাবুর যে বাড়াবাড়ি হয়েছে, আমি ওষুধ নিয়ে আসি, আপনি এখুনি ওপরে যান—বলে গোপাল গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

বিলাস চৌধুরী অফিসে যান্ নি।

গোপাল ছুটতে ছুটতে এসে বললে—বাবু দিদিমণির বাবা কেমন করছেন—

বিলাস চৌধুরী উঠে এ ঘরে এলেন। গাড়ি গেল ডাক্তারবাবুকে আনতে। অফিসে একবার টেলিফোন করলেন সুরুচিকে খবর দেবার জন্যে। কিন্তু শুনলেন সুরুচি আজ সকাল সকালই অফিস থেকে বেরিয়েছে।

সদানন্দবাবু তখন ছটফট্ করছেন।

হাত পা নড়ছে না, কিন্তু বোঝা গেল বুকের ভেতরে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে। বিলাস চৌধুরী চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে বসলেন।

ডাক্তার এলেন। ইন্‌জেকশন দিলেন। বললেন—খুব সাবধানে রাখবেন—রোগী নারভাস্ হয়ে পড়েছেন—

ঘড়ি দেখলেন বিলাস চৌধুরী। এখনও স্থরুচি এল না।

গোপালকে ডেকে বললেন—আজ রাত্রে এ-বাড়িতে তুই শুবি—কখন কী হয় ঠিক নেই……

একঘণ্টা পরে একটু যেন জ্ঞান হলো। সদানন্দবাবু চোখ খুললেন।

যেন ঘুম ভাঙলো।

ঘরের চারিদিকে দেখে নিলেন। যেন বুঝতে চেষ্টা করলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা। তারপর বিলাস চৌধুরীর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। কিন্তু দৃষ্টির সে রুক্ষতা যেন একটু পরেই কেটে এল।

তারপরেই সদানন্দবাবুর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে লাগলো।

বিলাস চৌধুরী কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

—স্থরুচি কোথায় ?

সদানন্দবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল।

বিলাস চৌধুরী বললেন—এখনও আসেনি, এখনি অফিসে টেলিফোন করেছিলাম, অফিস থেকে বেরিয়েছে—

—খোকা কোথায় ?

—খোকাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গেছে—

খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না সদানন্দবাবু।

তারপর তাঁর কথাগুলো যেন স্বগতোক্তির মতই শোনালো—ভাল আর আমি হবো না - ভালো আর আমি হতেও চাইনে—

বিলাস চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললেন—রুচি বড় অভিমানী, এত খেটে পয়সা উপায় করে কেন জানেন—আমি মারা গেলে ওকে যদি কারুর কাছে হাত পাততে হয়, তাই কেবল ওর ভয়—এখানে আর একটা দিনও থাকতে চায় না—

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমার বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে……আমি তো কিছু মনে করি না সে জন্যে—

সদানন্দবাবু বললেন—বিয়ে ওর দিতে পারলুম না, আগে বিয়ের চেষ্টাই করেছিলুম, তখন বললে লেখাপড়া করবে, বিয়ে করবে না, তারপর যুদ্ধ বাধলো, বোমা পড়লো······পালাল সবাই শহর ছেড়ে······তারপর ওর মা মারা গেল, ······এদিকে আমি অথর্ব হয়ে পড়লুম—

খানিক থেমে আবার বলতে লাগলেন—ভারি চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে জানেন····· ওর 'অয়ি ভুবনমনমোহিনি' শুনে সকলের চোখ দিয়ে জল পড়েছে······শেখর ওর আবৃত্তি শুনতে খুব পছন্দ করতো—

বিলাস চৌধুরী জিগ্যেস করলেন—শেখর? শেখর কে?

—সে একটি ছেলে, আমারই কাছে থাকতো আর ওকে পড়াতো, সে পড়াতো ইংরিজী, আর আমি পড়াতুম হিস্ট্রি, অঙ্ক আর সংস্কৃত ···সংস্কৃত ও খুব ভাল জানে······বেদ কত রকমের, বেদের কটা ভাগ······

খানিকক্ষণ পরে আবার বলতে লাগলেন—রুচির চেয়ে কি আমি কিছু কম ভাবি ভেবেছেন—ও-ও যেমন ভাবে, আমিও তেমনি ভাবি······ ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে যায়······অসুখ তো তাই সারছে না আমার—

বিলাস চৌধুরী বললেন—আপনি ভাবেন কেন অত? অত ভাববেন না আপনি—

—না ভেবে পারি? মেয়ে বড় হয়ে গেল, বিয়ে দিতে পারিনি, তা ছাড়া ছোট নাবালক ছেলে, তাকে কে দেখে—তাকে মানুষ করতে হবে আমার মেয়েকে—আমি কিছুতো রেখে যেতে পারবো না—

বিলাস চৌধুরী আবার বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না এখন—আমি তো আছি······

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন সদানন্দবাবু। যেন অনেক কথা বলতে চান তিনি। অনেক কৃতজ্ঞতা তাঁর বুক ঠেলে উঠতে চায়।

শেষে অনেকখানি সাহস নিয়ে বললেন—ভার নেবেন আপনি—ভার নেবেন?

কথাটা বলে হাঁফাতে লাগলেন সদানন্দবাবু। মনে হলো এখনি যেন তাঁর দম আটকে যাবে!

বিলাস চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন—আমি সমস্ত ভার নিলাম—স্বরুচির ভার নিলাম—খোকার ভার নিলাম—

কথা তাঁর শেষ হলো না। ঘরে ঢুকলো স্বরুচি। উৎকণ্ঠায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে। সন্তর্পণে এগিয়ে এল কাছে। গলা নিচু করে বিলাস চৌধুরীকে জিগ্যেস করলে—বাবা কেমন আছে…… ?

সদানন্দবাবু শুনতে পেলেন।

বললেন—তুই কিছু ভাবিসনে রুচি…… তুই কিছু ভাবিসনে……সব ঠিক হয়ে গেছে …

বিলাস চৌধুরী সদানন্দবাবুর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—আপনি চুপ করুন·· …উত্তেজিত হবেন না……

কিন্তু সদানন্দবাবুর চোখ মুখ তখন এক অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললেন ·····তুই কিছু ভাবিসনে রুচি ···· কিছু ভাবিসনে · ··· বিলাসবাবু সব ভার নিয়েছেন ·····আমার আর কোনও দুঃখ নেই···

চোখ দুটো তাঁর বুজে এল আর কী যেন এক উত্তেজনার আবেগে চোখের পাতা দুটো কাঁপতে লাগলো। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। খানিক পরে মনে হলো তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বিলাস চৌধুরী চেয়ার থেকে উঠে স্বরুচিকে চুপি চুপি বললেন—এখন ঘুমোতে দাও ওঁকে……

বাইরে বারান্দার কাছে আসতেই পেছনে স্বরুচি এসে দাঁড়াল।

বললে—বাবা এতক্ষণ আপনাকে কী বলছিল—

সামনে তখন অবাধ হাওয়ার স্রোত বইছে। রাত হয়ে এসেছে এ-পাড়ায়। মাঝে মাঝে ট্রামের মন্থর গতির শব্দ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে যায়।

বিলাস চৌধুরী স্বরুচির দিকে চাইলেন।

স্বরুচি পাশেই দাঁড়িয়েছিল উৎকণ্ঠিত হয়ে।

বললে—বললেন না বাবা আপনাকে কী বলছিল……

বিলাস চৌধুরী বললেন—আমি তোমার আর খোকার সমস্ত ভার নিলুম……

—তার মানে ?

হঠাৎ কোন উত্তর এল না বিলাস চৌধুরীর মুখে।

খানিক পরে বললেন—তোমার বাবার জীবনের দিকে চেয়ে অন্তত আপত্তি করবে না আশা করি ···· শুধু বাবার জীবনই নয়······আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি······আমার দিকটাও ভেবে দেখো স্বরুচি—

মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। পায়ের তলায় মাটি যেন তার সরে যাচ্ছে। তা কি সম্ভব। মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপতে লাগলো স্বরুচির। মনে হলো সে এখনি এখানে পড়ে যাবে। মাথা তুলে দেখলে বিলাস চৌধুরী তার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরুল—তা কি করে হয়—তা কেমন করে······আমি যে······

- তুমি ভালো করে ভেবে দেখো······আমি তোমাকে ভাববার সময় দিলাম—বলে বিলাস চৌধুরী হঠাৎ বারান্দা পার হয়ে ঘর দিয়ে বাড়ির পশ্চিম অংশে চলে গেলেন।

স্বরুচি স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

মাঝরাত্রে স্বরুচি বিছানা ছেড়ে উঠলো। শরীর খারাপের অজুহাতে আজ রাত্রে খায়নি কিছু।

বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে তারপর থেকে সারাদিন আর দেখাও হয়নি।

সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। সারা কলকাতা শহর ঘুমন্ত। একবার মনে হলো সে পালিয়ে যাবে!

খোকাকে নিয়ে ছেড়ে যাবে এ বাড়ি। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে এখানে আশ্রয় পাওয়ার অর্থ।

সে শেখরদার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেখরদা একদিন আসবে। নিশ্চয়ই আসবে শেখরদা।

টেবিলের কাছে গিয়ে ল্যাম্পটা জ্বালালে। কিন্তু কি যে করা তার উচিত কে বলবে। খোকা শুয়ে আছে বিছানায়। ও কিছু বোঝে না। ঘুমের মধ্যে বোধ হয় একবার স্বপ্ন দেখে একটু কেঁদে উঠলো। বিলাস চৌধুরীর ঘর এখান থেকে অনেক দূরে।

শেখরদার খবর পাওয়া যাবে রবিবারে। রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?

মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে অবিশ্রাম জল পড়তে লাগলো। কে বলবে কী করবে সে!

দরজার খিল খুলে বাইরে এল। বাবার ঘরে আলো জ্বলছে, এখান থেকে দেখা যায়। ওখানে গোপালও শুয়ে আছে। বাবাকে গিয়ে এই রাত্রে সে বলবে—বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী সে হতে পারবে না। বিয়ে সে করবে না। নাই বা হলো বিয়ে—খোকাকে নিয়ে সারাজীবন সে এমনি কাটিয়ে দিতে পারবে।

আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়াল স্বরুচি। আর একটি রাত্রির কথা তার মনে পড়লো।

সেদিন সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। এও তো এক রকম আত্মহত্যা! কিন্তু এবার সে বিদ্রোহ করবে।

বাবাকে গিয়ে সে সব বলবে। বলবে—বাবা তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। আমার ভার আমি নিজেই বইতে পারবো—খোকাকে আমিই মানুষ করে তুলবো—তোমার চিকিৎসা করবো—আমি কারুর সাহায্য চাইনে—চাইনে কারুর দয়া—

বারান্দা পার হয়ে স্বরুচি সদানন্দবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে গোপাল অঘোরে ঘুমোচ্ছ মেঝের ওপর। গোপালকে না জাগিয়ে স্বরুচি সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুললো। অল্প অল্প আলো জ্বলছে পাশের ঘরে।

সদানন্দবাবুর দিকে চেয়েই হতবাক হয়ে গেল স্বরুচি।

সামনের টেবিলের ওপর জলের শিশিটার দিকে হাত বাড়িয়ে উপুড় হয়ে আছেন—অর্ধেকটা শরীর মেঝের ওপর ঝুলে পড়েছে······

আর দেখতে পারলে না স্বরুচি। একবার উচ্চ আর্তনাদ করে ছুটে গেল সেইদিকে। কিন্তু পাথরের মত ঠাণ্ডা স্পর্শে তার শরীর হিম হয়ে এল। মনে হলো মূর্ছা যাবে সে। তারপর সেখানেই বসে পড়লো স্বরুচি। জ্ঞান নেই তার।

অনেকক্ষণ পরে কার যেন স্পর্শে স্বরুচি চোখ চাইলে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলে না। কে যেন তার মাথায় কপালে বরফের মত ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিয়েছে। ঘরে যেন অনেক লোক! বাবা তখনও সেইভাবে পড়ে আছেন।

চোখ তুলে মাথার ওপর দেখলে—বিলাস চৌধুরী তার মুখের ওপর সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন······

ক্লান্তিতে আবার স্থরুচির চোখ দুটো বুজে এল।

চেতলার কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি।

স্থরুচি জাতে উঠলো বলেই যে নিমন্ত্রণ হয়নি তা নয়—বিলাস চৌধুরী জাত মানেন না বলেই হয়নি।

শুধু দত্তমশাই একলা এসেছিলেন, সেই অত দূরের চেতলা থেকে। ব্যাপার দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে গেছেন। উৎসবের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর আয়োজন আর ঘটা দেখে লজ্জিত হলেন।

একদিন সামান্য পঁচিশ টাকা বাড়ি ভাড়ার জন্যে তাগাদা দিয়েছেন বলে আজ এই মুহূর্তে তাঁর কুণ্ঠা হলো।

দুটো রুপোর টাকা দিয়ে দত্তমশাই স্থরুচিকে আশীর্বাদ করলেন।

দু'হাত যুক্ত করে প্রণাম করলে স্থরুচি। বললে—মাঝে মাঝে দেখা করতে আসবেন দত্তমশাই—

দত্তমশাই জিভ কাটলেন।

বললেন—সে কি কথা! আমি কি শুধু ভাড়ার তাগাদা করতেই আসতাম নাকি! মাস্টার মশাইকে আমি যে কী চোখে দেখতাম······

মাস্টার মশাই-এর স্মৃতি হঠাৎ যেন দত্তমশাইকে শোকার্ত্ত করে তুলেছে এইভাবে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

সেই উৎসব মুখর পরিবেষ্টনীতে হঠাৎ আবার যেন নতুন করে স্থরুচির বাবার কথা মনে পড়লো। এমন করে এত শীঘ্র চলে যাবেন, ভাবা যায়নি। শেষকালে কোন কথাও বলে যেতে পারেন নি। বাবা তাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মানুষ হওয়া দূরের কথা, বাবার মাথা হেঁট হয়নি, এই-ই তো যথেষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে মা'র কথাও তার মনে পড়লো। আজ মা উপস্থিত নেই এখানে —হয়ত ভালই হয়েছে। পঞ্চাশজনের বেশী নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিলাস চৌধুরীর বাড়িতে সকাল থেকে শুরু হয়েছে উৎসব—এখন রাত হয়ে এল, তবু অভ্যাগতের আর কামাই নেই যেন!

চারিদিকের আবহাওয়া ঘি আর গরমমসলার উগ্র গন্ধে জমাট। ওদিকের ঘরটা উপহারের সামগ্রীতে ভরে গেছে।

খোকা এতক্ষণ জেগে থেকে এবার নতুন বিছানার ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। নতুন জামা কাপড় পেয়ে ওর আজ আনন্দের সীমা নেই।

বিলাস চৌধুরী আজ পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরেছেন। এক একবার এক একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে ঘরে এসে ঢোকেন।

বলেন—স্বরুচি ইনি আবার বন্ধু আমাদের ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর মিঃ অমুক ইত্যাদি।

স্বরুচি হাত দুটো যুক্ত করে নমস্কার করে মুখে একটু সস্মিত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করে।

তারপর আর একজন আসেন।

বিলাস চৌধুরীর বোধ হয় বন্ধুর শেষ নেই। নানা জাতের নানা পোশাকের লোক।

নানান্ উপহার দেন তাঁরা। কেউ কেউ করমর্দন করেন—কেউবা শুধু নমস্কার।

বিলাস চৌধুরীর নতুন কেনা'ফার্নিচার চারিদিকে সাজানো। স্বরুচি নতুন বেনারসী পরেছে। অনেক অলঙ্কার, অনেক পোশাক, অনেক ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।

নিউ মার্কেট থেকে ফুলের ঝুড়ি এসেছে। সারা বাড়িময় রান্নার গন্ধে ফুলের গন্ধ চাপা পড়েছে। বিলাস চৌধুরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়ারাও এসেছেন কম নয়।

একজন মহিলা এসে বলেন—এঁকে তুমি চিনবে না বৌদি, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই······

কত রকম সম্পর্কের উল্লেখ করেন মহিলাটি, কত নাম বলেন, সব কি স্বরুচি মনে করে রাখতে পারে?

—আমি তোমার পিস্‌শাশুড়ী হই বৌমা, আমাকে চিনতে পারবে না······ বিলাস আমার কোলে মানুষ হয়েছিল ·····

আগে এই ঘরেই বিলাস চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটা অয়েল পেন্টিং ছিল। আজ সেটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুরুচি হাসলো। হাসলো এই ভেবে যে, অয়েল পেন্টিংখানা ওখান থেকে না সরালে যেন সে খুব দুঃখ পেত।

দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে যেন জোর করে কেউ তাকে দিচ্ছে। যেন সে জেনেশুনেই বিয়ে করছে না। সকলের মুখ-চোখের ভাব দেখে এই কথাই তার মনে হয়েছে, সবাই যেন তাকে প্রচ্ছন্ন করুণা করছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের ঈর্ষার যে শেষ নেই, তা-ও সুরুচি বুঝতে পারে। এতবড় সম্পত্তির মালিক বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী সে—সুরুচির নিজের সন্তানই সমস্ত ভোগ করবে, ভাগীদার হবার দুর্ভোগ তাকে বইতে হবে না, এইটেই তাদের ঈর্ষার কারণ।

অথচ কেউই আসল তথ্যটুকু জানে না। কতখানি নিরর্থক এই বিয়ে সুরুচির কাছে, একথা সুরুচি নিজে ছাড়া আর কা'রই বা জানবার কথা!

একমাত্র যে জানে, সেই পিসীমা তার বিয়ের খবর পেয়ে কাশী থেকে চলে আসা দূরের কথা, একটা চিঠি লিখেও আশীর্বাদ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি।

সুরুচির কাছে কত অসার তার এই বিয়ে, এই উৎসব, এই ঐশ্বর্য, এই বেনারসী শাড়ি গয়না আর সকলের ওপর এই সিঁথের সিঁদুর!

—বাঃ, বেশ বউ হয়েছে—

—অনেক তপস্যা করলে বিলাসের মত অমন স্বামী পাওয়া যায়—

কে একজন চুপি চুপি বললে—মিস্টার চৌধুরীর স্ত্রী-ভাগ্যটা বরাবরই ভালো—

আজ রাত্রে সুরুচি বিয়ের কনে। আজ সমস্ত চুপ করে শুনে যাবার পালা।

আজ তর্ক করতে নেই, প্রতিবাদ করতে নেই। তাছাড়া সে তর্ক কোন দিনই করবে না।

বিয়ে তার প্রয়োজন, কারণ সে ক্লান্ত। একা সে খোকাকে কেমন করে মানুষ করবে! কোথায় তার সামর্থ্য।

সে মানুষ হবে—আরো দশজনের মত সে ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তার যাত্রাপথে কোনও বাধা সুরুচি রাখবে না—নিজেকে না হয় সে আহুতিই দিল, কিন্তু খোকা, তার খোকা মানুষ হয়ে তার মুখ উজ্জ্বল করবে যে।

অনেক রাত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে এল।

সুরুচি যা ভেবেছিল তাই।

বিলাস চৌধুরী একলা ঘরে ঢুকলেন। সারা দিনের পরিশ্রমে বড়ই শ্রান্ত।

ঘরে ঢুকে নিজের মনেই যেন বললেন—উঃ এতক্ষণে সব মিটলো—

সুরুচির দিক থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে বিলাস চৌধুরী বিছানায় বসতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু বিছানার এক কোণে খোকাকে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন- খোকা খেয়েছে তো?

সুরুচি বললে—হ্যাঁ, গোপাল ওকে খাইয়ে এনেছে—

সুরুচি হাসলো আবার।

যেন খোকা অভুক্ত থাকলে বিলাস চৌধুরী স্বস্তি পেতেন না। যেন খোকা খেলে কি না খেলে, সে খবর রাখা বিলাস চৌধুরী নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন।

বিলাস চৌধুরী খানিক থেমে বললেন—ওকে বিছানা পেতে শোয়ান হয়নি কেন? গোপালকে ডাকবো?

সুরুচি এগিয়ে গেল।

বললে—গোপালকে ডাকতে হবে না, আমিই শোয়াচ্ছি—

বিলাস চৌধুরী আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সুরুচি তার আগেই খোকাকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে গেল।

সে-ঘরে অনেক উপহার সামগ্রীর ভিড়। খোকা বরাবর সুরুচির পাশে শুয়ে এসেছে। আজ প্রথম সে একলা আলাদা শোবে।

বিলাস চৌধুরী একলা বসেছিলেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সুরুচির দেখা নেই। বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলেন বিছানার ওপর খোকার পাশে সুরুচিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিলাস চৌধুরীর কেমন সন্দেহ হলো, শরীর খারাপ হলো নাকি। কপালে হাত দিতেই সুরুচি চোখ তুলে চাইলে।

একটু লজ্জিত হয়ে সুরুচি বালিশের ওপর মুখ ঢেকে বললে—ভয়ানক মাথা ধরেছে আমার জানো……

—মাথা ধরেছে!

বিলাস চৌধুরীর ভাবনা হলো।

মাথা ধরার ওষুধ অবশ্য ঘরেই আছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মাথা

ধরা বিচিত্রও নয়। ডাক্তার সেনকে এখন ডাকলে হয়। সন্ধ্যের আগে এসে উৎসবে যোগ দিয়ে গেছেন। কিন্তু এমন দিনে সুরুচির অসুখ হওয়াটাই কি উচিত ছিল!

হঠাৎ সুরুচির কি যে হলো!

সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল সুরুচি। এক নিমেষে যেন সে সুস্থ হয়ে পড়ল।

বিলাস চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে মাথা নিচু করে বললে-- এখন আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি, আজকের দিনে শরীর খারাপ হতে নেই, না—

কথাটা বলে সুরুচি চোখের জল আড়াল করে নিলে। বিলাস চৌধুরী হয়ত এ চোখের জলের ভুল অর্থ করবে।

সত্যিই তো, সুরুচির তো তাঁর ওপর কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। সুরুচির পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় দিয়েছে যে, তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, এমন ব্যবহার করতে নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এই সেদিন।

এখন প্রবাসী সৈনিকরা বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচিন, ইরান, ইরাক, টোকিও থেকে ফিরে এসে দেখলে যুদ্ধে তারা জাপানীদের আর জার্মানদের হারিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের ঘরেই তারা হেরে বসে আছে আগেভাগে।

এখানে এটম্ বোমা ফেলেনি কেউ, তবু লক্ষ লক্ষ লোক মরে ভূত হয়ে গেছে। মিলিটারী লরীর চাকার তলায় হাজার হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে।

দেশে ফিরে এসে তারা আর একটা নতুন শব্দ শুনলে—'জয় হিন্দ'।

যাদের তারা যুদ্ধে জিতিয়ে দিলে, তারা এখানে সত্যি কথা বললে এখনও বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে মৃত্যু বুঝি বড় সুলভ হয়ে গেছে।

একটা ছোট ছেলেকে চাপা দেওয়ার অপরাধে সারাদিন ধরে পঞ্চাশখানা মিলিটারী লরীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। এরা সাদা চামড়ার সৈন্যকে ধরে 'জয় হিন্দ' বলিয়ে ছাড়ে।

যুদ্ধ যেন ছিল ভাল।

কিন্তু এখন পেট ভরে খেতে পায় না কেউ। জেলখানার বাইরে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি আনলেন শান্তি আর শৃঙ্খলার বাণী।

যারা এতদিন জেলের ভিতর পোরা ছিল, তারাও বেরুল। তবু শহরের চারিদিকে কেবল হরতাল।

বিলাস চৌধুরীর অফিসে সেদিন যাওয়া হলো না। বাস, ট্রাম, গাড়ি, ঘোড়া সমস্ত বন্ধ। গাড়ি রাস্তায় বার করাও বিপজ্জনক। জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়েও তবু বেরুনো হলো না।

সামনের বাগানের মধ্যে খানিকটা দাঁড়িয়ে ভেতরে আসছিলেন। পেছন থেকে দারোয়ান একটা চিঠি দিয়ে গেল হাতে।

খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন।

সুরুচি বাড়ির পশ্চিমের অংশে তার সংসার পেতেছে।

বিলাস চৌধুরী দক্ষিণ দিকের অফিস ঘরে বসে টেলিফোন তুলে নিলেন।

নতুন করে বিয়ে করেছেন বিলাস চৌধুরী আজ কয়েক মাস, সুরুচি এখন আর অফিসে যায় না।

অফিসে যারা কাজ করে, তারা হয়ত তেমন মনোযোগ দেয় না। অফিসের কাজে আজকাল অনেক ফাঁকি ধরা পড়েছে। নিজেকে এখন বেশী পরিশ্রম করতে হয় অফিসের জন্যে।

একটা সুবিধেমত লোক দরকার। সুরুচির অফিসে যাওয়াও ভাল দেখায় না আর।

তা ছাড়া সংসার তো এতদিন চাকর-বাকরদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ছিল—সেখেনেও চুরি কম ছিল না।

সুরুচি নিজে রাঁধে কিংবা রান্নার তদারক করে। সুরুচি রান্নাঘরের দিকে নজর দেবার পর থেকেই খেয়ে আজকাল তৃপ্তি পাচ্ছেন বিলাস চৌধুরী।

এই ঘরে বসেই শুনতে পাওয়া যায় অন্দর মহলের ঘর থেকে রেডিওর গানের সুর ভেসে আসছে।

সুরুচি বোধ হয় জানেও না যে, বিলাস চৌধুরীর আজ অফিসে যাওয়া হয়নি।

এক একদিন সুরুচিকে গান গাইতে শুনেছেন বিলাস চৌধুরী। তাঁর সামনে কোনওদিন গায় না। চমৎকার গলা তো সুরুচির। এক এক সময় মনে হয়—হয়ত এতদিন পরে বিয়ে করা তাঁর উচিত হয়নি।

আয়নার সামনে দাড়ি কামাবার সময়ে মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে কপালের রেখাগুলোর দিকে নজর পড়ে। ঘাড়ের কাছে মাথার দুএকটা সাদা চুল চোখে পড়েছে।

এক একদিন বিলাস চৌধুরী দেখেছেন, গরদের শাড়ি পরে গলায় আঁচল দিয়ে সুরুচি সূর্য প্রণাম করছে।

কাকে দিয়ে একটা তুলসী গাছ নিয়ে এসে টবে পুঁতেছে। একটা ঘরকে ঠাকুর ঘরে পরিণত করেছে। সেখানে জুতো পরে কারো প্রবেশ করবার অধিকার নেই।

তবু বাইরে থেকে বিলাস চৌধুরী দেখেছেন, ভেতরের দেয়ালে অসংখ্য দেব-দেবীর ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টানিয়ে রেখেছে। রোজ মালী এসে পুজোর ফুল দিয়ে যায়। সন্ধ্যেবেলা পুজোর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ কানে আসে।

এমন ছিল না সুরুচি বিয়ের আগে। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে আরও কতকগুলো নির্দিষ্ট সময় আছে সুরুচির ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে নমস্কার করবার।

বিলাস চৌধুরী কোনও দিন ও-সব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন নি, বাধাও দেন নি। অবশ্য তিনি বরাবরই ওসব পছন্দ করেন। কিন্তু বাড়াবাড়িটাও তাঁর ভাল লাগে না।

তা সুরুচি যে বাড়াবাড়ি করে না, সেইটুকু ভাল। তিনি লক্ষ্য করেছেন —সুরুচি যত্ন করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজে, চুল বাঁধে। রান্নার তদারক করে। বাজার আনার পর চাকরের কাছে হিসেব করে বাকী পয়সা ফেরত নেয়। খোকাকে সাজিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে চাকরকে সঙ্গে দিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠায়। পাশে বসে খাওয়ার তদ্বির করে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলেন বিলাস চৌধুরী।

ওই অনন্ত আকাশের মত মনে হয় সুরুচিকে।

কল্পনা করা যায় না, ওই সুরুচিই একদিন বাসে চড়ে অফিসে গিয়ে চিঠি টাইপ করেছে।

অন্যমনস্কভাবে নড়ে বসবার সময় হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। এতক্ষণ চিঠিটার কথা মনেই ছিল না।

খামটা নিচু হয়ে হাত দিয়ে তুলে নিলেন তিনি।

চিঠিখানা হাজারিবাগের বাড়ির ঠিকানা ঘুরে রি-ডাইরেক্ট হয়ে কলকাতার নতুন বাড়ির ঠিকানায় এসেছে। এমন আজকাল সাধারণত হয় না।

ক্ষিপ্রহস্তে খামটা ছিঁড়ে ফেললেন। ভেতরের চিঠির নিচের নামটা দেখেই কিন্তু চমকে উঠেছেন।

সামনের আকাশটার সমস্তখানি চোখের সামনে মাটিতে ভেঙে পড়তে দেখলেও এতখানি চমকে ওঠবার কথা নয়। আজ এতকাল পরে আনন্দ তাঁকে চিঠি লিখবে, এ যেন স্বপ্নেও ভাবা যায় না। বহুদিন পরে আনন্দর মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে তো আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

লম্বা চিঠি লিখেছে আনন্দ।

এক নিশ্বাসে সমস্ত চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর নিশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল।

আনন্দ অনুমতি চেয়ে লিখেছে, সে আবার এ-বাড়িতে ফিরে আসতে পারে কি না। যদি বিলাস চৌধুরী তাকে ফেরবার অনুমতি দেন, তবেই সে-বাড়ির ছেলের মতন এখানেই ফিরে আসবে, আর তা না হলে, তার পথ সে নিজেই বেছে নেবে। ভারতবর্ষের সব দেশেই সে প্রকাশ্য ভাবে বাস করতে পারে—কারণ এবারকার পথ তার আত্মগোপনের পথ নয়, হিংসার পথ নয়।

পড়তে পড়তে দুই চোখ বন্ধ করে বিলাস চৌধুরী ভাবতে লাগলেন।

সুরুচিকে একবার জিগ্যেস করলে ভাল পরামর্শ পাওয়া যেত। কী যে করবেন তিনি, বুঝতে পারলেন না।

সুরুচি আনন্দকে কেমনভাবে যে গ্রহণ করবে, সে-ও একটা সমস্যা।

চিঠিখানা নিয়ে বিলাস চৌধুরী আবার পড়তে লাগলেন।

"……সেদিন আমি ভুল করেছিলাম। শুধু আমি নয় বাবা, আমাদের সকলেরই ভুল হয়ে ছিল। জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে এ বড় মারাত্মক ভুল।

আমাদের দলে যারা ছিল, তারা খুব মুষ্টিমেয়। কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে এমন কোন ত্যাগ নেই, যা তারা করতে পারতো না বা করে নি,—প্রাণ দেওয়া তো তুচ্ছ কথা।

আজ আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের অনেককে সেদিন অকারণে প্রাণ দিতে হয়েছে। সে প্রাণবলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতার কাজ এতটুকু এগোয় নি। সেদিন আমরা ভাবতাম, আমরা এক একজন এক একটা ইংরেজ খুন করে বা একটা কেল্লা দখল করে সরকারকে ভয় পাইয়ে দেশে স্বরাজ আনবো। ভাবতাম আমাদের মত কয়েকটা ছেলে সারা ভারতবর্ষময় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারলে ওরা একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এ পথে যাওয়ার ফলে কয়েক জনের ফাঁসিও হয়েছিল। আমরা তা বলে দমি নি। কিন্তু দেখলাম, ওদের শিকড় এখানকার মাটিতে এমনভাবে জড়ানো, ওদের কামড় এখানে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে দাঁত বসিয়েছে যে, এ তুলতে একজন বীর বা কয়েকজন বীর বা কয়েকশ' বীরও পারবে না। ইতিহাস বদলানো একজন বীরের কাজ নয়। জনসাধারণ মানে চাষী, মজুর, কুলি, কামীন বলতে যা বুঝি, সকলে এক সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেই ইতিহাস বদলায়।

তাদের বরাবর আমরা দূরে সরিয়ে রেখে এসেছি। আমাদের দলের কাজে তাদের আমরা ডাকি নি। আজ ক'বছরে জেলের মধ্যে কাটিয়ে অনেক কথা ভাবলাম, অনেক বই পড়লাম, বহু ইতিহাস ঘাঁটলাম।

আমরা যে পথ বেছে নিয়েছিলাম, তাতে জনসাধারণের কোনও অংশ ছিল না। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের কত বড় ভুল হয়েছিল। আমাদের কাজ ছিল ব্যষ্টির কাজ—সমষ্টির নয়।

কিন্তু ইতিহাস ব্যষ্টিকে স্বীকার করে না—স্বীকার করে সমষ্টিকে……

চিঠিখানা আবার বন্ধ করলেন বিলাস চৌধুরী।

তাঁর কপাল ঘেমে উঠলো।

উঠে গিয়ে পাখাটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। এতদিন পরে আনন্দ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

অবশ্য মায়া বেঁচে থাকলে অমন হত না। তিনি থাকতেন তাঁর কাজ নিয়ে, আর আনন্দ একা তার নিজের জগতে বিচরণ করতো। সেখানে তাকে চালনা করবার কেউ ছিল না।

আবার চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন বিলাস চৌধুরী।

লম্বা চিঠি।

শেষের দিকে এক জায়গায় আনন্দ লিখেছে :

"..... আমাদের দেশের জনসাধারণ যন্ত্রযুগের মধ্যে বড় হয়েছে। তারা বিপ্লবের জন্যে তৈরি হয়েছিল, অথচ তাদের বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি টলান বাতুলতার চেষ্টা ছাড়া আর কী।

নির্জন কারাকক্ষে বসে আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি বাবা। এখন বুঝেছি, ইতিহাসই নেপোলিয়ানকে সৃষ্টি করেছে—নেপোলিয়ান ইতিহাস সৃষ্টি করেন নি।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে যদিও বা ব্যক্তিত্বের কিছু মূল্য ছিল,—আজ আর তা নেই।

আজ সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। গ্রাম, শহর, মুটে, মজুর, কেরানী সবাইকে চাই। আমাদের পরিকল্পনায় তাই সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের সংস্কারের কথাই মুখ্য। বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে। গ্রাম থেকে আমাদের সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে—সেই গ্রাম বাঁচলেই আমাদের দেশ বাঁচবে। তবেই নতুন করে আমাদের ইতিহাস গড়ে উঠবে। তবেই ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ থাকবে......"

চিঠিখানা আবার বন্ধ করলেন বিলাস চৌধুরী।

বহুদিন পরে আনন্দ তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, এ তো আনন্দেরই কথা।

সে কতদিন আগে আনন্দ চলে গেছে। ভুলেই গিয়েছিলেন তাকে।

নিজের মনের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করেই ভুলে ছিলেন এতদিন।

বিলাস চৌধুরীর মনে পড়ল, সে দিনের আত্ম-বিস্মৃতির সেই দুঃসহ তপশ্চরণ। তিনি নিজের হৃদয়কে কঠোর করে তুললেন,—মনকে প্রবোধ দিলেন,—যে বাতিল হয়ে গেছে, তার কথা মনে করে রেখে কোনও লাভই নেই। বহুদিনের অদর্শনে, বহুদিনের চেষ্টায়, বহু রকম কাজের ঘূর্ণিপাকে তাঁর স্মৃতির অবচেতন স্তরে যে আনন্দ একদিন তলিয়ে গিয়েছিল, সে যে ফিরে আসবে, এ-কথা কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল।

আবার চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন। শেষের দিকে লিখেছে আনন্দ :

"......আশা করি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। আমি আবার বাড়ি ফিরে যাবো ; এ-কথা নিজেই আগে কোনও দিন ভাবিনি। কিন্তু আজ আমার মত বদলেছি। আমি বাড়িতে থেকেই আবার দেশের কাজ করবো।

আমি জেল থেকে আসছে চব্বিশ তারিখে ছাড়া পাবো। আপনি যদি আবার আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দেন, তবে জেল থেকে বেরিয়ে সোজা হাজারিবাগের বাড়িতে চলে যাবো। আর যদি আপনার অনুমতি না-ই পাই, ভাববো......"

আনন্দ জানে না যে, বিলাস চৌধুরী কলকাতায় বাড়ি কিনেছেন।

যদি আনন্দকে বাড়িতে আসবার অনুমতি দিতে হয় তো আজই টেলিগ্রাম করে দিতে হবে।

কিন্তু ...

বিলাস চৌধুরী উঠলেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে পশ্চিম দিকের অংশে গেলেন।

সুরুচি এখন খাওয়া-দাওয়া সেরে খোকাকে নিয়ে হয়ত ঘুম পাড়াচ্ছে নয়ত সেলাই-এর কল নিয়ে বসেছে।

সকালবেলা উঠেই সুরুচি পুজোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারপর রান্নার তদারক করতে করতে বেলা হয়ে যায়।

তারপর খোকাকে নিয়ে তার কাজের শেষ থাকে না। তাকে স্নান করানো—খাওয়ানো—ঘুম পাড়ানো।

তারপর দুপুরবেলায় সুরুচির সেলাই, পড়া, আর বিশ্রাম যা কিছু সব।

বিলাস চৌধুরী চিঠিখানা হাতে নিয়ে সুরুচির ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

গাড়ি আসবে হাওড়া স্টেশনে বিকেল পাঁচটায়।

তবু খুব সকাল থেকেই সুরুচির কাজের অন্ত নেই। বহুদিন পরে ছেলে আসছে। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা আসছে এ-বাড়িতে! সুরুচির তো আনন্দ হওয়াই উচিত।

বিলাস চৌধুরী প্রথমটায় যেন সসঙ্কোচে তার কাছে কথা পেড়েছিলেন।

তিনি ভেবেছিলেন, সুরুচি মৃদু সঙ্কোচ প্রকাশ করবে।

হাসি এসেছিল স্বরুচির। যেন সঙ্কোচ করবার অধিকারই তার আছে।

ঘরগুলো পরিষ্কার করিয়ে, বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় সব আজ বদলাতে হয়েছে।

বিলাস চৌধুরীকে ক'দিন থেকেই যেন বেশ খুশি দেখা যাচ্ছে। বাগানটা তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিষ্কার করিয়েছেন।

বিকেল পাঁচটায় ট্রেন।

বাড়ির চাকর, ঝি, ঠাকুর সবাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

আজ কাজের এতটুকু ত্রুটি হলে কী যেন অনর্থ ঘটে যাবে। ব্যস্ত হয়ে সবাই নিজের কাজ করছে।

—মা—

ঠাকুর এসে ডাকলে।

স্বরুচি খোকাকে জামা কাপড় পরাচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে বললে—কী ?

—মাংস রান্না হবে, কিন্তু আদা নেই ঘরে।

আদা নেই তা-ও কি স্বরুচিকে দেখতে হবে নাকি !

—গোপালকে বল। যা নেই বল--একসঙ্গে সব আনুক। বার বার বাজারে যাবে নাকি ওরা—

সাজতে চায় না খোকা। নতুন জামা পরিয়ে. পাউডার মাখিয়ে খোকার গালে চুমু খেয়ে স্বরুচি বললে—বাঃ, এবার তোমায় দেখে মামাবাবু বলবে নিশ্চয়ই—

খোকা বলে—কে বলবে ?

—কে আসবে দেখবেখন। আজকে আসবে এখুনি, তোমাকে মামা বলে ডাকবে—

সমস্ত বাড়িটাই নতুন করে পরিষ্কার করান হয়েছে। বাগানের বাজে ঘাস-গুলো কেটে সাফ করা হয়েছে। স্বরুচি আজ নতুন একটা শাড়ি পরেছে। বেশি জমকালো না দেখায়, অথচ আনন্দের অভিব্যক্তিটাও প্রকাশ পায় এমনি।

ঠিক কেমন করে অভ্যর্থনা করতে হবে আনন্দকে, ভাবতে লাগলো স্বরুচি। বিলাস চৌধুরী নিজেও আজকে ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্টেশনে গেছেন।

নাগেশ্বর শেষ মুহূর্তে বললে নতুন গাড়িটায় ইঞ্জিনের একটু দোষ হয়েছে। অগত্যা পুরোন হুড্ খোলা গাড়িটাই নিয়ে গেছেন।

নাগেশ্বর কিছু বকুনিও খেলে বিলাস চৌধুরীর কাছে। গাড়ির তদারকের জন্যেই যখন তাকে রাখা হয়েছে, তখন এই গাফিলতি অসহ্য।

তবু এতদিন পরে আনন্দ ফিরছে, নতুন গাড়িটা গেলেই তো ভালো হতো!

দক্ষিণের বারান্দার ওপর খোকাকে কোলে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল স্বরুচি।

পেছন ফিরে দেয়ালের ঘড়িটা দেখলে।

সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর আধঘণ্টা মাত্র বাকি! তারপর স্টেশন থেকে এইটুকু আসতে কতটুকু সময়ই বা লাগবে! বিলাস চৌধুরী অবশ্য স্বরুচিকে স্টেশনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন প্রথমে।

স্বরুচিও আপত্তি করেনি। আপত্তি করবেই বা কেন।

শেষে তিনিই বললেন,—না থাক্, তুমি এদিকটা বরং দেখো—চায়ের ব্যবস্থাটা তুমি করে রাখ—

চায়ের ব্যবস্থা সমস্ত ঠিক করেই রেখেছে সে। আনন্দর শোবার ঘরটাও সাজান হয়েছে। দক্ষিণ দিকের একটা বড় ঘরই তার জন্যে ঠিক করেছেন বিলাস চৌধুরী।

আনন্দ পড়তে ভালবাসে বলে বিলাস চৌধুরী কাল কয়েকখানা বইও কিনে এনে সাজিয়ে রেখেছেন বিছানার পাশের শেলফে।

ফুল আনিয়ে টেবিলের ওপর 'ভাসে' বসিয়ে দিয়েছেন!

বহুদিন পরে ফিরে আসছে—নতুন করে ভাল রান্নার ব্যবস্থাও করেছে স্বরুচি। স্বরুচির দিক থেকে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই।

বাগানের ওপর বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে।

সেই দিকে চেয়ে চেয়ে স্বরুচির যেন কেমন ভাবান্তর হলো।

যেদিন বাবাকে এই ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেদিন এখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল স্বরুচি। সেদিনের কথা মনে পড়লে এখনও চোখে জল এসে পড়ে।

পিসীমা কাশী থেকে আর কোনও খবর নেন নি। খোকা যদি না থাকতো, কেমন করে কাটতো তার এই জীবন!

খোকাকে কোলের মধ্যে আরো জড়িয়ে ধরলে সে। খোকা আছে বেশ! আলোছায়ার খেলা ওর জীবনে কোনও রেখাপাত করে না।

গোপাল এসে বললে—ভাঁড়ারের চাবিটা দিন—পায়েসের জন্যে চিনি বার করতে হবে—

খানিক পরে আবার এসে বলে—পয়সা দিন দিদিমণি, পান কিনে আনতে হবে—

গোপালের কাজের শেষ নেই।

কতদিন থেকেই তার খাটুনি অনেক বেড়েছে। তবু গোপাল আছে বলেই স্থরুচির কিছুটা পরিশ্রম লাঘব হয়। স্থরুচির ঠাকুরঘরের সব কাজ গোপাল না হলে কে করতো!

•

এক একটা মটরের শব্দ হয় আর স্থরুচি সচকিত হয়ে ওঠে। ট্রেন বোধ-হয় লেট।

কিন্তু হঠাৎ একসময় পরিচিত মটরের শব্দে চমকে ওঠে স্থরুচি।

আসছে। স্থরুচি যা ভেবেছে, ঠিক।

নাগেশ্বর পুরোন গাড়ি রাস্তার মোড় ঘুরিয়ে আনছে বাড়ির দিকে।

গাড়ির ভেতরে দুজনে বসে আছেন। অল্প অন্ধকারে তাঁদের চেহারা অস্পষ্ট। গাড়িটা রাস্তা থেকে বাগানের গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান গেট খুলে সেলাম করে দাঁড়াল।

হঠাৎ যেন স্থরুচির চোখ দুটোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে এল। কিন্তু অল্প অন্ধকার হয়ে এসেছে চারিদিকে, স্থরুচি ভাল করে দেখতে পেলে না। গাড়িটা নিচে এসে গাড়িবারান্দায় দাঁড়াল। নিচে থেকে গাড়ির দরজা বন্ধ করবার শব্দ এল।

স্থরুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো তার!

কেমন করে অভ্যর্থনা করতে হবে, তাই যেন সে ভাবতে লাগলো।

নিচে বিলাস চৌধুরীর গলা শোনা গেল। তিনি এসেছেন—এবং একটার পর একটা ঘর পার হয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে তাঁকে।

স্থরুচি তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল খোকাকে কোলে নিয়ে।

হাঁক, ডাক, ত্রস্ত পায়ে চাকর বাকরদের যাতায়াতের শব্দ এখান থেকে কানে আসছে।

বিলাস চৌধুরী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন।

পেছনে আনন্দ আসছে—তাদের দুজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

সুরুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এখনি ওঁরা এদিকে আসবেন।

ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলে সুরুচি। প্রথমে কী কথা বলবে সে, কে জানে!

দূর থেকে বিলাস চৌধুরীর গলা শোনা গেল।

বিলাস চৌধুরী বললেন—বাড়িখানা এখনও শেষ হয়নি, পুবদিকটাতে একখানা ঘর বাড়িয়ে দিতে হবে—

তারপর আবার বললেন—ওই দক্ষিণ দিকের ঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা করেছি—

তারপর সত্যি সত্যিই তাঁরা দুজনে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সুরুচি বারান্দা পেরিয়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই বিলাস চৌধুরী ঘরের আলোর সুইচটা টিপে দিলেন। সুরুচিকে হঠাৎ সামনে দেখে কেমন যেন চমকে উঠ্‌ল আনন্দ।

এক মুহূর্ত!

সুরুচির মুখের দিকে নিশ্চল, নিস্তব্ধভাবে তাকিয়ে তার কোলের ওপর দৃষ্টি পড়তেই আনন্দর মুখখানা সাদা—ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সারা মুখের রক্ত জমে যেন কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে! সঙ্গে সঙ্গে সুরুচির হৃৎপিণ্ডটাও যেন ভারি একখানা পাথরের চাপে পিষে থেঁতলে নির্জীব অসাড় হয়ে এল।

সুরুচির মনে হলো, সে যেন সামনে ভূত দেখছে। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক অননুভূত আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

আনন্দ!

জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে শেখরদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছিল সুরুচি। কিন্তু তার সাক্ষাৎ যে অকস্মাৎ এমন মর্মান্তিকভাবে মিলবে, তা কে জানত!

বিলাস চৌধুরী কী বললেন, কিছুই কানে গেল না সুরুচির।

শুধু শেখরদার চোখের ওপর কঠিন পাথরের চোখ দুটো নিবিষ্ট করে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। খোকাকে আরো জোরে চেপে ধরে সে যেন তার ওপর নির্ভর করতে চায়। বাইরের আলো-বাতাস সমস্ত যেন রুদ্ধ হয়ে

আসছে—আর সে যেন আত্মহত্যার পণ করে সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তাল অন্তিম মুহূর্তগুলোর সামনে মাথা পেতে দিচ্ছে।

জীবনও নয়—মৃত্যুও নয়—জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে এক অস্বাভাবিক অসহনীয় অনুভূতি তার সর্বাঙ্গ গ্রাস করছে!

পরদিন সকাল বেলাই বিলাস চৌধুরী ডাকাডাকি শুরু করেছেন।

—আনন্দ কোথায়—আনন্দ কোথায় গেল—দেখেছিস কেউ?—

চাকর-বাকর ঝি দারোয়ান কেউ উত্তর দিতে পারে না।

সুরুচি নিজের ঘরের মেঝের ওপর বসে চুপ করে সব শুনতে লাগলো।

সে জানে!

শুধু সুরুচিই জানে! শেখরদা কোথায় গেছে, আর কেউ না জানুক সুরুচি জানে!

অনেক—অনেক দূরে এতক্ষণ শেখরদা এই বাড়ি ছেড়ে দ্রুত পায়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। এ-সংসার তাকে প্রবঞ্চিত করেছে। আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সুরুচি চোখ বুজলো। নিজেকে আর কখনও সে চিনতে পারবে না। ও সুরুচির মূর্তি নয়, ও তার প্রেতাত্মা। তার জ্বলন্ত আত্মার ধূমায়মান ভস্মাবশেষ যেন।

এই গেল সুরুচির গল্প। এ-গল্প সেবারে এখানেই শেষ করেছিলাম। কিন্তু সেদিনও জানতাম না—এ-গল্পের শেষ এখানেও নয়। জানতাম না এর পরেও আমাকে আরো কয়েকপাতা লিখতে হবে। যে-গল্প ১৯৪৫ সালের সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তার শেষ দেখবার জন্যে আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম না। তখন জানতাম না যে শেষের পরেও শেষ আছে। মৃত্যুর পরেও যেমন থাকে স্বর্গ-নরক।

সুরুচি আর বিলাস চৌধুরীর জীবন আর কোনিও দিন কোনও লোকের কৌতূহল আকর্ষণ করতে পারবে বলে মনে হয়নি। সুতরাং নতুন গল্পের সন্ধানে নতুন দেশে নতুন দৃষ্টি নিয়ে ঘুরছিলাম। যখন কলকাতায় আবার ফিরলাম তখন বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ততদিনে অনেক ব্যথা জুড়িয়ে গেছে, অনেক আঘাত মুছে গেছে। গ্রে-স্ট্রীটের এক বাড়ির অন্দর মহলে কী

ঘটছে তা নিয়ে আমারও যেমন মাথাব্যথা ছিল না, আমার গল্পের পাঠকদেরও না।

কিন্তু অনেকদিন বেঁচে থাকার আর যা কিছু অসুবিধেই থাক, একটা মস্ত সুবিধে এই যে চরিত্রগুলোর শেষ পরিণতিটা নিজের চোখে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পাড়ার নলিনীবাবু প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর প্রায় সন্নিসী হয়েই গিয়েছিলেন। একবেলা হবিষ্যি করতেন, চাকরি ছেড়ে দিযে গেরুয়া ধরেছিলেন। ফিরে এসে দেখলাম নতুন বিয়ে করে সস্ত্রীক সিনেমায় চলেছেন। বড়মাসিমার একমাত্র উপযুক্ত ছেলে মারা যাওয়ার সময় দেখেছি বড়মাসিমা শোকে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। দশজনে চোখে চোখে না রাখলে আত্মহত্যাই করে বসতো হয়ত। সেধে সেধে আমরা খাইয়েছি। ঘুম পাড়িয়েছি। বড়মাসিমা বলতো—আমায় তোরা বিষ এনে দে, আমি তাই খেয়েই মরি—। ফিরে এসে দেখলাম সেই মাসিমাই আবার সেদিন দুধে জল দেওয়া নিয়ে গয়লার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে পাড়া কাঁপিয়ে।

তা ছাড়া কলকাতা শহরটাও পালটে গেছে যেন কয়েক বছরে। দাঙ্গার সময় এই রাস্তাতেই সার সার মড়া পড়ে থাকতে দেখেছি, মিছিলের পর মিছিল আর ধর্মঘটের পর ধর্মঘটের আয়োজন-অনুষ্ঠানে পায়ে পায়ে কলকাতার অনেক গল্প মুছে গেছে। অনেক বোমা, অনেক বারুদ, অনেক গোলাগুলিতে সব স্মৃতি বিকল হয়ে গেছে। পাশের বাড়ির প্রতিবেশীই হয়ত মঙ্গলগ্রহের মত সুদূর হয়ে গেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই আরো অনেক বই লিখে ফেলেছি। এই ক'বছরে শত্রু পেয়েছি, মিত্র পেয়েছি। প্রতিষ্ঠাও বেড়েছে, দুর্নামও হয়েছে। অর্থাৎ ভালোয় মন্দয় অনেক পথ এগিয়ে এসেছি।

এই পরিস্থিতিতে আমার প্রকাশক একদিন জানালেন—বই তাঁদের ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে ছাপতে দিতে হবে। একবার মনে হলো আর ছেপে দরকার নেই। প্রথম উপন্যাসের জড়তা যে-টুকু এ-বইতে আছে, পালিশ করলে তা আর কতটুকু কাটবে। যে-লজ্জা একবার ছাপা হয়ে গিয়েছে, তা এতদিন পরে আবার দ্বিতীয়বার ছেপে দ্বিগুণ অপরাধ করতে চাই না।

কিন্তু যেতে আমার হলো। আমার হারানো চরিত্রদের আবার খুঁজে-পেতে হাজির করতে হবে। জানি সেদিন এক নাটকীয় অবস্থায় সুরুচিকে

ফেলে চলে এসেছিলাম। আজ যেন কেমন লজ্জা হলো। গ্রে-স্ট্রীটের সে-বাড়িটাকে আগে যখন দেখেছি তখন তার সামনে বাগান ছিল। চারদিকে খোলা-মেলা। সেই বিরাট বাড়িটার মধ্যে আছে জানতাম কেবল দু'টি প্রাণী আর একটি শিশু। স্বামী আর স্ত্রী। কিন্তু এমন স্বামী-স্ত্রীও বুঝি কেউ দেখেনি। বিয়ে হবার পর থেকেই সুরুচি যেন কেমন সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিল।

বিলাস চৌধুরী একদিন রাত্রে এসে বললেন—আজ সারাদিন বড় খাটুনি হোল—জানো—

সুরুচি খোকার জামা সেলাই করছিল তখন। বললে—আজ তা হলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়োগে যাও—এত খাটলে তোমার শরীর থাকবে কেন?

বিলাস চৌধুরী বললেন—জানো, কিছুই আমার আর ভালো লাগে না আজকাল—

সুরুচি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। বললে—তোমাকে আমি শান্তি দিতে পারিনি,...

বিলাস চৌধুরী বললেন—শান্তি তুমি দেবার কে বলো না, আনন্দও হঠাৎ চলে গেল,—

—সে তো আমার জন্যেই!

—হয়তো আমার এ-বয়েসে বিয়ে করাটা তার পছন্দ হয়নি, বরাবর খেয়ালী সে, বরাবর যা খেয়াল হয়েছে তার তাই-ই করেছে, কখনও তার কোনও কাজেই আমি বাধা দিইনি...তা ছাড়া এতদিন পরে মনে হচ্ছে এই ব্যবসা; এই বাড়ি, এই সম্পত্তি, এই পরিশ্রম, এর বুঝি আর কোনও প্রয়োজন নেই—

বলতে বলতে বিলাস চৌধুরী টেবিলে মাথাটা রেখে যেন ক্লান্তিতে ঢলে পড়লেন।

সুরুচি সেলাই রেখে উঠলো এবার। পাশে গিয়ে মাথায় হাত বুলোতেই বিলাস চৌধুরী মুখ তুললেন। বললেন—হঠাৎ যে...?

সুরুচি বললে—হঠাৎ নয়, তোমার জন্যে আমার বরাবর দুঃখ হয়—

বিলাস চৌধুরী সুরুচির হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন—কিন্তু আমার দুঃখ তো তুমিই ইচ্ছে করলে দূর করতে পারো সুরুচি—

সুরুচি বললে—তুমি অমন করে বোলো না আমায়, আমার ওতে কষ্ট হয়—

—কেন, তোমার কিসের কষ্ট! কিসের অভাব তোমার? শুধু মুখ ফুটে বলো আমায়, কী তোমার দরকার!

বিলাস চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন কথা বলতে বলতে। সুরুচি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তুমি চুপ করো, তোমার শরীর ভালো নেই—

—না, আমি শুনবোই সুরুচি।

সুরুচি বললে—তুমি শেষকালে ছেলেমানুষি শুরু করলে!···তুমি কি বোঝ না—

—আমি কী করে বুঝবো বলো, তুমি কি আমায় বুঝতে দিয়েছ কখনও, আমি কি জীবনে আর কারো কাছে এত ছোট হয়েছি?

সুরুচি খপ্ করে বিলাস চৌধুরীর মুখে হাত চাপা দিলে। বললে—ছিছি, তোমার মুখে কিছু বাধে না—খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

বিলাস চৌধুরী অনেকক্ষণ পরে বললেন—তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে এই আট বছর এক দিনও রাতে ঘুমুই নি আমি—রাতের পর রাত আমার জেগে কেটেছে—জানো—

সুরুচি মুখ নিচু করেই বললে—জানি—

—রোজ রাত্রে কখন চাঁদ ওঠে, কখন ডোবে, কখন বাস চলাচল থেমে যায়, বাস চলতে সুরু করে, কখন কাক ডাকে, কলে জল আসে, ছাদে টপ্ টপ্ করে শিশির পড়ে, তার শব্দটা পর্যন্ত টের পাই···জানো—

সুরুচি এবারও বললে—জানি···

বিলাস চৌধুরী বললেন—তুমি আর কতটুকু জানো সুরুচি, কতটুকু তুমি জানতে চাও—আমি কতদিন মাঝ রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরুই, সমস্ত বাড়িময় নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াই, ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকি, আবার একবার নেমে আসি, আবার এক-একদিন বারান্দা পার হয়ে উঠোন পার হয়ে তোমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াই, তারপর আস্তে আস্তে এসে তোমার দরজার ফাঁকে এসে কান পেতে শুনি—কোনও শব্দ পাই না—আবার ভয়ে ভয়ে চোরের মত চুপি চুপি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকি—

সুরুচি এবারও বললে—তা-ও জানি—

—সত্যি সুরুচি, তুমি জানো? জানতে পারো? টের পাও? সত্যি বলো না—

বিখ্যাত ব্যবসায়ী আজ নিতান্ত ভিখিরীর মত আর্তিতে সামান্য একটা মেয়ের কাছে যেন অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছেন। এ-দৃশ্য যেন সুরুচির সহ্য হলো না।

বললে—চলো—ওঠো—

বিলাস চৌধুরীকে হাত ধরে ওঠালো সুরুচি। অনেক রাত হয়ে গেছে। ঘর থেকে বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে সুরুচি বিলাস চৌধুরীকে নিয়ে চললো। এ-দিকটা সুরুচির মহল। আর ও-দিকটা বিলাস চৌধুরীর। আগে ছিল বার-বাড়ি ভেতর-বাড়ি। সেই বিয়ের পরদিন ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই এ-ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ফুলশয্যার রাত্রের সে-ঘটনা সুরুচির মনে আছে। তখন সবাই ক্লান্ত। নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনরা যে-যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। বাইরের লোকরাও বাড়ি চলে গেছে।

বিলাস চৌধুরী নিজের হাতে শোবার ঘরের দরজার খিল বন্ধ করলেন। তারপর বড় আয়নাটায় তাঁর ছায়া পড়লো। সেদিকে চেয়ে সুরুচি থর থর করে কাঁপতে লাগলো যেন। বিলাস চৌধুরী পেছন থেকে এসে দু'হাতে তার দু'টো কাঁধ ধরলেন। কাঁধে হাত লাগতেই বিলাস চৌধুরী চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিয়েছেন। দু'হাতের পাতায় যেন তার বিছুটির স্পর্শ লেগেছে।

—এ কী? তোমার গা এত গরম যে?

সুরুচি বললে—ও কিছু নয়, তুমি কী বলতে এসেছিলে বলো—

বিলাস চৌধুরী আরো অবাক হলেন। বললেন—তোমার কি শরীর খারাপ!

—শরীর আমার খারাপ নয়, তুমি বলো কী বলবে!

বিলাস চৌধুরী আরো কাছে মুখ সরিয়ে আনলেন। বললেন—জীবনে এমন রাত একবারই আসে, সুরুচি। যারা হতভাগা তাদেরই কেবল আসে একাধিকবার, কিন্তু এমন দিনেও কি তুমি এমনি করে মুখ ভার করে থাকবে?

—না, আমি আর মুখ ভার করবো না—এই তো আমি হাসছি—

বলে সুরুচি সত্যি সত্যি হাসতে চেষ্টা করলে। ফ্যাকাশে পান্‌সে প্রাণহীন হাসি।

বিলাস চৌধুরী বললেন তোমাকে হাসতে বলেছি বলেই কি শুধু হাসবে, তোমার কি হাসি আসছে না? আজ সমস্তদিন আমি প্রতীক্ষা করেছি শুধু কি এই হাসি দেখবার জন্যেই?

সুরুচি বললে—আমি—বড় ক্লান্ত, আমায় তুমি ক্ষমা করো—কাল থেকে আমার কোনও ত্রুটি পাবে না—আমি সব সইবো—মুখ বুজে সব সইবো—

—তুমি কি বলছো সুরুচি! কী বলছো তুমি? আজ যে আমাদের ফুলশয্যার রাত!

বিলাস চৌধুরী স্থির হয়ে গেলেন। সমস্ত অস্থিরতা, সমস্ত প্রতীক্ষা যেন তার শেষ সীমা অতিক্রম করে করে চরম পর্যায়ে এসে এখন তাঁকে নিথর-নিশ্চল করে দিয়েছে। যেন তিনি আর বিলাস চৌধুরী নন। যেন লক্ষপতি ব্যবসায়ী নন তিনি। এ-বাড়ির মালিকও নন। আজকের উৎসবের প্রধান নায়কও নন। তিনি শুধু মানুষ। রক্ত-মাংসের মানুষ। আর সামনে তাঁর উন্মুক্ত অনাবৃত উপভোগ্য নারী শরীর।

এক মুহূর্তে তিনি আবার নিজেকে সামলে নিলেন। প্রসারিত হাত সরিয়ে নিলেন নিজের দিকে।

সুরুচি মুখ তুলে চাইলে। বললে—তুমি খুব রাগ করলে তো? কিন্তু ··

বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে কথা বেরোল না সুরুচির। কিন্তু বিলাস চৌধুরী বুঝলেন। রাত তখন গভীর। উৎসব-ক্লান্ত বাড়ির তখন নির্জীব অবস্থা। কাছে-দূরে কোনও জাগরণের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও নেই, বিলাস চৌধুরী আবার জামা চড়ালেন গায়ে। চুলটা আঁচড়ে নিলেন।

তারপর দরজার কাছে এসে নিঃশব্দে খিল খুললেন।

সুরুচি কাছে এসে বললে—তুমি চলে যাচ্ছো নাকি?

—হ্যাঁ—

সুরুচি বললে—বলো আমায় ক্ষমা করেছ তুমি?

বিলাস চৌধুরী পেছন ফিরলেন। বললেন—তোমার ভয় নেই সুরুচি, আজকের রাত্রের কথা এ-বাড়ির কেউ টের পাবে না, শুধু এ-বাড়ির নয়, পৃথিবীর কেউ কোনও দিন টের পাবে না আজকের ঘটনার কথা, তুমি

খিল দিয়ে দাও, আমি ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে শোবো—তোমার কোনও ভয় নেই—

শুধু কি ওই একটি রাত! রাত আরো অনেক এসেছে। বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর কত বছর কেটে গেছে। আট বছরের প্রতিটি রাত একা ঘরে শুধু খোকাকে কাছে নিয়ে কাটিয়েছে সুরুচি। বিলাস চৌধুরী মাঝে মাঝে দেখা করেন। শক্ত হয়ে থাকেন। ব্যবসার জটিল কাজে আরো নিবিড় ভাবে তলিয়ে গেছেন। ব্যবসার কূটজালে যখন বিব্রত হয়ে পড়েন, তখন আসেন সুরুচির কাছে। নতুন কনট্রাক্ট, নতুন স্কীম, নতুন প্ল্যান। সুরুচির একে একে সব জটিলতা সরল করে দেয়। বলে—ফাইভ পার্সেণ্ট লাভে তোমার পোষাবে? অফিসের খরচ চলবে কী করে সেটা ভেবে দেখেছ?

বিলাস চৌধুরী কাগজগুলো গুটোতে গুটোতে বলেন—যুদ্ধের সময় পঁচিশ তিরিশ পার্সেণ্ট লাভ করেছি বলে চিরকাল কি তাই চলে?

সুরুচি বলে—তা বলে আট লাখ টাকা জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে ব্যাঙ্কে থাক্—ও শেয়ারের দাম নিশ্চয় উঠবে দেখে নিও—

শেয়ার আর ডিভিডেণ্ড, ইন্‌টারেস্ট আর ডিপোজিট—এই শুধু বিষয়বস্তু, আর কিছু নয়। অনেকদিন ব্যবসার জটিল জাল ভেদ করতে রাত হয়ে যায় অনেক। অনেক গভীর রাত পর্যন্ত সুরুচির সান্নিধ্য উপভোগ করতে চান বিলাস চৌধুরী। কিন্তু বিলাস চৌধুরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর আছে সুরুচির। হঠাৎ বলে ওঠে—আর না, এবার ঘুমোও গিয়ে তুমি, অনেক রাত হয়েছে—

বিলাস চৌধুরী নিঃশব্দে উঠে যান।

অন্ধকার বাড়িটার এ-মহল থেকে ও-মহল পেরিয়ে আসতে আসতে সুরুচি উঠোনের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। সেদিন এমনি মাঝ-রাত। নাজিরদের তেতলা-বাড়ির আড়ালে সেদিনও খণ্ড-চাঁদ এমনি সময়ে ডুবে গিয়েছিল। আর···

খোকা বলে—আচ্ছা দিদি, মটরগাড়ি তো তেলে চলে—আর রেলগাড়ি? রেলগাড়ি কিসে চলে?

সুরুচি বলে—কয়লায়।

—বারে, তেলে চলে না কেন ?

—রেলের ইঞ্জিন কি তেলে চলে ? রেলইঞ্জিন কি মটরগাড়ি ?

খোকা বলে—মটরগাড়ির ইঞ্জিন কি আলাদা ?

—আলাদাই তো,—

—তা হলে এরোপ্লেনও কয়লায় চলে ?

—দূর, এরোপ্লেন তো তেলে চলে !

—কেন দিদি কয়লায় চলে না কেন ?

সুরুচি বলে—তুমি এখন ঘুমোও তো বাবা, কাল তোমাকে আবার অনেক দূর বেড়াতে নিয়ে যাবো—

খোকা বলে—কালকে আমি গাড়ি চালাবো দিদি—

—ছি, গাড়ি যদি ভেঙে যায় ?

—গাড়ি যদি ভেঙে যায় তো কী হবে, তুমি আর একটা গাড়ি কিনবে—

সুরুচি বলে—গাড়ি কি আমার ?

—তোমার না তো কার ?

—বাবুর।

খোকা বলে—বা রে, বাবু তো আমাদের—আমাদের লোক হলে কি বকে ? বাবু তো আমায় আদর করে, কত জামা জুতো কিনে দেয় আমায়, বাবু তো ভালো খুব, না দিদি—

—হ্যাঁ, ভালোই তো, তুমি যখন লেখাপড়া শিখে বাবুর মত বড় হবে, তুমিও গাড়ি কিনবে, মস্ত বড় গাড়ি কিনবে—

—কত বড় হবো আমি ?

—এই এ-তো বড়—

—কেমন মজা, আমায় তুমি তখন চিনতেই পারবে না, না দিদি ?

—আমি তো চিনতেই পারবো না—আমি বলবো—এটা কেরে—তুমি বলবে—আমি খোকা—আমি বলবো—ওমা তাইতো, বলে তোমাকে এমনি করে বুকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খাবো—

খোকা বলে—উঃ ছাড়ো ছাড়ো—লাগে না ?—

সুরুচি বলে—আদর করলে কি লাগে নাকি ?

—জোরে আদর করলে লাগে না বুঝি ?

সুরুচি বলে—তুমি আমায় আদর করো, আমার কিচ্ছু লাগবে না—দেখো—

খোকা ছোট দুর্বল হাত দিয়ে সুরুচিকে জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খায়। বলে—লাগছে তোমার ?

—না—

আরো জোরে চেপে ধরে খোকা।

বলে—এবার লাগছে ?

—না—

খোকা অবাক হয়ে যায়! বলে—কেন দিদি, আদর করলে তোমার লাগে না কেন ?

সুরুচি বলে—তুমি আদরই করতে জানো না—

খোকা হঠাৎ বলে—আমার বাবা আদর করতো আমায় ?

সুরুচি গলা নিচু করে বলে—তোর বাবা কোথায় বল্‌তো খোকন্‌ ?

—আমার বাবা তো মরে গেছে, জানো না বুঝি—

সুরুচি বলে—ছি, ও-কথা বলতে নেই—

—বা, বাবা তো মরে গেছে—

—ছি, বলতে নেই ও-কথা—

—বারে, গোপাল যে বলে, বাবা মারা যাবার সময় তুমি কত কেঁদেছিলে, বাবা তো বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তাই মরে গিয়েছে—বুড়ো হলে তো সবাই মরে যায়—কী বলো—

এক সময়ে কথা বলতে বলতে খোকা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও জেগে থাকে সুরুচি। এ-বাড়ির ওধারে একটা মহলে জেগে থাকে বিলাস চৌধুরী আর এ-মহলে সুরুচি। যারা বাড়ির মালিক। যারা অর্থবান যারা বিত্তবান। আর যাঁরা অল্প মাইনের কর্মচারী,—এ-বাড়ির চাকর-ঝি-ঠাকুর—তারা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেই সব রাতে সুরুচি খোকাকে বুকের উত্তাপে ঘনিষ্ঠ করে পলকহীন চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ওই অন্ধকারের মতই যেন নিষ্প্রাণ, নিরবয়ব সুরুচির আত্মা। পৃথিবীর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে যখন সমস্ত উদ্বেগ শান্ত হয়ে এসেছে, তখন এ-বাড়িতে কেবল এই দৈনন্দিন হাহাকার। এখানে স্বামী স্বামী নয়, স্ত্রী স্ত্রী নয়,

সন্তানও সন্তান নয়। এ এক অপরূপ নাটক। পাঁচ অঙ্কের পরিধিতে যে-নাটকের ট্র্যাজেডিকে সীমায়িত করা যায় না। এপিক উপন্যাসের অপরিসীম বিস্তারের মধ্যেও তার যবনিকা টানা সম্ভব নয়। কবে এর শেষ হবে, কবে সমাপ্ত হবে এই অভিনয় এই প্রবঞ্চনা তার কোনও ঠিক নেই। অশেষ, অবোধ-গম্য, অপ্রকাশ্য এই সম্পর্ক। সুরুচির ভাবতেও ভয় করে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কি এই সম্পর্কের প্রবঞ্চনাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। একদিন কি দুর্বহ হয়ে উঠবে না এই প্রবঞ্চনা। সেদিন কি উচ্চকণ্ঠে সমস্ত কলঙ্ক উলঙ্গ করে বিশ্ববাসীকে সভয়ে ঘোষণা করতে হবে না! যদি তেমন হয় তবে কেমন করে সে বেঁচে থাকবে সেদিন। কেমন করে কলকাতার আধুনিক সভ্য-সমাজের সামনে মুখ দেখাবে সে! বিলাস চৌধুরীর বিপুল অর্থ কি সেদিন তাকে রক্ষা করতে পারবে! সমস্ত অগৌরব আর সমস্ত কলঙ্ক থেকে বিলাস চৌধুরীর আভিজাত্য কি তাকে সসম্মানে মাথা তুলে বাঁচতে দেবে!

এ-সব রাতের চিন্তা। সকাল হলে আর এ-সব চিন্তা মনে থাকবার কথা নয়। এ-বাড়ির আভিজাত্য-ঘেরা ছাদের মাথায় তখন সূর্যোদয় হয়েছে। এ-মহলে ও-মহলে ঝি-চাকরের কোলাহল শুরু হয়। দিনের পৃথিবীর কাছে রাতের পৃথিবী আবার বুঝি হার মানে। সবজি বাগানের সেই মধ্যবিত্ত দিনগুলো বুঝি খানিকক্ষণের জন্যেও জীবনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে পেছিয়ে পড়ে। বিলাস চৌধুরী কিন্তু সকাল থেকেই আবার অন্য মানুষ। সারা রাত যাঁর ঘুম হয় না ভোর বেলাই তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

গোপাল হাতের কাছে-কাছে থাকে। কোনও দরকার থাকতে পারে। দেশলাই চাই, চুরুট চাই। ঠিক সময় মত সব জিনিস হাতে তুলে দিতে হবে। পা টিপে দিতে হবে ভোর বেলা। অত ভোরেই বেড়াতে বেরিয়ে যান। কোনও দিন হেঁটে, কোনও দিন গাড়িতে। তখনও অন্ধকার ভালো করে কাটে নি। একা রুদ্ধশ্বাস গতিতে অন্ধকার কেটে কেটে চলেন।

গোপাল বলে—আজকে কী খাবেন?

বিলাস চৌধুরী যেন কানে শুনতে পান না। নিজের ছড়িটা নিয়ে চলতে শুরু করেন।

গোপাল আবার পেছন-পেছন ছুটে এসে বলে—আজকে আপনার কী খাবার করবো?

এক সময়ে বিলাস চৌধুরী বলেন—কিছু না—

কিছু খাবেন না, তাই কি হয়। ঠাকুরকে বলে কিছু খাবার করতে হয় গোপালকে। দু'টো টোস্ট, দুটো ডিম, এক কাপ চা। এমনি এক-একদিন এক-একরকম। এক-একদিন সাহেব কিছুই মুখে দেন না। কিছু না খেয়েই সোজা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে চলে যান অফিসে। অফিসে খাবার নিয়ে গেলে বিরক্ত হন।

বলেন—কেন, আমি তো বলেছি তোকে খাবো না—

সুরুচির কাছে এসে বলে—দেখুন তো দিদিমণি—সাহেব আমার কিছু খেলেন না, আপনিও তো কিছু আর দেখেন না—এমন না খেলে শরীর টিঁকবে কেন, বলুন ?

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে সুরুচিরই কি কম কাজ! ভোরবেলা কী-শীত কী-গ্রীষ্ম স্নান করতে হয় ঠাণ্ডা জলে। সে-স্নানও চলে এক ঘণ্টা ধরে। তারপর তসরের কাপড় পরে পবিত্র হয়ে পুজোর ঘরে ঢোকে সুরুচি। নিজের মহলে নতুন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে। নারায়ণ। পুরুত এসে পুজোর যোগাড় করে দিয়ে যায়। ধূপ ধুনো গুগ্‌গুল জেলে ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায়। গলায় আঁচল দিয়ে বার বার মন্ত্র পড়ে, প্রণাম করে। তন্ময় হয়ে যায়। বলে—ঠাকুর শান্তি দাও আমাকে—রাহুলকে মানুষ করে দাও—আমি আর কিছু চাই না—শুধু শান্তি—

সে-সব দিনের কথা আজো সুরুচির মনে আছে বৈকি! আজ এই দশ বছর পরে যখন সব ঢেউ স্থির হয়ে এসেছে, সেদিনের সে-সংগ্রামের কথা মনে আছে বৈকি তার। আজ সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেছে। গ্রে স্ট্রীটের এ-বাড়িতে আজ আর কেউ নেই। সমস্ত বাড়ি জুড়ে এক নিস্তব্ধতার সাম্রাজ্য। একবার গলা উঁচু করে ডাকলে সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি ওঠে আজ। হাহাকার করে ওঠে ইটের কঙ্কালগুলো। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-মহল থেকে ও-মহল শব্দের তরঙ্গ ভাসতে ভাসতে যায় শুধু অনন্ত শূন্যের দিকে। আজ আর বিলাস চৌধুরী নেই। নেই সেই চাকর-বাকরের সুসমারোহ। ঝি-চাকর, বাসন-কোসনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দ। আজ সুরুচি এ-বাড়ির নিষ্প্রাণ আসবাব পত্রের একটি হয়ে আছে। আসবাব-ফারনিচারের

মতই তার কোনও জৈব অস্তিত্ব যেন নেই। আছে শুধু নিষ্কাম দায়িত্ব, শুকনো কর্তব্য, আর কঠোর নিস্পৃহতা।

খোকা জিগ্যেস করে—আমার রাহুল নাম কে রেখেছে দিদি?

কিন্তু মাঝখানে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আগে সেই-গুলো বলে নিই। সুরুচির জীবনের আরম্ভে যে-সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, ধাপে ধাপে তার প্রত্যেকটি নিঃশেষ করে একেবারে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

ঠাকুর এসেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাহসে ভর করে বলেছে—মা, ভাঁড়ারের চাবিটা—

সুরুচি বলেছে—আজ থেকে গোপালের কাছে চাবি থাকবে—তাঁকে দাও গিয়ে ঠাকুর—

সন্ধ্যেবেলা পুজোর ঘরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। ধূপ ধুনো জ্বলে ওঠে। আরতির শব্দে আবার মসৃণ হয়ে ওঠে সুরুচির মন। মনে হয়—কোথাও যেন তার কেউ নেই। যেন অভাবও নেই তার অভিযোগও নেই কোনো। অনটনও নেই, আবার প্রাচুর্যও নেই। সে যেন কারো স্ত্রী নয়, মা নয়, প্রিয়া নয়, কন্যা নয়। তখন আর কারোর কথা মনে থাকে না। বিলাস চৌধুরী নয়, খোকা নয়, সংসার, সমাজ, বাবা, কেউ নয়। এমন কি শেখরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মন থেকে মুছে যায়। আর শুধু তাই নয়—নিজেকেই কি মনে থাকে তখন! নিজের শরীর, নিজের শারীরিক আরাম, নিজের ভবিষ্যৎ, নিতান্ত স্বার্থপরের মত যে-কথা সব সময়ে মনে পড়ে তা পর্যন্ত আর মনে থাকে না। ঠাকুরের গোলগোল চোখ দুটো জ্বলতে জ্বলতে নিঃশব্দে কখন মিলিয়ে যায়, কাঁসর-ঘণ্টা, ধূপ ধুনো—সমস্ত মুছে যায়, নিবে যায়, বিলীন হয়ে যায়!

ঠাকুরমশাই নামাবলী গায়ে জড়িয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে এসে দাঁড়ান।

বলেন—গোপালের দোলের আয়োজন করবো তা' হলে মা—আসছে পূর্ণিমার দিন—

সুরুচি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে বলে—করুন—

—আমি একটা ফর্দ করে এনেছি মা—এটা একটু দেখুন—

—আমি আর কী দেখবো, আপনি তো দেখে দিয়েছেন—

—ষোলজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করবো ভাবছি—আর গরদের থানের জোড় দিয়েছি প্রত্যেককে, পেতলের ঘড়া একটা করে, আর যেমন সিধে যায় তেমনি—

—তা করবেন!

পুরুতমশাই আবার বললেন—গোপালের ভোগের চালটা আপনি দেখেছেন, বড় খারাপ আলো চাল, কাঁকর থাকে, ভালো করে ঝাড়া বাছা হয় না—

—এতদিন বলেন নি কেন আপনি?

—বলবো বলবো ভাবছিলাম, তা আমি একটা নতুন দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি, ভারি সুন্দর চাল মা, যেমন সাদা ধবধবে তেমনি হাল্কা,—আপনি যদি বলেন তো…

—আপনি যখন বলছেন তখন তাই-ই হবে—

এমনি করেই প্রতিদিন কথা হয়—কোথাও কোনও বিরোধ নেই। সুরুচির কাছে কেউ এসে নিরাশ হয়ে ফেরে না। হাত পেতে চাইতে পারলেই হয়। সবাই সুখী হোক, সবাই শান্তি পাক। নারায়ণ সুরুচিকে তো অনেক দিয়েছেন। তবু অনেক পাওয়ার প্রাচুর্যে তার সব চাওয়াও যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ তার মনে হয় এত না পেলেই বুঝি ভালো হতো। এত কে চেয়েছিল! যা পেলে সব চাওয়ায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে তা সে কবে পাবে! অথচ এক-একবার মনে হয়—কীই বা সে চায়! কী পেলে তার আর সব পাওয়া পরিপূর্ণ হয়! কিছুই সে বুঝতে পারে না।

রামায়ণ মহাভারত পাঠ হয় পুজোর দালানে। কথক-ঠাকুরের জন্যে থরে থরে সিধে সাজানো থাকে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে ঝি-বউরা আসে। প্রণামী দেয়। সকলের সামনে বসে লাল পাড় গরদের শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে সুরুচিও শোনে। যখন সবাই প্রণাম করে সুরুচিও প্রণাম করে।

কথক ঠাকুর শান্তিপর্ব পাঠ করছেন।

একে একে প্রশ্ন করেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আর উত্তর দেন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব।

ধর্মরাজ প্রশ্ন করেন—হে পিতামহ, কিরূপ আচার ব্যবহারে মানুষ সুখী হয়—ইহলোক পরলোক উভয় লোক কৃতার্থ হয়—

মহামতি ভীষ্ম বললেন—হে কৌন্তেয়, সুখী হতে চাইলে মানুষকে ধর্মাচরণ করতে হবে। কেমন করে ধর্মাচরণ করতে হবে ? না, প্রসন্নমনে! যখন অর্থোপার্জন করবে পরকে কষ্ট দেবে না। সুখ সম্ভোগ করতে হলে গর্ব ত্যাগ করবে। অসৎ লোকের কোনওরূপ সাহায্য নেবে না। হঠাৎ ক্রোধ করবে না। শত্রু রাখবে না, হয় তাকে বন্ধু করে নেবে নয় তো তার সংস্পর্শ ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান করবে। যত প্রকার দান আছে তার মধ্যে অভয়দানই উৎকৃষ্ট দান। প্রাণদানের ন্যায় দান আর নেই।

যুধিষ্ঠির তখন বললেন—হে পিতামহ, অজ্ঞানকৃত যে পাপ তা থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় ?

শান্তনব বললেন—অজ্ঞাতসারে বা মুহূর্তের ভুলে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধি পূর্বক সৎ-আচরণে তা দূর হয়, যেমন কাপড় ময়লা হলে ক্ষার দিয়ে তার মলিনতা দূর করতে হয়, তেমনি সৎকার্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই অজ্ঞানজ পাপ দূর হয়—সূর্যের উদয় হলে যেমন অন্ধকার বিনাশ হয় তেমনি পুণ্যের উদয়ে অজ্ঞানজ পাপের ধ্বংস হয়—

যুধিষ্ঠির জিগ্যেস করলেন—ধর্মাচরণ যে করবো—ধর্মের মূল কী ?

ভীষ্ম বললেন—ধর্মের বহু শাখা কিন্তু মূল একটি—সে হলো সংযম, যার সংযম আছে সে সুখে নিদ্রা যায়, সুখে নিদ্রা ত্যাগ করে—যেখানে সংযম আছে, সেখানে ক্ষমা আছে, সন্তোষ আছে, অহিংসা আছে, শত্রু মিত্রে সমভাব আছে। সুখ দুঃখ তো দৈবায়ত্ত। সুখের সামগ্রী হাতে থাকতেও লোকে অশেষ দুঃখ ভোগ করে আর দুঃখের কারণ থাকতেও সকলে সুখ ভোগ করে। অমন যে তেজস্বী সূর্য তারও যেমন উদয় আছে তেমনি আবার অস্তও আছে যে।…

কথকতা যখন শেষ হয়ে যায় একে একে পাড়ার মহিলারা চলে যান। নারায়ণকে প্রণাম করে কথক ঠাকুরকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় দেন।

বুড়ীরা বলে—অনেক পুণ্যির জোর মা তোমার, নইলে লেখাপড়া শিখে ধম্মে-কম্মে এত ভক্তি তো কারো দেখিনি—

এই পাড়ার লোকেরাই একদিন সুরুচিকে দেখেছে জুতো পায়ে ব্যাগ নিয়ে অফিসে যেতে। আবার আজ সেই সুরুচিরই অন্য এক মূর্তি। এ-বাড়ির বউ হয়ে যেন আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। গলায়

আঁচল দিয়ে সেই মানুষই আবার ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে গড় হয়ে প্রণাম করে।

সুরুচি বলে—অনেক পাপ করেছিলুম জীবনে তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি আজ—

সবাই বলে—তুমি কেন পাপ করতে যাবে মা, তোমার সোনার সংসার, শিবের মত সোয়ামী, ধনে-জনে লক্ষ্মী তোমার দোরে বাঁধা,—পুণ্যি না থাকলে এমন কেউ পায়? তোমারও পুণ্যি। তোমার বাপ-মায়েরও পুণ্যি—

কেউ বলে—তুমিই পারবে মা, একটা শিবের মন্দির করে দাও না, ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি, পুজো দিতে গেলে যেতে হয় সেই ঠন্‌ঠনে—

সেদিন বিলাস চৌধুরীকে বললে—ভাবছি একটা সাধারণের মন্দির করে দেব—সেবায়েত থাকবে আর কিছু দেবোত্তর জমি-জমা—মন্দিরের খরচ চালাবার জন্যে—তোমার আপত্তি আছে?

বিলাস চৌধুরী মনে মনে একটু অবাক হলেও বললেন—মন্দির? তা করো—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—তোমার আপত্তি নেই তো, তুমি তো আবার ও-সবে বিশ্বাস করো না—

—বিশ্বাস! বিলাস চৌধুরী হাসলেন। বললেন—আগে কি তুমিই বিশ্বাস করতে?

সুরুচি বললে—এখনই কি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি ভেবেছ? তেমন ভাগ্য কি আমার হবে?

বিলাস চৌধুরী বলেন—অনেকেই তো বিশ্বাস করেনা, নাস্তিক, তারা তো সুখেই দিন কাটাচ্ছে—

সুরুচি হাসলে এবার। বললে—আমাকেও তো সব লোক সুখী ভাবে!

বিলাস চৌধুরী বললেন—কিন্তু কীসের তোমার দুঃখ, আমাকে বলবে সুরুচি?

এ-কথার কোনও উত্তর আসেনা সুরুচির মুখে।

বিলাস চৌধুরীর যেমন সব থেকেও কিছু নেই। সুরুচিরও তেমনি।

বিলাস চৌধুরী এক-একদিন বলেন—গাড়ি নিয়ে যাওনা একলা-একলা—সারাদিন বাড়িতে বসে বসেই তোমার এমন হয়েছে।

যেন গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেলেই সুরুচির সমস্ত দুঃখ মিটে যাবে, যেন গাড়ি বাড়ি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এই সবই সে চায়। তা হলে কবে সে সুখী হতো। ঈর্ষা করবার মত আজ সুরুচির ঐশ্বর্য। সত্যিই তো তার মত সুখী কে! নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ—নিজেরই শুধু নয়, খোকারও। দুপুরবেলা যখন বিলাস চৌধুরী অফিসে চলে গেছেন, রাহুলও খেলা করতে করতে ঘুমিয়েছে, তখন সুরুচির কোনও কাজ নেই। কোনও কাজ যেমন নেই, কোনও দুর্ভাবনাও নেই তেমনি। বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে আরাম করে দিন কাটাবারই তো সময় তার। কিন্তু তা হয় না। হয় না বলেই নিজেকে তার চরম দুঃখী মনে হয়। মনে হয় মাথাটা তার কোথাও গিয়ে ঠেকুক, যেখানে জগতের ছোট বড় সকলে এসে মিলেছে। ছোট বড় সকলে যেখানে মাথা ঠেকাতে পেরে ধন্য হয়েছে। বাইরের সমস্ত গোলমাল হট্টগোল যেখানে এসে থেমে গেছে। যেখানে সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত আচ্ছাদন, তার মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে। সে কে? সে কী? সে কোথায়?—তা সুরুচি জানে না। কিন্তু এমন জিনিস আছে নিশ্চয়ই কোথাও। নইলে মানুষ কেমন করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেঁচে আছে। এত পাপে মলিন হয়ে, এত কলঙ্কে কালো হয়েও কেন এতদিন টিঁকে আছে পৃথিবী! কোথাও আছে সেই নির্ভরতা, সেই অপার প্রত্যয়। সেই প্রশস্ত ক্ষমা!·· হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই ক্ষমার সাক্ষাৎ একদিন পেলে সুরুচি।

সেদিন হঠাৎ গোপাল এসে বললে—তোমাকে একজন ডাকছেন মা—

আমাকে! আমাকে কে ডাকবে।

গোবিন্দ বললে—মাস্টারমশাইকে খুঁজতে এসেছিলেন—আমি বললাম তিনি তো মারা গেছেন, তা তিনি বললেন—তাঁর মেয়ে আছে? আমি বললাম—আছে—

সুরুচি বললে—কী রকম চেহারা রে তাঁর?

গোপাল বললে—মুখে দাড়ি গোঁফ—ফরসা, লম্বা—

শেখরদা নয়তো! একবার বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মনের নিভৃত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তা কেন হবে, তা হলে গোপাল তো তাকে চিনতে পারতো! কিম্বা হয়ত পাছে চিনতে পারে তাই দাড়ি গোঁফের ছদ্ম-আবরণ দিয়েছে।

ভাবতেই সমস্ত শরীরে আবার শিহরণ লাগলো। কিন্তু কেন এল সে! এখন আর এসে কি লাভ! হয়ত বিলাস চৌধুরীর অনুপস্থিতির সুযোগে একটা বোঝাপড়া করতেই এসেছে। এসেছে চরম জবানবন্দী নিতে। সেদিন বিলাস চৌধুরীর সামনে যে-প্রশ্ন মনের ভেতর উদ্দাম হয়েছিল, যার দুর্দম বেগ সহ্য করতে না পেরে পরদিনই নিঃশব্দে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, সেই বেগ বোধহয় এতদিনে শান্ত হয়েছে। এখন ধীরে সুস্থে তর্ক করার পালা। বিচার করবার নির্জনতা! এই নির্জনতার সুযোগই সে আজকের দিনটায় বেছে নিয়েছে। কিন্তু না। সুরুচির মনে হলো—আর সে দেখা করবে না। শেখরদার সঙ্গে দেখা করবার কোনও অধিকার আজ তার আর নেই! আজ তার সিঁথিতে সিঁদুর হাতে নোয়া। অতীতে যত বড় অন্যায়ই সে করে থাক, আর একটা নতুন অন্যায় করে আর তার বোঝা ভারি করতে চায় না। তাতে কারোরই মঙ্গল নেই। না সুরুচির, না শেখরদার, না বিলাস চৌধুরীর, না তার খোকার!

গোপাল বললে—আমি তাঁকে ওপরের বৈঠকখানায় বসতে বলে এসেছি—

সেদিনকার কথা আজো মনে আছে সুরুচির। স্তব্ধ দুপুর। চারদিকের নির্জনতায় যেন কোনও প্রশান্তি ছিল। যেন এমনি অকাতর ঔদার্যের প্রয়োজন তার অপরিহার্য হয়েছিল, নইলে দেখা মাত্রই কেন মনে হয়েছিল এঁকেই সে এতদিন খুঁজেছে। তার ঠাকুরপুজো, তার ধর্ম-আলোচনা, তার মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প, সমস্ত বাসনা-কামনা—এই একটি লোকের অভাবে এতদিন যা সম্পূর্ণ হচ্ছিল না।

সেদিন প্রশান্ত হাসিতে গৌরদাসবাবু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন।

বলেছিলেন—সদানন্দর মৃত্যু হয়েছে বলে তুমি এত হতাশ হয়েছ কেন মা—

সুরুচি বলেছিল—বাবা যে আমার কতখানি ছিলেন তা আপনাকে আমি কেমন করে বোঝাবো কাকাবাবু—

গৌরদাস বলেছিলেন—আমাকে সে-কথা বোঝাতে হবে না মা, দু'জনে একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে জেল খেটেছি, তারপর সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল সে। সে তো আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ নয়,—আমার সঙ্গে তার যোগাযোগটা বরাবরই ছিল—আর এখন তার মৃত্যু হয়েছে বলেই কি যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে? তা-ও হয়নি, তুমি আমাকে আগে দেখনি বটে, আর আমিও

তোমাকে দেখিনি কিন্তু তোমাকে আমি চিনি মা—তুমি সদানন্দের মেয়ে আর আমারও মেয়ে—তোমরা যখন বিদেশে আমি তখন একরাত্রের জন্যে তোমাদের চেতলার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম—সে তুমি জানো না—

—আপনার কথা বাবা সব সময় বলতেন।

—আমাদের বন্ধুত্ব তুমি কল্পনাও করতে পারবে না মা, কয়েক বছর দেখা না হলে যে-বন্ধুত্ব ভেঙে যায় এ সে-বন্ধুত্ব নয়, সেই অধিকারেই আমি তার কাছে এসেছিলাম, তা শুনলাম তার মৃত্যু হয়েছে। তা হোক, তুমি তো আছো—তোমার কাছেই তাই হাত পাতছি, তুমি আমায় কিছু দাও—

সুরুচি বলেছিল—আমি কী দেব বলুন—কী আমি দিতে পারি— ?

—তুমি সব দিতে পারো আমাকে !

—এ সব যা দেখছেন এ তো আমার কিছু নয় কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু হাসলেন।

—তোমার নয় তোমার স্বামীর, এই বলতে চাও তো ? সে তো একই কথা ! তবে তোমায় আমি সব খুলে বলি, আমার নেবার ক্ষমতা অসীম, কিছুতেই আমার না বলা চলবে না, এখন শুধু তোমাদের দিতে পারলেই হলো, আমার অভাব যেমন, আমার এই ঝুলিটাও তেমনি, বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছি মা, এতদিন তো কেবল ভাঙার কাজই করেছি, এখন গড়ার কাজ করতে চাই, কিন্তু কাজে নেমে দেখছি, ভাঙা সহজ ছিল, গড়া শক্ত, —অনেক আমার ছেলেমেয়ে। তাদের সকলের থাকা-খাওয়া ভবিষ্যতের ভাবনা—সব মাথায় নিয়েছি শুধু তোমাদের মত কয়েকজনের ভরসায়—

সুরুচি জিগ্যেস করেছিল—আপনি এখন আবার সেই অতদূর ফিরে যাবেন—

গৌরদাস বললেন—দূরের জন্যে আমি ভাবিনে মা, সারা ভারতবর্ষ এককালে আমার ঘর ছিল। বলতে গেলে এখন তো তবু আমার একটা আস্তানা হয়েছে, আগে তাও ছিল না—সত্তর বিঘে জমি পেয়েছি একটানা, আরো পাবার ভরসা পেয়েছি—কিন্তু তাতেও কুলোবে বলে আশা হয় না, অভাবই বেশি যে, শুধু কি টাকা, জামা-কাপড়, বই-কাগজ, ডালা-কুলো যা দেবে তাই নেব—

কি জানি কি মনে হলো। সুরুচির।—বললে আমার হাতের এই চুড়ি দু'গাছা আপনাকে দিই—

গৌরদাসবাবুর একটু ভাবান্তর হলো যেন। কিন্তু তখনি সামলে নিলেন, —যেন কিছু বুঝতে পারলেন।

সুরুচি আবার বললে—আরো কিছু আপনাকে দিতে পারলেই খুশী হতাম কাকাবাবু—কিন্তু আজ এখন এই মুহূর্তে এর বেশি আর কিছু দিতে পারছি না—

গৌরদাসবাবু হাত পাতলেন। হেসে বললেন—আমি তো বলেছি—'না' বলবো না—আমার ছেলে-মেয়েরা সব না খেতে পেয়ে না পরতে পেয়ে পশুর মত জীবন যাপন করছে—তারাই আমাকে ভিখিরী করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে মা—

চুড়ি দু'গাছা ঝোলার মধ্যে পুরে গৌরদাসবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার ফিরলেন। বললেন—কিন্তু এ তোমার কেমন স্বভাব মা?

—কেন, কি হলো কাকাবাবু?

গৌরদাসবাবু বললেন—তুমি তো আমার বেশ মেয়ে—আমি একজন অচেনা মানুষ হাত পাতলুম আর তুমি দামী জিনিস দিয়ে দিলে—একবার জিগ্যেসও তো করলে না—কেন কিসের জন্যে এ-সব নিচ্ছি—

কথাটা বলে গৌরদাসবাবু হাসতে লাগলেন।

সুরুচি কিন্তু হাসতে পারলে না। বললে—আপনি জানেন না কাকাবাবু —ও দু'টো নিয়ে আমার কতখানি উপকার করলেন আপনি—

শুনে গৌরদাসবাবু যেন একটু অবাক হলেন। এমন কথা তো এতদিনের মধ্যে কোথাও তিনি এর আগে শোনেন নি। বললেন—তা তোমার এরকম উপকার করার লোকের কিন্তু অভাব হবে না সংসারে তাও তোমায় বলে রাখছি—কিন্তু কেন বলো তো? দান করার কিসের তোমার এত দায়?

—দান করার দায় নয়—আপনাকে দান করার দায়?

গৌরদাসবাবু বললেন - আমি যদি আজ এই সময়ে না আসতুম—

সুরুচি বললে—আমি আপনার মতই কাউকে খুঁজছিলাম কাকাবাবু—যাঁকে কিছু দিয়ে কৃতার্থ হবো, যাকে দিয়ে অনন্ত পরিত্রাণ পাবো—

—পরিত্রাণ?

—হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনি যদি না আসতেন তো আমি যে কি করতাম বলা যায় না—হয়তো কোথাও মন্দির করে দিতাম একটা - জলসত্র করতাম—ধর্মশালা, নয় তো···

গৌরদাসবাবু এবার বসে পড়লেন আবার। বললেন—এতদিন সংসারে নেবার দায়টাই বড় বলে জানতাম—দেবার দায়ও যে এত ভারি হয় তা তুমিই আজ শেখালে—তুমি সদানন্দেরই উপযুক্ত মেয়ে মা—

সুরুচি বললে—এ বাড়ির যিনি মালিক তাঁর অনেক টাকা—জানেন তো—

—তিনি তো তোমার···?

—হ্যাঁ তিনি আমার স্বামী, টাকার আমার অভাব নেই—দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে এ-টাকা কেবল বেড়েই চলেছে—স্বামীর টাকায় যদি স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার থাকে তো এ-সম্পত্তির মালিক আমিই বলতে পারেন—আমার বাবা দিন-রাত পরিশ্রম করে রাত জেগে নোট লিখে ছাত্র পড়িয়ে এর শতাংশের এক কণাও উপার্জন করতে পারেন নি—আমার মা'র অসুখ সারাবার পয়সা যোগাড় করতে পারেন নি—এত সম্পত্তির মালিক হয়েও সে-কথা আমি ভুলতে পারি না আজো।

গৌরদাসবাবু বললেন—কিন্তু এইভাবে দান করেই কি সে ক্ষোভ মেটাতে পারবে? সেই ক্ষোভের বশেই কি আজ আমাকে এই জিনিস দিলে?

সুরুচি বললে—তা নয় ঠিক—আমি পরিত্রাণ পাবো বলেই দিলাম—আর কথা দিচ্ছি, আরো দেব—

—কীসের পরিত্রাণ মা? কী তুমি করেছ?

—আমার যে অনেক অন্যায়···অনেক পাপ···

—পাপ?

সুরুচি হঠাৎ থেমে গেল। বললে—এই দেখুন, এই দুপুরবেলা আপনি এসেছেন, একটু জল পর্যন্ত আপনাকে খেতে দিইনি—বসুন—

গোপালকে ডেকে একটা রেকাবিতে মিষ্টি আর পাথরের গেলাসে জল এনে দিলে সুরুচি। বললে—কতদূর থেকে এসেছেন আপনি···অথচ আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম—

গৌরদাসবাবু হাসলেন। বললেন—ও আমি খাবো না এখন—তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও মা—

—একটা অন্তত মিষ্টি—

—আধখানাও নয়···তুমি আমাকে চেন না মা, তাই বললে—তোমার বাবা জানতো আমি দিনে শুধু একবারই খাই—সে ওই শুধু সকালে—যৌবনে ব্রত নিয়ে ছিলাম—এখন আরো বেশি করে ওটা পালন করি—আর ছেলে মেয়েদেরই ভালো করে খাওয়াতে পারি না—। তারা খেতে চায় খেতে দিতে পারি না—কাজ চায়, কাজও দিতে পারি না—তোমার যেমন প্রতি মুহূর্তে টাকা বেড়েই চলেছে—আমার দেশের ছেলেমেয়েদের অভাবও তেমনি বেড়েই চলেছে—

এতক্ষণে স্বরুচির চোখে যেন সামান্য কৌতূহল ফুটে উঠলো।

গৌরদাসবাবু লক্ষ্য করলেন সেটা। বললেন—তুমি জিগ্যেস না করলেও আমারই বলা উচিত—এরা সব তোমারই ভাই বোন মা—বাস্তু হারিয়ে নানাভাবে উচ্ছন্ন হয়ে যারা অনাথ হয়ে গেছে অসহায় হয়ে গেছে—তাদের কথাই বলছি—ওদের কেউ নেই—তেমনি হাজার-হাজার অনাথ লোকের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই শুধু আশ্রয় দিতে পেরেছি—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, আয়ু চাই,—সব চাই—তাই তো বলছিলাম আগে ভাঙার কাজ করেছি, এখন শুধু গড়ার কাজ—ওদের জীবন বলি দিয়েই তো আমরা স্বাধীন হয়েছি আজ—তবু যতটুকু শান্তি দিতে পারি ওদের—যে-কজনকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি চেষ্টা করে দেখি—

স্বরুচি বললে—এমন কত লোককে আশ্রয় দিয়েছেন?

—তা হাজারেরও ওপর—আরো কতজনকে যে আশ্রয় দিতে পারিনি—

স্বরুচি বললে—আপনি একলা কত পারবেন?

গৌরদাসবাবু বললেন—একলা কোথায় মা? একলা কি এত করা সম্ভব? কয়েকটা ছেলে আমার দলে তো ছিলই তারা আছে আর থাকবেও, যারা জেলে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে, তারা ছাড়া পেয়ে আবার এসে জুটেছে—আর এখন থেকে তুমিও একজন হলে—

স্বরুচি চুপ করে রইল।

গৌরদাসবাবু বললেন—একদিন তাদের দেখতে যাবে মা? তুমি গেলে সবাই খুশী হবে খুব—

স্বরুচি বললে—আমাকে নিয়ে যাবেন?

মনে আছে যাবার সময় গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—দুটো টিউব ওয়েল্ আর কয়েকটা সেলাই-এর কল আমার বড় জরুরি দরকার হয়ে পড়েছে মা—সেটার ভার তোমার উপরেই দিয়ে গেলাম—যেদিন আসবো সেদিন আমায় নিরাশ করো না তুমি,—আর যদি মণিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দাও—কিম্বা চেক্ দাও তো ঠিকানাটাও রেখে দিয়ে গেলাম—তা হলে আমাকে আর আসতে হয় না—

বাবা বলতো—গৌরদাসকেই তুই দেখলিনে তো আর মানুষ দেখলি কই—চারদিকের এই আধা কি সিকি মানুষের মধ্যে গৌরদাসই কেবল একটা আস্ত গোটা মানুষ—

সুরুচি জিগ্যেস করতো—গৌরদাসবাবু একদিন আসেন না কেন বাবা?

বাবা বলতেন—দেখবি তাকে? এই দেখ্ না, একদিন হয়ত হট্ করে হঠাৎ এসে পড়বে—বলা নেই কওয়া নেই—এমনিই ও—

সুরুচি জিগ্যেস করতো—আচ্ছা বাবা, দেশ স্বাধীন হলে, তুমি, গৌরদাস-বাবু সবাই যে এত জেল খেটেছ, তোমাদের কী হবে? ভালো চাকরি পাবে তো?

সদানন্দবাবু বলতেন—দূর, তা কি বলা যায়, যারা এখন দেশ চালাচ্ছে তারাই থাকবে—তারা আরো বড় বড় চাকরি পাবে—

—এই যে সব পুলিশ গোরা সৈন্য—এখন যারা অত্যাচার করছে, এদের কী হবে?

—এরাও থাকবে! রাজাই শুধু বদলাবে—ওরা ঠিকই থাকবে, হয়ত আরো মাইনে বাড়বে ওদের—

—আর গৌরদাসবাবুর দল?

—গৌরদাসের দল? এখনও যা করছে তখনও ওরা তাই করবে। ওরাই কাজ করবে। ওরা কি আর ভালো চাকরি পাবে বলে দেশের জন্যে খাটছে—ওদের কাজ করা যে স্বভাব রে—ওরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়—ইতিহাসের যে রথ চলে ওরাই হলো তার চাকা—

বাবার কথাগুলো মনে পড়তেই কেমন কাতর হয়ে ওঠে সুরুচি। সদানন্দ-বাবু শুধু তার মুখ চেয়েই, সংসারের মুখ চেয়েই আর ওপথে যাননি। সুরুচির ভাবনায় শেষ জীবনটা এক-দণ্ডের শান্তি পাননি! সাংসারিক তুচ্ছতার

তাগিদে তাঁর আদর্শকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। তবু গৌরদাস যে সেই আদর্শের জন্যে আজীবন অক্লান্ত কাজ করে চলেছে তার জন্যে তাঁর গর্বের সীমা ছিল না। তাই বার বার কারণে-অকারণে গৌরদাসের নাম করতেন। গৌরদাসের নাম করে কেউ এলে তাকে তাঁর অদেয় কিছুই ছিল না।

রাহুলও সেদিন অবাক হয়ে গেল। বললে—তোমার গলার হার কোথায় গেল দিদি?

গোপালও সেদিন জিগ্যেস করলে—তুমি কি মা মাটিতে শোও আজকাল?

ভালো করে তেলও মাখা হয় না মাথায়। চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে থাকে সব সময়। ভালো ভালো শাড়িগুলো আলমারিতে বন্ধ থাকে। সেগুলো পরবার দরকার হয় না আর।

বিলাস চৌধুরী একদিন দেখে বললেন—এত ত্যাগ ভালো নয়—বিশেষ করে এ-বয়সে—

সুরুচি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে—কিন্তু তোমার জন্যেই আমার ভাবনা, জানো—

—আমার জন্যে? বিলাস চৌধুরী হাসলেন।

সুরুচি বললে—হেসো না—তোমার চেহারা কী হয়েছে তুমি জানো না।

সত্যিই বিলাস চৌধুরীর চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। অথচ খারাপ না-হওয়াটাই আশ্চর্যের। কিন্তু সুরুচি তার জন্যে কী করতে পারে। এক-এক সময় মনে হয় সমস্ত ভুলে যাবে সে। সব ভুলে যাবে। খোকাকে ভুলে যাবে—শেখরকে ভুলে যাবে। মন-প্রাণ দিয়ে এ-বাড়ির গৃহিণী হবে। বিলাস চৌধুরীর স্ত্রী হবে। প্রাণ দিয়ে সেবা করবে তাঁর। বিলাস চৌধুরীর সন্তানের মা হবে। ঠাকুর-দেবতা, ব্রতকথা, রামায়ণ, মহাভারত, সমস্ত ভুলে গিয়ে একান্ত মনে এই সংসারকে আপন করে নেবে। কিন্তু একটু পরেই মনে হয়—কে বিলাস চৌধুরী! তার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক! শেখরই তো তার সর্বস্ব! শেখরকে বাদ দিয়ে, খোকার সত্য পরিচয় গোপন করে সে আর কতদিন এমনি করে নিজেকে প্রবঞ্চিত করতে দেবে।

সেদিন গৌরদাসবাবুর চিঠি এল।

তিনি লিখেছেন—মা তোমার পাঠানো সোনার হার, সোনার বালা আর

চুড়ি পেলাম—অনেক উপকার হলো—আমাদের আশ্রমে আরো চারটি বাচ্চা হয়েছে—দায় ক্রমেই বাড়তে চলেছে—তোমার কাছে তাই আমার চাওয়ার শেষ নেই জেনো !···

শেষে লিখেছেন—স্বর্গের জন্যে তুমি অনেক কিছু করছো জানি—ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছ, মন্দির করে দিচ্ছ, রামায়ণ, ব্রতকথা শুনছো—কী করলে স্বর্গলোকের অধিকারী হবে তাই কেবল ভাবছো—কিন্তু মা, স্বর্গ কোথাও নেই,—এই সংসারই স্বর্গ। এই সংসারকেই স্বর্গে পরিণত করতে হবে—সারা দেশময় তোমার সন্তান, সারা দেশজুড়ে তোমার সংসার ! তোমার ভক্তি আর তোমার আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় তোমার সংসার এখনও অপূর্ণ রয়েছে—তুমি না যোগ দিলে এই সংসার-উৎসব যে সম্পূর্ণ হবে না মা—স্বর্গ রচনা যে মিথ্যে হয়ে যাবে। তাই বলি জীবনকে সেই অমৃতরসে পূর্ণ করে যেদিন পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করতে পারবে সেইদিনই তুমি ধন্য হবে! তোমার অর্ধেক সংসার এখানে পড়ে রয়েছে—তোমার অভাবে এ-সংসারের উৎসব সম্পূর্ণ হচ্ছে না, যেদিন তুমি ইচ্ছে করবে সেদিনই তোমায় গিয়ে নিয়ে আসবো আমি—এখানে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, উপবাস আছে, শ্রান্তি-ক্লান্তিও আছে স্বীকার করি—কিন্তু এও জানি যে এই জীবনেই তো উৎসব শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও তো নয় আয়োজনের শেষ—বার বার এমনি করে পরিক্রমা করে তবেই তো একদিন চরম পরিত্রাণ মিলবে—বার বার এমনি ব্যর্থ হয়ে তবেই তো একদিন সার্থক হবে তীর্থযাত্রা।

বার বার চিঠিটা পড়লে সুরুচি। তবে কি এ-জীবনই সব নয়। এই জীবনের পাপপুণ্য চাওয়া-পাওয়ার জের এর পরেও চলবে। সাধনা এখানেই শেষ নয়, সিদ্ধিরও শেষ নয় এখানে। এ-জীবনের সমস্ত ভুলের শোধবোধ এর পরেও হিসেব-নিকেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তোমার জন্যে দুঃখ পেলাম, তোমার জন্যে অত্যাচার সইলাম—এ-কথা জানাবার সুখ আর সুযোগ এর পরেও কি মিলবে! আবার আর এক কক্ষে আর এক উপগ্রহে দেখা হবে তোমার সঙ্গে! সেদিন তবে কৃতাঞ্জলি হয়ে বলতে পারবে—তুমি আমায় ভুল বুঝো না, তুমি আমায় ত্যাগ করো না, আমার সমস্ত অপরাধ আমি স্বীকার করছি কিন্তু এ-অপরাধের সবটুকু দায়িত্ব আমার নয়! আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিত্ত, এমন কি সমস্ত দেহ—এ তোমারই! আমি তোমার

জন্যেই এখনও প্রতীক্ষা করে আছি—তোমার প্রতীক্ষাতেই আমার উৎসব এখনও আরম্ভ হতে পারেনি। আমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের লোহা, কপালের টিপ এ তো শুধু ছদ্মবেশ! তুমি আমাকে দেখনি, আমার ছদ্মবেশই শুধু দেখেছ! আবার তুমি ডাকবে, আবার আমি তোমার কাছে যাবো। তোমার আসন তাই আজো শূন্য রয়েছে—তুমি এলে তবে তো তা পূর্ণ হবে। এত কথা বলবার সময় তা হলে আজো শেষ হয়ে যায়নি। আরো অবসর মিলবে! দুঃখ পাবার অবসান হবে!

গোপাল হঠাৎ বললে—দিদিমণি, বাবু কেমন করছেন আবার।

বাবু! বাবু কখন এলেন।

গোপাল বললে—সেই সেদিনকার মত আবার বুকে চাপ ধরেছে।

দৌড়ে এ-মহল পেরিয়ে ও-মহলে গেল সুরুচি।

বিলাস চৌধুরী তখন যেন একটু সামলে নিয়েছেন। সুরুচিকে দেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। মুখে হাসি আনবার ক্ষীণ চেষ্টা করলেন।

সুরুচি বললে—তুমি শুয়ে থাকো—আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দিই—

তারপর বললে—কাল থেকে আর অফিস যেয়ো না তুমি—

গোপাল বললে—আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি গে মা—

অনেক রাত্রে একটু যেন ঘুমের মত ঘোর এল। এতক্ষণ কষ্টের একটু লাঘব হলো। ওষুধে কাজ হয়েছে মনে হলো। কিন্তু পাশ থেকে উঠে যেতে সাহস হলো না সুরুচির। সারা রাত বুকের ওপর হাত বুলোতে লাগলো সুরুচি। সুরুচিকে ছাড়তে চাইলেন না বিলাস চৌধুরী। জোর করে বসিয়ে রাখলেন কাছে। কথা বলছেন না কিন্তু হাতটা একটু সরে আসলেই নিজের হাত দিয়ে সুরুচিকে চেপে ধরছেন।

গোপাল বললে—মা তুমি খাবে না আজ?

একটু উঠতে গেলেই বিলাস চৌধুরী টের পেয়ে হাত চেপে ধরছেন আবার।

সুরুচি বললে—আমি আছি—আমি এখানেই থাকবো, তোমার কোনও ভয় নেই।

ক্রমে রাত অনেক হলো। রাস্তায় বাস ট্রাম চলাচলের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ

হয়ে এল। নিস্তব্ধ অন্ধকারে দু'একটা অসম্বৃত চীৎকার শুধু মাঝে মাঝে চিন্তার তরঙ্গকে বিদীর্ণ করে দেয়। যে ঈশ্বরকে একদিন প্রাণপণে নিজের সুখশান্তির জন্য আহ্বান করেছে সুরুচি, আজ সেই ঈশ্বরকেই আবার আহ্বান করতে লাগলো। এবার আর নিজের প্রয়োজনে নয়, বিলাস চৌধুরীর প্রয়োজনে। এতদিন বিলাস চৌধুরীর দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি সুরুচি ভালো করে। নিজের দিকেও মনোযোগ দেয়নি ভালো করে। সত্যি, কী স্বাস্থ্য হয়েছে বিলাস চৌধুরীর, বুকের পাঁজরগুলো এত তীক্ষ্ণ! বড় দুঃখ হলো মানুষটার জন্যে! একদিন—এক মুহূর্তের শান্তি সে দিতে পারেনি এঁকে! প্রতি দিনের অবহেলায়, প্রতি মুহূর্তের প্রবঞ্চনায়—সমস্ত জীবন তার পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। এতটুকু পরমায়ু যেন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। স্ত্রীর কর্তব্য সে করেনি, পৃথিবীর দায়িত্ব সে পালন করেনি, একমাত্র তার জন্যেই এ-সংসার আজ হতশ্রী!

আবার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল সুরুচির। কেউ নেই তার কোথাও! এতটুকু শান্তি তাকে দিতে পারেনি কেউ। না শেখর—না বিলাস চৌধুরী। তবে কিসের জন্যে জীবন! কে সব চেয়ে সত্য! শেখর না বিলাস চৌধুরী! কার স্ত্রী সে! শেখরের না বিলাস চৌধুরীর। কার মা সে! খোকার না গৌরদাসবাবুর? সমস্ত সংসারময় যদি তার সন্তান—তবে তার কেন এই দৈন্য? কেন এই অতুল ঐশ্বর্য থেকেও এত নিঃস্ব সে!

ভোলবেলা বিলাস চৌধুরী চোখ খুললেন। কৃতজ্ঞতায় চোখ ছল্ ছল্ করে উঠল দু'চোখ।

বললেন—সারা রাত কি তুমি ঘুমোও নি?

সুরুচি বললে—একটু ওষুধ খেয়ে নাও—

—এখন ক'টা বেজেছে? আমি অফিস যাবো—আজ অনেক পেমেণ্ট্ আছে।

আবার পরদিন ডাক্তার এলেন।

বললেন—আবার কি অফিসে গেছেন?

সুরুচি পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল। গোপাল বললে—কারো কথা শুনলেন না বাবু, জোর করে চলে গেলেন অফিসে—যাবার সময় ডাক্তারবাবু বললেন—বড় ভুল করলেন মা, অফিস গেলে অফিস আবার হবে, কিন্তু মানুষ গেলে…

গৌরদাসবাবুর আবার একখানা চিঠি এল।

লিখেছেন—তোমার পাঠানো টাকা পেলাম মা, অনেক উপকার হলো, তোমার স্বামীর অসুখের খবরও শুনলাম, শুনে বড় চিন্তিত আছি—তোমার জীবনে তুমি তোমার স্বামীর অস্তিত্বকে এত নিবিড় করে নিতে পেরেছ জেনে খুসী হয়েছি। তোমার স্বামীর জীবন শুধু তোমার পক্ষেই অপরিহার্য নয়—আমাদের মত এই ভিক্ষুকের পক্ষে আরো অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে তোমার স্বামীই তোমার পরমগতি, তোমার স্বামীই তোমার পরমপতি, তোমার স্বামীর মধ্যে দিয়েই তোমার পরম শ্রেয় আর পরম প্রেয়কে পেতে হবে। তোমার স্বামীকে বাদ দিয়ে তোমার সিদ্ধি নেই। আত্মরূপদর্শন না হলে যেমন বিশ্ব-রূপ দর্শন হয় না তেমনি স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীলাভ না হলে পরমস্বামীলাভও হয় না। জোনাকীপোকা নিজের পুচ্ছের আলোকসীমার বাইরে কিছু দেখতে চায় না তাই দেখতে পায়ও না, কিন্তু তুমি মহাসৌভাগ্যবলে মানুষ হয়ে জন্মেছ, চারিদিকের দুঃখবেদনা শোক অশান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে একমাত্র মানুষই তাই বলতে পারে বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। অন্ধকারের ওপার থেকে যিনি জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ হচ্ছেন আমি তাঁকেই দেখতে পেয়েছি···স্বামীকে সুস্থ করে তোল—তুমি সতীলক্ষ্মী, আমি আশীর্বাদ করছি মা—তুমিই পারবে—

দুদিন পরে নিজেই এসে পড়লেন গৌরদাসবাবু।

বললেন—সদানন্দর একটা দোষ ছিল, মাথা গরম হয়ে যেত অল্পে—কিন্তু অমন মানুষ আর হয় না—নিজে কিছু করতে পারেনি সে বটে কিন্তু তোমাকে দেখছি তৈরি করে গেছে নিজের মনের মত করে—

সুরুচি বললে—আপনি আমাকে অমন করে বলবেন না কাকাবাবু, ওতে আমার অপরাধ বাড়ে—

গৌরদাসবাবু বললেন—আমি লোক চিনতে পারিনে—একথা আমি বিশ্বাস করবো না মা—অপরাধের বিচার করবার মালিক কি আমি না তুমি—না অন্য কোনও মানুষ! না মা, তুমি নিজেকে অত ছোট করো না—নিজেকে এত ছোট করে দেখতে দেখতে একদিন সংসারে আর সকলকেই ছোট করে দেখতে শিখবে···ওতে আত্মার অপমান হয় যে—

সুরুচি ভেঙে পড়লো যেন! বললে—নিজেকে নিয়ে আমি আর যে পারছি না কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—ছি মা, এ-ও তোমার একরকম আত্মসেবা—নিজের সেবা সেটা তো লজ্জার, আর স্বামীর সেবা সেটা যে গৌরবের—নিজের সুখের দিকে যখন আমি নেমে পড়ি তখনই যে আমি ছোট হই মা, কিন্তু মানুষ তো ছোট নয়—মানুষ যে বৃহতের যোগেই বড়ো—সেই বৃহৎকে সেবা করো—সেই তোমার স্বামীকে সেবা করো, তবেই স্বামীর মধ্যে দিয়ে সেই বিশ্বভুবনের যিনি স্বামী তাঁকেই পাবে—

সুরুচি খানিক চুপ করে থেকে বললে—আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্যে আজ কিছু টাকা নিয়ে যান আপনি—

—দেবে তুমি ?

হাসলেন গৌরদাসবাবু।

—আমি না বলবো না—ভিক্ষের ঝুলি আমার সর্বদাই খোলা রয়েছে—কিন্তু না, আজকে আমি সে জন্যে আসিনি, ভাবলাম চৌধুরীসাহেবের অসুখ—একবার দেখে যাই তাঁকে,—এখন কেমন আছেন তিনি !

খোকা ঘুম থেকে উঠে সুরুচিকে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ ঘরে এল।

সুরুচি বললে—রাহুল প্রণাম করো এঁকে—কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—এইটিই বুঝি তোমার ভাই, বেশ—সদানন্দ বুঝি রাহুল নাম রেখেছে, তা বাবাকে বোধহয় এর মনেই পড়ে না—যখন তুমি হলে মা তখন সদানন্দ চিঠি লিখেছিল দুঃখ করে—আমি লিখেছিলাম মেয়েকেই ছেলের মত করে লেখাপড়া শেখাও, মানুষ হওয়াই বড় কথা, ছেলে অমানুষ হলে সে ছেলে হওয়াও যা না-হওয়াও তাই—তুমি একে মনের মত করে মানুষ করে তোল মা, দেখেই বুঝতে পারছি এ-ও তোমার মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে—

খোকাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুরুচি বললে—একে নিয়েই আমার যত সমস্যা কাকাবাবু—

খোকা হঠাৎ বলে উঠলো—আমি অ আ ক খ লিখতে পারি—

—পারো ? বাঃ, তবে আর সমস্যা কীসের মা, ও তো অ আ ক খ লিখতে পারে—

সুরুচি বললে—আপনি জানেন না কাকাবাবু, ও-ই আমার জীবনে একটা বোঝা হয়ে আছে—

গৌরদাসবাবু বললেন—সে কি মা, আমার ওখানে যদি যাও দেখবে এমনি দুশো অনাথ ছেলে, কারোর বা বাপ নেই, আবার কারোর বা কেউ-ই নেই, আমি একাই সকলের বাপ-মা, ওদের কথা ভাবো তো, তারাও তো মানুষ হচ্ছে—এই তোমাদের মত কয়েকজনের সাহায্যেই তো বেঁচে আছে—

সুরুচি বললে—ও তাদের চেয়েও হতভাগা কাকাবাবু—বিশ্বাস করুন—

গৌরদাসবাবু হাসলেন।

—তুমিও যদি ওই কথা বলো মা—তাহলে তারা কোথায় যায়! খাওয়া-পরার অভাব নেই তোমার—এমন ঐশ্বর্যের মধ্যেও যদি তোমার এত সমস্যা তা হলে…

কথা শেষ না করেই গৌরদাসবাবু হো হো করে হাসতে গিয়ে থেমে গেলেন হঠাৎ। সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে তিনি আর হাসতে পারলেন না যেন।

সুরুচি হঠাৎ বললে—ওই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু কাকাবাবু—সত্যিই আমার শত্রু ও—

বলতে বলতে হঠাৎ রাহুলকে রেখেই এক নিমেষে বাইরে বেরিয়ে গেল সুরুচি। কিন্তু তখনি ফিরে এসেছে হাসি মুখে। বললে—আমাকে যে একদিন আপনার আশ্রমে দেখতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—গেলেন না—

রাহুল হঠাৎ বললে—আমার তিনটে লাল মটর আছে—

সুরুচি বললে—তুমি এখন ওপরে যাও খোকা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলি—

গৌরদাসবাবু বললেন—থাক্ না মা, ও তো কোনো দুষ্টুমি করছে না—

সুরুচি বললে—দুষ্টু কি না আপনার কাছে ওকে রেখে দেখুন না—রাখবেন আপনার কাছে?

গৌরদাসবাবু বললেন—মুখেই বলছো মা তুমি—তাই কি তুমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে—ও তো তোমার ছেলের মতনই হয়ে গেছে এখন—পেটের ছেলের চেয়েও বেশি—ও-ই কি আর এখন তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

সুরুচি বললে—আর আমি যদি ওকে নিয়ে আপনার আশ্রমে থাকি? থাকতে দেবেন?

—সে কি মা, তোমার স্বামী, সংসার, চৌধুরী সাহেব···

—তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই, চাকর-ঠাকুর-ঝি কিছুর অভাব নেই এ-বাড়িতে, আমি চলে গেলেও কিছু আটকাবে না এখানে—

গৌরদাসবাবু উত্তরে সেদিন বলেছিলেন—তুমি হয়ত এ-সব কথা লঘু-ভাবেই বলছো মা, কিন্তু এ-সংসারেই তোমাকে থাকতে হবে যে, এই-ই যে বিধান, সংসারের সব কিছু মালিন্য, সব কিছু অশুচি—এই সব নিয়েই তোমাকে বাঁচতে হবে যে—এর মধ্যে থেকেই যে এর উর্ধ্বে উঠতে হবে—কখনও ভুলেও ও-চিন্তা মনে ঠাঁই দিও না মা—মনে ভাববে তোমার জন্যেই এই সংসার আর এই সংসারের জন্যেই তুমি—

সুরুচি বললে—তবে কি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই এই শাস্তি কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—তা ঠিক নয়—বরং মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই এই গৌরব—মেয়ে মানুষ হয়ে না জন্মালে কি জানতে পারতে মা যে বন্ধনের মধ্যে এত আনন্দ—সদানন্দ এ-কথা জানতো বলেই তো ছেলের নাম রেখেছিল রাহুল, রাহুল মানেই তো বন্ধন—সংসারের এই মহৎ ভয়কে এই উদ্যত বজ্রকে জানতে পেরেছ বলেই তো মৃত্যু ভয় তোমাদের কম—পুরুষ বলে কর্ম পদার্থটা স্থূল ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন—কিন্তু মানুষের মধ্যে যে নারী আছে সে বলে কাজ চাই আরো কাজ চাই—কারণ কাজের মধ্যেই আত্মার মুক্তি—বৈরাগ্যও মুক্তি নয়, অন্ধকারও মুক্তি নয়, আলস্যও মুক্তি নয়। ওরা ওরা হলো ভয়ংকর বন্ধন—ওই বন্ধন কাটবার একমাত্র অস্ত্র হলো কর্ম—এই কর্মই আত্মাকে মুক্তি দেয়—আর সংসারই সেই কর্মস্থল—সংসার ছাড়লে তোমার চলবে কেন মা—মুক্তি যদি চাও তো এ-সংসারেই তোমায় থাকতে হবে—

সুরুচি বলেছিল—কিন্তু মুক্তিও আমি চাই না কাকাবাবু—

—মুক্তি চাও না?

—না, আমি চাই, শান্তি—

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—কিন্তু আরামের মধ্যে তো শান্তি নেই মা—দুঃখ বাদ দিয়ে তুমি যদি শুধু সুখকে চাও তা হলে তো সেই পরম পূর্ণকে পাওয়া হলো মা, যিনি সুখকর, তিনিই যে আবার দুঃখকর, তাই তো আরামের

মধ্যে কল্যাণ নেই, তাই সেই তথাকথিত শান্তির মধ্যেও সত্যিকারের শান্তি নেই।

রাত্তির বেলা গোপাল এসে বললে—দিদিমণি—বাবু আজকেও খেলেন না—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—হ্যাঁরে বাবু কি এখন ঘরে একলা আছেন?

—না, এ্যাটর্নীবাবু রয়েছেন, উকীলবাবুও রয়েছেন—

সুরুচি বললে—ওঁরা তো কালকেও এসেছিলেন—

গোপাল বললে—বাবু যে ওদের টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন—কাল রাত বারোটা পর্যন্ত আমি জেগে বসে, গাড়ি বার করে ওদের আবার পাঠিয়ে দিলেন বাবু—অফিস থেকে টাইপিস্টবাবুও এসে ছিলেন, কাগজপত্তর ছাপা হলো—

বিলাস চৌধুরী কাজ শেষ হবার পর বললেন—এবার আমার বিছানা করে দে গোপাল—

গোপালও অবাক হয়ে গিয়েছিল—সে কি খাবেন না আজকে? আমি যে ঠাকুরকে উনুনে আঁচ রাখতে বলে দিয়েছি—খাবার গরম থাকবে—ঠাণ্ডা খেতে মানা করে গেছেন যে ডাক্তারবাবু—

বিলাস চৌধুরী শুধু বললেন—কথা বাড়াসনি—

—কিন্তু না-খেলে কি শরীর থাকবে আপনার? আর রোজ রোজ গেরস্তর খাবার নষ্ট হওয়া কি ভালো? ঠাকুরের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে কাল, আমি আর পারবো না এত—পরের বাড়ি খেটে খেতে এসেছি বলে আমায় সব লোকে কথা শোনাবে দু'বেলা—

বিলাস চৌধুরী বললেন—কে কথা শোনায় তোকে?

গোপাল বললে—কে কথা শোনায় না শুনি, আপনি কথা বললে মাথা পেতে নেব, আপনি হলেন আমার মনিব, কিন্তু ওরা বলবে কেন? ওই রামধনি বেয়ারা, লক্ষ্মীর মা, তারক ড্রাইভার···আমি কি ওদের চাকর?

বিলাস চৌধুরী বললেন—কী বলে ওরা?

—বাজার থেকে যে গাদা-গাদা আনাজ-তরকারি মাছ-মাংস আনি, কার জন্যে আনি? বাবুদের জন্যে তো, তা আপনি তো খান্-ই না, মা-ও মুখে দেন না, তা হলে খায় কে? আমি? ওই বলতে গেলেই যত দোষ—

বিলাস চৌধুরী খানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—এ সব কথা তোর মা'কে গিয়ে বলিস—

ঠাকুর বলে—মা-মণি, আমি আর কাজ করতে পারবো না এখানে?

সুরুচি বলে—কেন, কী হলো ঠাকুর?

ঠাকুর বলে—গোপাল আমাকে চোর বলে—

—কেন, চোর বলে কেন? তুমি কি চুরি করো?

—ওই দেখুন, ওই কথা বললেই দোষ, আজ পঁয়তিরিশ বছর বাবুর কাছে কাজ করছি, আমি বড়-মাকে দেখেছি, তাঁর আমলের লোক আমরা—আমাকে আপনি মাইনে পত্তর চুকিয়ে দিন মা—

সেদিন অনেক রাত্রে বিলাস চৌধুরীর ঘরে আলো দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল সুরুচি। এত রাতে জেগে কী করছেন। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। রাহুলও ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। জপ-তপ সেরে এবার শুতে যাচ্ছিল বিছানায়। হঠাৎ এই দৃশ্য নজরে পড়তেই বিলাস চৌধুরীর কথা নতুন করে যেন মনে পড়ে গেল সুরুচির।

আস্তে আস্তে টিপি টিপি পায় বিলাস চৌধুরীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুরুচি। দরজাটা ভেজানো রয়েছে। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

দরজাটা একটু ফাঁক করে ঠেলতেই বিলাস চৌধুরী বলে উঠলেন—কে?

এবার সুরুচি ভেতরে ঢুকল দরজা ঠেলে।

বিলাস চৌধুরী হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়ানো।—আর টেবিলের তলায় বসে গোপাল পা টিপে দিচ্ছে। কাগজপত্র-গুলো দু'হাতে গুছোবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বিলাস চৌধুরী বললেন—তুমি?

সুরুচি বললে—শুতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার ঘরে আলো দেখতে পেলাম—

বিলাস চৌধুরী বললেন—এই এখনি তো সব ওঁরা গেলেন—

—ওঁরা কারা?

—এই আমাদের এ্যাটর্নী আর প্লিডার—

—কিন্তু দিনের বেলা হয় না এসব কাজ!

বিলাস চৌধুরী বললেন—দিনে সময় হয় কই?

সুরুচি বললে—কাজ বুঝি খুব বেড়েছে আজকাল

বিলাস চৌধুরী বললেন—যত দিন যাচ্ছে—ততই বাড়ছে—আর তা ছাড়া আমি না দেখলে কে আর দেখবে বলো! একলা মানুষ—

—কিন্তু কী হবে এত কাজ বাড়িয়ে? কার জন্যে বাড়াচ্ছ?

বিলাস চৌধুরী কথাটা শুনে হাসলেন এবার। বড় ফ্যাকাসে হাসি। তারপর বললেন—একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো—

সুরুচি বললে—

কিন্তু বলবার আগেই থেমে গেল।

বিলাস চৌধুরী বললেন—গোপাল তুই যা, আর পা টিপতে হবে না—

গোপাল টুপ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনি ভেজিয়ে দিলে।

সুরুচি খাটের ওপর গিয়ে বসলো এবার।

বললে—ক'দিন থেকে শুনছি তুমি কিচ্ছু খাচ্ছো না—কী হলো তোমার? ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছ?

বিলাস চৌধুরী অন্য দিকে চোখ রেখেই বললেন—এ আর আমার সারবার নয় সুরুচি—

সুরুচি বললে—ভালো, নিজের ডাক্তারি নিজেই করছো তাহলে—

—না করে উপায় কী বলো?

—উপায় আছে বৈকি, কিন্তু তুমি কি তা শুনবে?

বিলাস চৌধুরী বললেন—আর হয় না সুরুচি, এখন আর সময় নেই—উপায় থাকলেও সে মন আর নেই, সে স্বাস্থ্য নেই—সে উৎসাহ নেই—বরং এই কাজই ভালো, কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে তলিয়ে যাই—অন্তত কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েও কিছুক্ষণের জন্যে সব ভুলে থাকি—

সুরুচি হঠাৎ বললে—না; এত কাজ তোমায় আমি করতে দেব না—

বলে কাগজপত্র সব গুছিয়ে তুলতে লাগলো। তারপর বিছানাটা ঠিক-ঠাক করে দিতে লাগলো।

বললে—কাজ—কাজ—কাজ—কাজের জালে জড়িয়ে কেবল নিজের সর্বনাশ ঘনিয়ে আনবে—

কিছু বললেন না বিলাস চৌধুরী কথাটা শুনে।

স্বরুচি বললে—দরকার নেই, দরকার নেই আমাদের টাকার, আগে তোমার স্বাস্থ্য তারপর সব—নাও বিছানা ঠিক করে দিয়েছি ঘুমোও—

বিলাস চৌধুরী চুপ করে শুয়ে রইলেন। স্বরুচি আস্তে আস্তে মশারি টাঙিয়ে চারিদিকে গুঁজে দিলে।

দিতে দিতে বললে—কাল থেকে অফিসে তোমায় আর যেতে হবে না—

বিলাস চৌধুরী বললেন—অফিসে না গেলে কাজ কী করে চলবে বলো? আর কে আছে আমার?

স্বরুচি মশারিটা চারিদিকে গুঁজে দিয়ে বললে—আমিই অফিসে যাবো—এককালে আমিই তো অফিস চালিয়েছি—আজও চালাতে পারবো—

তারপর একটু থেমে বললে—আর য়্যাটর্নী প্লিডারের সঙ্গে কথা-বার্তা কাজ-কর্ম যা কিছু সব আমি করবো এবার থেকে—

তারপর বললে—কাল শুধু তুমি একবার টেলিফোন করে দিও ভেঙ্কট-রমনকে আর রাজেনবাবুকে—

তারপর মশারির বাইরে থেকে স্বরুচি বিলাস চৌধুরীর মুখের কাছে মুখ এনে বললে—আলো নিভিয়ে দি?

বিলাস চৌধুরী এবারও কিছু বললেন না।

স্বরুচি বললে—আলোটা নিভিয়ে দিলাম—একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো—আমি চলি—

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে স্বরুচি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রথমটা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বরুচি নিজের ঘরে গিয়ে বসতেই রাজেনবাবু দৌড়ে এলেন। বৃদ্ধ মানুষ। কেরানী হয়ে একদিন ঢুকেছিলেন বিলাস চৌধুরীর অফিসে। তারপর ধাপে ধাপে উন্নতি করে উঠেছেন সকলের মাথায়। বললেন—কিছু অস্নবিধে হবে না মা, আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব—আপনি শুধু বলবেন কী করতে হবে—

তারপর জিগ্যেস করলেন—চৌধুরী সাহেব কেমন আছেন এখন?

অনেকেই এল দেখা করতে। অনেকেই চেনা মুখ। মাথা নিচু করে কেউ-কেউ প্রণাম করলে। কেউ মাটিতে মাথা ঠেকিয়েও নমস্কার করলে।

সুরুচিও একবার অফিসের ভেতরে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ করে বললে—আজকে চৌধুরী সাহেবের অসুস্থতার জন্যে আমি এই কাজের হাল ধরতে এসেছি। আপনারা তাঁর বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী, আপনাদের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আমি আশা করি আপনারা তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন—তারপর আবার যেদিন তিনি সুস্থ হয়ে এখানে ফিরে আসবেন, সেদিন আবার আপনারা আপনাদের পুরনো মনিবকে কাজে পাবেন, তাঁর উপদেশ পাবেন। আর যতদিন তা না হয় আমি আশা করি আমার সঙ্গেও আপনারা তেমনি ভাবেই সহযোগিতা করবেন···আজ। এটুকু ভরসা যদি দেন তো তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও খানিকটা শান্তি পাবেন, কিম্বা সুস্থ হয়ে উঠবেন—

রাজেনবাবু বললেন—সবাই আপনার খুব প্রশংসা করছিল আজ—

সুরুচি বললে—একদিন তো নিজেও আমি এখানকার কর্মচারী ছিলাম—সুতরাং সে-হিসেবে সকলেই আমার সমান—আমি কারো মালিক নই বলতে গেলে—

রাজেনবাবু বললেন—আর একটা কথা ছিল মা—

—বলুন।

একটু দ্বিধা করতে লাগলেন রাজেনবাবু। বললেন—প্রথম দিনেই কথাটা বলা ভালো হবে কিনা তাই ভাবছি—

সুরুচি বললে—বলুন না—

—বলছিলাম, আমাদের স্টাফের সম্বন্ধে -

সুরুচি বললে—আপনি যা ভালো বিবেচনা করবেন, আমাকে জানাবেন, কোম্পানীর অবস্থার কথা আগে বিচার করতে হবে, কোম্পানী বাঁচলে তবে আমরা সবাই বাঁচবো—সেই কথা মনে করে যা করা প্রয়োজন মনে করবেন, তাই করবেন,—আমার বা চৌধুরী সাহেবের তাতে কোনও আপত্তি নেই—

সমস্ত কাজ সেরে সন্ধ্যে বেলাই ফিরে আসতে হয় বাড়িতে। বাড়ির আকর্ষণও কি কিছু কম। রাহুল আছে, বিলাস চৌধুরী আছেন।

বাড়িতে এসে জিগ্যেস করে—কোনও দুষ্টুমি করোনি তো খোকা?

গোপাল বললে—খোকা খুব চুপ করে ছিল মা—আমি খাইয়ে দিয়েছি—জামা পরিয়ে দিয়েছি—

-বাবু কেমন আছেন রে?

গোপাল বললে—আজও এ্যাটর্নীবাবু আর উকীলবাবু এসেছেন—কথা বলছেন তাঁদের সঙ্গে—

তারপর বললে—একজন বুড়োপানা বাবু এসেছিল মা আপনাকে খুঁজতে—

—কে রে? কী রকম দেখতে?

গোপাল বললে—সেই যে আগে আসতেন—

—কে? গৌরদাসবাবু? কী বললেন?

গোপাল বললে—তিনি বললেন বাবু কোথায়?

বললাম—অসুখ হয়েছে—

তখন বললেন—এখন থাক, অসুখ সারলে একদিন দেখা করে যাবো—

সেদিন গৌরদাসবাবুর চিঠি এল।

লিখেছেন—বোধহয় খবর পেয়েছ মা যে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু শুনে খুব সুখী হলাম যে স্বামীর সমস্ত কর্তব্যের ভার শিরোধার্য করে নিয়েছ—নিজের কর্তব্য আর স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই মা, একদিন এই কর্তব্যটি বৃহত্তর সংসারের কর্তব্যে রূপান্তরিত হোক এই কামনা করি, তোমার স্বামীর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে চিনতে শেখো, তা হলেই সংসারের সমস্ত মানুষকে একদিন চিনতে পারবে—আত্মরূপ দর্শন করলে তবেই তো বিশ্বরূপ দর্শন হয়—

অফিসে বসে গৌরদাসবাবুর চিঠির উত্তর দিলে সুরুচি।

লিখলে—আপনি যা বলেছেন তাই ই বর্ণে বর্ণে পালন করবার চেষ্টা করছি কাকাবাবু, নিজেকে চিনতে পারবো কি না জানিনা, কিন্তু কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে খানিকটা যে শান্তি পাই তা ঠিক, কিন্তু এ যেন সেই খেলনা দিয়ে ছোট ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার মতন—মনে হয় নিজেকেও ঠকাচ্ছি, সংসারকেও ঠকাচ্ছি, সারা জীবন কেবল সকলকে বঞ্চনা করেই গেলাম, আমার এই অর্থ, এই রূপ-যৌবন, এই স্বামী, এই সমাজ—সবই কেবল প্রবঞ্চনা—

গৌরদাসবাবু কিছু দিন পরে লিখলেন—

—তোমার সমস্যা আমি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছি মা, কিন্তু এ-সম্বন্ধে সাক্ষাতে সব বলবো। ইতিমধ্যে আমি যেমন ভাবে বলেছি তেমনি

ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করো—। ধাপে ধাপে আদর্শে পৌঁছতে হয়। প্রথমে শ্রদ্ধা, আদর্শের ওপর শ্রদ্ধা চাই, সেই শ্রদ্ধা থেকেই জন্মাবে উৎসাহ, তারপর আসে স্মৃতি অর্থাৎ আত্মস্মরণ। এই কটা ধাপ রপ্ত করতে পারলে তখন আসবে ধ্যান-তন্ময়তা—। আর তার থেকেই আসে প্রজ্ঞা। আর প্রজ্ঞা যদি একবার স্থির হলো তো যোগ এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ মনের স্থিতিরূপ—তখন তার আর বিকার নেই—একেবারে শুদ্ধবুদ্ধি। শুদ্ধবুদ্ধি কি সাধারণ জিনিস! মনোবিকার অনুসারে বুদ্ধি বদলায়। দয়ার ছোপ লাগলে তাকে বলে দয়াবুদ্ধি, হিংসার ছোপ লাগলে তাকে বলে হিংসাবুদ্ধি, পাপের ছোপ লাগলে তাকে বলে পাপবুদ্ধি—এমনি নানা বুদ্ধি মানুষকে নানাদিকে টলাতে থাকে—কিন্তু একমাত্র অভ্রান্ত পথ দেখিয়ে দিতে পারে যা তাকেই বলে শুদ্ধবুদ্ধি। শুদ্ধবুদ্ধি একেবারে থারমোমিটারের মত। থারমোমিটারের নিজের জ্বর হয় না—তাই সে পরের শরীরের জ্বর মাপতে পারে—আমি যেদিন যাবো সব বুঝিয়ে আসবো মা তোমাকে—

অফিস থেকে বেরোবার সময় সুরুচি দেখলে রাজেনবাবুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। সুরুচি জিগ্যেস করলে—এখনও অফিসে আছেন?

রাজেনবাবুর সঙ্গে আরো কয়েকজন বসে কাজ করছিল।

রাজেনবাবু আর সবাই উঠে দাঁড়াল। রাজেনবাবু বললেন—ব্যালেন্স্ শীট্ তৈরি হচ্ছে—শেষ না হলে কি যেতে পারি মা—

—আমি কিন্তু চললুম—একটা কাজ আছে আমার—

রাজেনবাবু বললেন—না, আপনি আসুন—আর ঘণ্টাখানেক পরে আমরাও যাবো—

রাহুল ক'দিন থেকেই বড় বায়না ধরেছিল—গাড়িতে করে বেড়াতে যাবে সঙ্গে। দুপুরবেলা তাই গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়েছিল খোকাকে।

খোকা বললে—বেড়াতে যাবে না দিদি?

সুরুচি গাড়িতে উঠে বললে—তারক, সোদপুরে যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে?

খোকা জিগ্যেস করলে—সোদপুর কোথায় দিদি?

—চল্ না, সেখানে কেমন কাকাবাবু আছে—

—সেই বুড়ো কাকাবাবু? সেখানে যাবো না আমি—আমি গঙ্গার ধারে যাবো—

সুরুচি বললে—সেখানে আরো বড় গঙ্গা আছে, দেখবি চল্—

তারপর তারককে বললে—একটু তাড়াতাড়ি চালিয়ে চলো তারক, বেশি দেরি করতে পারবো না, বাবুর অসুখ জানো তো—

পাশে বসে রাহুলের প্রশ্নের যেন আর সীমা নেই। রাস্তার দুপাশে জল যাবার ঢালু জায়গা। তার পাশে পাশে দু'একটা দোকান। ছোট কুঁড়ে ঘর—একটু চায়ের সরঞ্জাম। মাচায় বসে কেউ চা খাচ্ছে গেলাস নিয়ে। তারপরেই হয়ত একটা বাস হুস্ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। আবার তার পরেই কয়েকটা গরু ঘাস খেতে খেতে একেবারে রাস্তার ধারে এসে পড়েছে। বোবা চোখে গাড়ির দিকে চেয়ে দেখে। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন বোবা। মাঠের ওপর দু'একটা যা বাড়ি উঠেছে তাতেও যেন বসবাসের চিহ্ন নেই। দূরে হয়ত কয়েকটা চালাঘরের সমষ্টি, চালের মাথায় শুকনো লাউডগা। নেড়া চালের ওপর চালকুমড়োর ছাইমাখানো বৈরাগ্য। নিতান্ত নীরস পটভূমিকায় সুরুচির গাড়িটা যেন প্রাণসঞ্চার করতে করতে ছুটে চলেছে। কোথাও বেগ না থাক, প্রাণ না থাক, সৌহার্দ্য না থাক, সুরুচি তো আছে। সুরুচি সকলের মধ্যে আয়ুর গতি দুর্বার করে দেবে। সুরুচি তার ঐশ্বর্য দিয়ে ধন্য করে তুলবে সকলকে।

গৌরদাসবাবু বলেছেন—মৃত্যু কি এক রকমের, আত্মার মৃত্যু সে-ও দেহের মৃত্যুর চেয়ে কম ক্ষতিকর নয় মা, সেও বিষের মত শরীরের কোষে কোষে প্রবেশ করে তিলে তিলে শরীরকে ক্ষয় করে—সেই মৃত্যুকেই তোমার রোধ করতে হবে। তাদের সান্ত্বনা দিতে হবে, শান্তি দিতে হবে, প্রেম দিতে হবে—তাতে লাভ শুধু তাদেরই নয়, আমাদেরও—

—আমাদেরও?

গৌরদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, লাভ তাদের চেয়ে আমাদেরই তো বেশি, যে পায় তার থেকে যে দেয় তার লাভই তো চিরকাল বেশি—তা জানো না—? যে পায়, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পাওয়া যে ফুরিয়ে যায় কিন্তু যে দেয় তার দান যে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে নানাভাবে, দিয়েই তো তার পাওয়া সম্পূর্ণ হয়।

স্থরুচি বলেছিল—দেবার ক্ষমতা যদি আমার অক্ষয় হতো কাকাবাব—

গৌরদাসবাবু বললেন—দেওয়ার ক্ষমতার শেষ আছে নাকি মা, যারা ভাবে আমার দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের দেওয়াই যে নিষ্ফল মা, নদী যে-জল সমুদ্রকে দেয় তাতে কি সে নিঃশেষ হয়? কারণ সমুদ্র তো সেই জলই ফিরিয়ে দেবে মেঘকে, মেঘ আবার তা ফিরিয়ে দেবে নদীকে—এমনি করে দেনা-পাওনার চক্র চলছে অনাদিকাল ধরে, যেদিন নদীর দেওয়া বন্ধ হবে, সেদিন আর সে পাবে না—সেদিন রথের চাকা আর চলবে না—কালের রথ তো একলা টানলে নড়ে না—সকলে মিলে তাকে টানতে হবে—তবে চলবে সে—

গৌরদাসবাবুকে প্রথমে দেখতে পায়নি স্থরুচি। একপাল ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘিরে কী যেন করছিলেন। একজন তাঁর কোলে বসেছে। একজন পিঠে, একজন মাথায়।

দেখেই গৌরদাসবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

—এসো মা, এসো মা—

তারপর সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—প্রণাম করো সবাই, প্রণাম করো—তোমাদের নতুন মা এসেছে—

একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল স্থরুচি। খোকাও কেমন বিব্রত হয়ে গেছে। গাড়িটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেইদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে।

গৌরদাসবাবু ছেলেদের বললেন—যাও, এবার তোমাদের মাদের ডেকে নিয়ে এস—বলো নতুন-মা এসেছে—

স্থরুচি বললে—কেন সবাইকে বিব্রত করছেন—

গৌরদাসবাবু—বিব্রত কিসের মা, তুমি কি কারো অচেনা? তোমার হাতের চুড়িতেই তো টিউবওয়েল হলো এখানকার—নতুন স্কুলবাড়িও তোমার টাকায় হয়েছে—সব তোমায় দেখাবো আজ—

স্থরুচি বললে—আজ কিন্তু অত সময় নেই আমার হাতে—ওঁর অসুখ দেখে এসেছি—

—অসুখ কি এখনো সারেনি?

স্থরুচি বললে—কাল রাত্রে খুব বেড়েছিল—

গৌরদাসবাবু—তা হলে তুমি কেন এলে মা? স্বামীর কর্তব্যই তো বড় কর্তব্য মা—

সুরুচি—সারা দিন অফিসে কাজ করে কেমন আপনাকে দেখতে ইচ্ছে হলো। ক'দিন থেকে কাজ করছি, ওঁর অসুখে পাশে গিয়ে বসছি, সবই করছি কিন্তু বার বার আপনার কথা মনে পড়ছিল—মনে হচ্ছিল আপনার কাছে এলে শান্তি পাবো—আমার সমস্ত পাপের বোঝা আপনার পায়ে নামিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হলেই পরিত্রাণ পাবো—

গৌরদাসবাবু বললেন—কাজকে তুমি পাপ মনে করো মা—কর্মই তো মুক্তি দেয়—যা মুক্তি দেয় তাই তো পুণ্য—

সুরুচি বললে—আমার পাপ-পুণ্যের সমস্ত ভার যদি আপনি নিতেন—

গৌরদাসবাবু বললেন—পাপ-পুণ্য কী তা আমি বুঝি না মা, আমি শুধু জানি কাজ, যা সৎ বলে বুঝেছি তা করে যাবো, কেউ আমার কাজের ভার মাথায় তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দেবে এমন কথা গুরুবাদের যুগে চলতে পারতো—এখন আর ও বুজরুকিতে লোককে ভোলানো যায়—তোমার পাপ যদি কিছু থাকে তো কর্মের মধ্যে দিয়েই ক্ষয় হবে, পুণ্যও যদি কিছু থাকে তা-ও কর্মের মধ্যে দিয়ে সঞ্চয় করতে হবে—

সুরুচি বললে—আর প্রায়শ্চিত্ত?

গৌরদাসবাবু বুঝতে পারলেন না। বললেন—কীসের প্রায়শ্চিত্ত মা?

সুরুচি বললে—পাপের—

গৌরদাসবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—ওই দেখ মা, তুমিও ঠিক আমার কথা বুঝতে পারোনি, আমার কাছে পাপও যা প্রায়শ্চিত্তও তাই। প্রায়শ্চিত্ত করলাম আর সব পাপ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল তাতে আমার বিশ্বাস নেই, আমি জানি কেবল কর্ম, কর্মই পুণ্য আবার কর্মই প্রায়শ্চিত্ত—। পাপ বলতে যদি কিছু থাকে তো সে হলো কর্মের বাধা। জীবনের চলার পথে বাধাটাই হলো পাপ, একমাত্র কর্মই কেবল সেই বাধাকে দূরে সরাতে পারে—তাই কর্মই প্রায়শ্চিত্ত—

সুরুচি বললে—আমার জীবনের পথে যে বাধা তাকে আর কোনও মতেই দূরে সরাতে পারছিনে—আমার জীবনকে ভেঙে একেবারে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে—

গৌরদাসবাবু বললেন—দেখ মা, কর্ম দু'রকমের, এক হলো অভাবের আর দুই হলো প্রাচুর্যের। যা অভাব তা হলো প্রয়োজন, আর যা প্রাচুর্য তা হলো আনন্দ। আমাদের দেশের জ্ঞানীসম্প্রদায় বলেছেন, কর্মই বন্ধন, কিন্তু আনন্দ থেকে যা করি তা তো বন্ধন নয়—আনন্দই তো মুক্তি, তাই তো ব্রহ্মবাদীরা বলেছেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দের জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—

সুরুচি বললে—আমি কিছুতে আনন্দ পাইনা কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—পাবে মা পাবে, পতিব্রতা হতে চেষ্টা করো পাবে, সংসারকর্মকে স্বামীর কর্ম জেনে আনন্দ বোধ করতে চেষ্টা করো, ক্রীতদাসীর মত মনে কোরনা নিজেকে, তবেই আনন্দ পাবে, আর যদি তা তোমার নিজের কাজ বলে মনে করো তো দশটা তুমিও সে-বোঝার ভার সইতে পারবে না—সংসারকর্মকেই নিজের কর্মযোগ মনে করো—

সুরুচি বললে—কিন্তু কাকাবাবু, চেষ্টা কি করিনা কাকাবাবু, চেষ্টা করি, কিন্তু বাধা এসে পাপ এসে সব গোলমাল করিয়ে দেয়—

গৌরদাসবাবু যেন বুঝতে পারলেন না। বললেন—পাপ? কিসের পাপ মা? কী পাপ?

পাশে রাহুল চুপ করে বসে ছিল। সুরুচি তাকে দেখিয়ে বললে—এই খোকাই আমার পাপ কাকাবাবু,—এই খোকাই আমার শত্রু—

গৌরদাসবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—খোকা!

সুরুচি কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে আবার ছেলে-মেয়ের দল এসে পড়েছে। পেছনে কয়েকজন মহিলা।

গৌরদাসবাবু ডাকলেন—এসো এসো নবীনের মা, এসো মা-লক্ষ্মীরা, দেখো তোমাদের মা জননী এসেছেন—প্রণাম করো এঁকে—

সবাই এল ঘরের ভেতর। দু'একজন কমবয়েসী মহিলা এসে নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। সুরুচি সরে দাঁড়িয়ে দুই হাতে বুকে তুলে নিয়ে বললে—না ভাই, প্রণাম করতে নেই—ছি—

মনে আছে সেদিন গৌরদাসবাবু খুব আপত্তি করেছিলেন—মা না প্রণাম করলে ক্ষতি কী! তোমার জন্যেই তো ওরা টিউবওয়েল পেয়েছে—কী

জলকষ্ট ছিল ওদের জানো না তো—কী বলো নবীনের মা—মনে আছে তো তোমাদের—

নবীনের মা এগিয়ে এসে বলেছিল—তোমার অক্ষয়স্বর্গ বাস হবে মা—সতী লক্ষ্মী মা-জননী তুমি আমাদের, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক মা, আগে ছেলে-মেয়েরা চোত-বোশেখ মাসে এক ফোঁটা জলের জন্যে হা-পিত্যেশ করেছে এখন তোমার কল্যেণে তারা জল খেয়ে বাঁচছে, তাই তো ঠাণ্ডা জল খাই আর কত আশীর্বাদ করি তোমায় মনে-মনে কী বলবো—বলি সোয়ামী-পুত নিয়ে ঘর করুক—

আর একজন মহিলা পাশ থেকে বললে—কত দিন থেকে দাদু বলছিলেন আপনি আসবেন,—আপনার কথা শুনে শুনে আপনার চেহারা আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে—

আর একজন মহিলা বললে—দাদু, আজকে নতুন-মাকে এখানে খেয়ে যেতে বলুন—

স্বরুচি বললে—না ভাই, আমাকে খেতে বোল না—আমার দেরি হয়ে যাবে—

নবীনের মা বললে—আমাদের শাক-ভাত তোমার রুচবে না মা, আমরা কী ভাবে আছি তাই একবার শুধু দেখে যেতে—

খোকা ততক্ষণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে খেলা করতে করতে চলে গেছে কোথায়। মেয়েরাও স্বরুচিকে ছাড়লে না।

তারা বললে—যখন কষ্ট করে এসেছেন—আরো একটু কষ্ট করুন—

গৌরদাসবাবু বললেন—দেখে এসো মা, দেখে এসো গিয়ে, দেশের আসল চেহারাটা তোমার দেখা উচিত—

মনে আছে গৌরদাসবাবু আরো কি কি বলেছিলেন।

বলেছিলেন—দেখলে তো মা, মানুষের অত্যাচারে মানুষ আজ কোথায় নেমেছে। দেহের বিকার মানুষের মনকে অধঃপাতের কোন্ পর্যায়ে নামিয়েছে —এই অধঃপতন থেকে যদি আমি বাঁচাতে পারি এদের, তা হলে এরাই আবার সমস্ত দেশকে বাঁচাবে—

নবীনের মা বললে—ছিলাম কোথায় আর কোথায় এলুম আমরা, নিজেরাই

ভাবতে পারি না, তিন ছেলে আর দু' মেয়ের মধ্যে এই একটি মেয়ে মাত্তোর আছে এখন—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—আর সবাই ?

নবীনের মা বললে—মা হয়ে তাদের খবর রাখতে পারিনি মা, কী বলবো, আমি এখানে খাচ্ছি-দাচ্ছি এইটুকুই জানি কেবল—

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—দেশই তো শুধু ভাগ হয়নি, আত্মাও যে ভাগ হয়েছে, সেই অক্ষয় অব্যয় আত্মা, যে আত্মার মৃত্যু নেই বিনাশ নেই, তাকেও আমরা হত্যা করেছি—এর পরিনামের দায়িত্ব তো আমাদেরই নিতে হবে—এই তুমি আমি পৃথিবীর যত লোক—সকলকেই—

আশ্রমের ভেতরে ঘুরে ঘুরে চারিদিকে দেখলে সুরুচি। উদার দেশের মানুষ সব এখানে এসে সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। অল্প পরিসরে বাসা বেঁধেছে ছোট ছোট। সামান্য প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে ব্যস্ত এখন। ছোট ছোট আশা তাদের, ছোট ছোট স্বপ্ন। কিন্তু তবু এদের ভালো লাগলো সুরুচির। এখানে কোথাও যেন শূন্যতা নেই। জীবনের সমস্ত ফাঁক যেন এখানে ভরাট হয়ে আছে। দাতব্যের জীবন এদের, তবু অবশিষ্ট যারা বেঁচে আছে তাদের নিজেদের জীবনে কোথাও কোনও নিঃস্বতা নেই, সব সম্পূর্ণ সব সুন্দর।

সুরুচি বললে—এবার যাই কাকাবাবু—

গাড়ির দিকে আসতে আসতে সুরুচি জিগ্যেস করলে—এ-সব কীসের ঘর কাকাবাবু ?

গৌরদাসবাবু বললেন—এ-সব আমাদেরই—আমাদের কর্মীদের, তালা চাবি দেওয়া পড়ে রয়েছে—ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তাদের পাঠিয়েছি আশ্রমেরই কাজে—যখন আসে এখানেই থাকে, আবার একদিন বেরিয়ে যায়—তাদের কারো সঙ্গেই তোমার দেখা হলো না—বড় ভালো ছেলে সব—

সুরুচি বললে—কোথায় গেছে সব ?

গৌরদাসবাবু বললেন—কেউ গেছে আলমোড়ায় মৌমাছির চাষ শিখতে, কেউ গেছে সুরাজগড়ে হায়দ্রাবাদে কাপাস তুলোর চাষ শিখতে—কাজ কি আর একটা, অনেক পরিকল্পনা আছে মাথায়, যদি মা তোমাদের আনুকূল্য পাই সব করে যাবো ইচ্ছে আছে···

তারপর ঘরে গিয়ে বললেন—এই দেখ মা ছবি দেখাই তোমাকে,

এখানকারই এক মায়ের বিয়ে হয়েছিল আমাদের, তাদের বর-কনের ছবি আর এই দেখ সব কর্মীদের ছবি—যারা বাইরে আছে এখন, এই ছেলেটি আছে হায়দ্রাবাদে—

ফটোগুলো দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে এল সুরুচির চোখ।

বললে—এ কে!

গৌরদাসবাবু হঠাৎ উঠলেন। বললেন—দাঁড়াও মা, বাইরে কে একজন এসেছে···আসছি···

সুরুচির দেহের সমস্ত রক্ত যেন জমাট বেঁধে এল। দুই কানের মধ্যে এসে যেন ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো সারা শরীরের রক্ত। বহু পরিচিত সেই মুখটার মতই এর মুখ। কোনও সন্দেহ নেই যেন। আরো নিচু হয়ে আরো কাছে এসে ফটোটা কাছে তুলে নিল সুরুচি। কোনও দুরধিগম্য পর্বত-শিখরে নয়, কোনও অনতিগম্য সমুদ্র কিনারায় নয়, কোনও অলৌকিক স্বপ্ন জগতেও নয়, মানুষের বসতি-বহুল পরিবেশেই যে আবার তার সঙ্গে তার চেহারার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পাওয়া যাবে, এ-কথা কে ভাবতে পেরেছিল। কে ভাবতে পেরেছিল এই কলকাতার এত কাছেই এতদিন তার কেটেছে।

রাহুল বললে—দিদি বাড়ি যাবে না?

গৌরদাসবাবু এলেন। বললেন—তোমার খুব দেরি করে দিলাম মা, চৌধুরী সাহেবের অসুখ—তিনি হয়ত ভাবছেন—

তারপর সুরুচির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

বললেন—এ কি, তোমার মুখের চেহারা অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন মা, তোমার কি শরীর খারাপ হলো?

সুরুচি বললে—না আমার শরীর খারাপ হয়নি, আপনি ভাববেন না—

গৌরদাসবাবু বললেন—না হলেই ভালো,—তবে চৌধুরী সাহেবের অসুখ শুনে আমিও একটু চিন্তিত আছি, বাড়ি ফিরে কেমন থাকেন লিখে জানিও মা—শুধু তোমার আমারই নয়, আমাদের এখানকার এতগুলো মানুষেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁর ভালো মন্দের ওপর—

তারপর একটু থেমে বললেন—কত পরিশ্রম করে যে এ-প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলছি তোমায় কি বলবো, শুধু আমি নয়, আমাদের প্রত্যেকটি কর্মী তাদেরও এ-ছাড়া সংসারে আর কোনও আকর্ষণ নেই, এদের সংসারে সবই আছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সেই যে একদিন দেশের ডাকে এরা বেরিয়ে এসেছিল আর ঘরে ফেরেনি, কত বছর জেল খেটেছে, তারপর যখন জেল থেকে ছাড়াও পেল, তখনও ঘরে ফিরে গেলনা আর। ঘরের স্নেহ-মমতা বিসর্জন দিয়ে তখন থেকেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা সকলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে—আমার আর কোনও চিন্তা নেই, শুধু এই চিন্তা যে এদের আদর্শ থেকে যেন এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এরা যেন হতাশ না হয়, এরা যেন মানুষের ভগবানকে মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে পায়—কিন্তু আর তোমার দেরি করে দেব না, তুমি ওঠ মা এবার—

সুরুচি উঠলো। কিন্তু যে-কথাটা বলবার জন্যে বার বার মনের মধ্যে অদম্য আগ্রহ হচ্ছিল তা আর কিছুতেই বলা গেল না।

গৌরদাসবাবু বললেন—চলো মা, হ্যারিকেনটা নিয়ে তোমায় এগিয়ে দিই—

সুরুচি বললে—না কাকাবাবু, আপনি আর কষ্ট করবেন না—

বলেই উঠলো। তারপর বললে—আপনার কর্মীরা কবে ফিরে আসবে আবার ?

গৌরদাসবাবু বললেন—তার তো কিছু ঠিক নেই মা, তবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের যখন বার্ষিক উৎসব হবে, তখন সবাই আসবে –

—সে উৎসব কবে হবে ?

গৌরদাসবাবু বললেন—এই তো আসছে বছরের এই সময়ে—তখন তোমাকে কিন্তু আসতে হবে মা—আমরা কিছুতেই ছাড়বো না—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—তার আগে আসতে পারে না ওরা ?

গৌরদাসবাবু বললেন—কেন আসতে পারবে না, বললেই আসতে পারে—তবে আসা-যাওয়ার অনেক ট্রেন ভাড়া পড়ে এই যা—তা তুমি কি তাদের দেখতে চাও ?

সুরুচি বললে—এই তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করতাম—একটু কথা বলতাম—

গৌরদাসবাবু বললেন—কিন্তু···

সুরুচি বললে—আমি তাদের সকলের আসা যাওয়ার খরচ দেব—

গৌরদাসবাবু বললেন—কিন্তু কেন মা, অত তাড়াতাড়ি কিসের—তারা তো বছর খানেক পরেই আসবে···

স্থরুচি বললে—তা হোক, তাদের আমি আগেই দেখতে চাই—আমারই নিজের গরজ, আমার বড় উপকার হয়।

গৌরদাসবাবু বললেন—কিন্তু গরজ তোমার কেন তা তো বুঝতে পারছি না—

স্থরুচি গাড়িতে উঠে বললে—আমারই গরজ কাকাবাবু, আমারই গরজ, আপনাকে আর একদিন সব বলবো—

ড্রাইভার ততক্ষণ স্টার্ট দিয়েছে।

গৌরদাসবাবু মুখ বাড়িয়ে বললেন—ওইখানটা একটু আস্তে চালাতে বোল মা, এই রাস্তার এইখানটা বড় ভিড়—এইখানে অনেক য়্যাকসিডেণ্ট্ হয়ে গেছে···আর গিয়ে চিঠি দিও মা, চৌধুরী সাহেব কেমন থাকেন।

অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার চারদিকে। ভালো আলোর ব্যবস্থা নেই।

স্থরুচি বললে—একটু আস্তে চালাও তারক,—খুব সাবধানে—

নবীনের মা বলছিল—অনেক পুণ্য তোমার মা, অনেক পুণ্য করে এসেছিলে তাই এ-জন্মে এমন স্থকৃতির ফল পাচ্ছো মা,—

আর একটি মহিলা বলেছিল—আর আমাদের ভাগ্য দেখ না, সোয়ামী পুতকে খেতে দিতে পারি না, এমন কপাল; ভাতের থালা সামনে এগিয়ে দিয়ে কাঁদতে বসি, বাসি কাপড় ছেড়ে ভাতের হাঁড়ি নামাবো এমন কাপড় নেই ছু'খানা—

স্থরুচি বলেছিল—আপনারা দুঃখ করবেন না, আমি যদি থাকি তো আমি খেতে পেলে আপনারাও খেতে পাবেন, আমি পরতে পেলে আপনারাও পরতে পাবেন—

আফিসে ভেঙ্কটরমণকে বলে কালই কিছু কাপড় আর কয়েকমন চাল এখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থরুচি অন্ধকার গাড়ির ভেতর চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার পটভূমিকায় ছু একটা তারা মিট্ মিট্ করছে আকাশে। আর নিচেকার পৃথিবীতে ছু'

পাশের জনবিরল মাঠ। দু'একটা সাইকেল ক্ষীণ আলো জ্বালিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায় নিঃশব্দে।

শেখরদার বরাবর রাগ ছিল বড়লোকের ওপর। বলতো—টাকা পয়সা অর্থ ওসব মানুষকে কেবল দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়—

বলতো—তোমার হয়ত একদিন বিয়ে হবে কোনও বড় লোকের সঙ্গে—সেইদিনই হবে তোমার চরম অধঃপতন—

সুরুচি বলতো—যদি বিয়ে কখনও না করি—

শেখরদা বলতো—বিয়ে করবে না এমন কথা জোর করে বলবার মত শক্তি তোমার আছে?

সুরুচি বলতো—বিয়ে করা-না-করাটা শক্তির ওপর নির্ভর করে না—বিয়ে করবো না সে আমার ইচ্ছে—

ছোটবেলার অপরিণত মনের তর্কবিতর্ক সে-সব।

শেখরদা বলতো—ইচ্ছেটা তো মনের বিলাস, যেমন ঘুমোতে ইচ্ছে, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে—খেতে ইচ্ছে—তেমনি তোমার কুমারী থাকবার ইচ্ছে—কিন্তু অত সহজ ওটা নয় সুরুচি।—

সুরুচি বলতো—আমি মাকে বলে দিয়েছি, আমার ইচ্ছে হলে তবে আমি বিয়ে করবো—

শেখরদা বলতো—অর্থাৎ স্বাধীন থাকবে—

সুরুচি বলতো—স্বাধীন থাকলে কত সুবিধে, কারো তাঁবে থাকতে হবে না—

শেখরদা বলতো—কিন্তু অন্যের ইচ্ছের কাছে নিজের ইচ্ছের বিসর্জন দেওয়ার যে কী গৌরব তা যখন বড় হবে তখন বুঝবে—

—ইচ্ছেকে বিসর্জন দিলে তো আত্মসম্মান খর্বই করা হয় বলে জানি।

—না, তাকে আর তখন আত্মবিসর্জন বলি না, বলি আত্মসমর্পণ,—কারোর অধীনে থেকেই সার্থক হয় জীবন—যেমন স্বামী বিবেকানন্দের হয়েছিল, সিস্টার নিবেদিতার হয়েছিল—

শেখরদার কাছে কত কথা শিখতে পেয়েছিল তখন, আজ এই অন্ধকার রাস্তার নৈঃশব্দের মাঝে সব মনে পড়তে লাগলো।

শেখরদা বলতো—মনে কোরনা এসব আমার বইপড়া বিদ্যে, এসব শিখেছি গৌরদাসবাবুর কাছে—

গৌরদাসবাবু তখন ছিল স্বরুচির সেই কচি মনের কাছে রহস্যের মতন। সারা দিনরাত্রির গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে গৌরদাসবাবুর নামটা ভেসে উঠতো। মনে হতো তিনি যেন ভারতবর্ষের সমস্ত পরিধিটা একেবারে জুড়ে বসে আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র জুড়ে তাঁর রাজ্য। দেশে দেশে তাঁর কাজ চলছে নিঃশব্দে। কোথায় খাইবার গিরিপথের কোন দুর্গম কন্দরে তাঁর কোন্ মন্ত্রশিষ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির একান্ত সাধনা করে চলেছে। আবার ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তের এক জলাভূমির মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করার সঙ্কল্প-সাধনায় আর একজন নিমগ্ন। আর তাঁর নিজের গতিবিধিরও যেন কোনও ঠিক নেই। নিতান্ত আটপৌরে মানুষটি বাইরে থেকে। আশে পাশে কোনও সঙ্গী নেই, একক তাঁর যাত্রা সামনের দুর্গম পথে। কিন্তু তাঁর একটি কথায় সমস্ত মানুষ ওঠে নামে।

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—সেদিনের কথা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সব জায়গায় একসঙ্গে এক অভ্যুত্থানের আয়োজন করা হয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রয়োজন হলো না মা—

স্বরুচি বললে—কেন ?

—হলো না কারণ, পরিস্থিতি বদলে গেল, দেশ কাল পাত্র ভেদে যেমন পরিস্থিতি বদলায়, পরিকল্পনাও বদলাতে হয়,—তা ছাড়া আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে কর্মীদলটি ছিল কলকাতায় তারা ধরা পড়লো—তাদের লম্বা জেল হয়ে গেল—যখন ছাড়া পেলে···

স্বরুচি বললে—তাদের মধ্যে··· ?

বলতে গিয়েও বলতে পারলে না স্বরুচি। কেমন সঙ্কোচ এসে বাধা দিলে।

গৌরদাসবাবু বললেন—তাদের মধ্যে সব চেয়ে বিশ্বস্ত কর্মী যে-ছেলেটি সে ছাড়া পাওয়ার পর তার মত-পথ সব বদলালে—আমার অনুমতি নিয়ে সে তার নিজের বাড়ি চলে গেল—তাকে বললাম, তোমার নিজের বিশ্বাস অনুযায়ীই তুমি চলো—তোমার নিজের ইচ্ছেকে নিজের বিশ্বাসকে আমি খর্ব হতে দেব না—

স্বরুচি বললে—তারপর ?

গৌরদাসবাবু বললেন—বহুদিন আগে একদিন তাকে আমিই শিখিয়ে-ছিলাম সব সময়ে স্বাধীন ইচ্ছের পরিচালনা নিরাপদ নয়, শিখিয়েছিলাম

অন্যের ইচ্ছের অধীন হয়েই, অন্যের ইচ্ছের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েই সার্থক করতে হয় নিজের জীবন—কিন্তু সোজা বললাম—তুমি যাও—তোমার বাড়ি ফিরে যাও—তোমার বেছে নেওয়া পথেই তুমি তোমার চরিতার্থতা খুঁজে পাবে—

—তারপর ?

—তারপর সে চলে গেল।

সুরুচি জিগ্যেস করলে—আর আসেনি সে ?

গৌরদাসবাবু হাসলেন। বললেন—এসেছিল, আমি জানতুম সে আসবে, একদিন রাত দু'টোর সময় সে ফিরে এল—আমি তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার নতুন কাজের সূচনার সুযোগ খুঁজছি—সে ফিরে এল। চোখ মুখ তার লাল, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হলে যেমন চেহারা হয় মানুষের, তেমনি চেহারা হয়েছে—

সুরুচির মুখে এবার আর কোনও প্রশ্ন যোগাল না।

গৌরদাসবাবু বললেন—তারপর জিগ্যেস করলাম—তুমি ফিরে এলে যে ?

সে বললে—আমাকে আপনি আশ্রয় দিন—

—আমি আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। জিগ্যেস করলাম না—কেন সে ফিরে এল। কেন সে তার মত বদলালো। কিন্তু সে নিজেই বললে—আমাকে আপনি কোনও কাজের ভার দিন—কাজের ভার দিয়ে অনেক দূরে কোনও দুর্গম জায়গায় পাঠিয়ে দিন—

সুরুচি বললে—দুর্গম জায়গায় ?

গৌরদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, সে বললে—কোনও দুর্গম জায়গায় যেখানে কেউ চিনবে না কেউ আমার কোনও পরিচয় জানবেনা—এমন জায়গায়, বিদেশে কাজ দিন—

সুরুচি বললে—কেন ?

গৌরদাসবাবু বললেন—তা আমি জিগ্যেস করিনি মা, আমার ইচ্ছের সঙ্গে যখন সে তার নিজের ইচ্ছের সমন্বয় করতে পেরেছে তখন আমার পক্ষে সে প্রশ্ন করা বাহুল্য—আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম—

সুরুচি বললে—কোথায় ?

গৌরদাসবাবু বললেন—সুরাজগড়ে, সেখানে তুলো নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—আর কোনওদিন আসে নি সে ?

—আসে, কিন্তু একদিনের জন্যে। হাজার কাজ থাকলেও এখানে সে একদিনের বেশি থাকে না—প্রতিবছর যখন আমাদের এখানে বার্ষিক উৎসব হয়, আসতেই হয়—আবার উৎসব আসছে, আবার আসবে, কিন্তু ওই একদিনের জন্যে—

সুরুচি বললে—আমি ওদের সকলের আসা যাওয়ার খরচ দেব, ওদের আপনি আসতে লিখুন—

এদিকে বাস চলে না। বাসরাস্তা ছাড়িয়ে দু'তিন মাইল এই সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। আস্তে আস্তে সাবধানে রাস্তা পার হয়ে গাড়ি এবার বড় রাস্তায় পড়লো। অনেক দেরি হয়ে গেছে। সুরুচি গাড়ির মধ্যে আর একবার নড়ে বসলো।

বললে—ক্ষিদে পাচ্ছে খোকা ?

খোকা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হলো। আস্তে আস্তে খোকাকে নিজের কোলে শুইয়ে নিলে সুরুচি। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এত দেরি করা উচিত হয়নি তার। কিন্তু গৌরদাসবাবুর কাছে না গেলে কি আজ তার এই সন্ধানের সঙ্গমে পৌঁছনো যেত !

সুরুচি জিগ্যেস করেছিল—এর নাম কি কাকাবাবু ?

—নাম !

গৌরদাসবাবু বললেন—সুরাজগড়ে যে রয়েছে তার নাম ?

সুরুচি বললে—হ্যাঁ—

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ব্রেক কষতেই বিকট শব্দ করে একটা আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো।

রাহুলের ঘুম ভেঙে গেছে। সেও জেগে উঠলো। বললে—কী হয়েছে দিদি ?

যে-লোকটা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল সে ততক্ষণে দৌড়ে পালিয়েছে।

সুরুচি বললে—একটু সাবধানে চালাও তারক—দেখছো তো রাস্তাটা সরু—

গাড়ি আবার চলতে লাগলো। খোকা আবার সুরুচির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গৌরদাসবাবু বললেন—তার নাম জিগ্যেস করো না মা, আমি তো বলেছি এই সব ছেলেরা একদিন বাপ-মা-ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল আমার কাছে, তখন থেকেই তাদের জীবনের নতুন পরিচ্ছেদ শুরু—তারা বাড়িঘরের কথা ভুলে গেছে—অবশ্য অনেকেই যা'র যা'র বাড়ি ফিরে গেছে, আমি তাদের বাধা দিইনি—কিন্তু এরা আর ফিরে গেল না—

তারপর বললেন—স্বরাজগড়ে যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল—এবার থেকে নতুন এক জন্ম হলো আমার, আমার অতীত আমি মুছে ফেললাম—আমার অতীতকে আমি অস্বীকার করলাম—

আমি জিগ্যেস করলাম—তা হলে তোমার নামও বদলাতে হয়—

সে বললে—আপনি আমার গুরু—আপনিই আমার নতুন নাম দিন একটা—

গৌরদাসবাবু বললেন—আমি তাকে নতুন নাম দিলাম—কোথায় মনের কোণে কোন্ নতুন আদর্শের সাড়া জেগেছে তার - নতুন কর্মের ডাক শুনেছে সে, আমি তাতে বাধা দেব কেন, কাউকেই কোনওদিন বাধা দিইনি—সদানন্দ যখন আমার দল ছেড়ে গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হলো, আমি তো রাগ করিনি মা—

সুরুচি বললে—কিন্তু কী নাম দিলেন তার ?

গৌরদাসবাবু বললেন—বাইরের কাউকেই তাদের কারো নাম জানানো হয় না মা, কিন্তু তুমি তো আর বাইরের লোক নও মা—তুমি তখন হয়ত খুব ছোট, সব তোমার মনে নেই, তাকে একদিন চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সদানন্দর কাছে, তোমাদের বাড়িতেই উঠেছিল সে—তারপর কোথায় থাকতো তা-ও জানি না—তারপর কারোর কোনও ঠিকানাই ছিল না কয়েক বছর—শেষকালে—

বাড়ির সামনে পৌঁছতেই কিন্তু চারিদিকে লোকজন দেখে অবাক হয়ে গেল সুরুচি। সমস্ত ঘরের জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। গেট খোলা।

তারক গাড়ি নিয়ে একেবারে ভেতরে গিয়ে গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়ালো।

রাজেনবাবুর সঙ্গে অফিসের আরো কয়েকজন বাবু দাঁড়িয়ে ছিল নিচে।

সুরুচি নামতেই তারা সুরুচিকে নমস্কার করলো!

সুরুচি সকলকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। বললে—আপনারা ?

কিন্তু তারা কিছু উত্তর দেবার আগেই গোপাল এসে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উঠে গিয়ে একেবারে বিলাস চৌধুরীর ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরুচি। সব শেষ হয়ে গেছে। বিলাস চৌধুরীর মুখে যেন প্রথম হাসি দেখতে পেলে আজ সুরুচি। তিনি হাসছেন। শান্ত প্রশান্ত হাসি। কোনও ক্ষোভ তাঁর নেই আর। কোনও অনুশোচনাও নেই। যেন অতৃপ্তিও নেই কোনও। সমস্ত পেয়ে পরম পরিপূর্ণতায় চরিতার্থ হয়ে বিদায় নিয়েছেন। যাকে পাওয়া হয়নি তাকেই যেন পেলে। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে লোকে লোকান্তরে পেলেন। সংসার তাঁকে শান্তি দেয়নি, স্ত্রী তাঁকে প্রেম দেয়নি, সন্তান তাঁকে সান্ত্বনা দেয়নি। তিনি বলতে পারেননি 'আনন্দ-রূপমমৃতং বিভাতি'। অর্থ এসেছে অযাচিত, ঐশ্বর্য এসেছে তাঁর জীবনের দু'কূল ছাপিয়ে। ধন, জন, সামর্থ্য, সাহচর্য সব পেয়েছেন। কিন্তু যা পেলে সব পাওয়া চরিতার্থ হয়, সার্থক হয়, সম্পূর্ণ হয়, তা তিনি পাননি। মানুষের মূঢ়তা নিয়ে তাঁর অন্তরে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কিন্তু অভিযোগ করা তিনি ত্যাগ করেছিলেন।

অনেক রাত্রে সবাই চলে গেছে, সুরুচি নিঃসঙ্গ বাড়িটার মধ্যে একলা যেন প্রহর গুনতে লাগলো নিঃশব্দে।

বিলাস চৌধুরী একদিন বলেছিলেন—অনেক টাকা জমছে—জমে জমে একদিন যে এর কোথায় পরিণতি হবে বুঝতে পারছি না—

সুরুচি বলেছিল—দান করে দাও না কিছু—

বিলাস চৌধুরী বলেছিলেন—টাকা উপায় করবার শিক্ষাই পেয়েছি, দান করবার শিক্ষা তো পাইনি—তোমার কাছে শিখতে পারি, শেখাবে আমাকে সুরুচি?

সুরুচি হেসেছিল সেদিন খুব।

বলেছিল—আমি যে এই দান করি সে তো তোমার মঙ্গলের জন্যেই—

বিলাস চৌধুরী বলেছিলেন—ছি, ও-কথা বলছো কেন? তোমার দান করার প্রবৃত্তিকে আমি কোনও দিন ছোট করেছি? কিন্তু দান করলে যে সত্যিই শান্তি পাওয়া যায়—সেটা যে এখনও বিশ্বাস করতে পারি না নিজের মনে!

স্বরুচি বলেছিল—শান্তি কী বস্তু জানি না, ও পাওয়া যায় কি না তাও জানি না, কিন্তু গৌরদাসবাবু বলেন যাকে দান করলাম তার কিছু উপকার হলো কিনা সেটাই আগে বিবেচ্য, নিজেদের কী হলো-না-হলো সেটা না হয় কিছুক্ষণের জন্যে না-ই ভাবলাম—

বিলাস চৌধুরী বলেছিলেন—তোমার গৌরদাসবাবুর সঙ্গে একবার পরিচয় করবো—

স্বরুচি বলেছিল—একবার চলো না—যাবে তাঁর আশ্রমে ?—

বিলাস চৌধুরী বলেছিলেন—শরীরটা সেরে উঠলেই যাবো একদিন—

কিন্তু শরীর আর তাঁর সারলো না। গৌরদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করাও তাঁর হলো না।

ক্রমে আরো অনেক রাত হলো।

যারা শ্মশানে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। অফিসের অনেক লোক আজ বাড়ি যায়নি আর। অফিস থেকে খবর পেয়ে সোজা শ্মশানে গিয়েছিল।

গোপাল বলেছিল—অফিসে আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম মা—শুনলাম আপনি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন—কোথাও নেই—শেষে রাজেনবাবু দৌড়ে এসে পড়লেন—

সন্ধ্যেবেলা ভিড়ের মধ্যেই স্বরুচি যেন বিলাস চৌধুরীর জন্যে সত্যিকার শোক বেশি করে অনুভব করলে। বিলাস চৌধুরীর মৃত্যুতে তারও যে কিছু করণীয় আছে তাও যেন তখন তার প্রথম খেয়াল হলো। একটু চোখের জল ফেলা, একটু সকলকে দেখিয়ে শোক প্রকাশ করা। নানাভাবে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে বিলাস চৌধুরী যে তার কতখানি ছিলেন তা জানানো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দেখতে দেখতে নানাজায়গা থেকে নিকট দূর সম্পর্কের লোকজন এসে দেখা করে গেছে। সকলেই এসে মিসেস চৌধুরীকে সান্ত্বনার বাঁধা বুলি শুনিয়ে গেছে। সবাই জানিয়ে গেছে বিলাস চৌধুরী তাদের কত প্রিয় ছিল। সকলের কতখানি ক্ষতি হলো তাও জানিয়েছে। অনেককেই স্বরুচি চেনে না, জানে না। অনেককেই জীবনে কখনো দেখেনি। টেলিফোন বার বার বেজেছে সমবেদনা জানাতে। অসংখ্য অসংখ্য সব সহানুভূতির, সমবেদনার, সান্ত্বনার বাণী। মৃত্যু যে এতলোকের শোকবাণী বয়ে আনতে পারে তা

এতদিন জানা ছিল না স্বরুচির। বিলাস চৌধুরীর বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্খীর সংখ্যা যে এত তাও জানা ছিল না। অথচ এই বাড়িতেই একটি ঘরে নিতান্ত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল তার বাবার। সদানন্দবাবুর। অসংখ্য তাঁর ছাত্র সংখ্যা। নিরহঙ্কার, নির্ভীক কিন্তু নিরুত্তাপ ছিল তাঁর জীবন। আজীবন সত্যবাদী, সরল উদার মানুষ। তবু তাঁর মৃত্যুতে এত আলোড়ন হয়নি। এত শোক প্রকাশ হয়নি। কলকাতা শহরের একটি জনপ্রাণীও উদ্বেগ-চঞ্চল হয়নি তাঁর সেই মর্মান্তিক অপসারণে।

আজকের শোকের সমারোহ দেখে আবার একটু হাসিও এল স্বরুচির মুখে। কেমন মনে হলো সমস্ত নাটকটাই যেন এক পরম কৌতুক। কৌতুকের দৃষ্টি নিয়েই স্বরুচি দেখতে লাগলো এই অন্তঃসারহীন অভিনয়। অনেকে এনেছে দামী ফুলের মালা! কানে গেল কারো কারো টুকরো টুকরো কথাঃ পঁচাত্তোর টাকা দাম নিলে মালাটার মশাই। পাশ থেকে কেউ দাম শুনে যেন বললে—ঠকিয়েছে, স্রেফ ঠকিয়েছে, কোন দোকান থেকে কিনলেন। আবার একজন পাশ থেকে বুঝি বললে—দেখুন তিরিশ টাকায় কতবড় মালা কিনেছি আমি। একজন বললে—ওটা বাসি ফুল। আর একজন বললে—ফুলেও ভেজাল দিচ্ছে আজকাল, কীসে ভেজাল নয়, বলুন—!

স্বরুচির মনে ছাঁৎ করে লাগলো কথাটা। মৃত্যুতেই শুধু ভেজাল নয়, মৃত্যুর শোকের মধ্যেও ভেজাল। স্বরুচির মনে হলো সে নিজেও যেন ভেজাল। শুধু অভিনয় করেই চলেছে। বিলাস চৌধুরীর সঙ্গে সারা জীবনই সে অভিনয় করে এসেছে। ভালবাসার ভান করেছে সে শুধু। স্ত্রী সে বিলাস চৌধুরীর হয়নি, এ-বাড়ির গৃহিণী সে হয়নি, সংসারে স্ত্রীর অভিনয় করে শুধু সে প্রবঞ্চনা করে এসেছে বিলাস চৌধুরীকে, আর সমস্ত পৃথিবীকে। কত বড় আঘাত পেলে শেখরদা জীবনের সব কিছু অস্বীকার করে পুরনো সব কিছু পরিচয় মুছে ফেলে নতুন করে নব জন্ম নিতে বাধ্য হয়েছে তা স্বরুচি এখন এখানে এই নিঃসঙ্গ রাত্রে কল্পনা করতে পারে। এত বড় প্রবঞ্চনা শেখরদার হয়ত সহ্য হয়নি। এত বড় ভেজাল সে চোখে দেখতে পারেনি। তাই সব অস্বীকার করে নবজন্ম গ্রহণ করেছে। যেখানে কেউ তাকে জানছে না, কেউ তাকে চিনবেনা, সেখানে গিয়ে গোপন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে নিজের।

হঠাৎ স্বরুচির খেয়াল হলো নিজেকে দেখে। বিলাস চৌধুরীর বিধবা স্ত্রী

হয়ে, তাঁর মৃত্যুর দিনে এ কার কথা সে ভাবছে। এ অন্যায়। অন্যায় এ কথা ভাবা। কিন্তু নিজের পোশাকের দিকে চেয়ে হঠাৎ আবার তার সম্বিত ফিরে এল। আয়নায় মুখটা ভালো করে দেখলে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাথাটা যেন তার ঘুরে এল। এতক্ষণ বিলাস চৌধুরীর নশ্বর দেহ কোথায় পঞ্চভূতে মিশে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন তো তার শোক করাই কর্তব্য। এখন তো বিলাস চৌধুরীর স্মৃতি নিয়ে বিভোর হয়ে থাকাই উচিত। কিন্তু সন্ধ্যে থেকে ভালো করে একবারও তার চোখে জল এল না কেন! ঘরে বাইরে সমস্তক্ষণ কেন চারিদিকে চেয়ে সে কেবল কৌতুক বোধ করেছে। সারা পৃথিবীতে সবাই কি তার মত কেবল অভিনয় করেই চলেছে!

পাশের বাড়ির একটি মহিলা বলেছিল—শাঁখা জোড়া খুলে ফেল মা, এসো মা, সিঁদুর মুছিয়ে দিই, কেঁদে কী করবে বলো,—সবই যে তাঁর বিধান—

সুরুচি হাত টেনে নিয়ে বলেছিল—না থাক্—

আর একজন আত্মীয়া স্থানীয়, কে বলেছিল—ছি মা, ও-কথা বলতে নেই, হিঁদুর মেয়ে, ওতে যে সোয়ামীর আত্মার অকল্যেণ হয়—

শেষ পর্যন্ত যখন আত্মীয়স্বজনেরা পীড়াপীড়ি করলে, সুরুচি বললে—না, আমি খুলবো না,—

কিন্তু বিলাস চৌধুরীর দূর সম্পর্কের এক পিসীমা বললেন—অত অধৈর্য হলে চলবে কেন মা, ও না করলে বিলাসের যে স্বর্গে গিয়েও গতি হবে না—

যতক্ষণ জ্ঞান ছিল অনেক কথা কানে এসেছিল।

কেউ বললেন—লেখা পড়াই শেখ আর ইংরিজীই পড়ো মা, হিঁদুর ধর্ম-কর্ম তো মানতে হবে, আমার ছোটজা যখন বিধবা হলো, বললাম—জুতোই পরো আর খিরিস্টানই হও—মাছ মাংস বাপু খেতে পাবে না—আহা মাছ না হলে আগে মুখে ভাতই রুচতো না তার—

আর একজন বললে—মেয়েমানুষের সোয়ামীই সব, সোয়ামী গেল তো বেঁচে কী লাভ—

কেউ বললে—এই যে আমি, আজ তেরো বছর উনি গেছেন, সেই থেকে নিরিমিষ—এখন মাছের গন্ধ নাকে গেলে বমি আসে, ও অব্যেস হয়ে যায়, এই এত বড় বড় চুল ছিল আগে, কত বাহার ছিল—এখন ঝাড়া-ঝাপটা।

পিসীমা হাতটা ধরে শাঁখাটা পট্ পট্ করে ভেঙে দিলে। তারপর আর

কিছু জ্ঞান নেই। যখন প্রথম জ্ঞান হয়েছিল তখন অনেক রাত! যারা আগে পাশে ছিল তারা অনেকেই যে-যার বাড়ি চলে গেছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় যাঁরা, পাশের ঘরে আছেন। স্থরুচি উঠলো।

যাঁরা একদিন স্থরুচির কৃপাকণা পাবার জন্যে কতদিন খোসামোদ করেছে তারাই আজ তার উপদেষ্টা। তার ভাল-মন্দের ব্যাপার নিয়ে উপদেশ দেয়। ওই পিসীমা কতদিন মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না বলে টাকা চাইতে এসেছেন।

মনে আছে শেষকালে একদিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দুপুর বেলা একেবারে এসে হাজির। রদ্দুরে ঘামে একসা।

স্থরুচি বলেছিল—আপনি একটু জিরোন, জল খান—তারপর কথা বলবেন—

পিসীমা বললেন—বৌমা তুমি আমায় কথা দাও আগে আমার মেয়ের বিয়েটা তুমি দিয়ে দেবে—

সে পিসীমা একেবারে নাছোড়বান্দা। অথচ বিলাস চৌধুরীর সামনে কথা বলার সাহসও নেই। দুদিন থাকলেন। স্থরুচির কত খোসামোদ করলেন। বললেন—হ্যাঁ বৌ, এই ক'টি ভাত খেয়ে কী করে বাঁচবে তুমি, এরকম খেয়ে শরীর থাকবে কেন?

খাইয়ে দাইয়ে কত করে তোয়াজ। নিজে রান্নাঘরে ঢুকে ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে পিসীমা বললেন—তুমি সরো দিকি ঠাকুর, রাঁধতে শেখো আমার কাছে—বলে হাতা বেড়ি ধরলেন।

জলখাবার নিয়ে নিজে গিয়ে ধরলেন বিলাস চৌধুরীর সামনে। বিলাস চৌধুরী সে-সব খেলেনও না। তারপর স্থরুচির মুখে মুখে খাবার যোগানো। খোকার খাওয়া-পরা দেখা। কদিন খুব করলেন।

শেষে খুব খোসামোদ করে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে তবে চলে গেলেন।

পুরুত মশাই হয়ত সকাল বেলাই এসে হাজির। হাতে পুজোর 'ফল। বললেন—কাল রাতে মায়ের পুজো করেছিলাম, ফল এনেছি তোমার জন্যে —এই নাও মা—

নিয়ে গেলেন পাঁচটা টাকা।

কত দিক দিয়ে কত লোক কত ভাবে এসেছে, কত ভাবে দু'হাতে ভিক্ষে

নিয়ে গেছে। কেউ দুঃস্থ, কেউ দুঃস্থ নয়। কেউ বা ঠকিয়েছে, কেউ বা সত্যি কথা বলে ন্যায্য পাওনা চেয়েছে। আর শুধু কি বাইরের লোক। বাড়ির ঠাকুর চাকর-ঝি-ঝিউড়ি। তাদের দেশের লোক। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব পরিজন সব। অফিসের সবাই। শশীবাবু এসে বলেছেন—আমার জামাই-এর একটা চাকরির জন্যে আপনাকে বলেছিলাম মা—

কালীবাবু সঙ্গে করে এনেছিলেন নিজের মেয়েকে একবারে অফিসের ভেতর। বলেছিলেন—এই আপনার পায়েই একে রেখে দিয়ে গেলাম মা—একটা পাত্র ঠিক করেছি—পাঁচশো টাকা নগদ চায়—

সুরুচি অফিসে যাবার ভার নেবার পর থেকে প্রত্যেকের মাইনে দশ টাকা পনের টাকা করে বেড়ে গেল। সুরুচি বললে—আপনারা টিফিনের জন্যে আট আনা করে পয়সা পাবেন—কিছু কিনে খাবেন—শুধু চা খেলে শরীর টিকবে কেন?

কিন্তু কিছু দিন পর থেকে পয়সা দেওয়া বন্ধ করে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। আট আনা পয়সা নিয়ে পকেটে রাখে, খায়না কিছুই।

কথাটা রাজেনবাবুই বলেছিলেন—ওতে আমাদের খরচ একটু বাড়বে বটে কিন্তু স্টাফের খাওয়া হবে—

সুরুচি বললে—দেখবেন সকলে যাতে খায়, কৌটোতে পুরে যেন সবাই বাড়িতে না নিয়ে যায়—

সুরুচি যাবার পর থেকে অফিস কত বেড়েছে। নতুন সুপারিনটেণ্ডেন্ট, ভেঙ্কটরমন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। বিলাস চৌধুরীর ভারতবর্ষময় যেখানে যত ফার্ম, তার হেড অফিস কলকাতায়। ভেঙ্কটরমণের কাজে ভারি খুশি হয়েছিল সুরুচি। ভেঙ্কটরমণও এসেছিল একটা ফুলের মালা নিয়ে।

ভেঙ্কটরমণকে ডিঙিয়ে কেউ সুরুচির কাছে সরাসরি যায় এটা তার পছন্দ নয় বোধ হয়।

অনেক দিন বলেছে—এতে স্টাফের মধ্যে ডিসিপ্লিন-জ্ঞান নষ্ট হবে—স্টাফ আনরুলি হয়ে উঠবে—আপনি যদি বেশি প্রশ্রয় দেন—

বিলাস চৌধুরীর তখন অসুখ। অসুখে বিছানায় পড়ে আছেন। ভেঙ্কট-রমণকে ডাকিয়ে বিলাস চৌধুরী বলেছিলেন—ভেঙ্কটরমণ, মনে রেখো মিসেস চৌধুরীর ওআর্ড ইজ ল—মিসেস চৌধুরীর ওআর্ড ইজ মাই ওআর্ড—

তারপর থেকে আর ভেঙ্কটরমণ কিছু বলতে সাহস করেনি।

আজ রাত্রের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে বিলাস চৌধুরীর চরিত্র যেন আরো স্পষ্ট করে চিনতে পারলে সুরুচি। কিন্তু বিলাস চৌধুরীর দুঃখ ঘোচাবার জন্যে কতটুকু আর করতে পারতো সে। কতটুকু তার ক্ষমতা।

এক এক করে অনেক রাতই কেটে গেল। অনেক লোকজন এল। যারা সেদিন আসতে পারেনি, কিম্বা সময় মত খবর পায়নি বলে আসতে পারেনি, তাদের সকলকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করলে সুরুচি।

বললে—আপনাদের সকলের শুভেচ্ছাই তাঁর আত্মাকে পরলোকে শান্তি দেবে—

সুরুচিকেও সবাই সান্ত্বনা দিয়ে গেল। সুরুচি মাথা নিচু করে সব স্তুতি, সব স্তুতিবাদ শিরোধার্য করে নিলে।

তারপর নিয়মমত একটা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান তাও করতে হয়েছিল মনে আছে: কিন্তু মনে পড়লেই যেন ভয় পায়। সেই ভিড়, সেই উত্তেজনা, সেই শোকের অভিনয়, সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। আলো, ফুল, খাওয়া, আপ্যায়ন, কোনও কিছুর ত্রুটি নেই কোথাও। সুরুচির সে-কদিন কেবল মনে হয়েছিল কতক্ষণে সব শেষ হবে, কতক্ষণে সব শান্তি হবে। কতক্ষণে সবাই বিদায় নেবে। আর তারপর নিরিবিলি নিভৃতির বিশ্রামের মধ্যে অবগাহন করে সমস্ত শ্রান্তি থেকে সে পরিত্রাণ পাবে।

একে একে সবাই চলে গেল। যারা কয়েকদিন সুরুচিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এসেছিল তাদের চিরকাল থাকা চলে না। থাকা চললে থাকতো। কিন্তু চলে একদিন তাদের যেতেই হয়।

হাসি মুখেই বিদায় দিতে হলো সবাইকে। মিথ্যের অভিনয়ও করতে হলো।

তারপর আবার সেই আগেকার নিয়ম-মাপা জীবন। সকালে উঠে অফিস। অফিস থেকে ফেরা। আর সকলের শেষে সেই অপরিহার্য নিঃসঙ্গতা।

শোকার্তদের ভিড়ে একটি মানুষই শুধু আসেন নি। তিনি গৌরদাসবাবু। শান্ত গম্ভীর ভাষায় শুধু খবরটা পেয়ে দু'লাইন চিঠি লিখেছিলেন।

লিখেছিলেন—যখন তোমার অসংখ্য শোকার্তদের ভিড় কমবে, তখন আমি যাবো মা। তোমার আবেগ একটু কমুক, তুমি একটু স্থির হয়ে ওঠো। আজ শুধু এই প্রার্থনা করি—মৃত্যুতে কাতর হয়ো না। মৃত্যুর আঘাত কঠিন বটে কিন্তু জীবনের ব্রত কঠিনতর, এটা ভুলো না যেন মা।

তারপর এসেছিলো বিলাস চৌধুরীর য়্যাটর্নি কালীদাসবাবু।

বললেন—মিস্টার চৌধুরীর উইল আমার কাছে সীল করা আছে, তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী পরশুদিন অন্যান্য সাক্ষীদের সামনে তাঁর উইল খোলা হবে—ওই দিন দুপুরবেলা কি আপনার সময় হবে?

সুরুচি বললে—আমার থাকা কি একান্তই দরকার?

য়্যাটর্নি বললেন—সেই রকম কথাই তিনি লিখে গেছেন তাঁর চিঠিতে।

সুরুচি বললে—দুপুরে, কখন, কটার সময়?

আজ নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে সে-সব দিনের সব কথা মনে পড়ে সুরুচির। সব দৃশ্য, সব পটপরিবর্তন। আজো রোজ সকালবেলা অফিসে গিয়ে বসতে হয়, আজো অভিনয় করতে হয় মিথ্যার। বিরাট অফিসের বিরাট গেটটা তার গাড়ি ঢোকবার সময় ফাঁক হয়ে যায়। আর পাশে দাঁড়িয়ে বন্দুকধারী দরোয়ান মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে। তারপর লিফ্‌টে উঠে সোজা তেতলার খস্‌-খস্‌ লাগানো ঘরে ঢোকবার আগেই একজন চাপরাশি ঝোলানো দরজাটা দু'ফাঁক করে ধরে দাঁড়ায়। তারপর বিরাট টেবিলটার একপাশে বসে সুরু হয় তার দিনের কাজ। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতে হয় ভেঙ্কটরমণকে।

ভেঙ্কটরমণ আসে অফিসের খবরাখবর নিয়ে। বম্বের অফিসের জরুরি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে। গভর্ণমেণ্টের নতুন কণ্ট্রাক্টের সাপ্লাই, রেলওয়ের সঙ্গে করস্‌পণ্ডেনস্‌—অনেক কথা।

কাজ করতে করতে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন একটু হেলান দিতে হয় চেয়ারে। খোকার ইস্কুলে একবার টেলিফোন করে। বলে—টিফিন খেয়েছ খোকা?

রাহুল বলে—খেয়েছি—

সুরুচি বলে—ছুটির পর বেরিও না, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো—

গোপাল এসে বলে—মা, আজকে কী খাবে?

সুরুচি বলে—আজ যে একাদশী রে—

গোপাল রেগে যায়—আগে তো আমায় বলতে হয়, মিছিমিছি কী খাটুনিটা খাটলুম—

মনে আছে গৌরদাসবাবু এসেছিলেন কিছু দিন পরেই।

বলেছিলেন—তোমার কথা মত সকলকে চিঠি লিখে দিয়েছি মা, সবাই আসবে—সবাই পৌঁছলে তোমাকে খবর দেব—

সুরুচি জিগ্যেস করেছিল—আপনার যে-কর্মীটি সুরাজগড়ে আছে, তাকে আসতে লিখেছেন?

—তাকেও আসতে লিখেছি মা, সবাইকেই আসতে লিখেছি—

সুরুচি জিগ্যেস করেছিল—কবে আসবে তারা?

আজ অবশ্য কোনও সুখ দুঃখ নেই সুরুচির। সমস্ত সুখ দুঃখের অনুভূতি তার লোপ পেয়েছে। গৌরদাসবাবুর কথা মত তার সমস্ত অনুভূতি তার নিজের কাজের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। যখনই মনে হয় ব্যথা বুঝি অসহ্য হয়ে বাজলো, দাহ বুঝি তীব্র হয়ে উঠলো, তখনই গোপালকে ডাকে। বলে—ঠাকুরকে বল যে আমি আজ কিছু খাবো না—

গোপাল বলে—আজও একাদশী?

ভেঙ্কটরমণকে ডাকে অফিসে গিয়ে। বলে—আমাদের নতুন টেণ্ডারের ফাইলটা দেখি—

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—আরো কাজ আরো কাজের মধ্যে তলিয়ে যেতে চেষ্টা করবে মা, কাজের জটিলতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে—দেখবে এর চেয়ে সহজ মুক্তির পথ আর নেই—

তারপর আরো বলেছিলেন—ফল যেমন বোঁটা থেকে খসে পড়ে, সংসারে থেকেও সংসার থেকে তেমনি দূরে থাকবে, সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারকে তেমনি ত্যাগ করবে, সহজিয়ারা এ-ভাবটি ভালো বুঝেছিল—নীর না ছুঁইবি সিনান করিবি ভাবিনী ভাবের দেহা—

সুরুচি বলেছিল—এই কি আমার শাস্তি?

গৌরদাসবাবু বললেন—শাস্তি নয় মা মুক্তি—

সুরুচি বললে—কেবল আমার জন্যেই কি এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা?

গৌরদাসবাবু বললেন—নিষ্ঠুর ব্যবস্থা নয় তো মা, আনন্দের—

সুরুচি বললে—সমস্ত থেকেও কিছু আমার থাকবে না—এও কি আনন্দের বলতে হবে?

গৌরদাসবাবু বললেন—পৃথিবীতে যা কিছু দেখছ মা সবই তো আনন্দরূপ, বাইরের রূপটাকেই দেখছি বলে আমাদের সেই ভুল হয়—কিন্তু ভেতরের আনন্দকে দেখতে হবে। আনন্দকে দেখতে গেলে এ-চোখ দিয়ে তো চলবে না, প্রেমের চোখ দিয়ে দেখতে হবে,—রোজকার এই পৃথিবী কত জীর্ণ কত অপরিচ্ছন্ন মনে হয় আমাদের, কিন্তু যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এ-কথা মনে হলেই দেখবে কালকে যা শ্রীহীন ছিল সব সুন্দর হয়ে উঠেছে আজ। এমন কেন হয় জানো? প্রেমের জন্যে! এ বৈরাগ্যও নয়, ত্যাগও নয়, লয়ও নয়। এ হলো প্রকাশ, এ হলো যোগ, এ হলো প্রেম। তোমাকে এই প্রেমের সাধনাই করতে হবে মা—

সুরুচি বললে—কেমন করে সে-সাধনা করবো?

গৌরদাসবাবু বললেন—যাকে ভালোবাসো তাকে প্রবঞ্চনা কোর না, তাকে অনাদর কোর না—তার কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করে নাও—তাকে দূরে ঠেলে দিও না, তাকে গ্রহণ করো—তাতে যত বাধাই আসুক, যত প্রতিবন্ধকই থাক—তার মধ্যেই নিজেকে বিলীন করে দাও—

সুরুচি বললে—যদি সে আমাকে গ্রহণ না করে?

—তা হলে বুঝতে হবে তোমার সাধনায় বিশ্বাসের অভাব আছে—নিষ্ঠায় গোঁজামিল আছে—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—যদি সমাজের বাধা থাকে—?

—তোমার গড়া সমাজ, তুমিই ভাঙবে, তোমার জন্যে সমাজ, সমাজের জন্যে তো তুমি নও—

—যদি কলঙ্ক রটে আমার?

গৌরদাসবাবু বললেন—রাধারও তো কলঙ্ক রটেছিল মা, তাতে তাঁর কৃষ্ণ-প্রীতি কমেনি—

—তারপর থেকে সুরু হলো সুরুচির কঠোর তপস্যা। কর্মের তপস্যা। সকাল-সকাল রাহুল ইস্কুলে চলে গেলেই সুরুচি অফিসে চলে যায়। সেখানে গিয়ে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় কিছু টের পাওয়া যায় না। কাজের মধ্যে তন্ময় হয়ে যায়। ভেঙ্কটরমণও কাজ-পাগলা লোক! এমনিতে সন্ধ্যে

সাতটা আটটা পর্যন্ত অফিসে তার কাটে! এবার স্থরুচির কাজের সঙ্গে থেকে সে-ও কাজ বাড়িয়ে দিলে। অফিসের আরো মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত আয়-ব্যয়ের দিকটা। কাজ, কাজ, কাজ। কাজের মিনিট ফুলে ফেঁপে ঘণ্টা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আবার ওঠে। কোনও জ্ঞান থাকে না কোনও দিকে। খাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছে স্থরুচি। বিশ্রাম একেবারে শূন্য। মাঝে মাঝে দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কাজ করতে করতে মাথা তুলে বাইরে তাকালে সমস্ত ঝাপসা দেখে। চোখে চশমা নিতে হয়েছে এবার। কৃশ হয়ে এল শরীর। নতুন কয়েকটা ডিপার্টমেণ্ট হয়েছে অফিসের। নতুন তাদের কাজ। নতুন তাদের পদ্ধতি। সমস্তই সুষ্ঠুভাবে চালাবার একটা নিয়ম কানুন তৈরি করে দিতে হয়। কিন্তু উদ্যমের তবু শেষ নেই। আরও নতুন কী কী করা যায়—নতুন কী পথ আবিষ্কার করা যায়। আরো কাজ দাও—আরো বিশ্রাম কেড়ে নাও। আরো কৃশ করে দাও শরীর। আরো কাজ করবার শক্তি দাও।

তারপর বাড়িতে খাওয়া বন্ধ হলো। অফিসেই খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। দুটা আলো চাল ফোটানো। কিছু সেদ্ধ তরকারী। রাত্রে উপবাস। সকাল হয় কাজের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, রাত্রি হয় আরো কাজের প্রতীক্ষা নিয়ে পরের দিনের জন্যে। শ্রান্তি যদি আসে, ক্লান্তি যদি নামে, প্রশ্রয় দিও না। শরীর যদি দুর্বল হয় গ্রাহ্য করো না। আমার কাজের মধ্যে দিয়ে তোমায় পাবো, আমার ক্লান্তি দিয়ে তোমার ক্লান্তি দূর করবো, আমার একাগ্রতা দিয়ে তোমায় জয় করবো—তুমি আমার। আমার আত্মাকে প্রবঞ্চনা করে তোমায় প্রত্যাখ্যান করবো না, আমার আলস্য দিয়ে তোমার অনাদর করবো না, আমার সংস্কার দিয়ে তোমায় দূরে ঠেলবো না—তুমি আমার। যদি কোনও প্রতিবন্ধক আমাকে আঘাত করে, যদি কোনও অপঘাত আমাকে আড়াল করে, যদি কোনও কলঙ্ক আমাকে মলিন করে—তবু তুমি আমার। হে কর্ম, হে সত্য, হে ধ্রুব, তোমার দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও। তোমার রুদ্ররূপ দেখেছি কিন্তু তোমার প্রসন্নতাও আমি দেখবো—তুমি আমার!

অফিসের ঘরেই যথা নির্ধারিত সময়ে উইল খোলা হলো।

য়্যাটর্নী কালিদাসবাবু, আরো কয়েকজন বিলাস চৌধুরীর বন্ধু-বান্ধব সময় করে এসেছিলেন।

কিন্তু অনেক কাজ ছিল সুরুচির। ভেঙ্কটরমণ বসে ছিল অফিসের একস্‌টেন্‌সন্ সম্বন্ধে ফাইলটা নিয়ে। সাত দিন ধরে নানা কাজের মধ্যে ওটা হচ্ছিল না। আজই করা চাই। কাজ কর্মের ক্ষতি হচ্ছে।

ভেঙ্কটরমণ বললে—নতুন বিল্ডিং-এ অন্তত এগারোটা ডিপার্টমেণ্টের য়্যাকোমোডেশন্ হওয়া চাই—

ভেঙ্কটরমণ সেই ধরনের কর্মী যারা কাজও করে আবার দৌড়-ঝাঁপও করে। রাত তিনটের সময় অফিসের স্বপ্ন দেখতে দেখতে যাদের ঘুম ভেঙে গিয়ে আর ঘুম আসে না। যারা বলে—ওয়ার্ক ইজ্ ডিভিনিটি।

বলে—কাজ দাও, আমি কাজ করবো, লয়্যাল্‌টি দেখাবো—পে-র কথা বলবো না, সে ডিউটি তোমার—

আরো বলে—তোমার 'পে' বুঝে আমি কাজ করবো না, আমার কাজ দেখে তুমি আমায় 'পে' দেবে—

ভেঙ্কটরমণ বাড়িতে বউকে বলে—তুমি পুজো করো গণেশের, আমি পুজো করি আমার মাস্টারের—ও দু'টো একই কথা—

বাড়িতে খেতে বসে অফিসের গল্প করে। ঘুমোতে যাবার আগে অফিসের গল্প করে, ঘুম থেকে উঠে অফিসের গল্প করে।

বন্ধুদের বলে—টুয়েন্টিফোর আওয়ার্স আমার ওয়ার্ক—আমি টুয়েন্টিফোর আওয়ার্সের সারভেণ্ট্—

সারভেণ্ট্ বলতে ভারি গর্ব ভেঙ্কটরমণের। তবু মিসেস চৌধুরীর কাছে তার তারিফ হয় না বলে মনে মনে দুঃখ আছে, অভিমান আছে। মিসেস চৌধুরীর ঘরে ঢোকবার আগে বার বার খবর নেয় মেজাজ কেমন আছে তাঁর। ঘরে ঢোকবার সময় সুইংডোর-এর শব্দ না হয়, পায়ের জুতোর আওয়াজ না হয়। মিসেস চৌধুরীর তবু মন পাওয়া যায় না। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট, মাঝে মাঝে আধ ঘণ্টাও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ফাইল বগলে করে। তবু মিসেস চৌধুরীর একটু মুখের হাসি পেলে ভেঙ্কটরমণের খুশির আর অন্ত থাকে না। সে-দিন টিফিনের সময় চারখানা 'দোসা' খেয়ে ফেলে, বাড়িতে গিয়ে বউকে সেদিন আদর করে—সেদিন আনন্দে নাচবে কি চীৎকার করবে ঠিক করতে পারেনা।

বউকে এসে বলে—জানো, আজ মিসেস চৌধুরী হেসেছে—

কিন্তু মিসেস চৌধুরীকে খুশি করা যার তার কাজ নয়। রোজ ঘুম থেকে উঠেই ভেঙ্কটরমণ স্ত্রীর আলপনা-আঁকা বেদীটার ওপর নিঃশব্দে প্রার্থনা করে—মিসেস চৌধুরীর মেজাজ যেন আজ ভালো থাকে লর্ড—

কিন্তু ভেঙ্কটরমণের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে রাজেনবাবুরা। চাপরাশিকে জিগ্যেস করে—আজকে সাহেবের মেজাজ কেমন আছে রে দ্বিজপদ—

রাজেনবাবুকেও ভেঙ্কটরমণ সাহেবের ঘরের সামনে গিয়ে ফাইল নিয়ে আধ-ঘণ্টা একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

দেখতে পেলে ভেঙ্কটরমণ মুখ নিচু করে কাজ করতে করতে বলে—নট্ নাউ, ওয়েট—

কিন্তু আজকাল মিসেস চৌধুরীর যেন আমূল বদলে গিয়েছে।

রাজেনবাবুরা কাজ শেষ করে অনেক রাত্রে বাড়ি যাবার সময়ও দেখে মিসেস চৌধুরীর ঘরে আলো জ্বলছে। সাহেবের ঘরেও আলো জ্বলছে। মিসেস চৌধুরী যেন কথা বলা কমিয়ে দিয়েছেন। হাসি যেন ক্রমেই কমে আসছে তাঁর মুখে। যখন কাজ করতে করতে এক একদিন বাইরে বেরোন সমস্ত অফিসের লোক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাছে গেলে দেখা যায় দু'একটা চুলে পাক ধরেছে। সাদা সিল্কের পোশাক—কাঁধে ব্রোচ—চেহারা দেখে সমীহ না করে আর পারা যায় না।

ভেতরকার খবর কিন্তু অফিসে চাপা থাকে না কিছু।

অফিসের কেরানী মহলে, বাবু মহলে, হেডক্লার্ক, সাব-হেড, এমন কি চাপরাশি পর্যন্ত জেনে যায়। বাড়িতে গিয়ে যার-যার পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে মিসেস চৌধুরীকে নিয়ে!

ভেঙ্কটরমণ পাড়ার লোকদের কাছে আলাপ করে—হোয়াট-এ ওয়াণ্ডারফুল লেডি—মাই বস্—

নতুন কেরানীরা রাজেনবাবুকে জিগ্যেস করে—মিসেস্ চৌধুরীর [illegible] লাভ ম্যারেজ ছিল?

রাজেনবাবু বলে—বড় বড় লোকের ব্যাপার—ওদের কথা আলাদা—

দ্বিজপদ বলে—আগে যে আমাদের অফিসে দেড়শো টাকা মাইনেয় কাজ করতেন উনি—

রাজেনবাবুকে জিগ্যেস করে সবাই—সত্যি কথা বড়বাবু?

টিফিনরুমেই খবরটা প্রথম শোনা গেল। কে একজন বললে—আজ চৌধুরী সাহেবের উইল খোলা হবে—। মিটিং বসেছে মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে—

সেদিনও মিসেস চৌধুরীর কোনও মুখের ভাবের পরিবর্তন নেই। মিটিং শেষ হলো। সবাই চলে গেল। ভেঙ্কটরমণ মিসেস্ চৌধুরীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কাজ চললো অনেক রাত পর্যন্ত। কোনও ব্যতিক্রম হলো না কোথাও। নতুন বিল্ডিং-এর প্ল্যান নিয়ে কূট আলোচনা নির্বিঘ্নে শেষ হলো। ভেঙ্কটরমণ যখন মিসেস্ চৌধুরীর ঘর থেকে বেরোল তখন রাত সাড়ে আটটা। বাড়িতে গিয়ে ভেঙ্কটরমণ ভাবতে লাগলো—হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল লেডী—মাই বস্—

বাড়িতে গোপাল বললে—আজকে কী খাবে মা?

সুরুচি বললে—আজ কিছু খাবো না রে—

গোপাল বললে—আজও একাদশী? রোজ রোজ তোমার একাদশী, আমাকে জানাবে তো আগে থেকে—শুধু শুধু খেটে মরলাম—

মাঝরাত্রে উঠলো সুরুচি। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। উঠে চিঠির প্যাড নিয়ে গৌরদাসবাবুকে চিঠি লিখতে বসলো।

লিখলে—কাজ নিয়ে থাকতে বলেছিলেন আমাকে, আমি তো সমস্ত শক্তি, সমস্ত সামর্থ, সমস্ত মন কাজের মধ্যে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু অনেক প্রতি-বন্ধক, অনেক আলস্য এসে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। আমি আর পারছি না। আপনার কর্মীরা কি এসেছে?

•

বাতাসের কানে কানে কোন্ কথা কোথা থেকে কোথায় যায় কে বলতে পারে। য়্যাটর্নী মহল থেকে উকিল মহল, ব্যারিস্টার মহল, সমস্ত হাইকোর্ট, সমস্ত কেরানী মহল, সকলের কানে চলে গেছে কথাটা।

কে[illegible]নী বললে সাব-হেডকে, সাব-হেড বললে হেড্ ক্লার্ককে। তারপর নিচে[illegible]পরাশি পর্যন্ত কেউ আর জানতে বাকি রইল না।

য়্যাটর্নী পাড়ায় এ ওকে টেলিফোন করে—কথাটা সত্যি নাকি বোস্?

বোস সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপর চিনেবাদাম খেতে খেতে বলে—দাঁড়াও, চাটার্জিকে ফোন্ করে দেখি—

আসলে খবরটা য়্যাটর্নী কালিদাসবাবুর কাছ থেকে ছড়ায়নি। ছড়ালো কোথা থেকে কেউ জানে না। এ ওকে প্রশ্ন করে, ও করে একে।

একজন জিগ্যেস করে—তা হলে কি কোম্পানী উঠে যাবে?

আর একজন জিগ্যেস করে—কে খবরটা দিলে?

বিশ্বাস না হবার মত কথাই বটে। তবু সকলকে বিশ্বাস করতে হলো কদিন পরেই। যথারীতি বিজ্ঞাপন বেরোল খবরের কাগজে। মৃত বিলাস চৌধুরী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ছেলে আনন্দ চৌধুরীকে উত্তরাধিকার সূত্রে আইনতঃ অধিকারী করে গেছেন। সে যদি কোনও দিন ফেরে বা সম্পত্তি দাবী করে তবে এ-সম্পত্তি তারই হবে—নচেৎ

উইলে আরো ব্যবস্থা আছে যে তাঁর বিধবা স্ত্রীকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। নিচে য়্যাটর্নী অফিসের নামধাম ঠিকানা। এবং শেষে আসল উত্তরাধিকারীকে যথাশীঘ্র ফিরে এসে সম্পত্তি দাবী করার অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞাপন শেষ করা হয়েছে।

সুরুচি য়্যাটর্নী অফিসে ফোন করে বলে দিলে—শুধু বাংলা দেশে নয় ভারতবর্ষের সব কাগজেই এ বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবেন আপনারা—

তাঁরা জিগ্যেস করলেন—কতদিন ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে?

সুরুচি বললে—অন্তত একমাস—

ভেঙ্কটরমণ ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করলে—এক্স্টেনসন্ কি বন্ধ থাকবে?

সুরুচি অবাক হয়ে গেল—কেন, বন্ধ হবে কেন? কীসের জন্যে?

একটু বিব্রত হয়ে পড়লো ভেঙ্কটরমণ। বললে—এমনি জিগ্যেস করছি।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও ভেঙ্কটরমণ একঘণ্টা লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে রইল। সত্যিই তো, কেন সে অমন প্রশ্ন করতে গেল। সমস্ত দিন যতবার কাজ করতে যায় ততবার কথাটা মনে পড়তেই লজ্জায় ধিক্কারে বেগুনে হয়ে ওঠে ভেঙ্কট-রমণের মুখ। যেন কিছুতেই এ-অপরাধের জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না।

বউ জিগ্যেস করে—কী হলো তোমার, ক্ষিদে নেই?

—না, ও কিছু না।

মুখে বললে বটে কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েও ভেঙ্কটরমণের মনে হতে লাগলো—হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল লেডী, হোয়াট এ মাইটি সোল্—

রাত্রে কিন্তু স্বরুচির মনে হলো সব যেন সম্পূর্ণ হলো এতদিনে। সমস্ত কাজের বোঝা এবার তার পায়ে নাবিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। এবার আত্মসমর্পনের মধ্যে অবগাহন করে সে পবিত্র হবে। এবার আর তার কোনও কাজ নেই। অনেক রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠলো। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর চলতে সুরু করলো বারান্দা পার হয়ে। এ মহল আগেকার মত আজও জনশূন্য। যারা দুদিনের জন্যে এসেছিল তারা সবাই চলে গেছে আবার। ওপাশে বিলাস চৌধুরীর মহল। দরজা খুলে সে-মহলেও যেতে হয়। সে-মহল পেরিয়ে বাড়ির উত্তর প্রান্তের শেষ দিকে চাকর-বাকর সব এখন ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে স্বরুচি সেই নিঃশব্দ বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলো। স্বর্গ কোথায় জানা নেই, নরক কোথায় তাও জানা নেই, স্বরাজগড় কোথায় তাও জানা নেই, তবু মনে হলো সব আছে। যে-যেখানে ছিল সবাই আছে। একদিন সদানন্দবাবু বিদায় নিয়েছেন এই বাড়ির একটি ঘর থেকে। তিনিও আছেন, মাও আছে। পিসীমাও আছে। এমন কি প্রিন্স, শ্রীলতা সকলের অস্তিত্বই আছে। তারা সবাই আজ তার দিকে অপলক চেয়ে দেখছে। তার প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভূতি। তার কর্মে চিন্তায় অনুভূতিতে তাঁরা বেঁচে আছেন। যত মানুষের সঙ্গে জীবনে দেখা হয়েছে, যত মানুষের সঙ্গে জীবনে দেখা হয়নি, ইহলোক পরলোক, আজন্ম সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তাদেরই ধারা বয়ে বেড়াচ্ছে সে। আবার একদিন যখন সব অভিনয়ের শেষে তাকেও বিদায় নিতে হবে, তখন আবার অনাগত যুগের মানুষকে তার উত্তরাধিকারী হতে হবে। তার কর্ম চিন্তা অনুভূতির উত্তরাধিকারী। এমনি করে যুগ থেকে যুগে অনাগত অসীম কালে পরিব্যক্ত হবে আদিম মানুষের চেতনা। হয়ত রূপটা বদলাবে, চেহারাটা বদলাবে বাইরের, হয়ত পালিশ করে নেবে বাইরেটা, কিন্তু চলা তার বন্ধ হবে না, ছেদ পড়বে না ধারাবাহিকতায়। আজ থেকে লক্ষ কোটি বছর আগেও যা ঘটেছে, লক্ষ কোটি বছর পরেও তাই ঘটবে। দুই যেখানে এক হয়ে মিলবে, ঋক্ আর সাম, বাক্য আর সুর, সত্য আর প্রাণ, যেখানেই এক হয়ে পরম এক হবে, সেখানেই সব হবে সার্থক, সব হবে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেখানে মিলবে না সেখানেই অনাসৃষ্টি, তাকে সেখানে ফেলে রেখেই তাকে পাশ কাটিয়েই ধারাবাহিকতার রথ চলবে অব্যাহত।

গৌরদাসবাবুর সেদিনকার সব কথাগুলো আজ যেন এই নিঃসঙ্গ বাড়িটাতেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

গৌরদাসবাবুর সোদপুরের নবীনের মা, সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল তাকে। সঙ্গে ছিলেন গৌরদাসবাবু, কোথাও চামড়ার কাজ হয়, কোথাও বাঁশের, কোথাও বেতের। কলের ঘানিতে সরষের তেল হয়। সকাল বেলা হলেই নিজের নিজের কাজ সেরে সব বেরিয়ে পড়ে কাজে, তারপর দুপুর বেলা বিশ্রাম। আবার কাজ। নিজেরাই গড়ে তুলেছে ইস্কুলের বাড়ি, টিউবওয়েল, কাপড় বোনা তাঁত।

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—এদের আমি কিছুই দিতে পারিনি মা শুধু কাজ দিয়েছি—কিন্তু আরো কত কাজ যে বাকি আছে—

সুরুচি বলেছিল—এখানে আপনি আমাকেও একটা কাজ দিন—

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—এ কাজ তো তোমার নয় মা, তোমার কাজ তোমার সংসারে—তোমার সংসারই তোমার কর্মক্ষেত্র, তোমার অফিস, তোমার ভাই, তোমার স্বামী—

অফিস থেকে য়্যাটর্নী অফিসে আবার টেলিফোন করলে সুরুচি—কোনও জবাব এসেছে আপনাদের অফিসে?

উত্তর এল—না।

অফিসের চিঠিগুলো এলেই খুঁজে খুঁজে দেখে সুরুচি। কোনওদিন সুরাজগড়ের কোনও চিঠি আসতে পারে হয়ত।

গৌবদাসবাবুর চিঠি সেদিন এল। লিখেছেন—আগামী কাল আমার কর্মী ছেলেরা আসবে কথা আছে—তোমার আসা চাই মা—এখানেই খাওয়া দাওয়া করবে, রাহুলকেও নিয়ে আসবে—আমি সব আয়োজন করবো—

ভেঙ্কটরমণ ঘরে এসেছিল। বার বার খবর নিয়ে দেখে শুনে তবে এসেছে। বার বার প্রার্থনা করেছে—আজ যেন মেজাজ ভালো থাকে মিসেস চৌধুরীর—

এসে বললে—ব্যালেন্স শীট তৈরি হয়ে গেছে—আপনি একবার [illegible]বেন—

সুরুচি বললে—তুমি তো দেখেছ ভেঙ্কটরমণ।

—ইয়েস্ আমি দেখেছি—

—সব ঠিক আছে তো, তা হলেই হলো।

ভেঙ্কটরমণ বললে—তা হলে টাইপ করতে দিই—?

স্বরুচি বললে—দাও, আমি পরশু সই করবো আর কাল অফিসে আসবো না আমি—

মুগ্ধ হয়ে ভেঙ্কটরমণ নিজের ঘরে ফিরে গেল। ওঃ, হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল লেডী—মাইটি সোল্—ওঃ—

পরদিন তারক সকালবেলাই গাড়ি নিয়ে হাজির করেছে।

ডাকলে—গোপাল—

গোপাল আসতে তাকে বললে—মাকে বল গাড়ি তৈরি—

গোপাল রেগে আগুন হয়ে উঠলো—গোপাল কারো চাকর নয় তারকবাবু—গোপালকে তুমি চেননি এতদিন. যাঁর যখন খুশি হবে তিনি আসবেন—

তারক বললে—কী হলো কি তোমার গোপাল—মাকে ডেকে দিতে বলছি—

গোপাল বলে—মাইনে দিয়ে কেউ আমার মাথা কিনে নেয়নি তারকবাবু, আমি কারো সাতে পাঁচে নেই—তোমার খুশি হয় আর পাঁচজনকে ডাকো—ডেকে ফরমাশ করো, আমাকে বিরক্ত কোর না—

তারক বলে—বাবু তোমায় পনের হাজার টাকা দিয়ে গেছে, ভাবছো শুনিনি গোপাল—

গোপালের মেজাজ আজকাল মিনিটে মিনিটে এমনি চড়ে যায়। বিলাস চৌধুরী মারা যাবার পর থেকেই কেমন গম্ভীর গম্ভীর হয়ে গেছে। বেশি কথা বলে না। সিঁড়ির নিচে ঠাণ্ডা অন্ধকার কোনটায় চুপ করে বসে থাকে সারাদিন ঝিম্ মেরে, বলে—ওখান দিয়ে কে যায়?

কেউ যাচ্ছে না। তবু গোপালের যেন মনে হয় সিঁড়িটার পাশ দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি ওপরে চলে গেল। কারো উত্তর না পেয়ে আবার বসে বসেই যেন নেশার ঘোরে ঢোলে। কোনও কাজ নেই তার। একেবারে নিঃস্ব নিঃসহায় অবস্থা। বিলাস চৌধুরী বেঁচে থাকবার সময় একটু ফুরসত থাকতো না তার। দৌড়ে চলে যেত রান্নাঘরে। ঠাকুরকে ধমক দিয়ে আবার চলে যেত দোতলায়। সেখানে বাবুর চটিজোড়া বিছানার সামনে মেঝের ওপর সোজা করে রেখে দিয়ে যেত কাপড় কোঁচাতে। তারপর সকলের যখন একটু বিশ্রাম নেবার সময় তখন মুখ-ঝাম্টা দিত ক্ষীরদাকে।

—ক্ষীরি তোর আক্কেলখানা কী বলতো, কলে জল এসেছে আর তোর এখন শোবার সময় হলো—বাবুরা কি তোর মুখ দেখতে মাইনে দিচ্ছে ?

তারপর বাবু বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়ে যেত প্রতাপ।

—বেরো বাড়ি থেকে, বেরো, বেরো বলছি এখুনি, আবাগীর বেটা, মাইনে নিয়ে ন্যাকাপনা হচ্ছে ? ঝাঁটা মেরে বিদেয় করবো না ?

কিন্তু সে-মেজাজ আর নেই গোপালের। অত যে প্রতাপ, আজ তার কিছু চিহ্ন নেই। যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছে। লাফালাফি, বকা ঝকা সব ঠাণ্ডা। হঠাৎ যেন আমূল বদলে গেছে। সহজে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। বাড়ির ভেতর থেকে খেতে ডাকতে এলে খেতে যায়। খেয়ে এসে আবার চুপ করে বসে থাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে। মাঝে মাঝে যেন ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। বলে—কে ? কে যায় ওখান দিয়ে ?

কেউ না। আবার বসে বসে ঝিমোয়।

বলে—পনেরো হাজার টাকা দিয়েছে মুখ দেখে—কাজ করিনি না ? শুধু বসে বসে তোদের মত মাইনে নিয়েছি না ?

অফিস যাবার পথে যেদিন দেখতে পায় সুরুচি ডাকে – গোপাল—

গোপাল বসে বসেই উত্তর দেয়—গোপাল তোমার চাকর নয়, গোপালকে ডেকো না—

তারপর টলতে টলতে উঠে এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে—কী ? ডাকছো কেন গোপালকে ?

সুরুচি বলে—আমি আর খোকা আজ বাইরে যাচ্ছি গোপাল—বুঝলে ?

গোপাল শুধু বলে—রাত্রে আসবে তো ?

বলে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। তারক গাড়িতে স্টার্ট দেয়। ঘড় ঘড় করে খানিকটা আওয়াজ হয়, তারপর শোঁ শোঁ শব্দ করে গেটের বাইরে বেরিয়ে যায় গাড়িটা। গেটের পাশের ঘরে রান্না করছিল দিলজিৎ। রান্না ফেলে দৌড়ে এসে গেটের পাল্লা দু'টো সরিয়ে দেয়।

এ বাড়ির জীবন-নাট্যের অঙ্কে অঙ্কে আর কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। যতদিন বিলাস চৌধুরী জীবিত ছিলেন, আর কিছু না থাক, ঝি-চাকর দরোয়ান ড্রাইভার সকলের কাজে কোথায় যেন ত্বরিত-গতির মসৃণতা ছিল। সাহেব আছে, সাহেব অফিস থেকে আসবে, সাহেব ঘুমোচ্ছে—সাহেবের অস্তিত্বের বোধ

সকলের মনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ফাঁকি দিলে চলে না, কামাই করলে চলে না, তাতে ক্ষতি হয়। কিন্তু এখন তেমন নয়। যেদিন থেকে খবরটা রটে গেছে আবার ছোটবাবু ফিরে আসবে, ফিরে এসে এ বাড়ির মালিক হয়ে বসবে, সব সুতো যেন যেন শিথিল হয়ে গেছে। সূর্য ঠিক সকালবেলাই ওঠে সেই আগে যেমন উঠতো। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা এখন মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে। কিম্বা এগিয়ে যায়। টিউব-ওয়েলের চাবিটা বন্ধ করতে ভুল হয়। ঘড়িতে দম দিতে মনে থাকে না, দরোয়ান গেট খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভট্চাযি্য মশাই এসে বলেন—কাল শেতলা ষষ্টির পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে—তাই এসেছিলাম মা আপনার কাছে—

সুরুচি বলে—আপনি বাতাসীর মা'কে বলুন—এখন থেকে ভাঁড়ারের কাজ ও-ই দেখছে—

ভটচাযি মশাই তবু বলেন—কিছু আলোচালও আনতে হবে—

—সরকারবাবুকে বলুন গিয়ে আপনার কী কী লাগবে—ফর্দ ফেলে দিন—

ভটচাযি মশাইও কিন্তু অবাক হয়ে যান। আগে এমন ছিল না। রোজ ডাক পড়তো তাঁর। আজ রামায়ণ পাঠ, কাল কথকতা, পালা-কীর্তন, অষ্ট-প্রহর, রোজ একটা-না-একটা উৎসব লেগেই আছে। আজকাল মা যেন কেমন হয়ে গেছে। পুজোর ঘরটার পরিষ্কার রাখার ভার পড়েছে ঝিয়ের ওপর। আগে বাসি কাপড়ে ওখানে কেউ ঢুকতে পেতনা। তামার কোষা-কুষি রোজ মাজা ঘষা হয় না তেঁতুল দিয়ে।

কেউ যদি গিয়ে অভিযোগ করে—মা ক্ষীরি কেমন করে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে দেখবে এসো—নিজের চোখে দেখবে এসো—

সুরুচি বলে—দিকগে, বুড়ো মানুষ, আর কি আগের মত চোখে দেখতে পায়—দিক্‌গে, বকো না ওকে—

কিন্তু ফিরে আসা সেদিন আর হয়নি।

হয়নি কারণ…

কিন্তু সে-কথা এখন থাক…

সেদিনকার মত খোকা আজও গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে। হু হু করে চলেছে গাড়ি। এ-দিকটা অন্ধকার। অল্প-অল্প জ্যোৎস্নাও যদি থাকে তা হলে কিছু অসুবিধে হয় না। তারক নতুন ড্রাইভার। আগে প্রথম যখন

বিয়ে হয়েছিল—তখন ছিল নাগেশ্বর। নাগেশ্বর আগেকার আমলের ড্রাইভার। বিলাস চৌধুরীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে সে দেখেছে। তারপর বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন বোম্বে অফিসের ট্রাক চালায়। মাইনে বেড়েছে। সেই তখন থেকেই আছে তারক।

গৌরদাসবাবু আয়োজন করেছিলেন ভালো। ছুটির দিন নয়। কিন্তু অনেককে সেদিন ছুটি দিয়েছিলেন। বললেন—মা জননী আসবে, তোমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয় দেখো—

নবীনের মা বিধবা মানুষ। কিন্তু রান্না-বান্নাতে কাজের লোক। গৌরদাসবাবু সাধারণত একবেলাই খান। তাঁর খাওয়ার ঝঞ্ঝাট নেই। নির্বিরোধ নির্লিপ্ত মানুষ, তাঁর নামেই সব কাজ চলে এ-প্রতিষ্ঠানে। তিনি আজকাল দেখেনও না সব। দরকার হলে বাইরে যান দু'একদিনের জন্যে। থলিতে ভরে টাকা নিয়ে আসেন। কোথায় যান, কোথা থেকে টাকা আনেন, কেউ জানতেও চায় না। শুধু দরকার হলে কোথাও চিঠি লেখেন—আর মণি অর্ডারে টাকা আসে।

তবু টাকার অভাবও হয় তাঁর। এক-একটা বড় কিছু কাজ আরম্ভের সময় হঠাৎ আটকে যায়। তখন সকাল থেকে ছাতি নিয়ে কাজের তদারক করেন। দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটান। সমস্ত দশ কামরা ইস্কুলবাড়িটা গড়বার সময় নিজে মিস্ত্রীদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ি তৈরি করানো। এখানকার লোকেরা গঙ্গা থেকে ক্যানেস্তারা ভরতি জল এনে এনে তুলেছে। আবার রাত্তিরে সকলকে ডেকে একসঙ্গে বসে কিছু পড়েন। তিনি পড়েন—অন্যেরা শোনে।

গৌরদাসবাবু বলেন—তা দু'শো বছর আগে, ধরো না কেন, এই রকম তো ছিল না, সেই সময়ে একবার মুর্শিদাবাদের লোক খাজনা দিতে চায় না, নবাব সরকারের লোক গেলে মেরে তাড়িয়ে দেয়। কে যাবে, কে যাবে—কার এত সাহস! গেলেন নন্দকুমার—মেরে ধরে শাসন করে চলে এলেন, খুব নাম হলো তাঁর, খেলাত পেলেন, আস্তে আস্তে মহারাজ হলেন—হুগলীর ফৌজদার হলেন—তারপর···

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করেন—সরলার মা, খুকী আজ কেমন আছে গো? তাকে দেখছি না—

নির্মল, বসন্ত দু'জনেই এসে গেছে। অনেকদিন পরে এসেছে ট্রেন থেকে নেমে এসে এখানে উঠেছে আবার। যার যার ঘরে গিয়ে হৈ হৈ করেছে। অনেক দিন পরে সব দেখা। অনেকে বাড়ি আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একদিন গৌরদাসবাবুর আশ্রয়ে এসেছিল। আজ তার কথা কারো মনেও নেই।

গৌরদাসদাস বললেন—কোনও কাজের জন্যে তোমাদের ডাকিনি, আমাদের যিনি সব চেয়ে বেশি চাঁদা দেন—তিনি একবার তোমাদের দেখতে চেয়েছিলেন —তাই—

বহুদিন আগে বহুশতাব্দী আগে এক দিন ঝড় উঠেছিল এখানে। বড় আশ্চর্য ঝড়। সোদপুরের এদিকে যেখানে গৌরদাসবাবুর এই আশ্রম, এইখানে পর্তুগীজ আমলে এককালে বসতো বাজার—মানুষের বাজার। মানুষ বেচা কেনা হতো। হার্মাদদের পাল তোলা জাহাজ এসে নোঙর বাঁধতো ওখানে আর কারবারীরা গিয়ে হাজির হতো মোহর নিয়ে। দশ বিশ তিরিশ পঞ্চাশ যা পাওয়া যায়। কোথাকার কোন মায়ের বাপের কোল থেকে ছিনিয়ে আনা সব ছেলে মেয়ে। পাইকারি বাজার। পাইকারি দরে কিনে আবার খুচরো বিক্রি হতো হুগলীতে, সাতগাঁয়ে, কলকাতায়।

সেই বাজারে দাস কিনতে এসেছিলেন জমিদার গুণীধন রায়।

শেখর বললে—তারপর ?

—ওটা আমাদের পূর্ব পুরুষের মহালের মধ্যে—তিনি এসে দেখেন তাঁর ছ'বছরের নাতিকে ধরে বাজারে বেচতে এনেছে পর্তুগীজরা। সে নাতি এক বছর আগে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল। তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। গুণীধন রায় ছিলেন তখন এ-দিগরের ছোট ভুঁইয়া। বিপুল প্রতাপ। লাঠালাঠি বেঁধে গেল বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কিন্তু শেষকালে হটে আসতে হলো গুণীধন রায়ের লোকদের পর্তুগীজদের গোলাগুলি আর গাদা বন্দুকের ভয়ে। সেখানেই মারা পড়লেন গুণীধন রায়। কিন্তু গুণীধন রায়ের ছেলে বংশীধন রায় শাহজাহানের কাছ থেকে ফর্মান পেয়ে আবার ফিরে পেলেন মহাল। কিন্তু দাস-বাজার উঠে গেল তারপর থেকেই।

—ও আমার পূর্ব পুরুষের রক্ত দেওয়া মহাল, ও আমি বেচবো না—ও আমি আপনাদের দান করলাম এমনি—

কথা বলছিলেন ওই জমিদারির বর্তমান মালিক শশীধন রায়।

শেখর বলেছিল—ওখানেই আমাদের আশ্রম খুব ভালো হবে গৌরদাসবাবু—

শেখরের চেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠা হলো একদিন এই আশ্রম। এমনিই একটা জমি বহুদিন থেকে খুঁজছিলেন গৌরদাসবাবু। একদিন আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। অনুষ্ঠান সুরু হলো। শেখরের দিন নেই, রাত্রি নেই। সত্তর বিঘে জমিটাকে একলাই বাঁশের খুঁটি দিয়ে যেন ঘিরে ফেলবে সে। শেখরের পরিশ্রম দেখে ভয় পেয়ে গেলেন গৌরদাসবাবু। রোদ বৃষ্টি অঝোর ধারে ঝরছে। তার মধ্যে শেখর কোদাল চালিয়ে চলেছে। তখন এ-সব ঘর-বাড়ি এখানে ছিল না। মেঠো অনাবাদী জমি। কতকালের কলঙ্কিত মাটি—হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শৃঙ্খলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে এখানে সব কিছু পাথর হয়ে গেছে। সে মাটিকে উর্বর করে ধন্য করা সহজ কথা নয়।

গৌরদাসবাবু বেরোলেন ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে। কলকাতা শহরে যেখানে যতটুকু পরিচয় তার সুবিধে নিতে হবে। ওদিকে শেখর, নির্মল, বসন্ত আর অন্য বন্ধুরা বাঁশ কেটে খড়ের চালা বানায়, রাঁধে বাড়ে খায়—আর দলে দলে আশ্রয়ের লোভে এসে হাজির হয় পদ্মা পেরিয়ে বাস্তুহারা মানুষের মিছিল। তাদের মধ্যে বাছ বিচার করলে চলবে না। বড় মর্মান্তিক অবস্থা তখন।

খোলা মাঠে খালি আকাশের তলায় রাতের পর রাত কেটে গেল।

গৌরদাসবাবু অনেক দিন বলেছেন—তুমিও আমার সঙ্গে চলো শেখর—আমাদের উদ্দেশ্য তুমি ভালো করে বুঝিয়ে বলবে সকলকে—

তবু শেখর যায়নি। কলকাতায় যাওয়াটা বরাবর এড়িয়ে গেছে। তবু সন্ধ্যে বেলা কোনও কোনও দিন কাজের পর গঙ্গার ধারে বসে বলতো—স্লেভদের হাড়ের ওপর আমাদের ইমারত গড়ছি—স্লেভারির যুগ শেষ করবার জন্যে—

বলতো—বলো, জয় গুণীধন রায়ের জয়—

সবাই হেসে উঠতো শেখরের কথায়। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যেত হাসি ঠাট্টায়। গুণীধন, বংশীধন, শশীধন সকলের জয় ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠতো সন্ধ্যেটা। ওপারের পাটকলের লোকরা মাঝে-মাঝে শুনতে পেত সে-হাসির ক্ষীণ শব্দ। তারপর তারা ভরা আকাশের তলায় আবার চলতো বিশ্রাম সমস্ত রাত্রের মতো। ভোর বেলা থেকেই আবার কাজ সুরু করতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন একেবারে বদলে গেল শেখর। সেই মানুষ স্থির গম্ভীর হয়ে এল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। আরো অনেকের সঙ্গেই ছাড়া পেয়েছিল সে। ফিরে গিয়েছিল নতুন পদ্ধতিতে নতুন কাজ সুরু করবে বলে। জেল থেকে সোজা এখানে এসে কত কাজ কর্ম সুরু হলো তার। তারপর টাকার প্রয়োজনের কথাটা মনে হতেই জেলখানা থেকে লম্বা চিঠি লিখেছিল বাড়িতে। নিজের বাবার কাছে।

লিখেছিল—সেদিন আমি ভুল করেছিলাম বাবা, আমরা সবাই ভুল করেছিলাম—আমায় ক্ষমা করুন--

আরো অনেক কথা লিখেছিল। লিখেছিল—সেদিন যে-পথ তারা বেছে নিয়েছিল তাতে জনসাধারণের কোনও অংশ ছিল না। এবার সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে। বুঝেছি নেপলিয়ন ইতিহাস সৃষ্টি করেনি—ইতিহাসেরই অনিবার্য সৃষ্টি নেপলিয়ন—। এবার আর গোপনতার পথ নয়। প্রকাশ্য দিনের আলোয় আমাদের এবারকার কাজ—

তারপর ভোর রাত্রে একদিন হঠাৎ ফিরে এল শেখর।

তখনও ভালো করে সকাল হয়নি। গৌরদাসবাবু উঠেছিলেন সেদিন খুব সকাল সকাল।

পায়ের শব্দে গৌরদাসবাবু চোখ তুলে চাইলেন।

—কে ?

মনে আছে একবার কলকাতা থেকে ফিরে এসে গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—আজ চেতলায় গিয়েছিলাম, জানো ?

শেখর কিছু কথা বললে না।

গৌরদাসবাবু আবার বললেন—গিয়েছিলাম সদানন্দের কাছে, সবজি-বাগানে, যেখানে একবার তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম সে গ্রে স্ট্রীটে জামাই-এর বাড়িতে ছিল, সেখানে নাকি মারা গেছে, তা তবু গেলাম সেখানে, ভাবলাম মেয়ে-জামাই তো আছে—গেলাম—

অবশ্য তখন এখানকার বাড়ি ঘর হয়েছে, থাকবার চালা-ঘরও হয়েছে। কিছু কিছু কাজ-কর্মও পেয়েছে কয়েকজন। লাইব্রেরী হয়েছে, পাঠশালা হয়েছে। অনেক কিছু হয়েছে। একবার এক উৎসবের অনুষ্ঠান হলো, তখনকার কথা। সুরাজগড় থেকে আসার পরের ঘটনা।

কিন্তু আরও আগের ঘটনা এটা। অল্প-অল্প ভোরের কুয়াশাতেই গৌরদাসবাবু যেন চিনতে পারলেন চেহারাটা।

বললেন—কে ?

—আমি শেখর।

—কী হলো ? চলে এলে ?

—আমি এখানেই থাকবো।

এখানে থাকবে বলেই প্রথমে এল অবশ্য সে। এতখানি উৎসাহ নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলতে পারা সহজ নয় হয়ত। সেই কথাই ভেবেছিলেন গৌরদাসবাবু। অবশ্য শেখর থাকলে সব দিক দিয়েই সুবিধে। কলকাতার আশে-পাশের সত্তর-আশি মাইলের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা এমনি নিঃসহায় প্রাণীতে ভরে গেছে। সমস্ত খালি জমি জনপদে পরিণত হয়েছে আবার। কিন্তু কী বিরাট যে সংগ্রাম! কী বিপুল যে অপচয় সে একমাত্র গৌরদাসবাবুই জানেন। ওই অকুতোভয় মানুষটি একলাই কেবল সমস্ত প্রতিরোধ করেছিলেন নিজের জোরে। শুধু কি স্বার্থ! স্বার্থের প্রলোভন ছাড়াও আছে রাজনীতি। রাজনীতির সমস্ত কূট-চক্রান্তের ঢেউ বার-বার এখানে আছড়ে এসে পড়েছে। টাকা নেবে নাও। 'চাকরি দরকার, নাও। ক্ষমতাশালী মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে এ-প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্যে সেদিন প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে শুধু একলা এই গৌরদাসবাবুকে। রাত্রে বেড়া ঘেরা জায়গাটার চার পাশে মানুষবেশীর দল উপবাসীর মত হা হা করে ধর্ণা দিয়েছে। কতবার কত সর্বনাশের পিছল পথে কত মেয়ে-ছেলে তলিয়ে গেছে। গৌরদাসবাবু ক্ষমা দিয়ে স্নেহ দিয়ে তাদের টেনে তুলেছেন।

নবীনের মা বলে—উনি আমাদের বাপ গো—

যারা অপরাধ করে ওরা তাদের সবাইকে ধরে এনে একেবারে গৌরদাস-বাবুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নেয়। বলে—ওঁর পা ছুঁয়ে বল্ আর কখনও করবিনে—

তবু আর যে-কেউ হলে হয়ত হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু গৌরদাসবাবু কঠিন লোক। সহজে হার মানার মত তিনি নন্।

বলেন—ওদের ক্ষমা করো মা, ছোট ছেলে, বয়েস কম, বড় হলে ভালো হয়ে যাবে। নিজের ভাল বুঝতে শিখবে—

তা সত্যিই দোষ ওদের নয়। তিনি বলেন—দোষ তো ওদের নয় গো। দোষ আমাদের। আমরাই তো দোষ করেছি। আমাদের উত্তরপুরুষকে এ-দোষের ফল ভোগ করতে হবে না? তাই তো কাজ দিয়ে সব দোষ সব ক্ষতি ভরাট করে দিতে চাই—এরই নাম কর্মযোগ—ওরা ছোট, ওরা এখন বুঝবে না—

তা শেখর কিন্তু থাকলো না বেশিদিন।

বললে—আমাকে কাজ দিন—বাইরে, অনেক দূরে—আর আমি এখানে থাকতে পারবো না—

গৌরদাসবাবু শুধু একবার বলেছিলেন—এত কষ্টে গড়ে তুললে-আর এখন তুমি চলে যাবে শেখর?

শেখর বললে—আমি জানি আপনার একলা কষ্ট হবে—তবু আমি দূরে চলে যেতে চাই—

আর কিছু বললেন না গৌরদাসবাবু। শুধু বললেন—তবে যাও, সুরাজগড়ে তুমিই যাও—ভেবেছিলাম বসন্ত কিম্বা নির্মলকে পাঠাবো—তা তুমিই যাও—

যাবার দিনের কথা আজো মনে আছে গৌরদাসবাবুর। সকাল থেকে সেদিন খুব কুয়াশা। ভালো করে দেখা যায় না কিছু। নির্মল এসেছিল কাছে। বললে—শেখরদা, আর কিছুদিন থাকলে পারতে—

ওখানকার মহিলারা এসেছিল শেখরের ঘরের সামনে। দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে।

শেখর বললে—নবীনের মা—কেঁদোনা—

শেখরের লম্বা চওড়া চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সবাই যেন কেমন করুণ হয়ে উঠলো। সবাই বুঝলো—যে যাচ্ছে সে এখানে আর আসবে না বলেই যাচ্ছে। তবু তাকে থাকতে বলার সাহস কার আছে! শেখর কথা বলে কম—তবু বরাবরই তার প্রকাশ ছিল বেশি। শেখরের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান এতদিন একটা সজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে বিবাদ যখন হয়েছে, তা মিটে গেছে শেখরের কথায়। ছেলে-মেয়েরা বাইরে গিয়ে অনাচার করেছে—এসে ক্ষমা চেয়েছে শেখরের কাছে। সমস্ত চপলতা, সমস্ত তরলতা শেখরের সামনে এসে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে উঠেছে। অথচ কটা দিনই বা।

যাবার সময় গৌরদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি শুধু বলেছিলেন—যাচ্ছ—

আর কিছু বলেন নি।

একদল ছেলে মেয়ে পেছনে পেছনে গেটের বাইরে পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে একেবারে তর-তর করে চলে গিয়েছিল শেখর। সেদিন কোথাও কোনও আকর্ষণ তাকে পেছনে টানেনি। যে মানুষ এত স্নেহ-করুণ তার এই রুক্ষ-কঠোরতা দেখে সত্যিই সবাই যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

গেটের বাইরে থেকে মাইলখানেক পথ খুব সরু। সংকীর্ণ। দু'পাশে আগাছা, ঝোপ জঙ্গল পথের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ওপরে চাইলে আকাশ দেখা যায় না। গ্রামের লোকজন, বাউল, ফকীর রাস্তা দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অনেক সময় কেউ কেউ ভয়ে আঁতকে উঠেছে। মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে রাস্তার পাশে। একেবারে টাটকা। তখনও রক্ত ঝরছে গা থেকে। কী আর হয়, কিছুই হয় না। পুলিশ আসে, তদন্ত করে। গৌরদাসবাবুর কাছেও তারা আসে, প্রশ্ন করে। তারপর একদিন চাপা পড়ে যায় সব।

ওটা গাড়ির রাস্তা। ও-পথে তেমন কেউ যাতায়াত করে না। আর একটা হাঁটাপথ আছে অনেক ঘুরে। অন্ধকার রাতে চলাফেরা করতে হলে সেইদিক দিয়ে যায় সবাই।

গৌরদাসবাবু সেই প্রথম দিন ফিরে যাবার সময় সুরুচিকে বলেছিলেন—এই রাস্তাটায় গাড়িটা একটু আস্তে চালাতে বলবে মা—রাস্তাটা সরু বড়—

যারা বেশি সাহসী, ডানপিটে, তারা এইখান দিয়েই চলে। খানিকটা সময় তো তবু বাঁচে। সিনেমা দেখে ফেরবার সময় সঙ্গে মেয়েরা থাকলে এ-রাস্তা দিয়ে আসতে কিন্তু কেউ সাহস করে না। বলে—কাজ নেই—ঘুরে চলো—

এ-সবই গুণীধন রায়ের মহাল ছিল এককালে।

অনেকবার ফেরার সময়ে রাত্রে শেখর ওই পথে একলা এসেছে।

বসন্ত বলতো—ডাকাত না থাক, সাপ তো থাকতে পারে—

তা এবার অনেকদিন পরে নির্মল এসেছে, বসন্ত এসেছে আবার। আবার দেখা হবে সকলের সঙ্গে।

সবাই জিগ্যেস করে—শেখরদা' এল না ?

কোথায় স্বরাজগড়ে শেখর নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আপন মনে। তাকে এ-সময়ে গৌরদাসবাবুর ডাকতে খুব ইচ্ছে ছিল না। তবু সুরুচি যখন বলেছে তখন চিঠি লিখতেই হলো।

সকাল থেকেই ফুল-পাতা দিয়ে গেট সাজিয়েছে ওরা। বসন্ত এসেছে আলমোড়া থেকে। আর নির্মলকে গৌরদাসবাবু পাঠিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে। নারকোল ছোবড়ার যত রকমের জিনিস হয় তার কাজ শিখতে।

সুরুচির মনে আছে। তারকেরও মনে আছে। রাহুলেরও মনে আছে। হৈ চৈ করে সবাই এসে ঘিরে ধরলো গাড়ি। কিন্তু এবার সুরুচির পোশাক দেখে নবীনের মাও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। জানা ছিল সব—তবু চোখের সামনে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগলো। যেন চোখ মেলে দেখা যায় না।

সুরুচি হাসলো। হয়ত হাসতে চেষ্টা করলে একবার।

বললে—তাতে কী হয়েছে নবীনের মা, মানুষ কি চিরকাল বাঁচে! আমিও একদিন থাকবো না—

সে-কথা কি নবীনের মা জানে না! ভালো করেই জানে। তবু সংসারের কঠোর নিয়মই তো এই যে পুরোন সত্যকেই নতুন করে দেখে নতুন জ্ঞান পেতে হয়। সূর্য প্রতিদিনই ওঠে, তবু সেই পুরান সূর্যই রোজ নতুন হয়ে ওঠে ভোর বেলা। এমনি করে এই পুরান পৃথিবীকেই তো প্রতিমুহূর্তে নতুন মনে হয়।

গৌরদাসবাবু বললেন—এসো মা, আমার ঘরে বসি—

চালাঘর। স্বল্প জিনিসপত্র। শুধু খানকতক বই। বললেন—কয়েকজন আসতে পারেনি। কিন্তু আমার নির্মল, আমার বসন্ত এসেছে—

সুরুচি জিগ্যেস করলে—আর··· ?

গৌরদাসবাবু বললেন—আর শেখর, সে-ও আসবে লিখেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা আসার কথা ছিল—এখনও তো এলো না দেখছি—আজ সকাল আটটার গাড়িতে যদি আসে—

নির্মল ছেলেটি ভালো। কাছে এল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বসন্তও প্রণাম করলে। সুন্দর চেহারা। গৌরদাসবাবুর উপযুক্ত কর্মী।

সুরুচি বললে—কাকাবাবুর আদর্শে তোমরা মানুষ হও এই কামনা করি—

আরো দু'একটা এমনি সহানুভূতির কথা। প্রীতির কথা। যে সব কথা গৌরদাসবাবুর মুখে বার বার শুনেছে সেই সব কথাই বললে সুরুচি।

নির্মল বললে—আমাদের শেখরদা'কে আপনি দেখেন নি, তাঁরও আসবার কথা ছিল—আমাদের মধ্যে শেখরদাই শুধু গৌরদাসবাবুর আদর্শ মনে-প্রাণে সামনে রেখে এগিয়েছে, আমাদের অনেক ভুল ক্রটি হয়—আমাদের এখনও অনেক সংশোধন করতে হবে—শেখরদার ভুল হয় না—

বসন্ত বললে—অমন চরিত্র হয় না আর—আমরা শেখরদা'র ওপরেই বেশ আশা রাখি—

গৌরদাসবাবু শুনছিলেন এতক্ষণ। বললেন—তাকে তোমার মনে নেই মা, সে এতক্ষণ এখানে থাকলে দেখতে শিবিরে যত ছেলে-মেয়ে সবাইকে নিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করতে বসতো। সে চলে যাবার সময় এখানকার সবাই কেঁদেছিল—জানো মা—

গৌরদাসবাবু বলতে লাগলেন—আমার ইচ্ছে আছে মা, আমাদের দেশের তুলোর সম্পদ বাড়িয়ে আমি পাওয়ার-লুম চালাবো—আমি বাংলা দেশের জমি পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি মা, এখানকার জমিতে যদি তুলোর চাষ করতে পারি, একদিন যেমন ঢাকার তাঁতিরা সমস্ত পৃথিবীতে কাপড় চালান দিত—এক মস্‌লিনই ছিল ছাব্বিশ রকমের টেলর সাহেবের বইতে পড়েছি, আমার আশ্রমে ঢাকার বহু তাঁতি আছে, তাদের ভালো রকম কাজই দিতে পারছি না—তারপর দেখ দোসুতী, শতরঞ্জী, সুসী, নিমজা, চারখানা—কত রকমের জিনিস তৈরি হতে পারে

সুতো নিয়ে অনেক আলোচনা করতে লাগলেন গৌরদাসবাবু।

তারপর বললেন—আমি একদিন ঠিক ও-সব তৈরি করবো মা—তুমি যদি সহায় থাকো, আর শেখর যদি কাছে থাকতে রাজি হয়—

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন শেখর এল না, তখন খাবার ব্যবস্থা হলো। নবীনের মা নানারকম নিরামিষ রান্না করেছে।

সুরুচি বললে—আজ তো একাদশী আমার কাকাবাব—

গৌরবাবু বললেন—আজ কি তুমি কিছুই খাবে না মা ?

স্বরুচি বললে—আজকে আমি নিরম্বু উপবাস পালন করি যে—

গৌরদাসবাবু বললেন—তা হলে তো বড় অন্যায় হলো মা—

তারপর বললেন—তোমার খোকা বোধহয় খেতে পারবে না এখানকার রান্না—

নবীনের মা বললে—ওর তরকারি আলাদা—ওর জন্যে ঝাল বাদ দিয়ে করেছি—

খোকার খাওয়ার পর স্বরুচি বিশ্রাম করছে ঘরে, হঠাৎ রব উঠলো—শেখরদা এসে গেছে—শেখরদা এসে গেছে—

স্বরুচি কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠলো।

আজ কলকাতার এত দূরে এই উদ্বাস্তুশিবিরে নিমন্ত্রিত হয়ে কেবল সেই কথাগুলোই মনে পড়ছে। সামনে মিসেস চৌধুরী চুপ করে বসে আছেন। গান হয়ে গেল একে একে। আবৃত্তি হলো। প্রতিযোগিতার পুরস্কার ঘোষণাও হলো। সব ঘটছে চোখের সামনে। আমি চেয়ে আছি মিসেস চৌধুরীর মুখের দিকে। বড় তাড়াতাড়ি তাঁর অনেক চুল পেকে গেছে। শীর্ণ কিন্তু স্থির, তীক্ষ্ণ কিন্তু উদাস মূর্তি। সমস্ত পরিবেশে এত শব্দ এত কোলাহল এত উদ্দীপনা, কিন্তু মিসেস চৌধুরীর কোনও দিকে লক্ষ্য নেই।

আমার মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা, আর এক রাতের কথা, আর এক জায়গার কথা।

সি. পি-র কোলিয়ারী এরিয়া। চিরিমিরি, কোরাসিয়া অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অন্য এক পাহাড়ের চূড়োয়। আমি অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম কদিনের জন্যে। বিশেষ এক-ধরনের অভিজ্ঞতা। চারদিকে বাঘ, হাতী, দাঁতালো শুওর আর অসংখ্য ময়ূরের রাজ্য। আশে পাশে কয়েক মাইলের মধ্যে কোথাও কোনও মানুষের বসবাস নেই। মাসে একবার করে আলু, পটল, ডিম যোগাড় করে আনা হয়। জিওল মাছ, আর টিনের ফুড্। আর সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ির চারদিকে মাইল খানেক জায়গা ঘিরে আগুন্ জ্বালাতে হয়। শুধু বাঘ নয়, ভালুকের উপদ্রবের ভয়ও আছে।

ভদ্রলোক ভূতাত্ত্বিক। মাটির স্তর পরীক্ষা করে করে খনিজ সম্পদ আবিষ্কার করবার চাকরি করেন।

সেদিন খানিক বেলা থেকে ভীষণ বৃষ্টি। আর ওখানকার বৃষ্টি ক্রমাগত সাতদিন ধরেও হয় মাঝে মাঝে।

একটা লোক সপ্তাহে দু'দিন ডাক দিতে আসে। সোমবার আর শুক্রবার। সকালে ডাক এনে আবার ডাক নিয়ে দুপুর নাগাদ ফিরে যায়। মুখে দাড়ি গোঁফ। লম্বায় ছ'ফুট। চেহারা দেখে বয়েস বোঝবার উপায় নেই। হাতে লাঠি থাকে একটা। খট্ খট্ শব্দ করতে করতে পাহাড়ের গা ঘিরে ঘিরে নামে। তারপর দূরে শাল আর মহুয়া গাছের আড়ালে একসময়ে মিলিয়ে যায়। আমি বাঙলো বাড়িটার ওপর তলার জানলা দিয়ে দেখি।

লাহিড়ী সাহেব বলেন—আমার মেয়াদ ছ'মাসের—তারপর আসবে চাকলাদার—

বলেন—অনেকদিন ধরে আসে লোকটা, ডাক নিয়ে আসে—নামও জানি না ওর কোম্পানী থেকে পঁচিশ টাকা মাইনে পায়—ওতেই চালিয়ে নেয়—বনজঙ্গল মাড়িয়ে ওমনি চাকরি ওর—

আমার কেমন মায়া হলো সেদিন।

লাহিড়ী সাহেবকে বললাম—ও কি করে ফিরে যাবে?

রাস্তা তো একটুখানি নয়। দুধটলিয়া পেরিয়ে আমনধানি তারপর আর একটা চড়াই—চবুতরাই। তারপর কোরাসিয়া। আর তারপর চিরিমিরি। এতক্ষণে পাহাড়ের নদী নালা ভেসে সমুদ্র হয়ে উঠেছে। হয়ত কোনও বাঘ ভাসতে ভাসতে আসছে বন্যার তোড়ে। বলা যায় না। মাঝে মাঝে তীব্র শব্দে মেঘ ডাকছে। এই সকাল দশটার সময়েই রাত বারোটার আবহাওয়া। আর বাইরে তাকালেও সব অন্ধকার। মেঘে বৃষ্টিতে ঝড়ে বিশ্বসৃষ্টি যেন রসাতলে যাবার যোগাড়। তাকাতে ভয় করে। এক-একবার ঝড়ের ঝাপটা আসে আর মনে হয় বাংলোটা যেন ধসে পড়ে যাবে দুধটুলিয়ার খাদে।

লোকটা কিন্তু কিছু কথা বললে না।

লাহিড়ী সাহেবকে জিগ্যেস করলাম—ও কি বাঙালী?

উদ্বাস্তু শিবিরের সভায় তখন একটি মেয়ে গাইছে—

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,

করুণাঘন ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য !

মিসেস চৌধুরী যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন—কিন্তু এক মিনিটের জন্যে। তারপরেই আবার সেই উদাস দৃষ্টি। এখানকার অধ্যক্ষ পাশেই বসেছিলেন। তিনিও একটু উস্‌খুস করে উঠলেন।

আমাকে যে ছেলেটি নিয়ে এসেছিল সে বললে—এটা আমাদের শেখরদার খুব প্রিয় গান—

জিগ্যেস করলাম—শেখরদা ?

—হ্যাঁ, এটা বলতে গেলে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি মারা গিয়েছেন—

—মারা গিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, সে ভারি স্যাড্‌—একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছিল। আপনাকে দেখাবো তাঁর স্মৃতিফলকটা—মিসেস চৌধুরী প্রতিবছর এই দিনে ওখানে ফুলের মালা দিয়ে যান একটা করে—

মনে আছে সেদিন ভুধটুলিয়া পাহাড়ের চূড়োয় বৃষ্টিটা আরো বেড়ে উঠেছিল। লাহিড়ী সাহেব সেদিনের মত তাঁর কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজের ঘরে শুতে গেলেন। আমিও খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে গিয়ে একটা বই নিয়ে বসেছি। হঠাৎ কাঁচের জানলার বাইরে যেন কিসের শব্দ হলো।

জানলাটা খুলতেই দেখি লোকটা এতক্ষণ বৃষ্টির জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়বার আর কোনও আশা না দেখে বাইরে বেরিয়েছে। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মাথার চুল দাড়ি গোঁফ জামা কাপড় সব ভিজে গেছে।

কী যে হলো। সেই মুহূর্তেই দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ধরলুম তাকে।

বললাম—ভেতরে আসুন—

বললে—না—

বললাম—বৃষ্টি থামলে না হয় যাবেন—

বললে—এ বৃষ্টি থামবে না—

বললাম—আপনি বাঙালী ?

নিজের জামা কাপড় বার করে তাকে পরতে দিয়ে বললাম—বৃষ্টি থামলে যাবেন, এখন আপনি গেলে মারা পড়বেন।

কিন্তু তবু নিজের সন্দেহ যেন গেল না। মনে হলো—একটু চোখের আড়াল

হলেই যেন পালাবে। চোখে চোখে রাখলাম সমস্ত দিন। আর বৃষ্টিও চললো সমানে।

রাত্রে লাহিড়ী সাহেবকে বললাম - আপনি খেয়ে নিন্, আমার ক্ষিদে নেই, আমার খাবার ঢাকা থাক।

তারপর সবাই যখন শুয়ে পড়েছে, তখনও যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে লোকটা।

শেষে আরো জোরে বৃষ্টি নামলো। এক বিছানার সান্নিধ্যে যখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলাম তখন তারও ঘুম এল না, আমারও না। অনেক পীড়াপীড়িতে যখন ভদ্রলোক কিছুই খেলেন না—আমারও খাওয়া হলো না।

আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে ধরে রাখা বুঝি পৃথিবীর ধর্ম নয়, পৃথিবীর ধর্মই হলো দূরে সরিয়ে দেওয়া। মানুষ বলে—ওই মানুষটিকে আমার চাই, ওই জিনিসটি আমি নেব, সংসার বলে—তোমায় ছাড়তে হবে। তোমার সব কেড়ে নেব! মানুষের সঙ্গে সংসারের এই সংগ্রামের মধ্যে একটি কথা বারবার মনে হয়েছে। যখনি রাত্রে একলা শুয়ে বসে থাকি কেবল ওই একটি কথাই মনে পড়ে—এর সমাধান কোথায়! কেমন করে সমাধান করলে সমস্ত জিনিসের সমন্বয় হয়। সুষ্ঠু হয়। সকলের তুষ্টি বিধান হয়!

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন ঘোড়ায় গাড়ি টানে বলে গাড়িটা তো ঘোড়ার নয়।

উপন্যাস নয়, কাব্য নয়, লোকগীতিও নয় যে মনগড়া একটা পরিণতি করিয়ে সকলের তুষ্টিবিধান করবো।

সেদিন কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে একটি নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়োর ওপর আমার যেন দিব্যচক্ষু খুলে গেল। মানুষ দূরে গিয়েও আবার এত কাছে থাকতে পারে কী করে। দূরে গেলেই কি দূরে যাওয়া যায়! নাকি দেহ অতিক্রম করেও দেহাতীতকে এমন করে কেউ পেয়েছে এর আগে!

রাত তখন একটা, তখনও বৃষ্টির শেষ নেই। বোধহয় চারদিকের সেই কলশব্দের আড়ালে আত্মগোপন করেই ভালো করে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়।

গান তখনও চলেছে—

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ভদ্রলোক বললেন—সেই দুপুর বেলা আমি সুরাজগড় থেকে গিয়ে পৌছুলাম আমাদের আশ্রমে।

বললাম—তারপর ?

রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। গল্প শুনতে শুনতে মনে হলো যেন আবার এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে চলে গেছি। যে-যুগের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল আজকের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ,আজকের চোখে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। মানুষের সেই ব্যবস্থার জটিলতায় সব গোলমাল হয়ে গেছে বুঝি আবার। আজকের মানুষের সমাজের কাছে যা দুর্বোধ্য, যা অশ্লীল, যা কুৎসিত। মহাযুদ্ধের আবির্ভাবে আজ বুঝি আবার সেই আদিম হয়ে গেছি আমরা, সেই বর্বর, সেই বন্য।

মনে হলো বহু প্রাচীন যুগ থেকে সুরু করে সেই যে এক অবিনশ্বর মানুষ একদিন এক উষালগ্নে দুর্গমের পথে যাত্রা করেছিল, সে কি তার একাকীত্বের দৈন্যের তাগিদে, না বহুর মধ্যে বিচিত্র্যের মধ্যে আপনার শক্তিকে বিস্তৃত করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নানাভাবে উপলব্ধি করবে বলে? এই যে এত বেদপাঠ, এত উপনিষদপাঠ, এত বুদ্ধ, এত চৈতন্য, এত খৃস্ট এল, এত ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁথি লেখা হলো, খবরের কাগজ, ছাপাখানা,—এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত কর্মপ্রচেষ্টা দূরে দূরে ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো, সে কি এই জন্যে ? বিরাটকে সঙ্কীর্ণ করতেই কি এত সাধনা ? সকলের প্রেম অস্বীকার করে একাকীত্বের দৈন্য নিয়ে সঙ্কুচিত হতেই কি এত তপস্যা ?

দলে দলে ছেলেরা মেয়েরা শেখরকে ঘিরে এসে দাঁড়াল সামনে।

গৌরদাসবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন—এত দেরি হলো—ট্রেন লেট ছিল বুঝি ?

তারপর বললেন—চলো, আমার মা-জননীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—

ভেতর থেকে সমস্ত কানে আসছিল।

গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—সতীলক্ষ্মীর প্রসাদ আমরা পেয়েছি, এ আমাদের সৌভাগ্য শেখর—আমাদের অন্তরে ছিল আকাঙ্খা, উদ্যোগ, সব, কিন্তু শুধু আকাঙ্খা আর উদ্যোগ থাকলে তো চলে না—তার সঙ্গে চাই বাইরের আশীর্বাদ—স্বামী ছিল, কিন্তু শান্তি ছিল না তাঁর, তাঁর দান গ্রহণ করে আমাদেরই শুধু উপকার হয়নি তাঁরও চরম উপকার হয়েছে—

ঘরের দরজাটা খুলতেই শেখর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওপাশে তক্তপোশটার ওপর খোকা ঘুমোচ্ছে আঘারে।

সুরুচি দাঁড়িয়ে আছে কাঠ হয়ে। তার সাদা থান পরা মূর্তিটা যেন নিস্প্রাণ পাথরের মত নিস্পন্দ।

গৌরদাসবাবু বললেন—ইনিই আমাদের এই আশ্রমের সকলের মা-জননী—প্রণাম করো শেখর ওঁকে—ওঁর আশীর্বাদ পেয়েছি আমরা – আশীর্বাদ পেয়ে আমরাই শুধু ধন্য হইনি উনিও আমাদের উপকার করবার জন্যে তৈরি ছিলেন—আমরা যখন চারিদিকে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হচ্ছি তখন খবরও রাখিনি যে আমাদের অন্তরাত্মার অচল বেদীতে মা-জননী মুক্তহস্ত হয়ে বসে আছেন—

বহুদিন আগে একদিন সবজিবাগানের বাড়ির দরজা ঠেলতেই যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে ছিল কুমারী, তারপর গ্রে-স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় উঠে যার সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ দেখা হয়েছিল সে ছিল সিমন্তিনী, আর তারপর আজ এতদূর থেকে যাকে দেখবে বলে এসেছে, সে বিধবা। কিন্তু সেই তিনজনই কি এক লোক! শেখরের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর, সব যেন হারিয়ে গেছে এখন, এই মুহূর্তে।

গৌরদাসবাবু কিন্তু তখনও বলছেন—তোমাকে আমি যে-কথা একদিন বলেছিলাম, এঁকেও সেই কথাই বলেছি। বলেছি—নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে যতদিন না সেই প্রেমকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পারি ততদিন অন্যের সঙ্গে তো আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না—

তারপর বললেন—এঁকে আমি আরো বলেছি শেখর—বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, বিশ্বের দিকে নিজের আত্মাকে ব্যাপ্ত করার পদ্ধতির নামই মৈত্রীভাবনা—এই মৈত্রীভাবনাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল কথা—বলেছি শেখরই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ—বলেছি···

কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন তিনি।

বললেন—তোমরা কি পরস্পরকে চেনো নাকি?

শেখর বললে—চিনি—

গৌরদাসবাবু সুরুচির মুখের দিকে চাইলেন।

বললেন—তুমিও চেন মা শেখরকে—? তুমি বোধহয় তখন খুব ছোট,

কিছু মনে নেই তোমার—এই শেখরই আমার সমস্ত কর্মের ভার একদিন নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল, এই শেখরই আমার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী—এমন জিতেন্দ্রিয়, সৎ, কর্মঠ ছেলে যদি ঘরে ঘরে সৃষ্টি হয় তো সমস্ত দেশের তা সম্পদ সমস্ত দেশের তা মঙ্গল—

বললেন—বসো মা বসো—শেখর, তুমিও অনেক দূর থেকে আসছো—বিশ্রাম নিয়ে তারপর না হয়—

বলে নিজেও বসলেন। বললেন—যাও শেখর, হাতমুখ ধুয়ে আগে সুস্থির হও—

শেখর নিঃশব্দে চলে গেল।

গৌরদাসবাবু বললেন—জানো মা, এই শেখরই প্রথম এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আমায় বলেছিল—বলতে গেলে গোড়া থেকে সবটাই ওর কৃতিত্ব—এর জমিটা পর্যন্ত ওর পছন্দ করা।

তারপর বললেন—একদিন এখানে মানুষের ব্যবসা চলতো জানো—দাসত্বের পাইকারী বাজার ছিল এটা, কথাটা শোনবার পর থেকেই ওর জেদ বেড়ে গেলে—তারপর ওরই চেষ্টায় সব হলো—ভেবেছিল পৈত্রিক সম্পত্তির সাহায্য নিয়ে একে আরো বড় করে গড়ে তুলতে পারবে—কিন্তু—

সুরুচির মনে হলো—এবারও শেখরদা বুঝি আবার দূরে চলে যাবে সেদিনকার মত—আবার হারিয়ে যাবে নিরুদ্দেশে, আর তার দেখা পাওয়া যাবে না।

সুরুচি বললে—এবার আমি আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্যে বেশি কিছু আনতে পারিনি কাকাবাবু, আমার গায়ের গয়না যা কিছু পেয়েছিলাম দিয়ে গেলাম—আর আমার কিছু রইল না—আমার বলতে আমার নিজের আর কিছুই নেই—

গৌরদাসবাবু বললেন—সে কি মা?

সুরুচি বললে—হ্যাঁ, আমার স্বামী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর উইলে তাঁর নিরুদ্দিষ্ট ছেলেকে দিয়ে গেছেন—

—কাগজে সে বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি মা।

সুরুচি বললে—তাঁর ছেলেকে তার সমস্ত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমি আপনার কাছে আপনার কোলে আশ্রয় নিতে চাই কাকাবাবু—আমাকে আপনি আশ্রয় দেবেন না?

গৌরদাসবাবু বললেন সে কি কথা মা, অর্থের জন্যে তোমার কাছে হাত পেতেছি বটে, তবু অর্থহীনদের আশ্রয় দেবার জন্যেই তো এই আশ্রম · তবে তা যেন হলো, কিন্তু সেই ছেলে ? তার সন্ধান কি তুমি পেয়েছ ?

সুরুচির সমস্ত দেহ শিরশির করে উঠলো।

বললে—পেয়েছি --

গৌরদাসবাবু বললেন—তা হলে তাকে তুমি তোমার স্বামীর সমস্ত কিছু দিয়ে দাও—আশ্রয়ের জন্যে তুমি ভেবো না – মা-জননীর আশ্রয় তো আমার অন্তরাত্মায় মা--

সুরুচি বললে—তাকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতেই তো আমার এই এত চেষ্টা কাকাবাবু ·

গৌরদাসবাবু বললেন—তাই দাও–তাকে বোল যে প্রকৃত বিত্ত অর্থে নেই, সে বিত্ত আছে অর্থের সদ্ব্যবহারে—অর্থ যদি প্রকৃত বৈভব না দেয় তো অর্থহীনরাই প্রকৃত বিত্তবান --

সুরুচি বললে—যখন ছোট ছিলাম তখন অর্থের প্রয়োজন ছিল বড় বেশি তাই প্রাণপণে অর্থই চেয়েছিলাম—

গৌরদাসবাবু বললেন—কিছু অন্যায় তো করোনি মা, অর্থের প্রয়োজন এ-সংসারে কে অস্বীকার করতে পারে বলো—

সুরুচি বললে—কিন্তু নিজের জন্যে আমি অর্থ চাইনি কাকাবু—চেয়েছিলাম ওর জন্যে, ওই রাহুলের জন্যে—

রাহুল তখনও ঘুমোচ্ছে।

সুরুচি বললে—ওই রাহুলই আমার কলঙ্ক কাকাবাবু, আমার পাপ—

বলতে বলতে হঠাৎ কঠিন পাথর যেন বেদনার্ত হয়ে বিগলিত হয়ে পড়লো এক মুহূর্তে।

গৌরদাসবাবু বললেন—যখন তুমি হলে মা তখন সদানন্দ চিঠি লিখেছিল আমাকে বড় দুঃখ করে—আমি লিখেছিলাম, মেয়েকেই তোমার ছেলের মতন মনে করো, অবাধ্য অশিক্ষিত ছেলের চেয়ে মেয়ে হওয়া অনেক ভালো—মেয়েকেই মানুষ করে তোল—ছেলে মনে করে—

সুরুচি তখনও আঁচলে মুখ ঢেকে অঝোর ধারে কাঁদছে।

গৌরদাসবাবু বললেন—আজ সে বেঁচে থাকলে দেখতো তার মেয়ে আমার

হাজার সন্তানের মা-জননী হতে পেরেছে—সতীলক্ষ্মী হতে পেরেছে,—স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হতে পেরেছে - সে যোগ্য স্বামীর উত্তরাধিকারী হতে পেরেছে—

সুরুচি বললে—আপনি আমাকে আর ও-সব বলবেন না কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—তুমি কেঁদো না মা—মা কাঁদলে সন্তানের অমঙ্গল হয় যে—

সুরুচি হঠাৎ বললে - আপনি আমায় কথা দিন, আমার সন্তানের ভার নেবেন —

গৌরদাসবাবু বললেন—সন্তান তো তোমার একটি নয় মা—আমিও তো তোমার সন্তান—এখানকার হাজার হাজার ছেলে মেয়ে তোমার সন্তান—তুমিই তো সকলের ভার নিয়েছ মা—আমরা যে সবাই তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি—

সুরুচি বললে - তাদের কথা বলছি না—আমার নিজের সন্তানের কথা বলছি কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু হাসলেন। বললেন—জানি, তোমার নিজের সন্তান নেই—কিন্তু আমরা কি তোমার নিজের সন্তান নয় মা? চৌধুরী সাহেবকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তাঁর কথা তো শুনেছি—অনেক সৌভাগ্যে তবে অমন স্বামী পাওয়া যায় মা—

সুরুচি বললে—বাবা মারা যাবার সময় কথা দিয়েছিলেন যেন আমি ওঁকে বিয়ে করি—তাঁর ইচ্ছেতেই আমার বিয়ে হয়েছিল সে আপনি জানেন না কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—চৌধুরী সাহেবকে না দেখলেও সদানন্দকে তো দেখেছি, সে যখন দেখে শুনে তোমার বিয়ে দিয়েছিল তখন সে ভাল বুঝেই তা করেছিল—সদানন্দকে আমি যেমন চিনেছি তুমি তার মেয়ে হয়েও তেমন করে চিনতে পারোনি মা, সে নিজে ছিল নিষ্কলুষ—কলুষকে সে কখনও ক্ষমা করেনি—কোনও বড় প্রলোভনেও না—

সুরুচি বললে—কিন্তু আমি পাপিষ্ঠা কাকাবাবু—সেই নিষ্কলঙ্ক পুরুষকেও আমি প্রবঞ্চনা করেছি—

গৌরদাসবাবু বললেন—ভুল কথা মা, হীরেকে হাজার টুকরো করলেও হীরে হীরেই থাকে—মাটির সংস্পর্শে এলেও হীরের হীরেত্ব ঘোচেনা—

সুরুচি চোখ মুছতে মুছতে বললে—আমি সেই হীরেরও অপমান করেছি কাকাবাবু—আমার অন্যায়, আমার পাপ, আমার কলঙ্কের যে ক্ষমা নেই—

গৌরদাসবাবু আবার হেসে উঠলেন হো হো করে।

বললেন—অন্যায় কে না করে মা, ভুল কার না হয়েছে, আমারই কি ভুল ক্রটি কম হয়েছে—জ্ঞানে অজ্ঞানে কত ভুল যে করেছি—এখনও করি—মহাভারতে স্বর্গারোহণ পর্বে পড়েছি যুধিষ্ঠির কুরুরাজ দুর্যোধনকে স্বর্গে দেখে বড় অবাক হয়েছিলেন—মনে আছে তো মা?

সুরুচি বললে—আমার কাছে এই পৃথিবীই যে আমার স্বর্গ কাকাবাবু—এখানেও আমি নরকবাস করছি—আমার রাহুলই আমার নরক—ওর জন্যেই আমার এই নরকবাস—

গৌরদাসবাবু বললেন—ও কথা বলতে নেই মা—

সুরুচি বললে—ও কথা বলতেও আমার আসা কাকাবাবু—আমি আজ সব কথা বলতেই যে এসেছিলাম—

গৌরদাসবাবু বললেন—বলো না মা, আমিও তো শুনবো বলেই হাজির—

সুরুচি বললে—সব অপরাধ স্বীকার করে নিঃশেষ হবো ভেবেছিলাম কিন্তু যাকে শোনাতে চেয়েছিলাম সে তো শুনলো না কাকাবাবু—

গৌরদাসবাবু বললেন—কার কথা বলছো মা? কার কথা? শেখর? শেখর তো আসবে, খাওয়া দাওয়া করেই আসবে সে—

সুরুচি বললে—না কাকাবাবু, সে আর আসবে না—

গৌরদাসবাবু বললেন—নিশ্চয় আসবে মা, আমি বলছি—শেখরকে তুমি তা হলে চিনতেই পারোনি—

সুরুচি বললে—না কাকাবাবু, সে আর আসবে না আমি জানি—এখন সে অনেক দূরে চলে গেছে—

গৌরদাসবাবু বললেন—দাঁড়াও, এখনি তাকে ডেকে আনছি, নিশ্চয় আসবে সে, শেখরকে তুমি চেননি মা—

বলে গৌরদাসবাবু বেরিয়ে গেলেন।

বৃষ্টি তখনও অঝোর ধারায় ঝরছে। দুধটুলিয়া বুঝি ভেসে যাবে। বাইরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। দুধটুলিয়ার পর আমনধানি তারপর চবুতরাই।

চবুতরাই পেরিয়ে কোরাসিয়া। আর তারপর চিরিমিরিতে পৌঁছলে সভ্য-জগতের সীমানা আয়ত্ত।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—রাত দুটো।

বললাম—তারপর?

সেদিন সেই সভায় বসে আমি যেন দিশাহারা হয়ে গেলাম। সভার সামনে হাজার হাজার নর-নারীর ভিড়। গৌরদাসবাবুর খদ্দরপরা প্রশান্ত মূর্তি। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। আর সভার মধ্যস্থলে মিসেস চৌধুরী যেন প্রাণহীন পুতুল। গলার ফুলের মালাটা সামনে টেবিলের ওপর রাখা। তিনি বসে আছেন—কিন্তু কিছুই যেন কানে যাচ্ছে না।

বার বার সন্ধান করে দেখলাম—কোথায় রাহুল। মিসেস চৌধুরীর ছেলে? সামনের অসংখ্য ছেলের মধ্যে হয়ত কোথাও বসে আছে। আমার চিনতে পারার কথা নয়—তবু বার বার মুখগুলোর ওপর চোখ বুলোতে লাগলাম।

মেয়েটি তখনও সেই গানটা গাইছে—

নূতন তব জনম লাগি কাতর সব প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,—

আমার মনে পড়লো আড়াই হাজার বছর আগেকায় এক রাজার ছেলের কাহিনী। কপিলাবস্তু নগরে সেদিন আলোর মালা দুলছে চারিদিকে। রাজার প্রাসাদের প্রমোদ কাননে উৎসব আরো জমে উঠেছে। শত শত সুন্দরীর পায়ে বেজে উঠছে নূপুরের ঝঙ্কার। উৎসবে গা এলিয়ে দিয়ে উন্মত্ত হয়ে আছে কুমার সিদ্ধার্থ। রাজার আদেশ ছেলেকে উৎসবের আনন্দে ভুলিয়ে রাখতে হবে দিনরাত। কোথাও কোনও শোকের চিহ্ন না নজরে পড়ে, জরার সাক্ষী না দেখে, মৃত্যুর পরিচয় না পায়। সমস্ত রাজ্যের বিলাস-ব্যসন এনে ঢেলে দাও তার পায়ে। মায়ায় ভুলে মশগুল হয়ে যাক কুমার।

হঠাৎ খবর এল—কুমারের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

রাজা নাম রেখেছেন—রাহুল।

এক নিমেষে কুমারের চোখে সমস্ত আলো নিভে এল। এক নিমেষেই ক্লান্ত হয়ে এল কুমার।

মনে হলো—রাহুলং জাতস্তি বন্ধনং জাতস্তি—এ সংসারের বন্ধনে আর একটা গ্রন্থি পড়লো এবার।

গৌরদাসবাবু তখন বলছেন—আজকের এ-অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের শিবিরের বিশিষ্ট ও প্রধান কর্মীর স্মৃতিবেদীমূলে মাল্য অর্পণ করবেন সভানেত্রী সুরুচি চৌধুরী। শেখরনাথ দত্ত একদিন এ-শিবিরের প্রাণস্বরূপ ছিলেন—বলতে গেলে আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ—তাই এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতিবছর আমরা ফুলের মালায় সাজিয়ে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করি। তিনি আমাদের সমস্ত নশ্বর বন্ধন ছিন্ন করে, পার্থিব সুখ ভোগবাসনা ত্যাগ করে পরম সুখের সন্ধানে অমরলোকে চলে গেছেন—তাঁকে স্মরণ করে 'ত্রিপিটকে'র সেই শ্লোকটি আমরা পাঠ করি আর তাঁর প্রিয় সঙ্গীতটি গান করা হয়—

একজন ছোট ছেলে আবৃত্তি সুরু করলো—

নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সা পিতা।—
নিব্বুতা নূন সা নারী যসসায়ং ঈদিশো পতীতি···

ভদ্রলোক বললেন—কিন্তু আমি মরিনি, মরতে আমি পারলাম না—

দুধটুলিয়ার এই পাহাড়ে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঠেলে চিরিমিরি থেকে কোম্পানীর ডাক নিয়ে আসেন সপ্তাহে দু'বার। অতি তুচ্ছ কাজ। কিন্তু তুচ্ছ কাজের মধ্যেও যেন সেই ক্ষীণ আলোয় চোখে মুখে কেমন প্রশান্তি দেখেছিলাম তাঁর। রোদ বৃষ্টির কোনও অত্যাচার তাঁকে টলাতে পারেনি। নিজের অস্তিত্বটুকু বিশ্ব-সংসার থেকে লুকিয়ে রাখতে যেন বড় ব্যস্ত দেখলাম। আমার পাশে বসে গল্প করছেন, অথচ আমার কাছেও যেন নেই। যেন 'ত্রিপিটকে'র সেই 'নিব্বুত', সেই নির্বাণ, সেই পরম ও চরম সুখের সমুদ্রে আকণ্ঠ অবগাহন করে আছেন সর্বক্ষণ!

আবার বললাম—তারপর?

তারপর দুপুরবেলা শিবিরের একটা ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ কেটে গেল। গৌরদাসবাবু শেখরকে ডাকতে গেছেন।

সুরুচি তখনও তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে। রাহুল তখনও ক্লান্তিতে তক্তপোশের ওপর ঘুমোচ্ছে।

শেখর এসে ঘরে ঢুকলো।

মুখ নিচু করে বললে—আমায় ডেকেছিলেন আপনি?

শেখরের কণ্ঠ যেন বহু শতাব্দীর সমুদ্র পার হয়ে সুরুচির কানে ভেসে এল।

সুরুচি পাথরের মত কঠিন হয়েই জবাব দিলে—তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি—

শেখর আবার মুখ নিচু করলে।

বললে—কী বলবেন বলুন—

সুরুচি বললে—আর তো তোমার বাড়ি ফিরে যেতে কোনও বাধা নেই—আমিও আর আগের সুরুচি নেই, তুমিও আর সেই আমার আগেকার শেখরদা নও—

সুরুচি থামলো একবার। শেখর বললে—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

সুরুচি দাঁতে দাঁত চাপলো।

বললে—শোনবার অবসর যদি তোমার থাকে, তো বলবার কথারও আমার শেষ হবে না জীবনে—

খানিক চুপ করে থেকে শেখর বললে—আপনার সব কথা আমি শুনতে বাধ্য—

সুরুচি বললে—তোমাকে শুনতে বাধ্য করবো তেমন অহঙ্কার আমার একদিন বোধহয় ছিল, কিন্তু আমার ঈশ্বর আজ সে-অহংকার কেড়ে নিয়েছেন—আর এখন তো মাথা পেতে শাস্তি নেবারই পালা কেবল—

শেখর বললে—তবে কি এখানে এসেছেন আমাকে দায়ী করতে?

সুরুচি সোজাসুজি মুখ তুলে চাইল শেখরের দিকে।

বললে—তুমি আর একবার বলো কথাটা! আর একবার বলো!

শেখর চুপ করে রইল শুধু।

সুরুচি বললে—অনেক গুণ তোমার ছিল, অনেক শিখেছি তোমার কাছে—কিন্তু এমন ভীরু তো ছিলেনা আগে, এমন করে তো মনুষ্যত্বের অপমান আগে করতে পারতে না—

শেখর কিছু কথা বললে না। শুধু চুপ করে রইল।

সুরুচি বললে—সর্বনাশের কথাটা আর বলবো না, ওটা বড় পুরান কথা—। আর আমাদের গরীবের সংসার, নিরপরাধ সরল সৎ বাবা, সংসারপটু মা, পিসীমা, তাঁদের মর্মান্তিক দুঃখের কথাটাও বলবো না—ওটাও বড় পুরান

কাহিনী, শুনে কারো চোখে এক ফোঁটা জলও আসবে না—আর তোমার বাবা! সমস্ত থেকেও তাঁর স্ত্রী হয়ে আমি ফুলশয্যার রাতটি থেকে সুরু করে তাঁকে যে প্রবঞ্চনা করেছি তার কথাও বলবো না—

সুরুচি একটু দম নিলে।

শেখর মুখ তুলে চাইলে সুরুচির দিকে।

বললে—আরো কিছু বলবার আছে আপনার?

সুরুচি দৃঢ় গলায় বললে—বলেছি তো বলার আমার শেষ নেই, কিন্তু এইটুকু শুনেই ক্লান্তি এলে তো চলবে না তোমার, এ সুযোগ হয়ত আর আমার আসবে না—আমি আজ বলবোই—

বলে সুরুচি উঠে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

শেখর চেয়ে দেখলে চুপ করে।

সুরুচি বললে—দরজা বন্ধ না করলেও চলতো—কিন্তু তোমার কথা ভেবেই বন্ধ করলাম—

শেখর বললে—আমার কথা ভেবে?

সুরুচি বললে—আমি আজ সব পাপ সব পুণ্যের ওপরে শেখরদা, কলঙ্কে বঞ্চনায় আমার দেহ মন সব অবশ অসাড় হয়ে গেছে একেবারে, এখন আমার পিঠে দশ ঘা চাবুক মেরে দেখো এতটুকু জ্বালা করবে না—এতটুকু দাগ বসবে না—আমি এতটুকু কাঁদবো না পর্যন্ত—

বলতে বলতে সুরুচির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

শেখর বললে—তবে কি আমার কথা ভেবেই দরজা বন্ধ করলেন?

সুরুচি বললে—তোমার কিসের দুঃখ বলো? তুমি কি জানো রাতের পর রাত ঘুম-না-আসা কাকে বলে? তুমি কি জানো শেখরদা সিঁথির সিঁদুরে কত জ্বালা? এই সাদা থান—এই একাদশী কত বড় বঞ্চনা?—

শেখর তবু চুপ করে রইল।

তারপর বললে—আমাকে দায়ী করলেই যদি সব দুঃখ ঘোচে আপনার, তবে আমি স্বীকার করছি আমি দোষী—

সুরুচি হেসে উঠলো। বললে—ছিঃ, এত ভয়? এত ভীরু তুমি?

বলে দরজার খিলটা আবার খুলে দিয়ে এল।

বললে—ভেবেছিলাম অন্তত জেল-খাটা লোক, সাহসটা এখনও আছে,

ওরা সবাই যখন তোমার প্রশংসা করে, ভাবি নিজের যা-ই হোক, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তো সার্থক হয়েছো তুমি—তোমার সম্মান হোক, প্রতিষ্ঠা হোক, তোমার দেশ-সেবা জয়যুক্ত হোক, তাতে তো আমার আনন্দ হবারই কথা—কী বলো!

শেখর কিছুই বললে না এবার।

সুরুচি বলতে লাগলো—ভাবি তোমার আনন্দেই তো আমার আনন্দ, তোমার জয়েই তো আমার জয়, তোমার প্রশংসায় তো আমারই প্রশংসা, ভাবি তুমি আমি কি আলাদা শেখর দা?

শেখর এবারও চুপ করে রইল।

গৌরদাসবাবু হঠাৎ বলতে বলতে ঢুকলেন—এই দেখ মা-জননী, কাজের ভিড়ে তোমার কাছে আসতেই পারিনি, আমার সরষের তেলের ঘানিটা ওদিকে বিগড়ে গেছে—এখনও সারা হয়নি—তবু একটু দেখতে এলাম—

শেখর বললে—আমি যাচ্ছি—দেখি—

গৌরদাসবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন—না না, তুমি মা-জননীর সঙ্গে কথা বলো—বসন্ত নির্মল ওরা দেখছে—আমি একটু দেখতে এলাম মা-জননীর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা—শেখরের সঙ্গে গল্প করো মা, শেখর আমাদের প্রতিষ্ঠানের গৌরব—এমন ছেলে তুমি দু'টো পাবে না মা—তুমি গল্প করো, আমি আসছি—

গৌরদাসবাবু আবার চলে গেলেন।

সুরুচি বললে—বাইরের মানুষের কাছে এই পরিচয়টাই তোমার বড় হয়ে রইল যে তুমি মহৎ—তুমি সৎ—তুমি আদর্শ-চরিত্র—

শেখর এতক্ষণে কথা কইলো। বললে—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

সুরুচি বললে—বলেছি তো, বলবার আমার অনেক কিছু আছে, সারা জীবন ধরে বললেও বলার শেষ হবে না—কিন্তু সে থাক—তোমারই বা কী বলবার আছে শুনি!

শেখর বললে—আমার কিছুই বলার নেই—

সুরুচি বললে—তা থাকবে কেন, তাতে যে মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, তাতে যে গৌরবের হানি হয়—

শেখর বললে—আমার গৌরব হানি কী করলে হয় জানি না, কিন্তু তোমার যদি তাতেই আনন্দ হয় তো আমি তাও করতে প্রস্তুত—বলো কী করতে হবে? কী করলে তুমি সুখী হও?

সুরুচি বললে—আমার সুখের সাধ মিটে গেছে শেখরদা, কিন্তু বলতে পারো, বড় হলে ওকে আমি কী বলে বোঝাবো? ওর আমি কী পরিচয় দেব? আমি যে আর পারি না,—আমি যে…

বলতে বলতে সুরুচি আবার ভেঙে পড়লো। দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে।

তারপর তেমনি করেই বলতে লাগলো—মেয়েমানুষ হলে বুঝতে শেখরদা, মা হয়ে এত বড় লজ্জা আর নেই, এত বড় অভিশাপ আর নেই—

শেখর বললে—আমার দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয় সব করতে পারি—কিন্তু আমাকে বলে দাও আমি কী করবো?

সুরুচি বললে—তুমি না মহৎ, তুমি না সত্যবাদী—! তুমি না সততার বড়াই করো!

শেখর বললে—বড়াই করি কি না সে আমি জানি—কিন্তু কী করতে হবে বলো!

সুরুচি বললে—তার চেয়ে তুমিই আমাকে বলো আমার রাহুলের কী পরিচয় আমি দেব!

শেখর বললে—কী পরিচয় দিতে পারলে খুশি হও বলো?

সুরুচি এবার মুখ তুলে সোজা কঠোর দৃষ্টি দিয়ে চাইলে শেখরের মুখের দিকে—তারপর বললে—দেখছি, তুমি শুধু মিথ্যেবাদীই নও—তুমি ভণ্ড—

শেখর চুপ করে রইল।

সুরুচি বললে—তোমার নিজের নামটা থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু তুমি করেছ, যা কিছু তুমি ভেবেছ, সবটাই তোমার ভণ্ডামী. সবটাই তোমার মিথ্যে—তুমি নিজে মিথ্যেবাদী হয়ে তোমার সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের সকলকে মিথ্যেবাদী করে তুলেছ, তোমার বাবাকে, আমাকে, রাহুলকে, গৌরদাসবাবুকে, আমাদের আশ্রমের সমস্ত লোককে আজ ভণ্ড করে তুলেছ—তুমি এর কী জবাবদিহি করবে বলো?

শেখর বললে—আমি তো বলেছি আমি দোষ স্বীকার করছি—

স্নুরুচি বললে— তুমি কি মনে করো ক্ষমা চাইলেই সব দোষ খণ্ডন হয় ?

শেখর চুপ করে রইল।

স্নুরুচি বললে—তুমি ক্ষমা চাইলেই আমার রাতের ঘুম আবার ফিরে আসবে, আমার সিঁদুরের জ্বালা আবার জুড়িয়ে যাবে, আমার সাদা থান আবার রঙিন হয়ে উঠবে, আমার একাদশী আবার সার্থক হবে, তাই না ?

তারপর আবার একটু থেমে বললে— মা হওনি তো শেখরদা, বাপের কর্তব্যও করোনি, স্বামীর দায়িত্বটুকুও নিলে না, তোমার কী! মুখের বুলি আর বাইরের ভণ্ড ব্রহ্মচর্যই তোমার সম্বল, এর চেয়ে সংসার করা আরো কঠিন, এর চেয়ে স্বামী হওয়া বাপ হওয়া, ভাই হওয়া আরো কঠোর পরীক্ষা, তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ শেখরদা, তুমি একেবারে বয়ে গেছ···

বলতে বলতে হঠাৎ চীৎকার করে স্নুরুচি হেসে উঠলো। সে হাসিতে ঘর যেন ফেটে গেল। সে হাসি যেন আর্তনাদের মত শেখরের কানে এসে বাজলো। মনে হলো স্নুরুচি যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।

বড় ভয় করতে লাগলো শেখরের।

হঠাৎ নিঃশব্দে শেখর দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই স্নুরুচি বাঘের মত থাবা দিয়ে শেখরের হাতটা ধরে ফেলেছে।

—পালিয়ে যাচ্ছো যে ?

—তোমার মাথার ঠিক নেই।

সুরুচি দৃঢ়-কঠিন দৃষ্টিতে চোখে চোখ রেখে বললে—আমার মাথার বদনাম দিয়ে পালাতে পারবে তুমি ভেবো না—ভেবো না হিন্দুঘরের কুলবধূ আমি, আমি অফিস চালাই, হাজার হাজার লোক আমার কথায় ওঠে বসে, আমার অফিস থেকে মাইনে পেলে হাজার হাজার রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ে—আমি হাসলে তারা কৃতার্থ হয়—আমি কারো সঙ্গে ডেকে কথা বললে সে ধন্য হয়, আমাকে যা দেখছো আমি তা নই—

শেখর বললে—তা আমি জানি—

স্নুরুচি বললে—শুধু সেইটুকুই জানো! আর কিছু জানোনা বুঝি ? জানো না কে আমায় এ-রকম করেছে! কার অপমানে আমার এমন হয়েছে ? বলো, তুমি জানোনা তা ?

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু আমি তো এসব কিছু চাইনি, আমি তো

তোমাদের পার্টির মেম্বর হতে চাইনি, তোমার বাইরের জগতের সঙ্গে আমি তো কোনোও যোগ রাখতে চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম সংসার করতে, শুধু চেয়েছিলাম…

শেখরের সত্যিই যেন মায়া হলো স্থরুচির দিকে চেয়ে। নিরুপায় দৃষ্টিতে কেবল চেয়েই রইল শেখর! এতক্ষণে শেখরের চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগলো।

স্থরুচি শেখরের আরো কাছে সরে এল।

দু হাত দিয়ে শেখরের হাত দুটো ধরে বললে—তুমি কিছু মনে কোর না শেখরদা…তুমি কেঁদো না—

আঁচল দিয়ে শেখরের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তোমায় যা কিছু বলেছি সব ভুল, সব রাগ করে বলেছি, তোমায় আমি দুঃখ দিতে চাইনি—নিজের দুঃখটা শুধু তোমায় জানাতে চেয়েছিলাম—তুমি কিছু মনে কোর না যেন—

শেখর তবু আবার দৃঢ় হবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন কথা মুখ দিয়ে বেরুল না তবু।

স্থরুচি বললে—এবার তুমি যাও—

শেখর তবু যেতে পারলো না যেন। একবার যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল, এবার যাবার স্বাধীনতা থাকলেও কে যেন তার পা দুটো আটকে রেখেছে জোর করে।

স্থরুচি শেখরকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—না তুমি যাও শেখরদা—আমি বলছি তুমি যাও—এই দেখ আমি হাসছি, আমি কিছু মনে করবো না—নইলে রাহুল ঘুম থেকে উঠলে তুমি বিব্রত হয়ে পড়বে শেখরদা—

তবু শেখর নড়লো না।

স্থরুচি শেখরের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—সত্যি আমি কিছু মনে করবো না শেখরদা—তুমি যাও—

শেখর পাথরের মত স্থির হয়ে রইল তবু।

স্থরুচি বললে—তোমার বদনাম হবে শেখরদা—যাও—তোমার ব্রহ্মচর্যে বিঘ্ন ঘটবে শেখরদা—যাও—তোমার পায়ে পড়ি শেখরদা, তুমি যাও—

তবু শেখর নড়লো না এতটুকু।

সুরুচি এবার আবার কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—তুমি যাবে না?

শেখর এতক্ষণে কথা বললে। বললে—না—

—কিছুতেই যাবে না?

শেখর বললে—না!

সুরুচি বললে—তাড়িয়ে দিলেও যাবে না?

শেখর বললে—না, আমি থাকবো!

সুরুচি হাসলো এবার। বড় বাঁকা সে হাসি। বললে—তুমি যেতেও যেমন শেখরদা আসতেও তেমনি, যখন বড় প্রয়োজন ছিল তোমাকে তখন তুমি চলে গেলে, আবার আজ যখন সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে আমার তখন তুমি এলে, তোমাকে নিয়ে আমি কী করি বলতে পারো?

বাইরে উদ্বাস্তু শিবিরে কিছু কিছু লোকের গলা শোনা যায়। বোধহয় বিকেল হয়ে আসছে। যারা রোদের ভয়ে এতক্ষণ আশ্রয়ের ভেতরে ছিল তারা এবার বাইরে আসছে। এখনি হয়ত মহিলারা একে একে তার কাছে আসবে। গৌরদাসবাবুরও হয়ত কাজ হয়ে গেছে—তিনিও এবার আসবেন।

সুরুচি বললে—এবার ওরা সবাই আসবে, এ-অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে তোমায়—

শেখর অন্য দিকে চেয়ে বললে—দেখুক, আমি যে কত বড় মিথ্যেবাদী, কত বড় ভণ্ড, কত বড় হতভাগ্য, ওরা তা দেখুক, ওরা তা জানুক—

—তোমার লজ্জা করবে না? মাথা কাটা যাবে না?

শেখর বললে—এতদিন কেবল লজ্জা বাঁচিয়েই তো চলেছি, লোকনিন্দা বাঁচিয়েই তো চলেছি—এবার না হয় ধর্ম বাঁচিয়ে চলি, সত্য বাঁচিয়ে চলি—

সুরুচি বললে—তা হলে রাহুলকে ডেকে বলো তুমি ওর কে, আমি ওর কে—বলতে পারবে? সাহস হবে তোমার?

শেখর একবার যেন কী ভাবলে।

সুরুচি বললে—এ তোমার বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়াও নয়, ইংরেজের জেলখানায় কয়েদখাটাও নয়—এতখানি অহঙ্কার কোর না শেখরদা—

শেখর বললে—তুমি জাগাও ওকে—রাহুলের ঘুম ভাঙিয়ে দাও—

সুরুচি বললে—তুমি ভেবো না তোমায় লজ্জায় ফেলে আমার খুব সুখ

—কিন্তু তার আগে নিজের মনকে ঠিক করে নাও—সমাজ সংসার দেশ কাল সব কথা ভেবে জবাব দাও—

শেখর বললে—ভেবেছি, আজ বারো বছর ধরে ভেবেছি—

সুরুচি অভিভূত হয়ে পড়লো যেন। বললে—ভেবেছ শেখরদা? তুমি ভেবেছ আমার কথা?

শেখর কিছু উত্তর দিলে না।

সুরুচি বললে—তবে এতদিন জবাব দাওনি কেন?

—কীসের জবাব?

সুরুচি বললে—তোমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিনের পর দিন ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেছি, তোমার চোখে পড়েনি তা এমন নয়—

শেখর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—অতীতকে আমি অস্বীকার করেছি, আজ তাকে আর স্বীকার করি না—

সুরুচি বললে—সে অতীত অস্বীকার করায় লাভ ছিল বলেই অস্বীকার করেছিলে—কিন্তু টাকা?

শেখর বললে—সে টাকাতেও আমার কোনও অধিকার নেই—

—কার অধিকার আছে?

—তোমার।

সুরুচি হেসে উঠলো। বললে—হাসালে তুমি শেখরদা, আইনের অধিকারের কথা না হয় ছেড়েই দাও—কিন্তু তুমিই তো তাঁর সত্যিকারের উত্তরাধিকারী—

শেখর বললে—তাঁর সন্তানের কর্তব্য আমি তো করিনি—

সুরুচি বললে—তা হলে আমিই যেন তাঁর স্ত্রীর কর্তব্য যথাযথ করেছি!

শেখর বললে—করোনি?

সুরুচি বললে—তুমি বিশ্বাস করো আমি করেছি?

শেখর হঠাৎ বড় নিষ্ঠুর ক্রূর কঠোর হয়ে উঠলো।

সুরুচি তবু থামলো না। বললে—বলো, তুমি মনে প্রাণে তাই বিশ্বাস করো নাকি? সত্যি বলো?

শেখর তবুও চুপ করে রইল।

সুরুচি বললে—বলো তুমি শেখরদা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি বলো, তোমায় বলতেই হবে, চুপ করে থাকলে আজ চলবে না—

শেখর তখনও চুপ করে আছে। সুরুচি শেখরের দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—বলবে না তুমি? তোমার মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই—বলো তুমি!

শেখর জবাব না দিয়ে আবার ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সুরুচি সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললে—আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি পালাতে পারবে না,—কিছুতেই না—

শেখরের চোখে মুখে যেন ঘৃণা ফুটে উঠলো।

বললে—ছাড়ো—

সুরুচি বললে—না ছাড়বো না, একবার যখন তোমায় কাছে পেয়েছি, কিছুতেই ছাড়বোনা—তোমায় বলতেই হবে—

শেখর সুরুচির মুখের ওপর চোখ রেখে বললে—কী শুনতে চাও বলো—

সুরুচির মাথাটা কেমন যেন ঘুরতে লাগলো। বললে—কেমন করে তুমি বললে যে আমি তাঁর স্ত্রীর কর্তব্য করেছি—?

শেখর একবার চেয়ে নিলে সুরুচির শরীরের দিকে, তারপর বললে—করোনি তো এসব কী? এই সাদা থান, এই একাদশী—এই বৈধব্য···এও তো স্ত্রীর কর্তব্য করা··

বলেই শেখর দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরতে গিয়ে সুরুচির মাথাটা আরো ঘুরে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে গেল টাল খেয়ে। মাথাটা দরজায় লাগতেই—মাগো বলে একটা আর্তনাদ করে উঠলো সুরুচি।

সে চীৎকারে রাহুল ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে হঠাৎ। আর তারপর কিছু মনে নেই।

সভায় তখনও গান হচ্ছে—

নূতন তব জনম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম চির মধু নিস্যন্দ·

ঢুধটুলিয়া পাহাড়ে তখন রাত তিনটে। বৃষ্টির তখনও বিরাম নেই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ বুঝি ভাসিয়ে তবে ক্ষান্ত হবে এ। আমার সামনে তখনও দাড়ি গোঁফ নিয়ে ভদ্রলোক চুপ করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে এক একটা কথা বলেন। তখন আর বৃষ্টি থাকে না, ঝড় থাকে না, জল থাকে না, পাহাড় পর্বত কিছু থাকে না। সমস্ত একাকার হয়ে যায়। মনে হয় এক রাজপুত্র প্রমোদ উদ্যান ছেড়ে চলেছেন—সুন্দরী কিশা গৌতমী দেখলেন তাঁকে। কিশা গৌতমী গান গাইছেন—নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতো নূন সো পিতা।

নিব্বুতা নূন সা নারী যস্সায়ং ঈদিসো পতীতি…

কথাটা কানে বাজলো কুমারের। কেমন করে সেই পরম ও চরম সুখ পাওয়া যায়! উদ্বেল হলো কুমারের মন। পার্থিব সুখের শেষ আছে, অবসাদ আছে, পার্থিব ভোগবিলাসের সীমা আছে। কিন্তু কোথায় সেই প্রেম যা পেলে জন্ম-মৃত্যু-ভয়, জরা-ব্যাধি-বার্ধক্যের ভয় থাকে না। কোথায় সেই নিব্বুত? কোথায় সেই নির্বাণ? বন্ধন কেমন করে মোচন করা যায়। যে-বন্ধন গোপা, যে-বন্ধন রাহুল!

গৌরদাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এবার আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের পরলোকগত প্রাণ শ্রীমান শেখরের স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন সভানেত্রী শ্রীমতী সুরুচি চৌধুরী—

রাত ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হলো। কুমার উঠলেন। ক্রমে ক্রমে উৎসবক্লান্ত সঙ্গীরা সবাই তন্দ্রায় অচেতন। ঘরে সুগন্ধী দীপ জ্বলছে। চিন্তাতপ্ত চোখ দুটিকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে কুমার চোখ বুজলেন। আবার চোখ খুললেন। নিদ্রায় কারো অঙ্গবাস খসে গেছে। শিউরে উঠে কুমার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কুমারের মনে হলো—তিনি ভ্রান্ত! এই মিথ্যা রূপের মোহে এতদিন বিবশ হয়ে ছিলেন তিনি। নিত্য সত্য সুন্দরের দিকে তাঁর নজর পড়েনি! ধিক্কারে মন ভরে গেল কুমারের। কেমন করে উদ্ধার হবে তাঁর। বিষাক্ত বৃশ্চিক দংশন করছে তাঁকে। কেমন করে এ-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হবে। দেখলেন অচৈতন্য অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছেন গোপা, রাহুলও নিদ্রিত! সর্বত্র বন্ধন! পালিয়ে এসে বাইরে একবার দাঁড়ালেন। ডাকলেন —ছন্দক!

বললাম—তারপর?

ভদ্রলোক বললেন—তারপর অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে ধারে একলা বেড়ালাম।

যা একদিন অত ভালো লেগেছিল, যে-আশ্রমকে একদিন নিজের প্রাণের চেয়েও ভালো বেসেছিলাম, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে যাদের নিয়ে একদিন কত খেলা করেছি, যাদের দুঃখে কেঁদেছি, যাদের সুখে সুখ পেয়েছি, সব বিরস মনে হলো, সব মিথ্যে মনে হলো।—মনে হলো চরম ও পরম সুখ তো এতেও নেই—সব সমস্যার সমাধান তো এ-পরিকল্পনায় নেই—সবই তো বন্ধন—। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও এ যে আরো বড় জেলখানায় কয়েদ খাটছি—।

ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়লাম। শিবিরের বাইরে এক মাইল সরু পথ, সে পথ দিয়ে বেশি লোক হাঁটে না। সেখানে মাথার ওপর বড় বড় গাছ আকাশ ঢেকে ফেলেছে—দু'পাশে জঙ্গল। রাত হয়ে এল—যেন মাথাটা ঠাণ্ডা হলো ক্রমে। কিন্তু আমার সমস্যার কোনও সমাধান হলো না—। একদিকে মিথ্যের মুখোস পরা সমাজ, কিন্তু অন্যদিকে সত্যপথের সন্ধান কে দেবে! পথ কোথায়? কোথায় নির্বাণ, কোথায় নিবৃত, কোথায় শান্তি!

ভদ্রলোক থামলেন।

বললাম—তারপর?

৬

গৌরদাসবাবু যখন কাজ সেরে এলেন, ঘরের বাইরে থেকেই ডাকলেন—মা-জননী—

কিন্তু সুরুচির যখন জ্ঞান হলো, দেখলে—ঘরে লোকজন ভরে গেছে। রাহুল একপাশে হতবাকের মত বসে আছে জড়সড় হয়ে। নবীনের মা মাথায় বরফ দিচ্ছে। তারকও এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে।

গৌরদাসবাবু বললেন—এখন কেমন আছো মা-জননী?

তারপর বললেন—সারাদিন একাদশী, বড্ড পরিশ্রম গেছে মা তোমার, এবার তোমার বাড়ি যাওয়া উচিত মা—বাড়িতে গেলে তোমার সেবা শুশ্রূষা ভালো হবে—আর রাতও অনেক হয়ে গেছে—

তারক গাড়ি তৈরি করলে।

নবীনের মা ধরে ধরে তুলে নিয়ে এল সুরুচিকে। বড় দুর্বল মনে হলো নিজেকে।

সবাই পায়ের ধুলো নিলে। গৌরদাসবাবু ড্রাইভারকে বললেন—সামনের সরু রাস্তাটা একটু সাবধানে চালাবে বাবা—

সমস্ত আশ্রমের পুরুষ-মহিলারা বিদায় দিতে এসেছিল। আনন্দের আয়োজন করে এমন দুর্বিপাক ঘটবে জানা ছিল না কারো। সবাই যেন একটু লজ্জিত। এমন করে পীড়াপীড়ি না-করলেই বুঝি ভালো হতো। অনেক পরিশ্রম করতে হয় মিসেস চৌধুরীকে। তাঁর অফিসের কাজ, সংসারের কাজ। অনেক কাজের মানুষ তিনি। তার ওপর একাদশীর কৃচ্ছ সাধন। এমন করে তাঁকে বিব্রত করা উচিত হয়নি।

নবীনের মা বললে—আবার যে আসতে বলবো তোমাকে—সে-মুখ আমাদের নেই মা—

গাড়ি একসময় চলতে সুরু করলো।

কিন্তু বেশি দূর যায়নি। শিবিরের গেট পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। গাড়িতে সুরুচি চুপ করে চোখ বুজে হেলান দিয়েছিল। আবার সেই দিনানুদৈনিক সমস্যা, সভ্য মানুষের সমাজে আবার মুখে মুখোস তুলে নেওয়া, আবার প্রবঞ্চনা। আবার সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হওয়া। শেখর আর আসবে না!

যখন ভীড়ের মধ্যে সবাই এসে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, গৌরদাসবাবু একবার জিগ্যেস করেছিলেন—শেখরকে দেখছি না, শেখর কোথায় গেল?

নির্মল না বসন্ত কে একজন বললে—শেখরদাকে বাইরে যেতে দেখেছি—

গৌরদাসবাবু জিগ্যেস করেছিলেন—বাইরে? কোথায়?

—জঙ্গলের সরু রাস্তাটার দিকে একলা-একলা ঘুরছে দেখলাম।

—তাকে ডেকে নিয়ে এসো তো, ডাক তাকে।

সুরুচি মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু বলতে চেয়েছিল—না কাকাবাবু, শেখরদা আসবে না—

কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। মানুষকে এমন করে অপমান করা উচিত হয়নি সুরুচির। বড় আঘাত দিয়েছে সে। কিন্তু আঘাত যতটা সে দিয়েছে ততটা সে নিজেই তো পেয়েছে। শেখরকে আঘাত দিয়ে কি তার আনন্দ! যাকে মনে প্রাণে কামনা করি তাকে কেন আঘাত দিই কাছে এলে! অথচ আঘাত দেবার বাসনা তো ছিলনা তার!

শেখরদা একদিন বলেছিল মনে আছে—সেতারের তারে আঘাত দিলে

তবে সে বাজে—যে বাজাবার জন্যে আঘাত দেয় তার আঘাত ভালবাসার আঘাত, তাতে বেদনা নেই—

জানি না সে-কথা আজ শেখরদার মনে আছে কিনা। নিশ্চয়ই মনে আছে। তা যদি মনে না থাকে তো হয়ত খুব ব্যথা পেয়েছে। হয়ত একলা কেঁদেছে বাইরে গিয়ে। নিজের ব্যথা আড়াল করতেই হয়ত সে এমনি করে আত্মগোপন করেছিল তখন!

গাড়িতে বসে বার বার সুরুচি বলেছিল—নিজের বেদনার শেষ হয় হোক, না হয় না হোক, কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু বেদনা কাউকে দিয়েছি এ ক্ষোভ যে যাবার নয়। সংসারে কাউকে ব্যথা দেবার সাধনায় যেন তার শক্তি ক্ষয় না হয় ঈশ্বর। ব্যথা পেলে আঘাত পেলে তবেই বুঝি আঘাতের গুরুত্ব বোঝা যায়। কিন্তু তবু কেন সে আঘাত দিলে শেখরকে!

ভদ্রলোক বললেন—সে রাত্রে কিন্তু মিসেস চৌধুরীর বাড়ি ফিরে যাওয়া আর হয়নি—

জিগ্যেস করলাম—কেন?

—যাবার মুখেই দুর্ঘটনা ঘটলো যে! দুর্ঘটনা দিয়ে যে-জীবনের আরম্ভ তার জীবন দুর্ঘটনায় শেষ হবে তাতে আর বিচিত্র কী! আজো যদি চার্চ লেনের অফিস পাড়ায় কোনোওদিন যান, দেখবেন ঠিক সাড়ে নটার সময় বিরাট একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ায় চৌধুরী কোম্পানীর অফিসের সামনে। গেটের দরোয়ান দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়ায়। আর গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মিসেস চৌধুরী। মাথার চুল অল্প-অল্প পাকতে সুরু হয়েছে। কাগজের মত নিষ্প্রাণ সাদা শরীর—শুকিয়ে এসেছে। দেখলেই বুঝবেন শরীরে রক্ত নেই। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেন তিনি। অফিসের নানা চেয়ার টেবিল ফার্ণিচারের মতই একজন। অফিসের কাজের স্রোতে জীবন কেটে যায়। আক্ষেপ নেই, আশাও নেই। অথচ অনুশোচনাও নেই। তারপর সন্ধ্যে সাতটার সময় আবার গাড়িটা এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। তেমনি কাগজের মত একখণ্ড শরীর ভেসে এসে গাড়ির ভেতর আবার বসে। তারপর জনস্রোতে যানস্রোতে মিশিয়ে যায় সে-খানা। এমনি রোজ। এর আর কোনও ব্যতিক্রম নেই এক রবিবার ছাড়া।

ভেঙ্কটরমণ বাড়ি যাবার পথে আজো অন্যমনস্ক হয়ে কেবল অফিসের

কথাই ভাবে। মিসেস চৌধুরীর কথাই ভাবে। বাজেটের ফাইল, ইনকাম ট্যাক্স, সুপার চার্জ, ব্যালেন্স্ শীট, আর এস্‌ট্যাবলিশমেণ্ট ম্যানুয়েল।—ওঃ হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল লেডী—

বাড়িতে সিঁড়ির কোনে বসে গোপাল বলে—আমি কারো চাকর নই জানো—আমাকে বলছো কেন শুনি—

ক্ষীরদা ঝি রোয়াকের ওপর ভর সন্ধ্যেবেলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকে। উঠোন ঝাঁট দেওয়া হয়নি, বাসন মাজা হয়নি—সেদিকে হুঁশ্ থাকে না কারো।

গোপালকে বললে বলে—আমি কেন দেখবো, আমার বয়ে গেছে দেখতে, আমি কারো কেনা চাকর নই তো—

খেতে ডাকলে বাড়ির ভেতর গিয়ে খেয়ে এসে আবার দিব্যি সিঁড়ির নিচে চুপ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে।

ভটচাযি্য মশাই আবার এসে বলেন—কাল লক্ষ্মীপুজোর ব্যবস্থা করতে হবে মা—কিছু আলোচাল চাই যে—

অফিসে রাজেনবাবু তাঁর ছোট জামাইকে সঙ্গে করে এনে বলেন—আমার জামাইকে একটা চাকরি দিলে বুড়ো বয়েসে আমার ভারি উপকার হয় মা—

গৌরদাসবাবুও আসেন। বলেন—আমাদের ঘানির তেলটা খুব চলছে মা, এবারে একটা দেশলাই-এর কারবার করবো ভাবছি—এখনো অনেক লোক বেকার বসে আছে—

সুরুচি একবার শুধু জিগ্যেস করে—রাহুল কেমন আছে কাকাবাবু?

গৌরদাসবাবু বলেন—তার জন্যে ভেবো না মা, শেখরের ছেলে সে; সে যে আমার নিজেরই ছেলে—

গৌরদাসবাবু একদিন বলেছিলেন—কাজের মধ্যেই আত্মার মুক্তি, বৈরাগ্যও মুক্তি নয়, অন্ধকারও মুক্তি নয়, আলস্যও মুক্তি নয়। ওরা হলো ভয়ংকর বন্ধন, এই বন্ধন কাটাবার একমাত্র অস্ত্র হলো কর্ম, এই কর্মই আমাদের মুক্তি দেয়, আর সংসারই সেই কর্মস্থল, সংসার ছাড়লে তোমার চলবে না তো মা, মুক্তি যদি চাও তো এ-সংসারেই তোমায় থাকতে হবে যে।

গৌরদাসবাবু বললেন—এইবার সভানেত্রী সুরুচি চৌধুরী আমাদের

প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ পরলোকগত শেখরনাথ দত্তের স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন···

সভানেত্রীকে ধরে ধরে সন্তর্পণে স্মৃতিসৌধের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরাও সবাই চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালাম।

গৌরদাসবাবু বললেন—সাধনার মধ্যে দিয়েই যে আমাদের সিদ্ধি হবে, সংসারের সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকেই যে জাগিয়ে রাখতে হবে, এই সত্যটি যে কর্মী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল তার পরলোকগত আত্মার কল্যাণে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি যেন তার আত্মা আমাদের সাধনার মধ্যে দিয়ে শান্তি পায়, স্বস্তি পায়—

আরো কী কী যেন সব বললেন গৌরদাসবাবু। মিসেস চৌধুরী ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে। সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি সৌধ। প্রীতিতে, পবিত্রতায়, সৌরভে সমস্ত আবহাওয়া মুখরিত।

মেয়েরা আবার গান ধরলো—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থা তাহার লোভ জটিল বন্ধ।

আমরা সবাই গান শুনছিলাম। আমার কেবল মনে পড়তে লাগলো সেই দুধটুলিয়ার পাহাড়ের সেই ভদ্রলোকের গল্প।

বৃষ্টি তখনও থামেনি। রাত তখন প্রায় চারটে।

বললাম—তারপর ?

ভদ্রলোক বললেন—দুর্ঘটনা ঘটলো বড় আশ্চর্য রকমভাবে! আমি নিঃশব্দে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বসেছিলাম। হঠাৎ একটা গোলমালে সচকিত হয়ে উঠেছি। কান পেতে শুনি সবাই দৌড়চ্ছে। মনে হলো যেন সবাই বলছে—শেখরদা মোটর চাপা পড়েছে—

কে একজন বললে—কার মোটরে— ?

আর একজন বললে—মিসেস চৌধুরীর—

আমাদের প্রতিষ্ঠানের সবাই তখন দৌড়েছে। সবাই বলছে—কোথায়! কোথায়! কেউ বলে—কে চাপা পড়েছে! কারো কোনওদিকে খেয়াল নেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। হায় হায় করছে সবাই।

কিন্তু অনেক রাতের মত সে-রাত্রেও মিসেস চৌধুরীর ঘুম এল না।

মনে আছে ভদ্রলোকের গল্প শুনতে শুনতে কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। শেষের দিকে বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি বৃষ্টি থেমে গেছে। কেউ নেই কোথাও। তারপর সকালবেলা চারদিকে খোঁজ করেও আর তাঁর দেখা পাইনি। সে-সপ্তাহে আর ডাক এল না। পরের সপ্তাহেও না। আর তার পরের সপ্তাহে তো চলেই এসেছিলাম ভুধুটুলিয়া থেকে।

লাহিড়ী সাহেব পরে চিঠি লিখেছিলেন—সে লোকটার আর কোন সন্ধান নেই। কোথায় চলে গেছে জানেন না।

কিন্তু আজ এই স্মৃতি-সৌধের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিনের মিসেস চৌধুরীর দৃশ্যটা যেন কল্পনা করে নিতে পারি।

গৌরদাসবাবুর তখন বিশ্রাম নিতে যাবার কথা। সব কাজ শেষ করে নিজের কিছু কাজ সেরে ঘরে গিয়ে বসবেন, হঠাৎ দুর্ঘটনার খবর কানে এল। কে বললে—শেখর নাকি মোটর চাপা পড়েছে—

গৌরদাসবাবু খবর পেয়েই দৌড়ে গেছেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে আশা করবার আর কিছুই নেই।

তারক ব্রেক কষবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সরু অন্ধকার রাস্তা, ঠিক তাল রাখতে পারেনি! রাত হয়ে গেছে দেখে গাড়িটা একটু জোরেই চালিয়েছিল সে। কিন্তু পাশের জঙ্গল থেকে কে যেন হঠাৎ রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালো—আর সঙ্গে সঙ্গে···

—গেল, গেল, গেল—

ভীষণ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা থামল। কিন্তু তখন সে একেবারে চাকার তলায় ঢুকে গেছে।

সুরুচি বললে—কী হলো, তারক ?

তারক বললে—আজ্ঞে একটা লোক চাপা পড়েছে—

সে কি ! সুরুচি উঠলো। রাহুলও উঠতে যাচ্ছিল। সুরুচি বললে—তুমি বোস রাহুল, আমি দেখি—

চারদিকে অন্ধকার। অশান্ত ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঐক্যতান। অন্ধকারে সুরুচি নেবে দাঁড়াল। জিগ্যেস করলে—কোন দিকে ?

তারক তখনও কাঁপছে। বললে—এইযে—

সুরুচি বললে—দেখ তো বেঁচে আছে কি না—

অন্ধকারেও বোঝা গেল সমস্ত জায়গাটা তখন রক্তে ভেসে গেছে। সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

সুরুচি বললে—গাড়িতে তোল তারক—

কিন্তু গাড়িতে তোলা অত সহজ নয়। দীর্ঘ চেহারার মানুষ। তারকেরও সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেল। গাড়িতে ওঠাবার সময় হেডলাইটের আলোয় চেহারাটা দেখেই সুরুচির মাথাটা ঘুরে এসেছে।

—শেখরদা!

মুখের কাছে মুখ এনে সুরুচি ভালো করে দেখলে। শেখরই তো বটে! কিন্তু এমন করে আত্মাহুতি দেবার কী প্রয়োজন ছিল?

সমস্ত মাথাটা আবার ঘুরতে লাগলো সুরুচির। সুরুচি আর রাহুল সামনের সিটে বসলো।

সুরুচি বললে—গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলো তারক—গৌরদাসবাবুর ওখানে হাসপাতাল আছে—

গেটের কাছে আসতেই খবর পেয়ে গৌরদাসবাবু দৌড়ে এসেছেন।

গৌরদাসবাবু দুই হাতে তুলে ধরলেন সুরুচিকে। বললেন—স্থির হও মা—

কিন্তু এমন করে অস্থির হবার মত ঘটনায় কেমন করে স্থিরই বা থাকা যায়। সুরুচির মনে হলো—আপনাকে দান করবার উপাসনা যেন শেখরদার এতদিনে এত মর্মান্তিকভাবেই সিদ্ধ হলো। যে-বাধা এতদিন এত উত্তুঙ্গ হয়ে দু'জনের মধ্যে অভেদ্য আড়ালের সৃষ্টি করেছিল, স্বেচ্ছায় আত্মদান করে শেখরদা বুঝি তা এখন ধূলিসাৎ করে দিলে। শেখরদা যেন এতদিন যে-সাধনা করছিল তাতে সে-বাধা দূর হয়নি। দিনে দিনে ভক্তি দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, সন্তোষ দিয়ে, সেবা দিয়ে, মঙ্গল দিয়ে, প্রেম দিয়ে নিজেকে বাধাহীনভাবে ব্যপ্ত করে তাকেই আরো কাছে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও যখন সাফল্য আসেনি, তখন শেষ পর্যন্ত এই পথই বেছে নিয়েছে। এই অমানুষিক আত্মদানের পথ!

আজও গৌরদাসবাবুর মনে আছে সুরুচির সেদিনকার সেই কান্নার কথা। ছেলেমানুষের মত আকুল হয়ে বলেছে শুধু—এ কী করলাম আমি কাকাবাবু,

এত বড় পাপ, এত বড় অপরাধ—এর জন্যে আমায় কী চরম শাস্তি দেবেন দিন—আমি যে খুন করেছি তাকে কাকাবাবু—খুন করেছি—

আরো মনে আছে রাত্রে সেদিন যাওয়া হয়নি তার। সমস্ত রাত স্নুরুচি শুধু ছট্‌ফট্‌ করেছে আর বলেছে—আমায় শাস্তি দিন৷ কাকাবাবু- আপনার পায়ে পড়ি—

তারপর রাত যখন আরো গভীর হয়েছে, যখন সব গোলমাল থেমে গেছে তখন স্নুরুচি যেন পাগলের মত প্রলাপ বকেছে কেবল। গৌরদাসবাবু মাথার কাছে বসে কেবল হাত বুলিয়ে দিয়েছেন মাথায়। বলেছেন—শান্ত হও মা—শান্ত হও—

স্নুরুচি বলেছে—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন কাকাবাবু?

গৌরদাসবাবু বললেন—ক্ষমার কথা কেন বলছো মা?

স্নুরুচি বললে—মানুষের কাছে মুখ তুলে চাইবার অধিকার যে আমার নেই কাকাবাবু—আমি যে অশুচি—

গৌরদাসবাবু বললেন—অশুচি কেন মা?

স্নুরুচি বললে—স্বামী আমার স্বামী নয়, সন্তান আমার সন্তান নয়, এর চেয়ে অশুচিকর আর কী হতে পারে কাকাবাবু—

একে একে সব কথা বলে গেছে স্নুরুচি। কোনও কথা সেদিন গোপন করেনি আর—

বলেছে—যাকে সন্তান বলে জানি তার ওপর মা-র কর্তব্য করতে পারিনি. কাকাবাবু, যাকে স্বামী বলে জানি তার ওপর স্ত্রীর কর্তব্য করতে পারিনি—এ আমার কোন পাপের ফল বলুন—এ যে আমার কী বিড়ম্বনা—

স্নুরুচি কেবল বলেছে—কাকাবাবু আপনি আমায় বাঁচান, চৌধুরী সাহেবের যে-সম্পত্তি তা ভোগ করবার আমার কোনও অধিকার নেই, আমি তাঁকেও বঞ্চনা করেছি—

তারপর খানিক থেমে আবার কাঁদতে লাগলো। বললে—আমি সংসারকে বঞ্চনা করেছি, সমাজকে বঞ্চনা করেছি, বাবাকে আপনাকে, সকলকে—

বললে—ছোটবেলা থেকে যেখানে প্রীতি পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, এতটুকু স্নেহ মমতা পেয়েছি, প্রতিদানে তাকে কেবল ঠকিয়েছি—আমার মত এমন প্রবঞ্চক আর সংসারে দুটি নেই—

তারপর আবার বলতে লাগলো—মানুষকে ভালোবাসতে গিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষই আমায় দূরে ঠেলে দিলে, মানুষকে ভালোবাসতে গিয়ে তাকে দূরেই ঠেলে দিলাম কেবল—

রাত আরো গভীর হলো। সকালবেলা গৌরদাসবাবু বললেন—এবার চলো মা—

সুরুচি বললে—আমি কোথাও যাবো না কাকাবাবু, এখানে আপনার কাছেই থাকবো—

গৌরদাসবাবু বললেন—কিন্তু এখানে তোমার থাকা চলবে না তো মা—

সুরুচির শুকনো মুখ হতাশায় আরো শুকিয়ে গেল।

বললে—আমায় তাড়িয়ে দেবেন কাকাবাবু?

—তোমাকে আরো আপনার করে নেব মা।

বলে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন। বললেন—রাহুল আমার কাছে থাকবে, ও শেখরের ছেলে, আমারও ছেলে, আমি ওকে নিলাম, অন্য ছেলের সঙ্গে থাক এখানে, ওর কোনও কষ্ট হবে না, হোস্টেল বোর্ডিং-এও তো ছেলেরা মা'কে ছেড়ে থাকে—তেমনি থাক্—ওকে আমি বুঝিয়ে বলেছি—তুমি মাঝে মাঝে এসে শুধু দেখে যেও—

সুরুচি বললে—আর আমি?

—তোমার তো ছুটি নেই মা, তোমাকে আমি কাজ দেব, আর নিজের সেই কাজের মধ্যে যদি আনন্দ খুঁজে নিতে পারো তো তবেই মুক্তি পাবে।...

সুরুচি বললে—তাহলে আমার কি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারও নেই কাকাবাবু?

আজ অফিসের চেয়ারে বসে সেদিনকার সব কথা মনে পড়ে মিসেস চৌধুরীর। গৌরদাসবাবু বলেছিলেন—প্রায়শ্চিত্ত নয় মা, অমৃত। উপনিষদে আছে—অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে—কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা মানুষ অমৃত লাভ করে—সেই সাধনাই তোমায় করতে হবে মা এখন থেকে—

গৌরদাসবাবু সেই সকালেই গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে একেবারে সোজা চার্চ লেনের অফিসে গিয়ে তুললেন। তারপর তার নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এই তোমার কর্মদীক্ষা মা—এখন সিদ্ধি তোমার নিজের হাতে,

মানুষকে ভালবাসতে চেয়েছিলে, এখন আবার ভালবেসে দেখ, ভালবাসা পাবে মানুষের কাছ থেকে, কর্মের মধ্যে থেকেই তো কর্মের উর্ধ্বে উঠতে হয়, পরিত্যাগ করে পলায়ন করার নাম মুক্তিও নয়, প্রায়শ্চিত্তও নয়—

ভদ্রলোক বললেন—তারপরে সেই রাত্রেই আমি সকলের চোখের আড়ালে বেরিয়ে পড়লাম—

জিগ্যেস করলাম—আর যে লোকটা চাপা পড়লো— ?

ভদ্রলোক বললেন—তার কথা জানি না, কত নাম না জানা লোক ওখানে ঘুরে বেড়াত তাদেরই কেউ একজন হবে—কে তাদের ঠিকানা রাখে, কে তাদের কথা ভাবে—কেউ ভাবেনি—আমিও ভাবিনি—

আমার মনে হলো—আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম কপিলাবস্তু থেকে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ একদিন মধ্যরাত্রে বেরিয়ে পড়লেন পথে। রেশমের মত কুঞ্চিত কেশদাম তরবারি দিয়ে কেটে ফেললেন—। এক ব্যাধের কাছে কাষায় বস্ত্র চেয়ে পরে নিলেন অঙ্গে। তারপর পদব্রজে চললেন লোকালয়ের পর লোকালয়, অরণ্যের পর অরণ্য, কান্তারের পর কান্তার অতিক্রম করে অনেক দূরের দুর্গম পথের সন্ধানে। তারপর বহু নগর, বহু রাজ্য পার হয়ে দেবতাত্মা দ্রুমের তলায় তাঁর আসন পাতলেন। আর তারপর বসলেন ধ্যানে। তারপর সেই নিবৃত্ত, সেই মহাপরিনির্বাণ, সেই বোধি! কতবার কতরূপে কতভাবে আমি বার বার জন্মগ্রহণ করেছি, তবু তৃষ্ণা আমার মেটেনি। তৃষ্ণার তৃপ্তি হয়নি বলেই আমি বারবার জন্মগ্রহণ করেছি। এখানে এবার তৃষ্ণা মিটেছে, এবার স্থিতধী হয়েছি, প্রজ্ঞা পেয়েছি, তৃষ্ণাহীন আসক্তি-হীন কামনা-বাসনা রহিত হয়েছি—বোধিত্ব পেয়েছি।

লাহিড়ী সাহেব চিঠিতে লিখেছিলেন—তার পরদিন থেকে সে-লোকটা আর আসেনি—কেউ আর তার কোন সন্ধানও দিতে পারেনি—

ভদ্রলোক বলেছিলেন—আজো যদি চার্চ লেন-এর অফিস-পাড়ায় কোনও দিন যান—দেখবেন বিরাট একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় চৌধুরী কোম্পানীর অফিসের সামনে। গেটের দরোয়ান দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়ায়। আর গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মিসেস চৌধুরী। মাথার চুল অল্প অল্প পাকতে সুরু করেছে। কাগজের মত নিষ্প্রাণ সাদা

শরীর—শুকিয়ে এসেছে। দেখলেই মনে হবে সে-শরীরে রক্ত নেই। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসেন তিনি। অফিসের নানা টেবিল চেয়ার কার্নিচারের মতই একজন। অফিসের কাজের স্রোতেই জীবন কেটে যায়। আক্ষেপ নেই—আশাও নেই। অথচ অনুশোচনাও নেই। তারপর সন্ধ্যে সাতটার সময় আবার গাড়িটা এসে গেটের সামনে দাঁড়ায়। তেমনি কাগজের মত সাদা একখণ্ড শরীর ভেসে এসে গাড়ির ভেতর বসে। তারপর জনস্রোত আর যানস্রোতে মিশিয়ে যায় সে-খানা। এমনি রোজ। এর আর কোনও ব্যতিক্রম নেই।

আর ওদিকে একজন পুরুষ—অবজ্ঞাত অখ্যাত একটি প্রাণী মানুষের ভিড় থেকে দূরে সরে গিয়ে পাহাড় আর অরণ্য সীমা অতিক্রম করে জীবন-প্রশ্নের চরম উত্তরের সাধনায় মগ্ন। রোদ-বৃষ্টি শীত-বর্ষা জয় করে আরো কঠোর, আরো কঠিন, আরো চরম আরো পরম সমাধান চাইছে।

আমার মনে হলো—কোথায় রইলেন মিসেস চৌধুরী। কোথায় রইল শেখর। কিন্তু দূরে গিয়ে কি শেখর সত্যিই সুদূর হতে পেরেছে। এক শয্যায় শুয়ে এক ছাদের তলায় বাস করেও কি এত একাত্ম হওয়া যায়! ইন্দ্রিয় দিয়ে নাই বা পেলাম, আমার অন্তরের অতীন্দ্রিয়তে, আমার চেতনার স্পন্দনে সে তো আছে। পাওয়া যেখানে অপমান, না পাওয়া যেখানে গৌরব, অন্তর্দেশের সেই অনির্বচনীয় লোকেই তো তাকে পেয়েছি। যে আমার প্রিয়, তাকে প্রয়োজনের সীমায় বেঁধে রেখে তার যে শেষ পাইনে। কোনও কালের বাঁধনে বেঁধে তাকে নিঃশেষ করতে পারিনা, কোনও দেশের ভূগোলে সীমায়িত করে তাকে হারাতে চাই না। অপ্রাপ্তিই যে আমার সব অভাব পূর্ণ করেছে —অদর্শনই যে আমার সব দৃষ্টি সার্থক করেছে!

আমি আবার মিসেস চৌধুরীর দিকে চেয়ে দেখলাম।

মিসেস চৌধুরী তখন ধীর স্থির ভাবে হাতের মালাটা স্মৃতি-সৌধের চূড়োয় পরিয়ে দিলেন।

প্রশান্ত-গম্ভীর সঙ্গীতে বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠলো—

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।